প্রমোদ সেনগুপ্ত :
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ / প্রথম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা ৯

শব্দসূচি : অমলেন্দু ঘোষ

মুদ্রাকর : শ্রীমদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২-এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

বি ষ য় সূ চি

বর্তমান প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সিপাহি বিদ্রোহের শত-বার্ষিকী (১৮৫৭-১৯৫৭ খ্রী) উপলক্ষে প্রমোদ সেনগুপ্ত রচিত **ভারতীয় মহাবিদ্রোহ** বইখানি বিদ্যোদয় লাইব্রেরি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯৫৭ আগস্ট)। অতঃপর সুদীর্ঘ ২২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রথম সংস্করণের বই নিঃশেষিত ও দুষ্প্রাপ্য। নিষ্ঠাবান লেখক দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে তাঁর পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কপি প্রেসে যাবার অনেক আগেই লেখক পরলোকগমন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, বইখানি প্রথম প্রকাশকালে পাঠকসমাজে এক নতুন চিন্তাভাবনার প্রেরণা যোগায় এবং যোগ্য সমাদর লাভ করে। তার অন্যতম কারণ, ইতিহাস লেখক প্রমোদ সেনগুপ্ত মশায় দীর্ঘকাল যাবত তাঁর অভীষ্ট বিষয়ে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে লেখাপড়া করেছেন। ভারত ইতিহাসের সন্ধানী পাঠক হিসেবে ৩০ বছরেরও বেশি সময় যাবত তিনি বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলন করেছেন বিপ্লবী চিন্তাধারার সাহায্যে। এ বিষয়ে তিনি India Today-র লেখক প্রখ্যাত রজনীপাম দত্তের সহকারী হিসেবে কাজ করার সময় এবং প্যারিসের সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের কৃষি অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণাকালে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ পান।

গভীর পাণ্ডিত্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ প্রমোদবাবু জীবনে বেশিদিন কোথাও শান্ত ও স্থির থাকতে পারেন নি। মাতৃভূমি থেকে তাঁর বিচ্ছেদ প্রায় ২০ বছরের। জেল থেকে গ্রাজুয়েট হবার পর তিনি অক্সফোর্ডে যান আই-সি-এস হতে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আপত্তিতে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি। অতঃপর ১৯২৯ সনে তিনি বার্লিনে যান। ওই সময় তিনি নলিনী গুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রবাসী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসেন। বার্লিন থেকে ফেরবার পথেই তিনি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধরা পড়েন ফরাসি সরকারের নিরাপত্তা পুলিশের হাতে। পরে সেখান থেকে মুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে শুরু করেন সাংবাদিকের জীবন। এবং এই সময়েই কৃষ্ণমেনন, রজনীপাম দত্ত, সকলতওয়ালা প্রমুখের সঙ্গে তিনিও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সনে তিনি স্পেন ও ফ্রান্সে যান সেখানকার 'পপুলার ফ্রন্ট'-এর অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে। তারপর থেকে ফ্রান্সেই তিনি অবস্থান করেন এবং সেখানকার একটা স্কলারশিপ নিয়ে ডক্টরেটের জন্যে আবার লেখাপড়া শুরু করেন সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু

স্পেনের যুদ্ধে তাঁর মন আবার অশান্ত হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান ও প্যারিস পতনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। এই সময়ে তাঁকে কয়েকমাসের জন্যে পেঁতা সরকারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে হয়। ১৯৪২ সনে প্যারিসে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে, এবং এখান থেকেই তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয় 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর সঙ্গে। তারপর তিনি জার্মানিতে এসে 'আজাদ হিন্দ্' পত্রিকা সম্পাদন ও রেডিও পরিচালনার গুরুদায়িত্ব লাভ করেন। এতসব কাজের মধ্যেই লেখা 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। এই সময়ে বার্লিন পতনেরও তিনি অন্যতর সাক্ষী। অতঃপর ইণ্ডিয়ান মিলিটারি মিশনের হাতে ধরা পড়ে তাঁকে ১০ মাস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ব্রিটিশ অফিসারদের হাতে নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

অবশেষে দীর্ঘ ২০ বছর পরে তিনি অনুমতি পান মাতৃভূমিতে ফেরবার। কমিউনিজম গণতন্ত্র ফ্যাসিজম-এর সঙ্গে সঙ্গে ও ধ্বংসের মধ্যে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের আন্তরিক আকাংক্ষা ও আবেগের পরিচয় নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় এখানেও তাঁর অশান্ত জীবন তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। অর্থাৎ স্বদেশের নানা গণ-আন্দোলন ও কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে ১৯৫০ সনে স্বদেশীজেলের হাত থেকেও তিনি রেহাই পাননি। তাঁর এহেন বিচিত্র কর্মজীবনের দীর্ঘ পরিশ্রম, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সচেতন দেশাত্মবোধের ফসল এই গ্রন্থখানি তাই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এবং আমরা তার দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকসমাজে পৌঁছে দিতে পেরে, লেখকের বিয়োগজনিত দুঃখের মধ্যেও স্বভাবতই আনন্দিত। ইতি—

ভূমিকা

প্রায় দু'বছর হয়ে গেল। কলকাতায় ইতিহাসের এক নামকরা অধ্যাপকের বাড়িতে আমরা ক'জন কয়েকবার জড়ো হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সাধু। ১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকী উপলক্ষে যাতে সেই বিরাট ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সবাই মিলে সহযোগিতা করে একটা ভালো বই খাড়া করা যায়—এই ছিল আমাদের ইচ্ছা। একটা খসড়া ছক তৈরি করা হয়েছিল, লেখকদের মধ্যে অনেকের নামও স্থির হয়ে গেল; উপস্থিতদের মধ্যে প্রায় সকলেই এক একটা অধ্যায়ের ভার নেবেন বলে ঠিক হল। আর দু-একজন ঠেকে-শিখে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছাড়া আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হলাম এই ভেবে যে এবার একটা কাজের মতো কাজ বোধহয় করা যাবে।

ফলে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নির্ভুল প্রমাণ হল। লেখা সম্বন্ধে প্রায় কোনো প্রতিশ্রুতিই রক্ষিত হল না। এবং যারা প্রকাশ করবেন বলে আন্দাজ করা গিয়েছিল, তাঁদের একদিকে একান্ত ঔদাসীন্য, আর অন্যদিকে উন্নাসিক অস্থিরমতিত্ব—এই পরিকল্পনাকে একেবারে ব্যর্থ করে দিল।

আমার বন্ধু প্রমোদ সেনগুপ্ত আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে ওই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। যখন সবই অসার মনে করে তথ্যানুসন্ধানের পরিশ্রম থেকে রেহাই নেওয়া তাঁর পক্ষে অন্যান্য সহযোগীর মতোই সহজ ছিল, তখন কিন্তু তিনি তা করলেন না। রোজ নিয়মিত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে (জাতীয় গ্রন্থাগারে) গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটতে লাগলেন, বিস্তর মালমশলা জড়ো করলেন, বাংলা আর ইংরেজিতে ১৮৫৭ সম্বন্ধে বহুকথা লিখে কাগজ ভরালেন, আর নানা বাধা কাটিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ধারাবাহিক অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ইংরেজিতেও একখানি মোটা বই বের করার মতো লেখা তাঁর প্রস্তুত হলো। সেটা কবে ছাপা হবে, কিংবা আমাদের দেশের প্রকাশকদের কল্যাণে আদৌ বেরোবে কিনা, আমার জানা নেই। এখন বাংলায় যে তাঁর পুরো বই প্রকাশ হচ্ছে, এতে আমি খুবই খুশি।

প্রমোদবাবু প্রায় ২০ বছর ইয়োরোপে কাটিয়েছেন। ইয়োরোপের অন্তত ৩টি বড় দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর একরকম পেশা, তাই দেখা ও শেখার সুযোগ তিনি কম পাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তার বিবরণ তিনি লেখেন নি—যদি লেখেন তো বেশ হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত বিদ্যায়তন 'সরবন্'-এ যে 'থিসিস' তিনি লিখেছিলেন, যুদ্ধের গণ্ডগোলে তার

পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জার্মানিতে সুভাষচন্দ্রের সাহচর্যে 'আজাদ-হিন্দ্' সংগঠনে তাঁর অভিজ্ঞতারও অনেক দাম আছে। কিন্তু তাঁর কথা প্রায় কেউ এখনো শুনতে পাননি। যুদ্ধশেষের সময় তিনি ছিলেন বার্লিনে—ইংরেজ-বাহিনীর ভারতীয় চাকুরিয়াদের (যাঁদের মধ্যে অন্তত একজন স্বাধীন ভারতে প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন।) হাতে যে নিগ্রহ তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল আর তাঁদের চরিত্রের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাও হচ্ছে শোনবার মতো জিনিস। যাই হোক, দেশে ফিরে 'আজাদ হিন্দ্' ফৌজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও দেখা গেল যে, কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রমোদবাবুর ওপর অপ্রসন্ন। যেসব কাগজ ইয়োরোপ থেকে তাঁর পাঠানো লেখা বহুবার ছাপিয়েছে, তারাই পরে তাঁর সাম্যবাদী দুর্নাম আছে বলে দরজা বন্ধ করে দিল। তাই বোধহয়, আজ এদেশে যে পরিচিতি ও খ্যাতি প্রমোদবাবুর পক্ষে একান্ত সংগতভাবেই প্রাপ্য ছিল, তা তিনি এখনো পাননি।

কিন্তু এ-বই লিখে তিনি আবার নতুন করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বাংলা লিখতে তিনি অভ্যস্ত নন, কিন্তু লিখতে তিনি একটুও পেছপাও হননি। বিশ বছর প্রবাসী থেকে, আর দেশে ফিরে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে তাঁর কাজে যে ঘাটতি পড়ে গিয়েছিল, তা এবার তিনি পুষিয়ে দিতে চলেছেন্।

১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আমি একজন বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু সম্প্রতি শতবার্ষিকী উপলক্ষে যেসব কাণ্ড হচ্ছে, তা দেখে আমি স্তম্ভিত। কর্তৃপক্ষীয়েরা এক সময় শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে উৎসাহ রীতিমতো ঝিমিয়ে এসেছে। পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা কেউ কেটা, তাঁরা গম্ভীরভাবে এমন কথা বলে যাচ্ছেন তাতে ধারণা হয় যে, ১৮৫৭ সনের ঘটনাগুলো শুধুই একটা 'সিপাহি-বিদ্রোহ', জাতীয় জীবনে তার বিশেষ ছাপ পড়েনি, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার কোনোই যোগাযোগ ছিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সবচেয়ে মারাত্মক কথা এই যে, যাঁদের আমরা ঘোর প্রগতিবাদী বলে জানি, তাঁদেরই কেউ-কেউ 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের' নিন্দাবাদ আরম্ভ করেছেন। সুবিখ্যাত 'পরিচয়' মাসিকপত্রের চৈত্র ১৩৬৩ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এ বিষয়ে 'আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে' বলে যে নিবন্ধ লেখেন তা আমাকে বিস্মিত করেছে। গোপালবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর মতের মূল্য দিতে আমি সংকুচিত নই, তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু ১৯৫৭ সনে 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর এই নিবন্ধ কেমন করে প্রকাশ হতে পারল তা আমার ধারণার অতীত। গোপালবাবুর লেখার সমালোচনা এই মুখবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—তার উল্লেখ করলাম শুধু এই কারণে যে, প্রমোদবাবুর বই থেকে এমন বহু তথ্য মিলবে যা আজ ১৮৫৭ সনের বিরাট

গণ-অভ্যুত্থানকে ছোট করে দেখার ঝোঁক থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারবে।

ইংরেজ রাজত্ব যাঁদের মনোমত হয়েছিল, যাঁরা বলতে দ্বিধা করেন নি যে, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানেই ইংরেজ এদেশের রাজা হয়েছে, ইংরেজ দয়া করে আমাদের টেনে না তুললে আমরা চিরকাল অন্ধকারাতেই বাস করতাম বলে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের যত গুণই থাকুক, স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বলে তাঁদের কথা ভাবা যায় না। 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' বলে 'সিপাহি বিদ্রোহ'কে যতই উড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, দেশের মানুষের মনে ১৮৫৭ যে দাগ কেটেছিল তাকে স্বাধীনতার অভিযানের সঙ্গে একান্তভাবে সংযুক্ত না করার মতো ঐতিহাসিক অন্যায় আর নেই।

স্যার চার্লস্ মেটকাফের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ১৮১৪ এবং ১৮২৪ সনে লিখেছিলেন যে, সারা ভারতবর্ষ ইংরেজের পতনের জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, আর ইংরেজের ধ্বংস ঘটলে ভারতবাসী সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। বড়লাট হয়ে এদেশে আসার ঠিক আগে খোদ লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন: "আমি চাই আমার কাজের সময় যেন দেশে শান্তি থাকে। কিন্তু আমি ভুলতে পারি না যে, ভারতবর্ষের আকাশ এখন নির্মল হলেও একটা ছোট্ট মেঘ সেখানে দেখা দিতে পারে, যা বেড়ে উঠে ঝড় তুলে আমাদের ধ্বংস ঘটাতে পারে।" কথাটা যে তিনি অকারণে বলেন নি, তা তো ইতিহাসই প্রমাণ করেছিল। এই ক্যানিং সাহেবই পরে বিদ্রোহের সময় বলেছিলেন যে, সিন্ধিয়া সিপাহিদের সঙ্গে যোগ দিলে "আমায় কালই পাততাড়ি গুটোতে হবে" ('I shall have to pack off tomorrow')। এডওয়ার্ড টম্‌সন সাহেব বহুপরে লিখেছিলেন যে, কোনো বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে এত ব্যাপক বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। সেদিন এক নামজাদা বাঙালি ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ যখন দেশের এক-চতুর্থাংশ অঞ্চলে মাত্র হয়েছিল, তখন তাকে সারা দেশের অভ্যুত্থান বলা যায় কেমন করে? এঁকে যদি ফরাসি বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব (যে দুটো বিপ্লব ইতিহাসে সবচেয়ে বড়) ফ্রান্স ও রুশিয়ার কতটা আয়তনে প্রথমে ঘটেছিল, তার মাপজোখের কাজে পাঠানো যায় তো মন্দ হয় না!

'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' সম্বন্ধে গালভরা কথা যখন খুবই শুনছি, তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়: যে পোল্যাণ্ডে জাতীয়তার জন্ম বলে বহু পণ্ডিত প্রচার করেছেন, যেখানে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে সেখানকার 'feudal' (ফিউডাল) চরিত্র ঘুচতে কতদিন লেগেছিল? ১৮৪৮ সনের হাঙ্গেরি, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটা তীর্থস্থান বিশেষ; কিন্তু সেখানে 'ফিউডাল' ব্যাপারের ছড়াছড়ি কি সেদিন পর্যন্ত ছিল না?

মাৎসিনি প্রমুখ যাঁরা জাতীয়তামন্ত্রের উদ্‌গাতা বলে কীর্তিত, তাঁদের ইতালিতে 'ফিউডাল' ধারার কি অভাব ছিল? 'ফিউডাল' ছোঁয়াচ লেগেছে কি অমনি আন্দোলনের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়েছে, এমন ছুঁৎমার্গী মনোভাব কি অন্যায় নয়? কেউ বলবে না যে, 'সিপাহি বিদ্রোহে' জাতীয় সংগ্রামের সুপরিণত মূর্তি দেখা যায়—তা অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে দেশের একটা বিরাট এলাকা জুড়ে, আর সারাদেশের মন মাতিয়ে একটা বিপুল ঘটনা ঘটলো, ইংরেজশাসন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা মরীয়া হয়ে একেবারে নারকীয় রূপে দেখা দিল—আর সেই অভূতপূর্ব ঘটনার কদর্থ করব, জাতির মনে তার যে স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে—তাকে মলিন করার চেষ্টায় নামব, 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' প্রভৃতি বুলি আউড়ে তথ্যান্বেষীকে বিভ্রান্ত করে দেবো, এটা কি ধরনের ইতিহাসবোধ, কি ধরনের দেশপ্রেম?

তাই আজ দেখতে হচ্ছে, ব্যারাকপুরে বীর মঙ্গল পাণ্ডের অদ্ভুত আত্মাহুতি-কেও দেশ সম্মান দেয় না। শুনতে হচ্ছে—বাহাদুর শাহ আর ঝান্সির রাণী ইংরেজকে তাড়াতে চাননি (যাঁরা একথা বলেন তাঁরাই আবার সেইসব মহারথীকে স্বাধীনতার ধ্বজাধারী বলে থাকেন—যাঁরা ইংরেজ শাসনকে 'বিধির সদয় বিধান' বলে অভ্যর্থনা করেছেন)! সুভাষচন্দ্র বসু যখন বর্মায় বাহাদুর শাহের কবরের পাশে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন, আর 'চলো দিল্লি' আওয়াজ বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অভিযানের মন্ত্র হিসেবে, তখন তার মধ্যে ঢের বেশি ইতিহাসবোধ ছিল আজকের ইতিহাসবিদ আর বিদগ্ধ মহলের তুলনায়।

প্রমোদবাবুর লেখা থেকে অনেক দামী খবর আমরা পাবো। আর তাঁর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ আমার পক্ষে অনুচিত। তবে একটা কথা না বলে পারছি না। প্রায়ই শোনা যায় যে, বাঙালিরা বিদ্রোহটাকে অপছন্দ করেছিল, আর লেখকরা তো বটেই। কথাটা পুরো মানতে রাজী হতে পারি না। প্রমোদবাবু দেখিয়েছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে (১৮৫৭ খ্রী.) যখন বহরমপুরে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়, তখন মুর্শিদাবাদে জনসাধারণ হাজারে হাজারে বিদ্রোহে নেতৃত্বের আশায় নবাবের দিকে চেয়ে ছিল, কিন্তু তাঁর মিরজাফরী মুখ থেকে কথা বেরোয় নি। ইংরেজরা যে সেখানে দারুণ একটা কিছু ঘটবার মতো অবস্থা ছিল জেনে আতঙ্কগ্রস্ত, তা তাদেরই সাক্ষ্যে প্রমাণ করা যায়। বহরমপুরে এবং পরে ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের খবর পেয়ে নদীয়া চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান, যশোর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও অন্যান্য জেলায় বাঙালি জনসাধারণ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার অনেক পরিচয় ইংরেজদের তরফ থেকেই পাওয়া যায়। ব্যারাকপুরে যখন সিপাহিদের শায়েস্তা করা হচ্ছিল, তখনি কলকাতা শহরে ইংরেজ আর ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যে নিদারুণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, সে ঘটনার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে। বাস্তবিকই চট্টগ্রাম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত

১৮৫৭ সনে ইংরেজের যে বিপদ দেখা দিয়েছিল, তা কাটলো প্রধানত বর্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি বিভীষণের সহায়তায়। লাট কর্নওয়ালিস বৃথাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করে যাননি!

আর বাঙালি লেখকদের কথা? হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও নির্ভীক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, সেদিকে নজর যায় না কেন? অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা কি নগণ্য? ঈশ্বর গুপ্তের কতকগুলি শ্লেষাত্মক কবিতায় কি '৫৭ সনের ছাপ নেই? কয়েক বছর বাদে যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন লিখছেন, তখন তাতে কি '৫৭ সন সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর পাওয়া যায় না—যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির চাপে ধামাচাপা পড়ে যায়নি? 'ফিউডাল' বলে 'সিপাহি বিদ্রোহ'ই অশুদ্ধ হয়ে গেল, আর জমিদারদের আঁচল-ধরা বাক্যবাগীশেরা 'বুর্জোয়া জাতীয়তার' নেতা বনে গেলেন, এই অদ্ভুত যুক্তিই আজ যেন চল্‌ হয়ে এসেছে।

১৮৫৭ সনের স্মৃতির প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য-পালনে কর্তৃপক্ষীয়েরা এবং বিদগ্ধ সমাজ (প্রগতিবাদীরাও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত) যদি পরাঙ্মুখ হন তো অত্যন্ত পরিতাপের কথা। প্রমোদবাবুর রচনা ও সিদ্ধান্ত একেবারেই তর্কাতীত নয়, কিন্তু যে উদ্ভট ধারা এসে উপস্থিত হয়ে '৫৭ সনের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে, তাকে খানিকটা প্রতিরোধ করতে এ-বই সাহায্য করবে বলেই এর প্রভূত প্রচার কামনা করি।

কলকাতা
১লা আগস্ট ১৯৫৭

মুখবন্ধ

১৮৫৭-৫৯ সনের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধান ও আলোচনা করা যে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যা কিছু ইতিহাস ইত্যাদি এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে, তা প্রায় সবই ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই লেখা। ভারতীয় জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে এই মহাবিদ্রোহের পুনর্বিচারের সময় এসেছে। বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এ কাজের সূচনা হয়েছে।

এই পুনর্বিচারের সময় বিদ্রোহের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে যেসব মতভেদ দেখা দিয়েছে, তা খুবই স্বাভাবিক। এর ফলে অবশ্য অনেকেই বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু জগতে এমন কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটেছে, যার মূল্য-বিচারে সকলেই একমত হতে পেরেছেন? ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ রয়েছে—এটাই প্রধান দুঃখের বিষয় নয়। দুঃখের বিষয় হল এই যে, এক শ্রেণীর ভারতীয় নিরপেক্ষতার আবরণে এই বিদ্রোহের প্রাথমিক তথ্যগুলিকে উপেক্ষা ও বিকৃত করে তাঁদের মতবাদ প্রচার করছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৩৬১ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকার (পৃ. ২৫৮) সম্পাদকীয় মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

"পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে, ১৮৫৭-৫৮ সনে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তাহাকে কেহ কেহ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সমর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহা যে জরাজীর্ণ শত বিচ্ছিন্ন দিল্লীর বাদশাহী তক্তকে পুনরায় পূর্বগৌরবে বসাইবার জন্যই একটি মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা, যাহার সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিল না বলিলেই চলে, সেকথা নিরপেক্ষ তথ্যদর্শী ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন।...শুধু ভাবালুতার বশবর্তী হইয়া সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতার সমর আখ্যা দিয়া আমরা যেন ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত না করি।"

সহজ ভাষায়, 'প্রবাসী' সম্পাদকের মতে: ক. ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থান নয়, সিপাহিদেরই একটা বিদ্রোহ মাত্র; খ. এটা মরণোন্মুখ বাদশাহীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র; গ. কোনোরূপ প্রগতি-চেতনাশূন্য এটা একটা মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়; ঘ. এই

বিদ্রোহের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং আরো অনেকে এই একই মত ব্যক্ত করেছেন।

মহাবিদ্রোহ প্রসঙ্গে এইসব প্রশ্নগুলিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উপরিউক্ত লেখকদের এইসব সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা, 'শুধু ভাবালুতার বশবর্তী' না হয়ে ও 'ঐতিহাসিক তথ্যকে ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত' না করে এবং বিশেষ করে পূর্ব পরিকল্পিত কুসংস্কারগ্রস্ত শ্রেণী-চিন্তার বশবর্তী না হয়ে, বরং তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণের দ্বারা মহাবিদ্রোহের চরিত্র নির্ধারণ করাই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় এই প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিক সত্য', 'নিরপেক্ষতা' ইত্যাদি কথাও তুলেছেন। মুখবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এইটুকুই বলা চলে যে, 'ইতিহাস' পত্রিকার ১৩৬২ অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যায় ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এইসব বিষয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, তার যথোপযুক্ত উত্তর অধ্যাপক সুশোভন সরকার মহাশয় ওই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় দিয়েছেন।

ইতিহাসে কল্পিত ঘটনার আমদানি করা চলে না। প্রাথমিক তথ্যের স্তরকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাস রচনা নিশ্চয়ই কাল্পনিক হতে বাধ্য। তাই ইতিহাসজ্ঞের প্রথম কর্তব্য—প্রাথমিক সত্য বা 'ফ্যাক্ট' নির্ণয় করা, 'নিরপেক্ষভাবে' যার সত্য নির্ধারণ করা খুব কঠিন কাজ নয়; এই কর্তব্যের আর একটি দিক হল, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র ও কার্যকারণ সম্বন্ধের সন্ধান করা ও ঘটনার ফলাফল নির্ণয় করা। ঘটনার মূল্য-বিচার, ইতিহাস-বিচারের দ্বিতীয় স্তর এবং এই মূল্য-বিচার কালেই বিভিন্ন ও বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়ে থাকে—যেমন, সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক, ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদী ইত্যাদি। তার পরেই আসে যুক্তি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে নানা দৃষ্টিভঙ্গির বিচার, আপেক্ষিক সত্যাসত্যের বিচার ইত্যাদি।

প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতো ইতিহাসবিদ অখণ্ড সত্য নির্ধারণের দাবি করেন না, আপেক্ষিক সত্যাসত্য নির্ধারণ করেন মাত্র। কোনো ইতিহাসবিদই আজ পর্যন্ত সমাজ-নিরপেক্ষ অখণ্ড সত্য দাবি করতে পারেন নি। বহুধা বিভক্ত সমাজে, বিশেষ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে—যেমন, ইয়োরোপের রিফর্মেশন, ফরাসি বিপ্লব, রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ, চীন বিপ্লব, কমিউনিস্ট আন্দোলন ইত্যাদি—যাতে অসংখ্য মানুষের অগণিত দৈনন্দিন ও সুদূরপ্রসারী স্বার্থ জড়িত—দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ অনিবার্য। মহাপ্রতিভাশালী ইতিহাসবিদও দৃষ্টিভঙ্গির হাত থেকে রেহাই পাননি, পেতে পারেন না; কারণ ইতিহাসবিদও একজন সামাজিক জীব মাত্র।

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের ইতিহাস লেখার একটা মস্ত বড় অসুবিধা হচ্ছে, এ সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে তা সবই ইংরেজ পক্ষের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। ভারতীয় পক্ষে যাঁরা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা কোনো ইতিহাস বা স্মৃতিকথা রেখে যাননি। ভারতীয় পক্ষের এই নীরবতা, দুনিয়ার ইতিহাসে একটা আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম। তার ফলে, বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধ ও নতুন শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্যে কি রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, বিদ্রোহীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল, বিদ্রোহীদের ও নেতাদের চিন্তাধারা, আশা-আকাংক্ষা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানা খুবই কঠিন। সুতরাং প্রাথমিক তথ্যের জন্যে বর্তমান গ্রন্থকারকে ইংরেজ পক্ষের লেখার ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে।

বিদ্রোহের পরাজয়ের পরে, বিদ্রোহী ও ইংরেজ উভয় পক্ষই যে অনেক মূল্যবান দলিলপত্র ধ্বংস করে ফেলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশিষ্ট দলিলপত্রগুলি—যাদের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়—দিল্লি, সিমলা, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে ন্যাশনাল আরকাইভে (National Archive) সংরক্ষিত রয়েছে। বস্তুত ন্যাশনাল আরকাইভ (জাতীয় মহাফেজখানা) হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দলিলের এক রত্নাগারবিশেষ। সেখান থেকে প্রচুর মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকের পক্ষে—কিংবা যাঁরা এ বিষয়ে কাজ করতে চান,—এই সব স্থানে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া এক রকম অসম্ভব বললেই চলে। কেবল সাধারণের পক্ষেই নয়, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো একজন ইতিহাসবিদকেও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় জাতীয় মহাফেজখানা সম্বন্ধে অভিযোগ করতে হয়েছে: "এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন, তার ডিরেকটরের সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাবে বিরক্তিকর রীতিনীতির জন্য সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা কার্যত অসম্ভব অথবা বহু সময়সাপেক্ষ। এইরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারবার ব্যর্থ হয়ে, আমি এইসব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, দোষ ধরবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বরং এই আশা নিয়ে যে, এর সত্যকার উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হবে।" (*Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, pp. IX-X)

বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ না পেলে এই বই এত তাড়াতাড়ি শেষ করা ও ছাপানো সম্ভব হতো না। শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশীল জানা আগ্রহসহকারে পাণ্ডুলিপি পড়ে নানা বিষয়ে উপদেশাদি দিয়ে সম্পাদনার কাজে খুবই সাহায্য করেছেন।

শ্রীসুপ্রকাশ রায়, শ্রীসরোজ দত্ত, শ্রীমহাদেব সরকার এবং আরো নানাজনে এই বই লিখতে নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরি এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্মীবৃন্দ প্রয়োজন মতো পুস্তকাদি সরবরাহ করে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। সকলকেই আমি এজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২১৪।১।৫ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৭
১৫ই আগস্ট ১৯৫৭

গ্রন্থকার

মহাবিদ্রোহের পটভূমি

"It is not without reason that a revolution is said to be a successful, and a revolt an unsuccessful revolution."
(Lenin : Collected Works, VIII, p. 103)
"Of what is a revolt composed ? Of nothing and everything —of an electricity suddenly disengaged, of a flame which suddenly breaks out, of a wandering strength and a passing breath. This breath meets with heads that talk, brains that dream, souls that suffer, passions that burn, and miseries that yell, and carries them off with it."

—Victor Hugo

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান। এর পূর্বে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ শাসনাধীনে একশত বৎসর ধরে বহুবার সিপাহিদের ও জনসাধারণের পৃথক পৃথক ভাবে বিদ্রোহ ঘটেছিল, কিন্তু তা কখনো আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জাতীয় আকার ধারণ করেনি। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত একশ' বছরের মধ্যে জনসাধারণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫৪ বার ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।[১] আর এই সময়ের মধ্যে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল ৫ বার। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহই জাতীয় বিদ্রোহে প্রথম রূপান্তরিত হল।

একথা সত্য যে, বর্তমান যুগের জাতীয়তাবোধ এর অনেক আগেই রামমোহন রায়ের সময় থেকে ভারতে বিস্তার লাভ করছিল। কিন্তু তা তখনো জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে একটা জনজাগরণে পরিণত হতে পারেনি। একথা জোর দিয়েই বলা যায়, ৫৭-র বিদ্রোহ বর্তমান ভারতের জনজাগরণের প্রথম সুত্রপাত ও জনগণের রাজনৈতিক জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইণ্ডিয়া স্ট্রাগল্‌স ফর ফ্রীডম' গ্রন্থে এই বিদ্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন— এ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 'প্রথম অপক্ব অভিব্যক্তি'। কিন্তু অপরিণত, অপরিপক্ব ও অনেক বিষয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় দুর্বোধ্য হলেও এটাই যে সর্বভারতীয় জনগণের

১. এই প্রসঙ্গে S. B. Chaudhury প্রণীত *Civil Disturbances During British Rule in India* দ্রষ্টব্য।

জাতীয় চেতনার প্রথম শক্তিশালী তেজস্বী আত্মপ্রকাশ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৮৫৭ সনের জাতীয় অভ্যুত্থান আকস্মিকও নয়, অথবা কেবলমাত্র সিপাহিদেরই একটা সামরিক বিদ্রোহও নয়। সিপাহিদের দ্বারা শুরু হলেও সকল শ্রেণীর লোকই এতে যোগ দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল কতকগুলি গভীর ও সুদূরপ্রসারী জাতীয় কারণবশত। এই বিদ্রোহ অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনারই পুঞ্জীভূত ফল। মিরাট ও দিল্লিতে বিদ্রোহের প্রথম বিস্ফোরণের মাত্র কয়েকদিন পরেই সমকালীন সত্যদর্শী সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিদ্রোহের রূপ ও কারণ বিশ্লেষণে যে দ্ব্যর্থহীন মত ব্যক্ত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের অনুধাবনযোগ্য :

"এই বিদ্রোহ এখন আর সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা এখন ব্যাপক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। সিপাহীরা তাদের জীবনের সর্ব স্বার্থ এতে উৎসর্গ করেছে এবং দেশবাসীরাও তাদের মহান জাতীয় আদর্শরূপ পবিত্রব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শহীদরূপে গণ্য করেছে।...ভারতবাসীদের মধ্যে এমন কেউই নেই, পরাধীনতার ক্ষোভ ও তার পীড়ন যে সম্যক অনুভব না করে, সে ক্ষোভের একমাত্র কারণই হচ্ছে ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব এবং সে ক্ষোভ বিদেশী শাসনের আধিপত্যের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্য। ভারতীয় শিক্ষিতদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি চিন্তা করেন না যে, তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ও তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই বিদেশীদের আধিপত্যের ফলে খর্ব হচ্ছে না।"[২] ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই হরিশ্চন্দ্র ৯ই এপ্রিল 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আবার লিখেছিলেন যে, সাধারণ রাজনৈতিক সংস্কারের দ্বারা সিপাহিদের মনকে আর এবার ঠাণ্ডা করা যাবে না : "সব টোটাগুলি যদি সিপাহীদের চোখের সামনে পুড়িয়েও ফেলে দেওয়া হয়, তা হলেও তাদের অসন্তুষ্টি দূর হবে না। তাদের অসন্তোষের কারণ সুদূরপ্রসারী এবং তা এই সব উপায়ে দূর হবার নয়।...এইরূপ মনোভাব তাদের একদিনে জন্মায় নি এবং তা একদিনে দূর হবারও নয়। সকলেই আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে সিপাহীদের মনে এক স্থায়ী পরিবর্তন ঘটেছে।" মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই সময়টাতে কি সিপাহি, কি জনসাধারণ, সকলের মধ্যেই একটা নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এবং সকলেই একটা মৌলিক পরিবর্তনের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

'একশ' বছর ধরে ইংরেজের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই মহাবিদ্রোহ ঘটে। রাজা, নবাব, জমিদার ব্যবসায়ী, কৃষক শিল্পজীবী, সিপাহি, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই ব্রিটিশের সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল নিবৃত্তির জন্যে

২. *Hindu Patriot*, 21 May 1857

উপকরণ যোগাতে হয়েছিল। এই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের অর্থ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা ইংরেজ যেমন একদিকে তাদের দেশের নতুন-পুরনো সকল শিল্পকে বড় করে গড়ে তুলতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি এই নতুন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ভারতের সমৃদ্ধিশালী শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংস করে ভারতের শিল্পজীবী, ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে দিতে লাগল।

এইখানেই ইংরেজের সঙ্গে অন্যান্য বিদেশী বিজেতাদের প্রভেদ। ইংরেজের পূর্বে যত বিদেশী ভারতে এসেছিল, তারা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মিশে যেত এবং ক্রমে ক্রমে নিজেরাও ভারতীয় হয়ে যেত, যার ফলে ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ কোনো বিপর্যয় ঘটত না। কিন্তু ইংরেজরাই প্রথম যারা ভারতের পুরনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। কৃষি ও শিল্পের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সংস্থাগুলি (Village Republics) এবং এই কৃষি-শিল্পের যোগসূত্রের ওপরই নির্ভর করত তার সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্ব।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের সামাজিক ক্রমবিকাশ ধনতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন মূলধনের সঞ্চয় (accumulation of capital), বন্ধনহীন শ্রম ('free' labour) অর্থাৎ যে-শ্রম কৃষিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে না, ব্যবসায়ী-মূলধনের যন্ত্রশিল্প-মূলধনে উত্তরণ ইত্যাদি। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ভারতে মূলধনের সঞ্চয় যথেষ্টই ঘটেছিল, কিন্তু কতকগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ভারতে ব্যাহত হয়েছিল, এবং ভারত গৃহশিল্পের স্তর (handicraft stage) থেকে কেন্দ্রীভূত শিল্পোৎপাদন স্তরে (manufacturing stage) পৌঁছতে পারেনি (যা ঘটেছিল পশ্চিম ইয়োরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের মাধ্যমে), যদিও সেদিকে অগ্রসর হবার কিছু কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বহিরাগত প্রবলতর শক্তির হস্তক্ষেপ না হলে কালক্রমে নিজের শক্তিতেই সময়োপযোগী একটা নতুন উন্নততর সমাজব্যবস্থা ভারতীয়রা নিজেরাই গড়ে তুলতে পারত।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আকবরের সময় থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে ইয়োরোপের চেয়ে কোনো অংশে পশ্চাৎপদ তো ছিলই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসরই ছিল।[৩] এই কারণেই ইয়োরোপের বণিক

৩. "...prior to British rule Indian economic development stood well to the forefront in the world scale." (R. P. Dutt : *India Today*, 1947. p. 21)

সম্প্রদায় অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে ভারতের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করবার জন্তে এতখানি লালায়িত হয়ে উঠেছিল। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রক্ষণশীল পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই ভারতের ইতিহাসের এই তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটিকে ভুলে যান এবং ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ থেকে তার স্বাভাবিক বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। ভারতে ইংরেজ শাসন স্থাপিত না হলে ভারত প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারত না, কিংবা ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহীরা বিজয়ী হলে ভারতবাসীকে আবার মধ্যযুগীয় বর্বরতার যুগে ফিরে যেতে হতো, এই ধরনের চিন্তাধারা—যা এখনো একশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে বর্তমান—তা আত্মবিশ্বাসহীনতা ও দাসসুলভ মনোভাবেরই পরিচায়ক।

১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ভারতের দ্রুত অধঃপতন শুরু

Indian Industrial Commission Report এই বলে শুরু হয়েছে যে—"At a time when the west of Europe, the birth-place of modern industrial system, was inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsmen. And at a much later period, when merchant adventurers from the West made their first appearance in India, the industrial development of this country was at any rate not inferior to that of the more advanced European nations." (p. 6) কার্পাস ও রেশমের বস্ত্রশিল্প এবং নানা প্রকারের বিলাসদ্রব্য ছাড়াও ধাতুশিল্পেও—যা বর্তমান যুগে শিল্পোন্নতির ভিত্তিস্বরূপ বলে গণ্য করা হয়—তারও যথেষ্ট অগ্রগতি ভারতবর্ষে হয়েছিল: "The high quality of the native-made iron, the early anticipation of the processes now employed in Europe for the manufacture of high-class steels, and the artistic products in copper and brass gave India at one time a prominent position in the metallurgical world." (T. H. Holland : *The Mineral Resources of India*, 1908 ; quoted by R. P. Dutt ; *Ibid*, p. 24). ভারতীয় শহরগুলির ঐশ্বর্য দেখে ইয়োরোপীয় বণিক ও পর্যটকরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ক্লাইভ ১৭৫৭ সনে প্রথম মুর্শিদাবাদ দেখে বলেছিলেন. "This city is as extensive as the city of London, with this difference that there were individuals in the first possessing infinitely greater prosperity than in the last city." (*Indian Industrial Commission Report*, p. 249).

হয়, এবং এই অধঃপতন ছিল সর্বব্যাপী—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সমাজ-জীবনে ও ধর্মাচরণে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালির মতোই ভারতবর্ষও বিশ্বাস-ঘাতকদের একটি স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। শাসকশ্রেণীর মধ্য থেকে মনুষ্যত্ব ও নীতিবোধ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; যেটুকু কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য সাধারণ চোর-ডাকাতদের মধ্যেও দেখা যায়—তাও তাদের মধ্যে ছিল না। ভারতের মহাদুর্ভাগ্য যে, এই পচা-গলা সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করার মতো ভারতে কোনো ধনতান্ত্রিক সমাজ শক্তি-শালী শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠেনি। এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদিত হলো বিদেশী ইংরেজ ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর দ্বারা। ভারতের এই পুরনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোটাকে ভেঙে দেওয়া একটা ভয়ানক ক্ষতিকর ব্যাপার নাও হতে পারত, যদি তার জায়গায় নতুন একটা উন্নত ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠত, যা বর্তমান যুগে অনেক দেশেই ঘটেছে: যার ফলে সেসব দেশ প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পেরেছে। ভারতে এসে ইংরেজরা পুরনো কাঠামোটা তো ভাঙলই, ভারতের নিজস্ব শক্তিতে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল সেটাকেও একেবারে অঙ্কুরে ধ্বংস করে দিল। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮, এই একশো বছরের ইংরেজ-ভারতের ইতিহাস হচ্ছে একটা ধ্বংস ও মৃত্যুর ইতিহাস; সুস্থ সবল একটা বনিয়াদ গড়ে তোলার ইতিহাস নয়। এই ঘটনাটিই হলো ইংরেজ-শাসিত ভারতের মূল ট্র্যাজেডি।

নবাবি শাসনের শেষ বৎসর ১৭৬৪-৬৫ সনে বাংলার রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮১ লক্ষ টাকার কিছু কম। পরের বছরে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের প্রথম বছরেই তা প্রায় দ্বিগুণ করে বাড়িয়ে ১৭৪ লক্ষ টাকায় তোলা হলো।[৪] ইংরেজের এই দানবীয় নির্মম শোষণ প্রতি বছর নিষ্ঠুরভাবে বেড়েই চলল।

১৭৭০-৭১ সনে (বাংলা ১১৭৬ সাল) বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে সব বাঙালির কাছেই পরিচিত, তার প্রধান কারণই হলো বিদেশী বণিকদের অমানুষিক শোষণ। এই মন্বন্তরের ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারালেও এবং সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ একেবারে শ্মশানে পরিণত হলেও, ইংরেজ কিন্তু কৃষকদের এক পয়সাও খাজনা মকুব করেনি। বরং সেটাকে আরো বাড়িয়ে পরের বছর (১৭৭১-৭২ খ্রী.) ২৩৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করল। ১৭৯৩ সনে কর্নওয়ালিস বাংলায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা প্রবর্তন করবার সময় বাংলার রাজস্ব ৩৪০ লক্ষ টাকা ধার্য করলেন এবং সেই সঙ্গে পোষ্য জমিদারদের জন্যে আরো ১০-১২ কোটি টাকা প্রজাসাধারণের কাছ থেকে আদায় করবার কায়েমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। মোট কথা, ইংরেজ

৪. **Wadia and Merchant**: *Our Economic problem*, p. 279

২

শাসনের প্রথম ৩০ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে তার ভূমি-রাজস্ব খাতে আদায় বেড়ে গেল চারগুণেরও বেশি। বাংলা দেশে যা ঘটেছিল ইংরেজ-শাসিত অন্যান্য প্রদেশেও তার কোনোরকম ব্যতিক্রম হয়নি।

ভারতের শিল্পক্ষেত্রেও এই একই পীড়াদায়ক ইতিহাস। উনিশ শতকের প্রথম থেকে ইংরেজ ভারতের শিল্পগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে। ১৮১৫ সনে ভারত থেকে ইয়োরোপে বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল ১৩০ লক্ষ টাকার। এই রপ্তানি কমতে কমতে ১৮৩২ সনে এসে দাঁড়াল মাত্র ১০ লক্ষ টাকায় এবং তার কয়েক বছর পরেই তা একেবারে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। আবার অন্যদিকে, ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে বস্ত্রের আমদানি—১৮০০ সনে যার কোনো অস্তিত্বই ছিল না—বাড়তে বাড়তে ১৮৩২ সনে এসে পৌঁছল ৪০ লক্ষ টাকায়। যে ভারতবর্ষ এক সময় নিজের চাহিদা মিটিয়ে প্রতি বছর এক কোটি থেকে দেড় কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করত, ১৮৫০ সনের মধ্যে তাকে হতে হলো ইংরেজের ওপর নির্ভরশীল। তার নিজের চাহিদার মাত্র তিন-চতুর্থাংশ সে নিজে তৈরি করতে লাগল, আর বাকি এক-চতুর্থাংশ ইংল্যাণ্ড থেকে আসতে লাগল। এইভাবে ভারতের বস্ত্রশিল্পই শুধু নয়—তার রেশম, পশম, লোহা, কাঁচ, কাগজ, ধাতু ইত্যাদি শিল্পগুলিও ইংরেজ ধ্বংস করে দিল। তাই মার্কস ১৮৫৩ সনে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ আলোচনা করে বলেছিলেন : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইংরেজ ভারতবাসীর ওপর যে দুঃখ-দৈন্য চাপিয়েছে তা হচ্ছে 'পূর্বেকার তুলনায় মূলত পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র'—"essentially different and infinitely more intensive kind than Hindustan had to suffer before."[৫]

এই রকম শিল্প ধ্বংসের ফলে লক্ষ-লক্ষ ভারতীয় শিল্পজীবীর কি দুরবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ১৮৪০ সনে স্যার চার্লস ট্রিভেলিয়ান এক পার্লামেণ্টারি কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে বলেছিলেন : "ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ৩০ হাজারে কমে গিয়েছে। এই বর্ধিষ্ণু শহর, যা ভারতের ম্যানচেস্টার ছিল, তা আজ অত্যন্ত গরিব ও খর্ব হয়ে গিয়েছে, জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তার দুর্দশার সীমা নেই।" স্যার হেনরি কটন ১৮৯০ সনে লিখেছিলেন : "মাত্র একশো বছর আগেও ঢাকা শহরে ২ লক্ষ লোক বাস করত এবং তার বাৎসরিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকার ওপর। ১৭৮৭ সনে ঢাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। ১৮১৭ সনে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

৫. Marx : *British Rule in India*. New York Daily Tribune, June 25, 1853.

এই অধঃপতন কেবলমাত্র ঢাকাতেই নয়, সব জেলাতেই হয়েছে।” ঢাকার মতো মুর্শিদাবাদ, সুরাট, কালিকট ইত্যাদি অন্যান্য শিল্পপ্রধান শহরগুলিরও এই একই রকমের শোচনীয় পরিণতি হলো, যা ইতিহাসবিদ মণ্টগোমারি মার্টিনের কথায়—‘বর্ণনা করা বেদনাদায়ক’।

আলেকজাণ্ডারের ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড কলোনিয়াল ম্যাগাজিনে’ (৯ম খণ্ড, ৫৪ নং, ১৮৩৬) লেখা হয়েছিল যে—“১৮২০ সনে ঢাকার একজন অধিবাসী চীন থেকে বিশেষ অর্ডার পেয়ে ১০ গজ লম্বা ও ১ গজ চওড়া দু’খণ্ড মসলিন দুশো টাকায় কিনেছিলেন। মসলিনের ওজন ছিল সাড়ে দশ তোলা। ১৮২২ সনে ওই লোকই অনুরূপ দ্বিতীয় অর্ডার পান। যারা প্রথমবার মসলিন দিয়েছিল এর মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়েছে, এবং আর কোথাও সেরূপ মসলিন না পাওয়ায় চীনের অর্ডারও বাতিল হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে, মসলিন তৈরির কুশলতা ব্রিটিশ শাসনের অসাধু ও অত্যাচারী বাণিজ্য-নীতির ফলে লোপ পেয়ে গেছে।”

বাংলা দেশের দেওয়ানি পাবার পর ক্লাইভ কোম্পানির ডিরেক্টরদের লিখে পাঠালেন (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৫) যে, বাংলার বাৎসরিক মোট রাজস্ব এখন ২৫০ লক্ষ টাকা হবে। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ দুটির জন্যে খরচ হবে ৬০ লক্ষ টাকা, আর নবাবকে ভাতা দিতে হবে ৪২ লক্ষ টাকা ও মোগল সম্রাটকে কর দিতে হবে ২৬ লক্ষ টাকা; কোম্পানির উদ্বৃত্ত থাকবে মোট ১২২ লক্ষ টাকা; এই টাকাটা কোম্পানির ‘পরিষ্কার লাভ’। প্রতি বছর কোম্পানির এই ‘পরিষ্কার লাভের’ অংশ বেড়ে যেতে লাগল এবং ৬-৭ বৎসরে তার পরিমাণ দাঁড়ালো ৪ কোটি টাকারও বেশি। বলা বাহুল্য, সে টাকাটা প্রতি বছর ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে লাগল।

কোম্পানির নিজের এই লুণ্ঠন ছাড়াও, কোম্পানির ছোট বড় কর্মচারিদের ব্যক্তিগত লুণ্ঠনের পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যে ক্লাইভ নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে এসেছিলেন, তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন তখন তাঁর সম্পত্তির মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা। তাছাড়া, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভারতীয় সম্পত্তি থেকেও বছরে আয় করতেন আড়াই লক্ষ টাকারও বেশি। অন্যান্য বড় বড় ইংরেজ কর্মচারিরাও এরকম বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে দেশে ফিরতেন। তা ছাড়াও তাঁরা ভারতের রাজস্ব থেকে মোটা পেন্সন ভোগ করতেন। লর্ড কর্নওয়ালিস পেতেন প্রতি বছর ৫০ হাজার টাকা। ওয়ারেন হেস্টিংস পেতেন ৪০ হাজার টাকা। ওয়েলেস্‌লি থেকে ডালহাউসি পর্যন্ত সকল গভর্নর জেনারেলকে একসঙ্গে ৬ লক্ষ টাকা করে দিয়ে দেওয়া হতো। মহাবিদ্রোহ শুরু হওয়ার সময় ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল অ্যানসন পেতেন মাসিক বেতন বাবদ এক লক্ষ টাকা, তাছাড়া বড়লাটের কাউন্‌সিলের

সদস্যপদের জন্যে পেতেন প্রতি মাসে ৬০ হাজার টাকা, যদিও তিনি কদাচিৎ এই কাউন্সিলের সভায় যোগ দিতেন, এবং বেশির ভাগ সময় কাটাতেন সিমলাতে।[৬] ছোট কর্মচারিরাও এই প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হতো না। একজন সাধারণ কেরানিও ১৫-২০ বছর ভারতে কোম্পানির কাজ করে ৪৫ বছর বয়সে অনায়াসে ৩ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারত এবং সেখানে নবাবের মতো বাস করতে পারত ; লোকে তাদের নবাবই বলত।

একটার পর একটা প্রদেশ দখল করে এত লুণ্ঠন, এত শোষণ করেও ইংরেজের ক্ষুধার নিবৃত্তি হলো না। বিখ্যাত ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী হারবার্ট স্পেনসার তাঁর 'সোস্যাল স্ট্যাটিস্টিক্‌স' নামক বইতে ১৮৫১ সনে ইংরেজ বণিকদের সাম্রাজ্যবিস্তারের কৌশল ও তাদের শোষণ-নীতি আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে—"একটা নির্মম বিশ্বাসঘাতকতাই হলো ভারতে ইংরেজ শাসকদের স্থায়ী নীতি। রাজাদের ফুসলিয়ে একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো হয়েছে, তারপর একজন রাজা যখন আর একজনকে হারিয়ে দিয়েছে তখন এই জয়ী রাজাকেও কোনো-না-কোনো ছুতো করে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে। ছুতো হিসেবে সরকারি নেকড়ে বাঘগুলির জন্যে ঘোলাজলের নদী সব সময়েই হাতের কাছে প্রস্তুত আছে। আকাংক্ষিত রাজ্যের রাজাদের নিকট থেকে করের পর কর আদায় করে চূড়ান্তভাবে শোষণ করে নিঃশেষ করে দেওয়ার পর যখন তাঁরা আমাদের অফুরন্ত দাবি পূরণ করতে আর সমর্থ হন না, তখন তাঁদের রাজদ্রোহের অপরাধে রাজ্যচ্যুত করে চরম শাস্তি দেওয়া হয়।··· বর্তমানেও আমাদের চোখের সামনেই কত না অত্যাচার, কত না শোষণ চলছে। আমাদের চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি যে অতি ক্ষতিকর একচেটিয়া লবণের ব্যবসায় মারফত, আর নির্দয়ভাবে করের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে গরিব কৃষকদের কাছ থেকে তাদের অর্ধেক ফসল আমরা শুষে নিচ্ছি। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, কী শয়তানি উপায়ে ভারতীয় রাজ্য জয় করবার জন্যে এবং তাদের দাবিয়ে রাখার জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করছি,

৬. Montgomery Martin : *Eastern India*, II, 1838. p. 139. ১৮৩৮ সনে মার্টিন লিখেছিলেন : "অর্ধশতাব্দী ধরে প্রতি বৎসর ২ থেকে ৩ কোটি ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৪ কোটি টাকা করে ভারতবর্ষকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে হচ্ছে; এইভাবে আমরা তাকে 'ড্রেইন' (শোষণ) করে আসছি—যে টাকার কোনো প্রকার প্রতিদান ভারত আমাদের কাছ থেকে পায় না।" মার্টিন তারপর হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, গত ৫০ বছরে ৮,৪০০ কোটি টাকা ভারত থেকে ইংল্যাণ্ড শুষে নিয়েছে। (ঐ, ভূমিকা)। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মুখার্জির *Rise and Fall of East India Company* (pp. 224-25) দ্রষ্টব্য।

আবার এই সৈন্যদেরই, যখন তারা কিছুদিন পূর্বে উপযুক্ত পোশাকের অভাবে মার্চ করতে অস্বীকার করেছিল, তখন তাদের একটা গোটা রেজিমেণ্টকেই হত্যা করেছি। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে, পুলিশরা ধনী লোকদের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালতকে নিজেদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে আরো দেখতে পাই যে, তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাতি চড়ে কৃষকদের ফসলক্ষেতের উপর দিয়ে যদিচ্ছা ঘুরে বেড়ান এবং কোনো রকম মূল্য না দিয়েই কৃষকদের কাছ থেকে নিজেদের রসদ সংগ্রহ করেন।"

সামন্ততন্ত্র ভাঙনের যুগে ইংরেজ ভারত জয় করেছিল প্রধানত ভারতীয় সিপাহিদের সাহায্যে। তারা প্রধানত অযোধ্যা ও বিহারের সিপাহিদের সাহায্যে এক এক করে মারাঠা, পাঠান, গুর্খা, শিখদের পরাজিত করে। তারপর যখন এইসব হিন্দুস্থানি সিপাহিরা বিদ্রোহ করল, তখন তাদের পরাজিত করার জন্যে ইংরেজরা সেইসব শিখ, গুর্খা ও পাঠানদেরই ব্যবহার করল।

বাহুবল ছাড়াও কূটনীতি, ছলচাতুরী, জালিয়াতির সাহায্য ইংরেজরা কম নেয় নি। প্রথম দিকে ইংরেজদের নীতি ছিল একজন রাজাকে ব্যবহার করে আর একজনকে জয় করা। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ওয়েলেসলি একটি নতুন কায়দা বার করলেন ও তার নাম দিলেন Subsidiary Alliance—সাহায্যকারী সন্ধি। যে রাজা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতো তাকে নিজের খরচে একদল ইংরেজ সৈন্য তার রাজ্যে রাখতে হতো এবং অন্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের সম্বন্ধ ইংরেজ সরকার নিয়ন্ত্রিত করত। এর পরিবর্তে ইংরেজ সরকার সেই রাজাকে এই গ্যারাণ্টি দিত যে তার রাজ্যের সীমানা অক্ষত থাকবে ও তার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজরা কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না। হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন; তারপর পেশোয়া, বরোদার গাইকোয়াড়, অযোধ্যার নবাব। এইভাবে পলাশি যুদ্ধের ৫০ বছরের মধ্যেই ভারতের একটা বিরাট অংশে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের (১৮১৭-১৯ খ্রী.) পর অবশিষ্ট স্বাধীন মারাঠা রাজাদেরও—নাগপুরের ভোঁসলা, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার—একই শোচনীয় পরিণতি হলো। রাজপুত রাজাদেরও এই অবস্থা। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। সার্বভৌম ক্ষমতা থাকল ইংরেজের হাতে, আর শাসন-কাজের দায়িত্ব থাকল রাজাদের হাতে। ভালোভাবে রাজ্য পরিচালনা করে রাজারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অথবা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এটা ইংরেজের কাম্য নয়। এই অবস্থায় শাসনভার মন্ত্রীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাজার পক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও ব্যভিচারে নিমগ্ন হয়ে থাকাই বেশি নিরাপদ হতো।[৭] এই অবস্থায় দেশীয়

৭. Henry Cotton: *Indian and Home Memoirs*, pp-253-54

রাজ্যগুলিতে বিশৃংখলা ও সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতন ও শোষণ যে চূড়ান্ত সীমায় পৌছবে ও জনসাধারণের অসন্তোষ যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি![৮]

ইংরেজের সাম্রাজ্যবিস্তারের অসাধুনীতির একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সিন্ধু। সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে ইংরেজ সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সন্ধি উপেক্ষা করে ইংরেজরা সিন্ধু দখল করল। ১৮৪৩ সনে জেনারেল চার্লস নেপিয়ার তাঁর ডায়েরিতে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে—"সিন্ধু দেশ দখল করার আমাদের কোনো অধিকার নেই; দখল করা হবে মস্ত বড় একটা শয়তানি। কিন্তু শয়তানি জেনেও আমরা সিন্ধু দেশ দখল করব, কারণ তা হবে আমাদের পক্ষে খুবই লাভজনক।"

এই একই রকম শয়তানি উপায়ে ভারতে ডালহাউসির ৮ বছর রাজত্বকালে (১৮৪৮-৫৬ খ্রী) আরো ৮টি ভারতীয় 'মিত্র রাজ্য' ইংরেজরা অধিকার করে। ডালহাউসি ভারত ত্যাগ করবার পূর্বে তাঁর শেষ রিপোর্টে কোম্পানির ডিরেক্টরদের নিকট গর্ব করে লিখেছিলেন: তিনি পাঞ্জাব, পেগু, নাগপুর, অযোধ্যা, সাতারা, ঝান্সি ও নিজাম রাজ্যের একটা অংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—সেসব রাজ্য অধিকার করার ফলে ইংরেজ সরকারের বাৎসরিক আয় ৪ কোটি টাকা বেড়ে যাবে।

এত গ্রাস করার পরও কিন্তু ইংরেজের শয়তানি ও ছলচাতুরীর শেষ হলো না। ভারতের রীতিনীতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করে, অন্যান্য অবশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করবার উদ্দেশ্যে ডালহাউসি একটা 'ডকৃট্রিন অব ল্যাপ্‌স' ঘোষণা করলেন। এই নীতির দ্বারা ইংরেজ সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হলো যে, কোনো দেশীয় মৃত রাজার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকলে, তাঁর কোনো দত্তকের সিংহাসনে আরোহণ করার দাবি গ্রাহ্য করা হবে না এবং ওই রাজ্য আপনা থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ডালহাউসির এই দাম্ভিক নীতিও ইংরেজ শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। কয়েক বৎসর পূর্বেও ইংরেজ শাসকবর্গ শাস্ত্রসম্মত ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন মেনে নিয়েছিল। ১৮২৫ সনে কোটার রাজার মৃত্যুর পর তাঁর দত্তককে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী রাজা বলে স্বীকার করে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ লিখেছিলেন—"অন্যান্য হিন্দুদের মতো কোটার রাজারও দত্তক ও উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে।"[৯]

৮. ভারতীয় রাজ্যগুলির এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে মার্কস বলেছিলেন—. **"European despotism, planted upon Asiatic despotism"**. (***British Rule in India*, June 1853**)

৯. ***Parliamentary papers*, 15 February 1850. p. 153**

তারপর ১৮৩৭ সনে যখন অরছার রাজা দত্তক উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলেন, তখনো কোম্পানির ডিরেক্টররা পুনরায় তা স্বীকার করে লিখলেন যে, "স্বগোত্রভুত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অন্য যাকেই হোক দত্তক উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার অধিকার হিন্দু রাজাদের আছে। কেবলমাত্র দেখতে হবে যে, এই দত্তক নির্বাচন যেন ঠিকভাবে হিন্দু শাস্ত্রসঙ্গত হয়।"[১০] এইভাবে ১৮৪৮ সন পর্যন্ত অনেক ছোট ছোট রাজাদের দত্তককে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে বিনা দ্বিধায় আইনসঙ্গত বলেই ইংরেজ সরকার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ডালহাউসি ভারতে এসেই হিন্দুশাস্ত্র, আইন ও রীতিনীতি উপেক্ষা করে, 'ডক্‌ট্রিন অব ল্যাপ্‌স'-এর সাহায্যে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর ও ঝান্সির রাজ্যগুলিকে স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবের অজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং এই একই অজুহাতে নানা সাহেবের পেন্সনও বন্ধ করে দেওয়া হলো। যেরূপ বিনা কারণে, নির্লজ্জভাবে ও অন্যায়ভাবে ডালহাউসি মিত্র-রাজ্য অযোধ্যা দখল করে নিলেন তাতে সারা ভারতে সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। ম্যালিসন বলেছেন যে, অযোধ্যা দখলের ফলে এমন কি ভারতীয় রাজারাও আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়লেন; তাঁরা দেখলেন যে তাঁরা যতই ইংরেজের অনুগত হোন না কেন, ইংরেজের বিপদের সময় তাদের যতই সাহায্য করুন না কেন, তাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে তাঁদের রেহাই নেই। "এক কথায় বলা যায় যে, যে-অযোধ্যা ব্রিটিশের প্রতি রাজভক্তিতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিল, সেই দেশই বিক্ষোভে পূর্ণ হয়ে উঠল ও চক্রান্তের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল।"[১১]

এই সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "এই সব দুষ্কার্যের দ্বারা ইংরেজ যে কেবলমাত্র তাদের পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলিকেই ভঙ্গ করেছিল তাই নয়, তারা যুগ-যুগান্তরের পবিত্র অধিকারগুলিকে, যার থেকে মানুষ কোনো রাজ-শক্তির দ্বারাই বঞ্চিত হতে পারে না,—পদদলিত করে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়েছে। এই সব রাজ্যগুলি দখল করার ফলে যাঁরা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের কার্যাবলী পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যতই শত্রুতাপূর্ণ হোক না কেন, তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এবং সেইজন্যে তাঁরা সমস্ত সভ্য-জগতের সহানুভূতি পেতে বাধ্য।" নাগপুর রাজ্য দখল সম্বন্ধেও হরিশ্চন্দ্র মুখো-পাধ্যায় লিখেছিলেন—"ডালহাউসি যতগুলি রাজ্য দখল করে বাহবা পেয়েছেন তার মধ্যে নাগপুর রাজ্য অধিকার ও নাগপুর রাজ-পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি

১০. *Ibid*, p. 141

১১. Malleson: *History of the Indian Mutiny*, 1880. vol. 1, pp. 348-49.

লুণ্ঠন সব থেকে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসাপূর্ণ ও বিচার-বর্জিত।[১২] কিন্তু হরিশ্চন্দ্র ও অন্যান্য ভারতীয়রা ডালহাউসির এই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির যতই নিন্দা করুন না কেন, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন ডালহাউসির এই নীতিকে 'ন্যায়সঙ্গত' (legitimate) ও 'সদাশয় সাম্রাজ্যবাদ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ কথাটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের unification-এর জন্যে কৃতিত্ব দেওয়া হয়, তারাই আবার তাদের প্রয়োজনে ভারতবিভাগ (partition) করেছিল।[১৩]

'ডালহাউসি ডকট্রিন'-এর ফল হলো এই যে, অন্যান্য সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর ন্যায় রাজা, মহারাজা ও নবাবেরা পর্যন্ত সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন : এইবার বুঝি ইংরেজ আর ভারতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেবে না। ইংরেজের এইসব শয়তানি ও ধূর্তামির জন্যে ডালহাউসির রাজত্বকাল থেকেই সকল ভারতবাসীর মনেই ইংরেজদের প্রতি একটা ঘৃণা ও ভয়, সন্দেহ ও ক্রোধ ঘনীভূত হতে থাকে। ১৮৫৭-র ১০-১৫ বছর আগে থেকেই, বস্তুত সিন্ধুজয়ের সময় থেকে, এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের বীজ বপন হতে শুরু হয়। বছরের পর বছর ধরে তারা দেখছিল যে, ভগবানের নাম করে ইংরেজরা নিজেরাই যেসব পবিত্র সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিল, সেগুলি ভাঙ্‌তে তাদের এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না, তাদের বিবেকেও এতটুকু বাধে না। মহাবিদ্রোহের কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ইংরেজের এই সব কপট আচরণের বিচার-বিশ্লেষণ করে একজন ঝানু ইংরেজ জেনারেল বিদ্রোহের সময় লিখেছিলেন: "ভারতবাসীরা অনেকদিন ধরে যে পীড়ন অনুভব করছিল ও যে রকম অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করছিল, যার ফলে তাদের মনের মধ্যে বিদ্রোহের আকাংক্ষা ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, সেই মনোভাবই বিনা প্রস্তুতিতে ও ঠিক সময় আসবার আগেই বিপ্লবের

১২. *Selections from the Writings of Harish chandra Mukherjee*, ed. Naresh Sengupta. pp. 3-4

১৩. "Dalhousie was anxious to extend the benefits of the British rule whenever a legitimate opportunity came···It is hard to find fault with his intention, and his policy of annexation undoubtedly contributed to the political unification of India which was to serve as the foundation of Indian nationhood such was certainly not the intention of Dalhousie. But the immediate reaction to Dalhousie's benevolent imperialism was far from favourable." – (*Eighteen Fifty-Seven*, pp. 37-38)

আকারে হঠাৎ ফেটে পড়ল।...এই ভারতীয় বিদ্রোহকে কেবলমাত্র একটা সিপাহিদের বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করার মানে হচ্ছে—ব্রিটিশ রাজত্বের অনেক বৎসরের কুশাসন ও দুঃশাসনের ওপর পর্দা টেনে দেওয়া। আসলে ইংরেজের এতদিনকার দুঃশাসনই তাদের এই জাতীয় সামাজিক বিদ্রোহের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।"[১৪] মহাবিদ্রোহের এই জাতীয় সংগ্রামের চরিত্র ও বৈপ্লবিক রূপ কেবলমাত্র জেনারেল গার্ডিনারই নন,—কেই, ম্যালিসন, ফরেস্ট, রাসেল, জর্জ ক্যাম্পবেল, টমাস লোয়্রী, আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও লেখকরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো ভারতীয় লেখক মহাবিদ্রোহের এই প্রগতিশীল চরিত্রটাকে অস্বীকার করে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসীর নানা প্রকারের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ১৮১৮ সনে লর্ড হার্ডিঞ্জ লিখেছিলেন: "বিদেশী বিজেতারা পরাজিত জাতির উপর নির্দয় ও হিংসাত্মক ব্যবহারই করে থাকে, কিন্তু আমরা যতখানি ঘৃণার সঙ্গে তাদের প্রতি ব্যবহার করেছি তা কেউই করেনি; অবিশ্বাসযোগ্য, অসৎ এবং রাজকার্যে অনুপযুক্ত বলে আমাদের মতো আর কেউই ভারতীয়দের মনে করেনি।" ১৮২৪ সনে হার্ডিঞ্জ ইংরেজ শাসকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, এই ধরনের উগ্র ও অসম্ভব মনোভাব সব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও কেউ দেখায়নি, এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদিন যখন অসন্তোষ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়বে তখন "তা এত শক্তিশালী হবে যে তা দমন করা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে।"[১৫] হার্ডিঞ্জের এই ভবিষ্যদ্‌বাণীই যে ৩০ বছর পরে সফল হতে চলেছিল তা বলাই বাহুল্য।

মাদ্রাজের গভর্নর স্যার টমাস্‌ মুনরোও এইরকম সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: প্যাক্স ব্রিটানিকার ফলে ভারতে আইন ও শৃংখলার প্রবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু শান্তি স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় সত্তা—যে জাতীয় সত্তা মানুষকে সম্মানিত করে—তাকে বিনষ্ট করে; ভারতবাসীদের পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়ে আমরা শান্তি স্থাপন করেছি।

১৪. General Sir Robert Gardiner: *Military Analysis of the Remote and Proximate Causes of the Indian Rebellion*, pp. 32-33

১৫. Sir John Eddy: *Recollections of a Military Life*. pp. 150

মুনরো আরো বলেছিলেন: "আমাদের রাজত্বের প্রধান দোষ হলো এই যে, আমরা ভারতীয়দের সব থেকে নিম্নস্তরে দাবিয়ে রেখেছি।...প্রত্যেকটি বিশ্বস্ত ও বড় চাকুরি থেকে আমরা তাঁদের দূরে সরিয়ে রেখেছি।...আমরা তাঁদের নিকৃষ্ট জাতি বলে গণ্য করি। যেসব লোক, আমরা না থাকলে ভারতীয় রাজত্বে প্রথম স্থানগুলি সম্মানের সঙ্গে অধিকার করতে পারতেন, যাঁরা গভর্নরের পদে বসতে পারতেন, তাঁদের আমরা বাসার চাকরের মতো গণ্য করি, এবং অনেক সময় আমরা তাঁদের ভৃত্যের মতোই বেতন দিই, এবং আমাদের উপস্থিতিতে তাঁদের আমরা চেয়ারে বসতে পর্যন্ত দিই না।...ভারতে মুসলমান রাজত্বেও সরকারের সর্বোচ্চ আসনগুলিতে হিন্দুরা অধিকারী ছিলেন, এবং প্রায়ই তাঁরা তাঁদের বিজেতাদের থেকে এই সব চাকুরিতে বেশি অংশ পেতেন।"

ভারতীয় সিপাহিদের সম্বন্ধে মুনরো লিখেছিলেন: একজন ভারতীয় সুবাদারের চেয়ে বড় অফিসার হবার আশা করতে পারে না, এবং এই সুবাদার হচ্ছে একজন সর্বনিম্ন ইংরেজ অফিসার, এন্‌সাইনেরও নিচে; অর্থাৎ একজন এন্‌সাইন কমাণ্ডার-ইন-চিফের যতটা নিচে, সুবাদারও এন্‌সাইনের ততটা নিচে।[১৬] একজন সুবাদারের উচ্চতম বেতন ছিল মাসিক ১৭৪ টাকা, কিন্তু একজন অতি নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ সৈন্যের বেতন প্রায় ততখানি। এরকম দুঃসহ জাতীয় অবমাননার অবসান ঘটাবার জন্যে মহাবিদ্রোহের সময় যেসব মহাপ্রাণ ভারতীয় নরনারী অস্ত্রধারণ করেছিলেন- তাঁরা যত 'ফিউডাল,' যত 'ধর্মান্ধ' ও 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন'ই হোন না কেন—সকল স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর নিকট তাঁরা চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞভাজন হয়ে থাকবেন।

ইংরেজরা সাধারণত ভারতবাসীদের কতখানি ঘৃণার চক্ষে দেখত তা এই উদাহরণটি থেকে বেশ বোঝা যায়। জর্জ বোরো নামক একজন লেখক 'রোমানী রাই' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে নায়কের সঙ্গে কোম্পানির একজন রিক্রুটিং সার্জেন্টের পরিচয় হলো—যে তাঁকে কোম্পানির চাকুরিতে প্রবেশ করবার জন্যে আহ্বান করল। এই চাকুরিতে কি কি সুবিধা আছে—এই প্রশ্নের উত্তরে রিক্রুটিং সার্জেন্টটি উত্তর দিলে: "ভারতবর্ষ হচ্ছে সব থেকে সুন্দর দেশ, যদিও তার লোকগুলি হচ্ছে একদল বদমাশ (rascals) যাদের এতটুকু মূল্য নেই, এবং যারা একটা অবোধ্য ভাষায় কথা বলে।" কোম্পানি তার চাকুরিয়াদের কাছ থেকে কি কাজ আশা করে? "এই সব বদমাশগুলিকে লাথি মারা আর কেটে ফেলা, আর তাদের কাছ থেকে রজতমুদ্রাগুলি কেড়ে নেওয়া।" আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দৈব ঘটনা বশত 'রোমানী রাই' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭ সনে—ঠিক যে সনে এই

১৬. Glieg: *Life of Thomas Munro.*

'নেটিভ রাস্কেল'গুলি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে মরীয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সাধারণ ভারতবাসীর মনে ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা এত শক্তভাবে শিকড় বিস্তার করেছিল যে, ১৮৫৮ সনে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের প্রচারের পর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখেছিলেন : "বারংবার বিশ্বাসভঙ্গের ফলে ইংরেজ সরকারের ইজ্জত এত কমে গিয়েছে যে, সততার বাস্তব প্রমাণ না দিলে এই ঘোষণাপত্র যাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছে তারা সহজে এ বিশ্বাস করবে না। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আবার সুযোগ বুঝে সরকার তাদের এই পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলি ভঙ্গ করবে না। রাজাদের সঙ্গে যেসব সন্ধিগুলি প্রচলিত পন্থা অনুসারে পবিত্র প্রতিশ্রুতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই সন্ধিগুলিই যখন বিনা দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে যাদের দ্বারা ভঙ্গ হতে পেরেছিল, তারাই যে নতুন প্রতিশ্রুতিগুলি অনুসারে কাজ করবে, তার গ্যারান্টি কোথায়,—যদিও এই প্রতিশ্রুতিগুলি মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর মুখ থেকে বের হয়েছে?"

ভারতবাসীর মনে ইংরেজের শয়তানি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে এই ধারণা বদ্ধমূল হবার আরো একটা গুরুতর কারণ ছিল। একটি একটি করে ভারতীয় প্রদেশগুলিকে দখল করে, লক্ষ-লক্ষ ভারতবাসীকে শোষণ করে, নিঃস্ব ও বেকার করেই ইংরেজ ক্ষান্ত হলো না, তারা ভারতীয় জনসাধারণকে বিধর্মী ও বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন করে তুলবার জন্যে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিল। ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিগুলিকে তারা ইচ্ছে করে যখন-তখন অবমাননা ও লাঞ্ছিত করতে লাগল এবং ইংরেজ শাসক ও পাদরিরা লোভ ও চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে এবং ছলচাতুরীর দ্বারা যে কোনো উপায়ে ভারতীয়দের খ্রীস্টান করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের ভারতীয় মনুষ্যত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এই প্রসঙ্গে সকল ভারতবাসীরই স্মরণীয়। বস্তুত, একদিকে ইংরেজ পাদরিদের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযান ও অন্যদিকে তাঁদের শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের ফলেই ইংরেজদের এই শয়তানি চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

১৮৩৩-এর নতুন সনদ পাদরিদের ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করার অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দেখতে দেখতে পাদরিদের কার্যকলাপ চতুর্দিকে অসম্ভব ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল, শিশুভবন, হাসপাতাল, জেলখানা, হাটবাজার প্রতিটি স্থানে কুসংস্কার দূর করার নাম করে ভারতীয়দের খ্রীস্টান করার কাজে তারা উঠে পড়ে লাগল। হিন্দু-মুসলমানরা তাদের নিজেদের গৃহে, মন্দিরে, মসজিদে তাদের ধর্মালোচনা সীমাবদ্ধ রাখত, কিন্তু পাদরিরা প্রকাশ্য স্থানে

এসে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মকে আক্রমণ ও নিন্দা করতে লাগল এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা শীলতা ও শালীনতার মাত্রাও ছাড়িয়ে যেত।

ভারতীয়দের খ্রীস্টান করার অভিযানে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এতই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল যে, ১৮৩৬ সনে ১২ই অকটোবর, মেকলে খুব আশা প্রকাশ করে তাঁর মা'কে লিখেছিলেন, যে-নতুন শিক্ষাপ্রণালী ভারতে চালু করা হচ্ছে তার ফলে "৩০ বৎসরের মধ্যে আর একটিমাত্র পৌত্তলিকও বাংলা দেশে থাকবে না।" আইন-আদালতও খ্রীস্টধর্ম প্রচারে নানাপ্রকার সুবিধা করে দিতে লাগল। একটা আইনে (Act 21 of 1850) বলা হলো যে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিতরা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে। "তিনটি প্রেসিডেন্সি আদালত অপ্রাপ্তবয়স্ক নব্য-খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকারীদের তাদের অভিভাবকদের অভিভাবকত্ব স্বীকার না করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মিশনারিদের হাতে সস্ত্রীক তাদের সমর্পণ করত। এরকম একটা বিচারের রায়ের সময় জনসাধারণ আদালত ঘেরাও করে জজকে ইটপাটকেল ছুঁড়েছিল ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মিলিটারি ডাকতে হয়েছিল।[১৭]

কোম্পানির একজন অভিজ্ঞ উচ্চ কর্মচারি, স্যার চার্লস ট্রিভেলিয়ান ১৮৫৩ সনে হাউস অব লর্ডস কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে বলেছিলেন (প্রশ্ন : ৬৭১৮-৯) : "কলকাতা ত্যাগ করবার পূর্বে শিক্ষিত খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকারীদের আমি একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং আমি দেখলাম এই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকারীদের বেশির ভাগই চরিত্রে, শিক্ষায় ও মনের জোরে খ্রীস্টধর্মের প্রধান সহায়ক।···আমার মনে হয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যেভাবে ধর্মান্তর ঘটেছিল, ভারতবর্ষ ঠিক সেইরূপে পাইকারি ভাবে অচিরেই দীক্ষিত হবে। সরাসরি মিশনারি প্রচারের দ্বারা ও পরোক্ষভাবে নানাপ্রকার বই-এর ভেতর দিয়ে, আলোচনার ভেতর দিয়ে ও সর্বপ্রকার জ্ঞানপ্রচারের মধ্য দিয়ে খ্রীস্টীয় শিক্ষা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর যখন এইভাবে সমস্ত সমাজ এই খ্রীস্টীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং যখন জনমত এইদিকে ঘুরে দাঁড়াবে, তখন ভারতীয়রা হাজারে হাজারে খ্রীস্টান হয়ে যাবে।"[১৮]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর একজন প্রধান দিকপাল ম্যাংগল্স মহাবিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন : "ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাতে যিশুখ্রীস্টের নিশান বিজয় গৌরবে উড়তে পারে, তারই জন্যে

১৭. Majumdar : *The Sepoy Mutiny etc.*, p. 249
১৮. J. B. Norton : *Topics for Indian Statesmen*, p. 377

ভগবান এই বিরাট রাজ্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাদের সকলকে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, সমস্ত ভারতবাসীকে যাতে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী করে তোলা যায়। এই মহৎ কাজে এতটুকু অবহেলা করা চলবে না।"

ভারত সরকারের সেক্রেটারি এডমণ্ডের একটা চিঠি ১৮৫৫ সনে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিদের নিকট পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়েছিল যে, এখন সমস্ত ভারত একই সরকারের আজ্ঞাবহ, টেলিগ্রাফের দ্বারা সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে ও রেলের দ্বারা একত্রিত করা হচ্ছে—সুতরাং এখন সমগ্র ভারতের জন্যে একটিমাত্র ধর্মের প্রয়োজন, সকলকেই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে হবে। এইসব কথা পড়ে আজ হয়তো অনেকেই হাসবেন, কিন্তু সেদিন এই ব্যাপার সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে একটা ভয়ংকর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এডমণ্ডের সমস্ত চিঠিটা উদ্ধৃত করে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান লিখেছিলেন: "এটা একেবারেই অলংকারযুক্ত রূপক কথা নয় যে, এডমণ্ডের এই চিঠির কথা জানতে পেরে ভারতবাসীরা আশংকায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল।"[১৯]

এই নীতি অবলম্বন করেই ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে, প্রলোভন দেখিয়ে ও নানাপ্রকার ছল-চাতুরীর দ্বারা ভারতীয়দের যেমন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছিল, তেমনই সিপাহিদের মধ্যেও নানা

১৯. Syed Ahmed Khan : *The Causes of the Indian Revolt*, pp. 21-22. ড° রমেশচন্দ্র মজুমদার, যিনি বিদ্রোহী সিপাহি ও জনসাধারণকে 'ধর্মান্ধ', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' ইত্যাদি নানারকম বিশেষণে বিভূষিত করেছেন, তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে: "Anyone who carefully reads the accounts of those times will be convinced, not only about the actuality of such fears in the minds of all alike, but, what is more important also that there were good grounds for such apprehensions". (*The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, p. 247)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারত সরকারের 'নিরপেক্ষ' ইতিহাসবিদ ড° সুরেন্দ্রনাথ সেন এই সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মত ব্যক্ত করে তাঁর 'উদারনৈতিকতা'র পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "The missionary was an excellent teacher, but his very efficiency as an educationist was a source of grave anxiety to the *orthodox* Indian." (*Eighteen Fifty-Seven*, *p.* 9—Italics mine, P.S)। তাহলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা—যাঁরা পাদরিদের অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁরা কি সকলে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন?

ভাবে এই চেষ্টা চলছিল। সিপাহিদের লোভ দেখানো হতো যে—তারা যদি খ্রীস্টান হয়, তাহলে যে আজ সিপাহি আছে সে হয়ে যাবে হাবিলদার, আর হাবিলদার হয়ে যাবে সুবাদার মেজর; তাদের বেতন বেড়ে যাবে ও তারা নানা রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। ব্যারাকপুরের ৩৪-তম বাহিনীর অধিনায়ক হুইলার নিজের বাংলোতে সিপাহিদের ডেকে তাদের খ্রীস্টান হতে বলতেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজের নামে পুস্তিকা লিখেও সিপাহিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় সাক্ষ্যদানকালে হুইলার বলেছিলেন যে, তিনি গত ২০ বছর ধরে সিপাহিদের খ্রীস্টান করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করে আসছেন।[২০] আরো অনেক অফিসার এই কাজ করতেন, যদিও এটা ছিল তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ বে-আইনি। কিন্তু এই বে-আইনি কাজের জন্যে তাঁদের কোনো শাস্তি হতো না। বরং ক্যানিং থেকে শুরু করে সকলের নিকটই তাঁরা সহানুভূতি পেতেন। ক্যানিং পাদরিদের তহবিলে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন।

খ্রীস্টধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্তিবশেই কি ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে এতখানি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল? তা মোটেই নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, ইংরেজের এই ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টার প্রধান কারণ ছিল ধর্মনৈতিক নয়—রাজনৈতিক। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছিল, যেসব ভারতীয় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা নিজেদের দেশীয় সত্তা হারিয়ে বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন হয়ে ইংরেজদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞ জনসাধারণকে রাজার ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের চিরকালের জন্যে ইংরেজ-রাজের অনুগত গোষ্ঠীতে পরিণত করাই ছিল এই খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। 'নিরপেক্ষ' ইতিহাসবিদরাও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি।[২১]

ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতিগুলিকে ইংরেজরা কত ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দেখত, তার একটি প্রমাণ হলো হায়দ্রাবাদের নিকট বোলারামের ঘটনা। ১৮৫৫

২০. *Causes of the Revolt*, by a Hindu; Forrest: *State Papers*, I. p. 18; Kaye: *History of the Sepoy War in India*, I. p. 480.

২১. Some of the officers, civilian and military were inspired by evangelical zeal... Others were perhaps influenced by considerations of political expediency, for, christianity was expected to supply that bond of lenion between the ruler and the ruled which had hitherto been lacking." (S. N. Sen : *Eighteen Fifty-Seven*, p. 10)

সনে ২০শে সেপ্টেম্বর মহরমের দিন ব্রিগেডিয়ার ম্যাকেঞ্জি এক হুকুম জারি করে মিছিল ও বাজনা নিষিদ্ধ করেছিল। আদেশ অমান্য করে সিপাহিরা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহরমের মিছিল বের করেছিল এবং যে প্রধান রাস্তার ধারে ব্রিগেডিয়ারের বাংলো অবস্থিত ছিল, সেখান দিয়েই তারা যাচ্ছিল। সে সময় ব্রিগেডিয়ার আরো কয়েকজন অফিসার ও 'লেডিজ' নিয়ে পানাহার করছিল। এইসব অফিসারদের ধরে সিপাহিরা বেশ প্রহার দিয়েছিল, এবং আমন্ত্রিত 'লেডিজ'রাও সিপাহিদের ব্যবহারে খুব আনন্দ প্রকাশ করেনি।[২২]

এই হীন প্রচেষ্টার ফলে ভারতবাসীরা ভাবতে শুরু করল যে, ছলে-বলে-কৌশলে ইংরেজরা যেভাবে ভারতের প্রদেশগুলিকে দখল করেছে, ঠিক সেই-ভাবেই ভারতবাসীদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের ধর্ম, সভ্যতা ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেবে। কতকগুলি কারণে ভারতবাসীর মনে, বিশেষ করে সিপাহিদের মনে, আরো একটা সন্দেহ জাগল যে, ভারতীয়দের ধর্ম নষ্ট করে ইংরেজরা তাদের বিদেশে পাঠাবে—ইংরেজদের স্বার্থে অন্যান্য দেশ জয় করবার জন্যে। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিরাট বিদ্রোহের একদিন পূর্বে, ৯ই মে তারিখে হেনরি লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে লিখেছিলেন: একজন ৪০ বছর বয়সের পুরনো ও চরিত্রবান ভারতীয় সিপাহি অফিসার তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি এবং অন্যান্য সিপাহিরা সকলেই বিশ্বাস করেন—সরকার ছলে-বলে ভারতবাসীর ধর্মনাশ করবার জন্যে গত ১০ বছর থেকে চেষ্টা করে আসছে, ঠিক যেভাবে তারা ভারতবাসীর দেশ কেড়ে নিয়েছে। সিপাহি অফিসারটি আরো বলেছিলেন যে, তাঁদের ধর্ম নষ্ট করার পর তাঁদের সাগরপারের অন্যান্য দেশগুলিকে ইংরেজের জন্যে জয় করতে পাঠানো হবে। সিপাহিদের এই ধরণের উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যখন সেকালের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীলদের মধ্যেও এইরকম রাজনৈতিক বোধশক্তি জন্মায় নি, তখনো এইসব 'অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন' সিপাহিদের মধ্যে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কী দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল।

ইংরেজ ইতিহাসবিদ মীড তাঁর 'সিপয় রিভোল্ট' গ্রন্থে লিখেছেন: "আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্রাইমিয়াতে রুশদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই হবার সময় আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে দাবি উঠেছিল, ভারতীয় সিপাহিদের এই যুদ্ধে নিয়োগ করা হোক। অনেক সময় এই দাবিও করা হয় যে, আমাদের উপনিবেশগুলিতে ইংরেজ সৈন্যদের স্থানে ভারতীয় সিপাহিদের পাঠানো হোক। ক্রমশ এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াল যে, ক্রাইমিয়াতে ভারতীয় সৈন্য যদি না পাঠানো হয় তাহলে রুশরাই জয়ী হবে। কিন্তু সিপাহিদের বিদেশে পাঠাতে

২২. *Narrative of the Mutiny of Bolaram.*

হলে তার পূর্বে তাদের ধর্ম ও জাতি নষ্ট করা প্রয়োজন। পারস্য ও চীনের যুদ্ধের সময় এই ধারণা বিস্তার লাভ করল যে, এইসব বিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ তাদের অত্যাবশ্যক মনে করে ও সেখানে গেলে হয় তাদের উপবাসে মরতে হবে, নতুবা তাদের অখাদ্য খেতে হবে।"

সিপাহিদের এই সন্দেহ যে অমূলক ছিল না তার প্রমাণ হচ্ছে—ভারত সরকারের ১৮৫৬ সনের ২৫শে জুলাই-এর 'জেনারেল এনলিস্টমেণ্ট অ্যাক্ট'। ১৮৫৬ সন পর্যন্ত সিপাহিরা যেখানে মার্চ করে যাওয়া সম্ভব সেখানেই তারা যুদ্ধ করবে, এই বলে চাকুরির শর্তে সই করে দিত। এর ফলে সরকার সিপাহিদের সমুদ্রযাত্রায় বাধ্য করতে পারত না। কিন্তু এই জেনারেল এনলিস্ট মেণ্ট অ্যাক্টের দ্বারা ঘোষণা করা হলো যে, এখন থেকে যে সব লোক সিপাহি রেজিমেণ্টে নাম লেখাবে তাদের যেখানেই সরকার হুকুম করবে সেখানেই যেতে হবে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তখন এশিয়া ও আফ্রিকার চতুর্দিকে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত—একটার পর একটা দেশ তারা সরাসরিভাবে জয় করছে কিংবা তাদের প্রভাবাধীনে আনছে। কিন্তু দেশ জয় করার জন্যে প্রচুর সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন। ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা প্রথমত পর্যাপ্ত নয়, দ্বিতীয়ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তারা বিশেষ কাজের হয় না, তৃতীয়ত তারা অত্যধিক ব্যয়সাধ্য।[২৩] পক্ষান্তরে ভারতীয় সৈন্যরা মোটেই ব্যয়সাধ্য নয়, তারা কষ্ট সহ্য করতে পারে, আর কামানের খোরাক হিসেবে প্রচুর সংখ্যায় তাদের পাওয়াও যায়—এই ছিল সেদিনকার অবস্থা। ভারতীয় সিপাহিদের সাহায্যে ইংরেজ ভারত জয় করেছিল। ভারত জয়ের পর তাদের প্রয়োজন ভারতীয় সিপাহিদের সাহায্যে এশিয়া জয় করা। কিন্তু বেঙ্গল আর্মির বেশির ভাগ সিপাহিই ছিল ব্রাহ্মণ ও রাজপুত, এবং কালাপানি পার হওয়া তাদের ধর্ম ও রীতিনীতির বিরুদ্ধ। তাছাড়া বিদেশে বিভূঁইয়ে গিয়ে কঠিন অবস্থার মধ্যে বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইংরেজের জন্যে অন্য দেশ জয় করতে তারা স্বভাবতই খুব উৎসাহ বোধ করেনি। বেঙ্গল আর্মি দু'বার বর্মায় যেতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেছিল,

২৩. "The entire army of India amounts to 315, 520 men costing £ 9,802, 235. Out of this sum no less than £ 5,668,110 are expended on 51,316 European officers and soldiers." "The European corps take no share in the rough ordinary duties of the service...They are lodged, fed and paid in a manner unknown to other soldiers." (*The Mutiny in the Bengal Army* by a Retired officer, p. p. 25-26)

আর ১৮৪০ সনে মাদ্রাজ আর্মি চীনের প্রথম আফিম যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছিল। এইভাবে ভারতের চূড়ান্ত অবনতির দিনেও ভারতীয় সিপাহিরা সময় সময় ভারতীয় মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল।

জেনারেল এনলিস্টমেণ্ট আইন তৈরি করে গিয়েছিলেন ডালহাউসি, আর ক্যানিং ভারতে আসার পরই এই আইন চালু করে কাজ শুরু করে দিলেন। এর ফলে সিপাহিদের মনে বিক্ষোভ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দ্রুত বেড়ে গেল। ফরেস্ট বলেন: "একজন ভারতীয় রাজভক্ত অফিসার বিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, যখন পুরনো সিপাহিরা এই জেনারেল এনলিস্টমেণ্টের কথা জানতে পারল তখন তারা বিক্ষুব্ধ ও ভীত হয়ে উঠল। তারা বলল, যেসব সিপাহিরা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের অনেককেই এখনো পর্যন্ত জাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; এখন এই আইনের বলে কে জানে ইংরেজ আমাদের জোর করে কোথায় পাঠাবে? এর পর হয়তো তারা আমাদের লণ্ডন পাঠিয়ে দেবে।"[২৪]

ভারতবাসী ও সিপাহিদের মন যখন এইসব ঐতিহাসিক কারণে খুবই বিক্ষুব্ধ অবস্থায়, ঠিক সেই সময় ভারতে শুয়োর-গোরুর চর্বি মিশ্রিত টোটার প্রশ্ন দেখা দিল। চর্বি মিশ্রিত টোটা চালু করবার প্রচেষ্টার মতো এত বড় মূর্খতা বোধ হয় ইংরেজ শাসকবর্গ আর কোনো কালেই করেনি।[২৫] হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে তারা এতদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছিল; কিন্তু টোটার বিপদ এক মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের একতাকে সুদৃঢ় করে দিল। ভারতের চতুর্দিকে রাষ্ট্র হতে শুরু করল, এই টোটা দিয়েই ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমান সকল সিপাহির জাত নষ্ট করবে এবং তাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করবে। ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয় যে কেবলমাত্র একটা কুসংস্কারের প্রশ্নই নয় তা ইংরেজ

---

২৪. *History of Indian Mutiny*, p. xxii

২৫. "The recent researches of Mr. Forrest in the records of the Government of India prove that the lubricating mixture used in preparing the cartridges was actually composed of objectionable ingredients, cow's fat and lard, and that incredible disregard of the soldiers' religious prejudices was displayed in the manufacture of the cartridges." (Field Marshal Roberts: *41 years in India*, p. 431)। লেকি লিখেছেন: "English writers must acknowledge with humiliation that if mutiny is ever justifiable, no stronger justification can be given than that of the Sepoy troops." (Leckey: *The Map of Life*, p. 98)

ইতিহাসবিদ লেকি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর 'ম্যাপ অব লাইফ'-এ লিখেছিলেন : "সিপাহিদের টোটা ব্যবহার করতে বলা আর ১৭শ' খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সৈন্যদের পরলোকের মুক্তির আশা ত্যাগ করতে বলা ও তাদের খ্রীস্টান ধর্মকে অপমান করতে বলা একই কথা।"

ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিরা চর্বি মিশ্রিত টোটা চালু করার কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সিপাহিরা মিষ্টি কথায় ভুলতে রাজী হয়নি। এমনকি ড° রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো সিপাহি-দের এত বড় একজন কঠোর সমালোচককেও বলতে হয়েছে যে, সিপাহিরা টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়েছিল, তা ন্যায়-সংগতই হয়েছিল।[২৬]

টোটা ব্যাবহারের প্রতিবাদে সিপাহিদের বিদ্রোহকে ইংরেজদের অনুকরণে তৎকালীন কোনো কোনো বাঙালি অজ্ঞ, অন্ধ সিপাহিদের কুসংস্কারের ফল বলে মেনে নিয়েছিলেন। আবার, অন্যদিকে বিদ্রোহের সময় কলকাতার কতকগুলি ইংরেজি সংবাদপত্র বাঙালি শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বলতে থাকে যে, 'নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার হওয়ার ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটেছে। তার উত্তরে 'মিউটিনিজ অ্যাণ্ড দি পিপল' নামক বইয়ের 'হিন্দু' নামধারী শিক্ষিত লেখক তীব্র প্রতিবাদ করে নির্লজ্জভাবে লিখেছিলেন : "সিপাহিদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারই এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, ভারতীয় ভদ্রলোকদের শিক্ষা এর জন্যে দায়ী নয়।" তিনি আরো বলেন যে, যদি সিপাহিরা ভদ্রলোকদের মতো শিক্ষিত হতো তাহলে চর্বি মিশ্রিত টোটার কথা কিংবা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার কথা তারা মোটেই বিশ্বাস করত না। সুতরাং "জনসাধারণকে শিক্ষা দাও, তাহলে দেখবে যে, জমিদার ও মহাজনদের মতো সিপাহিরাও ইংরেজের অনুগত হবে এবং প্রতি গ্রামের কৃষকরা সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়ে ও তাদের সাহায্য না করে, তাদের ধ্বংস করবে।"[২৭] ছদ্মনামধারী এই 'হিন্দু' ভদ্রলোকটি ছিলেন তৎকালীন একজন বুদ্ধিজীবী 'প্রগতিশীল' বাঙালি।

ভারতীয়দের জাতীয় আবেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইংরেজ যে চর্বি মিশ্রিত

২৬. **"In judging the effect of the story of greased cartridges on the minds of the sepoys and the justice or reasonableness of their obstinate refusal to use them, we must remember the very essential fact, often ignored, that the story was undoubtedly a true one." (*The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, p. 251)**

২৭. ***Mutinies and the people* — by a Hindu, p. 41**

টোটা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, সেই টোটাই ভারতের স্তূপীকৃত বারুদে স্ফুলিঙ্গের কাজ করল। এ সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন : "এই গুরুতর ভুল, ভারতের যে বিস্ফোরক স্তূপ ইংরেজদের পূর্ববর্তী কুকার্যের ফলে রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছিল, তাতে অগ্নিসংযোগ করল। সিপাহিদের আবেগ ও মনোভাব একেবারে উপেক্ষা করে সামরিক বিভাগ তাদের মধ্যে টোটা চালু করতে পারবে, সামরিক বিভাগের এই অজ্ঞতা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। অন্য সময়ে হয়তো এই টোটা উপলক্ষ করে এত বড় গুরুতর ঘটনা নাও ঘটতে পারত, যদি না সিপাহিদের মন ইংরেজদের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকত।"[২৮] ইতিহাসজ্ঞ জাস্টিন ম্যাকার্থিও ঠিকই বলেছেন : "এই টোটার প্রতিবাদই ভারতীয় বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে আকস্মিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শ যোগাল। যদি এই স্ফুলিঙ্গের দ্বারা ইন্ধনের কাজ না হতো, তাহলে অন্য কোনো বস্তু সেই ইন্ধন যোগাত।" ১৮৫৭ সনে সিপাহি ও ভারতবাসীর মন বিদ্রোহের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল, তা না হলে কেবলমাত্র টোটার পক্ষে এই বিস্ফোরণ ঘটানো কখনো সম্ভব হতো না, এবং টোটার সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারত।

একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : "টোটা বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ হতে পারে, ডিজরেইলি এমন কোনো কথায় আমলই দিতেন না। সিপাহিরা যে টোটা তাদের ধর্মনাশ করবে বলে ঘোষণা করেছিল, সেই টোটাই আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার সময় ব্যবহার করেছিল।"[২৯] বাহাদুর শাহের বিচারের সময় সরকারি পক্ষের উকিল বেশ জোর করেই বলেছিলেন যে, এই বিদ্রোহ মোটেই ধর্মনৈতিক কারণে ঘটেনি, ঘটেছিল প্রধানত রাজনৈতিক কারণে। অন্য কোনো গভীর কারণ না থাকলে, কেবলমাত্র টোটার ব্যাপারটাই এত ব্যাপক ও এত সাংঘাতিক বিদ্রোহ ঘটাতে পারত না। টোটার প্রশ্ন আসার আগেই ভারতীয়দের মন বিদ্রোহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[৩০]

২৮. *Writings of Harish chandra Mukherjee*, p. 18.

২৯. Ball : *Indian Mutiny*, vol. I, p. 629.

৩০. Prosecutor's statement during Bahadur Shah's trial in Delhi : "I may perhaps be in error in attributing to a religious influence a movement which, after all, may prove to have been merely a *political* one—a struggle of the natives for power & place, by the expulsion from the country of a people alien in religion, in blood, in colour, in habits, in feelings and in everything...That neither Mussulman nor Hindu had any honest objection to the use of any of the cartridges at Meerut or

বস্তুত বিদেশী শাসকদের শোষণ, অত্যাচার ও অবমাননার ফলে যে আক্রোশ ভারতবাসী ও সিপাহিদের মনে বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেই আক্রোশই টোটার প্রশ্নে অকস্মাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। ভারতের এই পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে পার্লামেন্টে একজন সভ্য বলেছিলেন : ভারতে এত অসন্তোষ জমে উঠেছে যে, তা শুধুমাত্র একটা নয়, অন্তত ডজন খানেক বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিতে পারে। ইটালিতে একটি প্রবাদবাক্য আছে : "প্রতিশোধের আকাংক্ষা অনেকদিন সুপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু কখনো তার মৃত্যু ঘটে না।" উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারত সম্পর্কে একথা খুবই প্রযোজ্য। নর্টন ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন : "দুদিন আগেই হোক, আর দুদিন পরেই হোক ; কোনো স্থানে, কোনো উপায়ে, কোনো সময়ে, যদিও মানুষের পক্ষে খুব সঠিক স্থান, কাল, পাত্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়, মহাকাল অপরিহার্যভাবে এইসব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেই ; যে বিষবৃক্ষ আমরা রোপণ করেছি, তার বিষময় ফল আমাদের ভোগ করতে হবেই।"[৩১]

ভারত সরকারের সামরিক ইনটেলিজেন্স দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা উইলিয়াম মুইর বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে—"একটা আত্মশক্তির চেতনা সিপাহি বাহিনীতে জেগে উঠেছিল, যার স্ফুরণ কেবলমাত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সম্ভব ছিল। টোটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহের সেই সুপ্ত শক্তিকে কার্যকরী করে তুলেছিল মাত্র।"[৩২]

Delhi, is sufficiently proved by the eagerness with which they used them, when their aim & object was the murder of their European officers...Is it possible that such fearful results as these could have at once developed themselves, had the native army previous to the cartridge question been in a sound & well affected state ?...Can it be imagined that the three regiments at Meerut even when joined by those at Delhi, could have conceived an idea so daring as that overthrowing, by themselves, the British Government in India ?" (*Two Historic Trials in Red Fort*, pp. 392-95)

৩১. Norton : *Topics for Indian Statesmen*, p. 43

৩২. *Records of the Intelligence Department During the Mutiny*, vol. II, p. 120. "It may be observed that this point of the cartridges so openly & frequetly insisted on, before the 10th of May, gradually became more & more

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল আর্মির শক্তিও বেড়ে যেতে লাগল। ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহের পূর্বে ভারত সরকারের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ও কামানের সংখ্যা ছিল ৫১৬টি। এর মধ্যে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার; এই ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার অবস্থান করত উত্তর-ভারতে।

ভারতের বাহিনী তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল—বেঙ্গল আর্মি, মাদ্রাজ আর্মি ও বম্বে আর্মি। এগুলির মধ্যে বেঙ্গল আর্মিই ছিল সব থেকে শক্তিশালী ও তার কর্মক্ষেত্র ছিল আসাম থেকে পেশোয়ার, আর সিমলা থেকে নর্মদা। বেঙ্গল আর্মির সিপাহিদের সংখ্যা ছিল পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ মিলিয়ে ১ লক্ষ ৪০ হাজার। এর মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাজদের সংখ্যা ছিল ২ হাজার। এই গোলন্দাজরাই যে সিপাহি বাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল ও সিপাহিদের আত্ম-শক্তিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসবান করে তুলেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপরের তথ্যগুলি থেকে একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সংখ্যা ও সংগঠনের দিক থেকে সিপাহিরা খুব নিকৃষ্ট অবস্থায় ছিল না, যদিও তাদের মধ্যে সবথেকে বড় দুর্বলতার কারণ ছিল শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর অফিসারের অভাব। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, ১৮৫৭ সন পর্যন্ত ভারতীয় সিপাহিরা তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র কামান ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়নি এবং এটাও একটা উল্লেখযোগ্য কারণ, যার জন্যে তারা নিজেদের খুব অসহায় বোধ করেনি।

সিপাহি বাহিনী সম্বন্ধে একজন ইংরেজ বিদ্রোহের সময় লিখেছিলেন: "বিদ্রোহের পূর্বে বেঙ্গল আর্মিতে শাসকজাতি অধীন জাতির লোকদের হাতে এতগুলি কামান কি করে ছেড়ে দিয়েছিল তা ভেবে সকলেই আশ্চর্য হতেন। পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র কনটিনজেন্ট ইত্যাদি সাময়িক বাহিনীর কামান-গুলি ছাড়াও নিয়মিত গোলন্দাজ বাহিনীগুলির মধ্যে পাঁচ ভাগের ২ ভাগ কামান ছিল নেটিভদের হাতে।" তারপর উপসংহারে এই ইংরেজ বীরপুরুষটি বলছেন: "কামানগুলি রাখা উচিত কেবলমাত্র ইংরেজদের হাতে। নেটিভদের হাতে কোনো কামানই রাখা উচিত নয়। নেটিভরা যাতে আমাদের ভয় ও সম্মান

---

indistinct ..and after furnishing the mutineers with their first war cry at Delhi, it seems to have answered its purpose... With little or no vitalily at starting, it soon died a natural death, and was succeedad by a reality of purpose, and a fixedness of resolve." (Prosecutor's statement during Bahadur Shah's Trial : *Two Historic Trials in Red Fort*, p. 396)

করে, তার জন্যে তারা যাতে নিজেদের দুর্বল ও অসহায় মনে করে তা করতে হবে।"[৩৩]

বিদ্রোহের সময় সিপাহিরা কামানের দ্বারা ইংরেজ শিবিরে কি ভয়ংকর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা বিদেশী শাসকরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল। তাই বিদ্রোহের পর, ভারতীয়দের হাতে আর কোনো কামান দেওয়া হবে না, এই সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছিল। লর্ড এলেনবরো এই সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "কামান তৈরি করতে ও কামান চালনা করতে নেটিভদের একটা প্রতিভা আছে; এবং এর সুযোগ যাতে তারা আর না পায় সেটা আমাদের দেখতেই হবে।...নেটিভরা কামানের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তবু কামান ছেড়ে দেবে না। এই যুদ্ধে তাদের কৃতিত্ব খুঁব কম করে আমাদের সমানই ছিল।"[৩৪]

লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন: "ভারতীয়রা অতি উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ, কিন্তু তাদের হাতে কামান দিতে আর বিশ্বাস হয় না; তারা কামানকে ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে।"[৩৫]

পাঞ্জাবের কমিশনাররাও এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন: "পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশ থেকে কামানের মূল্য বোধ হয় এশিয়াতেই বেশি। ভারতীয়রা কামানকে অত্যধিক ভয় পায়, তার জন্যেই ভারতীয় গোলন্দাজদের কাছে কামান অনুরাগ ও পূজার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজের একটি ছোট বাহিনীর হাতে শক্তিশালী কামান থাকলে তারা দুর্নিবার হয়ে উঠবে; এবং কামান ছাড়া সিপাহিদের কোনো বিদ্রোহে জয়ী হবার আশা থাকবে না।"[৩৬]

বিদ্রোহের পর ১৯৩৫ সন পর্যন্ত ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী আর গঠন করা হয়নি। আর ১৯৩৫ সনেও মাত্র একটি গোলন্দাজ বাহিনীই গঠন করা হয়েছিল।

বেঙ্গল আর্মির সিপাহিদের আত্মশক্তির উপর *নির্ভরশীল* হবার আরো একটি কারণ ছিল। বেঙ্গল আর্মি যেভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিল, তা সিপাহিদের মধ্যে একতা গড়ে উঠবার সহায়ক ছিল। প্রধানত অযোধ্যা ও পশ্চিম বিহারের ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও মুসলমানদেরই এই বাহিনীতে নেওয়া হতো। এই ধরনের সিপাহি সংগঠনকে বলা হতো 'সাধারণ সংমিশ্রণ' প্রথা, অর্থাৎ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব সিপাহিদের একই দলভুক্ত করা। বম্বে ও মাদ্রাজের বাহিনীগুলিও এই প্রথাতেই সংগঠিত ছিল, তবে সেখানে নিম্নবর্ণের লোকদের ও খ্রীস্টানদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল।

৩৩. *Calcutta Review*, September, 1857. pp. 99-100
৩৪. *Report of the Peel Commission*, 1858-59, Appendix-2
৩৫. *Ibid*, Appendix-54
৩৬. *Peel Commission Supplementary Papers*, p. 6

বেঙ্গল আর্মি সম্বন্ধে ইতিহাসবিদ কেই লিখেছিলেন : "এই বেঙ্গল সিপাহি··· সব থেকে উৎকৃষ্ট সৈনিক, দীর্ঘদেহী, সুগঠিত ও মহত্বপূর্ণ, কিন্তু সে দক্ষিণী সিপাহিদের মতো নম্র ও সেবাপরায়ণ নয়। ভালো মেজাজে থাকলে তার থেকে উৎকৃষ্ট সৈনিক পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, সে সব সময় ঠিক ভালো মেজাজে থাকে না। সে প্রায়ই যে রকম খারাপ মেজাজের পরিচয় দেয়, তা তার কমাণ্ডারদের কাছে খুবই কষ্টদায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক।"[৩৭]

কেই আরো এক জায়গায় বলেছেন : "এই সিপাহিরা নির্ভীকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে এবং সর্বপ্রকারের বিপদ, অনাহার ও কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়েছে। যে অফিসারকে তারা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, তার দ্বারা চালিত হলে তারা এমন কিছু কষ্ট নেই যা সহ্য করবে না, আর এমন কিছু কাজ নেই যা করবে না। তারা এমন দুর্গম স্থানে বাহিনীর পতাকা তুলে ধরেছে, যেখানে পৌঁছতে ইংরেজদের শক্তি ও অধ্যবসায় ব্যর্থ হয়েছে।"[৩৮]

ভারতে ফরাসি ও ইংরেজদের মধ্যে যে কতকগুলি ঔপনিবেশিক যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ফরাসিরাই প্রথম তাদের বাহিনীতে ভারতীয় নিযুক্ত করে। তারা দেখতে পেয়েছিল যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও নেতৃত্ব পেলে ও শৃংখলাবদ্ধ হলে, সিপাহিরা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক হতে পারে। ফরাসিদের অনুকরণে ইংরেজরাও সিপাহি বাহিনী গঠন করতে থাকে। এইভাবে পলাশি যুদ্ধের সময় ক্লাইভ বেঙ্গল আর্মি গঠন করেছিলেন। এই বেঙ্গল আর্মিই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে একটার পর একটা প্রদেশ ইংরেজদের জন্যে জয় করেছিল। কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে, তার জন্ম থেকেই সে বারবার বিদ্রোহ করে তার প্রভুদের ভারতে অস্তিত্ব অনেকবার বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সিপাহিদের চরিত্রের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটাই ইংরেজ শাসকদের মনে তাদের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত আতঙ্ক সৃষ্টি করে এসেছে।

বেঙ্গল আর্মির প্রথম বিদ্রোহ ঘটে পলাশি যুদ্ধের ৭ বছর পর ১৭৬৪ সনে। কোর্ট মার্শালের বিচারে ৩০ জন সিপাহিকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার হুকুম হয়। ভারতের সব থেকে ঐশ্বর্যশালী প্রদেশ বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে জয় করার জন্যে সিপাহিদের এই প্রথম পুরস্কার। প্রথম ৪ জন সিপাহিকে যখন কামানের মুখে বাঁধা হচ্ছে, তখন ৪ জন দীর্ঘাকৃতি সিপাহি এগিয়ে এসে বলল—তারাই হচ্ছে এই বাহিনীর নেতৃস্থানীয়, সুতরাং প্রথম মৃত্যুর সম্মান তাদেরই প্রাপ্য। ভারতের ৩০ জন বীর সৈনিক এরকম নির্ভীকভাবেই জীবন দিয়েছিল। ইংরেজ

---

৩৭. Kaye : *History of Sepoy War in India*, vol. I, p. 213

৩৮. *Ibid*, p. 202-3

ইতিহাসবিদ কেই ভারতীয় সিপাহিদের এই বীরত্বের খুব প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এই নিরর্থক বীরত্ব একটা ভারতীয় জাতীয় ট্রাজেডি মাত্র।

স্যার টমাস মুনরো যখন মাদ্রাজে গভর্নর ছিলেন, তখন সিপাহিদের নিকট থেকে তিনি একটি বেনামী চিঠি পান। এই চিঠিতে সিপাহিরা লিখেছিল: আমরা সিপাহিরা যদি তলোয়ারের জোরে কোনো প্রদেশ জয় করি, কাপুরুষ ফিরিঙ্গি সন্তানেরা সেই দেশ দখল করে সেখানে নবাব হয়ে বসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে টাকা-পয়সায় তাদের বাক্স ভর্তি করে ইয়োরোপে ফিরে যায়। কিন্তু একজন সিপাহি যদি সারাজীবন ধরেও খেটে মরে, তবু পাঁচটি কড়িও সে বেশি পায় না।"

এই চিঠিতে আরো বলা হয়েছিল যে মোগল রাজত্বে এই রকম অবস্থা ছিল না, কারণ যুদ্ধে জয়ী হলে তখন সৈনিকদের জায়গির দেওয়া হতো এবং অনেকেই উচ্চপদ লাভ করত।[৩৯] এই চিঠির ওপর কেই মন্তব্য করেছিলেন যে, এ রকম আবেগপূর্ণ চিন্তাধারা সিপাহিদের মধ্যে সব সময়ই বদ্ধমূল ছিল এবং অল্প চেষ্টাতেই তাকে বাস্তবরূপ দেওয়া কিছুই শক্ত কাজ ছিল না।[৪০] জনসাধারণের এই চেতনাই তো জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশ।[৪১]

৩৯. রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির লোক ছিলেন না এবং তিনি কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর যে ইতিহাসবোধ ছিল তা অনেক ইতিহাস-পণ্ডিতদের মধ্যেও দেখা যায় না। তিনি লিখেছিলেন: "মুসলমান সম্রাটের সময় দেশ-নায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই ;...এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ 'হাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া' – এক সময়ে ভারতে পৌরুষ রক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল. আজ কেবল কেরানিগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ...ইংরেজ বলে, 'তোমরা কেবলই চাকুরির দিকে ঝুঁকিয়াছ, ব্যবসা কর না কেন?' এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচশত কোটি টাকা খাজনায় ও মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। মূলধন থাকে কোথায়? এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি। তবু কি বিলাতি অত্যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কেবলই দরখাস্ত জারি করিতে হইবে? হায়, ভিক্ষুকের অনন্ত ধৈর্য্য!" ('অত্যুক্তি' প্রবন্ধ – দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড)

৪০. Kaye, I p. 264.

৪১. এইসব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ড° মজুমদার প্রমুখ এই মত স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে, সিপাহি ও জনসাধারণের মধ্যে কোনো জাতীয় চেতনার ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ হয়নি, বিদেশী শাসকদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে জাতীয় অপমান-বোধ তাদের মধ্যে জাগেনি; কেবলমাত্র শুয়োর-গোরুর চর্বিমিশ্রিত টোটার বিরুদ্ধেই তারা কুসংস্কার ও অন্ধ

পীড়নের একটা চাপের মধ্যে এই রকম জাতীয় চেতনার উন্মেষের ফলে বেঙ্গল আর্মির সিপাহিদের মধ্যে সর্বত্র একটা সংগ্রামশীল ঐক্যবোধ জেগে উঠল। পরস্পরের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্যগুলি ঘষামাজায় সমতল হয়ে গেল ও সিপাহিরা একটা নব আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। ১৮৫৭ সনে বেঙ্গল আর্মিতে কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিদ্রোহ যে এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে পেরেছিল, তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে সিপাহিদের মধ্যে এই একাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ।

ভারতবাসীদের মধ্যে এই নব চেতনা ও ঐক্যবোধই যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শত্রু, তা এই দেশের কয়েকজন আলোকপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরা না বুঝলেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাই তাদেরই একজন উচ্চ সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন কোক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন : "বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মাবলম্বীদের একটা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করলে তারা সংমিশ্রিত হয়ে একত্রিত হয়ে যায় ও একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। কিন্তু তাদের যদি বিভিন্ন বাহিনীতে রাখা হয় তাহলে এরকম ফল হয় না। হিন্দু, মুসলমান ও শিখেরা পরস্পরের স্বাভাবিক (!) শত্রু ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এইরকম দলে রাখার ফলে তারা সকলেই সরকারের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছিল ; শুধু তাই নয়, তারা হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদেরও তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে উত্তেজিত করেছিল, যা করা কখনোই সম্ভব হতো না, যদি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকগুলিকে বিভিন্ন দলে তফাত করে রাখা হতো। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে, এই বিভিন্ন জাতি ও ধর্মগুলির (যে ভেদাভেদগুলির অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয়) পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্যকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা ও তাদের সংমিশ্রণের সুযোগ না দেওয়া। 'বিভক্ত করা ও শাসন করা' – এই হবে ভারত সরকারের নীতি।" বিদ্রোহের পরবর্তীকালে কিভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত হবে, তাই ছিল পীল কমিশনের বিচার্য বিষয়। পীল কমিশন রায় দিয়েছিল যে, সিপাহিদের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দিতে হবে, আর ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়াতে হবে, যদিও একজন ইংরেজ পুষতে একজন সিপাহি থেকে ৪।৫ গুণ বেশি খরচ হয় ; বিদ্রোহের পূর্বে যেখানে একজন ইংরেজ সৈন্যের অনুপাতে ৫ জন সিপাহি ছিল, সেখানে এখন থেকে হবে ২ জন, বড় জোর ৩ জন সিপাহি ; কামানগুলি থাকবে কেবলমাত্র ইংরেজ গোলন্দাজদের হাতে ; প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে

ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। ড° মজুমদারের এই মতবাদ যে কত অনৈতিহাসিক ও তথ্য-বিরোধী অসত্য, তা যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনী রাখতে হবে। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে এইটেই যথেষ্ট হবে না। পাঞ্জাব কমিশনাররা বললেন (এবং সরকারও তা মেনে নিলেন) যে, "অধিক সংখ্যক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে আরো একটা ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার—সেটা হচ্ছে নেটিভদের বিরুদ্ধে নেটিভদের দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা। 'সাধারণ সংমিশ্রণ' তত্ত্ব হিসেবে ভালো শোনালেও আমাদের খুব উপকারে লাগেনি। দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের এক সঙ্গে রাখলে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বেশিদিন বজায় থাকে না। অন্যের প্রতি তাদের জাতিগত বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাবগুলি দুর্বল হয়ে যায়, অবশেষে তারা একতন্ত্রী হয়ে পড়ে; তাদের মধ্যে সংঘর্ষ যাতে বেড়ে যায়—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের যে মিশ্রিত করা হয়েছিল—সেই উদ্দেশ্যই অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি (যার ফলে এক প্রদেশের মুসলমানরা আর এক প্রদেশের মুসলমানদেরও ভয় ও ঘৃণা করে থাকে) বাঁচিয়ে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং ভবিষ্যতে সিপাহি দলগুলি হবে প্রাদেশিক, যার মধ্য দিয়ে অনৈক্য ও রেষারেষি তীব্রভাবে বেড়ে যাবে।"[৪২]

চিফ-অব-স্টাফ, জেনারেল ম্যান্‌সফিল্ড আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন: "আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে একই কোম্পানিতে কিংবা একই বাহিনীতে মুসলমানদের রাখা ঠিক হবে না, এবং হিন্দু ও শিখদেরও একই দলে মিশতে দেওয়া উচিত হবে না। প্রতি বাহিনীতে এই বিভেদগুলি অতিশয় যত্ন নিয়ে রক্ষা করতে হবে; আমি একথাও বলব যে, বিভিন্ন দল-গুলির মধ্যে রেষারেষি এবং এমনকি ঘৃণাও যাতে বেড়ে যায় তা দেখতে হবে। এই নীতির ফলে সিপাহিদের শৃংখলা ভেঙে যাবে, সে ভয়ের কোনো কারণ নেই; বরং এর ফলে আমাদের প্রতি সিপাহিদের নির্ভরতা অনেক পরিমাণে বেড়েই যাবে।"

দলমত নির্বিশেষে ইংরেজ শাসকরা সকলেই এই একই মত ব্যক্ত করলেন; এমনকি লর্ড এলফিনস্টোনের মতো একজন শিক্ষিত উদারনৈতিক লোকও এই মতে সায় দিলেন।[৪৩] মহাবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ সরকার সচেতন ভাবে ও পরিকল্পনা করে যেমন ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনই সামরিক বিভাগে ভেদনীতি (Divide and Rule) চালু করতে শুরু করে দিলেন।

মহাবিদ্রোহের পটভূমি প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। ভারত জয় করতে ইংরেজদের অনেকদিন লেগেছিল। তাদের ভারত জয় ১৭৪৮ সনে আর্কট অবরোধ থেকে ১৮৪৮ সনে পাঞ্জাবের যুদ্ধ পর্যন্ত এক শতাব্দীর

৪২. *Peel Commission Supplementary Papers*, p. 30
৪৩. *Peel Commission's Report*, Appendix, p. 14

অবিরাম যুদ্ধ, দুর্নীতি ও কূটনীতির ফল। ১৮৪০ সন পর্যন্ত কেবলমাত্র উপকূলবর্তী প্রদেশগুলিতেই ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৪৮ সন পর্যন্ত ভারতের অর্ধভাগ ভারতীয় রাজাদের শাসনাধীনে ছিল—অযোধ্যা রাজ্যের সার্বভৌমত্ব একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়নি, মহারাষ্ট্রীয়দের গোয়ালিয়র রাজ্য কম শক্তিশালী ছিল না, বিশেষ করে রণজিৎ সিংহের শিখ সাম্রাজ্য ইংরেজ শাসকদের মনে আতঙ্কেরই সৃষ্টি করত। ১৮৩৭ সন পর্যন্ত মোগল মুদ্রাই সারা ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ফার্সি ভাষাতেই সরকারি কাজ চলত।

কিন্তু ১৮৪৪ থেকে ১৮৫৬, এই ১২ বছরের মধ্যে ভারতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে যায়; গোয়ালিয়র তার স্বাধীনতা হারায়, পাঞ্জাব পর পর দুটি যুদ্ধের পর অধিকৃত হয় ও সর্বশেষে অযোধ্যার স্বাধীনতাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এতদিনে ভারতবাসী অনুভব করল যে, সমগ্র ভারত সত্য সত্যই পরাধীন দেশে পরিণত হলো। কিন্তু তা হলেও বহু ভারতীয় তখনো এই অবস্থাটাকে ইতিহাসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেন নি, তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ রাজাকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেন নি।

এই সময়কার কতকগুলি ঘটনা বরং তাদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে আরো জাগ্রত করে তুলেছিল। ১৮৩৯-৪২-এর প্রথম আফগান যুদ্ধে তারা দেখেছিল যে ইংরেজের শক্তি যতটা দুর্ধর্ষ বলে মনে হতো কার্যত ততটা ছিল না। সেই যুদ্ধ থেকে একজন মাত্র ইংরেজ জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিল—এই ঘটনা ভারতবাসীর মনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। ১৮৫৬ সনে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধেও ইংরেজদের সামরিক খ্যাতি পুনরায় গুরুতরভাবে কমে গেল। এই যুদ্ধে ইংরেজরা তাদের অযোগ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিল, তাদের হতাহতের সংখ্যাও সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ একদিকে ইংরেজের এইরকম শোচনীয় অবস্থা ও অন্যদিকে রুশদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী ভারতে তখন খুব প্রচার হয়েছিল : নানা সাহেবের প্রতিনিধি আজিমুল্লা খান লণ্ডন থেকে ভারতে ফিরবার পথে, রুশ 'রুস্তমরা' কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ছে তা দেখবার জন্যে ক্রাইমিয়াতে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় লণ্ডন টাইম্‌স-এর প্রতিনিধি রাসেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে—একথা রাসেল তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন।[৪৪] আজিমুল্লা দেশে ফিরে ইংরেজের অক্ষমতার কথা বহু প্রচার করেছিলেন। ১৮৫৬-৫৭ সনে ইংরেজরা যখন পারস্যদেশ আক্রমণ করেছিল, সেখানে তারা খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি।

৪৪. W.H. Russel : *My Indian Mutiny Diary*, vol. I, 1859. pp. 167-70. এটা খুবই সম্ভব যে, আজিমুল্লার নিকট এইসব রিপোর্ট শুনে

এইসব ঘটনা ও প্রচারের ফলে ইংরেজের শক্তি, গৌরব ও খ্যাতি সম্বন্ধে ভারতীয় জনমানসে একটা মোহভঙ্গ হয়েছিল; যত সাময়িকভাবেই হোক না কেন, ভারতীয় জনসাধারণ ব্রিটিশ শক্তিকে অপরাজেয় বলে ধরে নেয় নি।[৪৫] বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে বহুবার অস্ত্রধারণ করেছিল, এই ঐতিহ্যটাও তাদের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ১৮৫৭ সনে যখনো স্বাধীন ভারতের স্মৃতি সকল ভারতীয়দের মন থেকেই মুছে যায়নি, যখন স্বাধীনতা ও পরাধীনতার ব্যবধানটা অনেকেই বুঝতে পারতেন, তখন এইসব ঘটনা ও প্রচার ভারতের তৎকালীন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের চিত্র ভারতীয় জনমানসে জাগ্রত হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। বস্তুত, নানা ঐতিহাসিক কারণে ১৮৫৭ সনে ভারতে একটা বৈপ্লবিক আবহাওয়ারই সৃষ্টি করেছিল। একশত বৎসরের পরাজয়, লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্যের গ্লানি সরিয়ে দিয়ে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ও আশা-উদ্দীপনা নিয়ে ভারতের সাধারণ মানুষ, হিন্দু মুসলমান আদিবাসী সকলে মিলিতভাবে অন্তত একটিবারের মতো তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মাথা তুলে মানুষের মতো দাঁড়িয়েছিল।

নানা সাহেবের ইংরেজদের প্রতি মনোভাব বদলে গিয়েছিল এবং তার পর থেকেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন।

৪৫. এই বিষয়ে কেই লিখেছেন: **"We deceive ourselves when we think that European politics make no impression on the Indian public. The inpression may be very vague and indistinct; but ignorance is a magnifier of a high power...That a number of very preposterous stories were industrially circulated, and greedily swallowed during the Crimean war, and that these stories all pointed to the downfall of the British power, is not be doubted." (Kaye : *Ibid*, I, p. 342)**

মহাবিদ্রোহের সূচনা

"If there be fuel prepared, it is hard to tell whence the spark shall come that shall set it on fire. The matter of seditions is of two kinds—much poverty and much discontentment. It is certain, so many over-thrown estates, so many votes for troubles... The causes and motives for sedition are innovations in religion, taxes, alteration of laws and customs, breaking of privileges, general oppression, advancement of unworthy persons, strangers, deaths, disbanded soldiers factions grown desperate; and whatsoever in offending people joineth and knitteth them in a common cause."
— *Francis Bacon*

১৮৫৭ সনের জাতীয় বিদ্রোহের সূচনা হয় বাংলা দেশেই। এই বছরের শুরুতে ভারতের ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ভাবতেই পারেনি যে তাদের শীঘ্রই একটা অতি ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। যদিও দেশের জনসাধারণের মনে অসন্তোষের অভাব ছিল না, তবু ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখনো কোনো প্রকারের মেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। সুতরাং ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তাও ছিল না, যদিও অনেকের মনে একটা আশংকা মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুকিও মারত।[১]

সরকার তখন ব্রাউন বেস্ বন্দুকের জায়গায় নতুন এন্‌ফিল্ড বন্দুক সিপাহিদের মধ্যে প্রচলন করবার ব্যবস্থা করেছিল। এই এন্‌ফিল্ড বন্দুক পুরনো বন্দুকের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট, এর গুলীর পরিসর বেশি, আর তাছাড়া ওজন কম হওয়ার জন্যে তা বহন করা সৈন্যদের পক্ষে কম কষ্টসাধ্য। এমন একটি উন্নততর অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে জেনে সিপাহিদের মন খুশি হয়ে উঠেছিল।

১. লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হবার পর লণ্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের ১৮৫৬ আগস্টের এক ভোজসভায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: **"We must not forget that in the sky of India, serene as it is, a small cloud may arise, at first no bigger than a man's hand, but which, growing bigger and bigger, may at last threaten to overwhelm us with ruin."**

দমদম, মিরাট, ও আম্বালা – এই তিন জায়গায় এনফিল্ড রাইফেল চালনার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হলো। শিক্ষার কাজ ভালোভাবেই চলতে লাগল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে একটা বিষয়ে সিপাহিদের মনে সন্দেহ দেখা দিল। এই এনফিল্ড বন্দুকের গুলী ছিল এক রকম চর্বি মিশ্রিত কাগজে মোড়া; তা বন্দুকে ব্যবহার করতে হলে কাগজটা আগে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হতো। এই কাগজ দেখে সিপাহিদের মনে সন্দেহ জাগল যে, এটা নিশ্চয়ই শুয়োর ও গোরুর চর্বি দ্বারা মিশ্রিত, যা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই মুখে লাগানো তো দূরের কথা, ছোঁওয়া পর্যন্ত তারা ঘোরতর পাপ বলে গণ্য করত।

চর্বি মিশ্রিত টোটা ইংল্যাণ্ড থেকে ১৮৫৩ সনে ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীতে পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। বাংলা সৈন্যদলের অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেল কর্নেল টাকার এই টোটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, এগুলি সিপাহিদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। তিনি তখনই তাঁর উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে একটি সাবধানতাসূচক চিঠি লিখলেন। কিন্তু এই চিঠি মিলিটারি বোর্ডের অবহেলায় ধামা চাপা হয়ে পড়ে রইল, উপরতলায় আর পৌছল না। পরে দমদম ও মিরাটে এই টোটা তৈরি করার কারখানা খোলা হলো[২] এবং ধীরে ধীরে সিপাহিদের মধ্যে এর প্রচলনের ব্যবস্থা চলতে থাকল। এই টোটা সিপাহিদের কাছে যাতে সহজে গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্যে সরকার এমন আদেশও জারি করল যে, টোটার কাগজ দাঁত দিয়ে না কেটে হাতে ছিঁড়ে তারা বন্দুকে ব্যবহার করতে পারবে। সরকারের এই রকম গোঁজামিল দেবার চেষ্টা দেখে সিপাহিদের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। তাছাড়া, তারা জানত যে, কাজের সময় টোটার কাগজ হাতে ছিঁড়ে বন্দুকে দিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, দাঁত দিয়েই তা তাদের কাটতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সব সিপাহিরই জাতিধর্ম সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির কোনো মীমাংসাই হলো না। তাই সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েই চলল। ঠিক এই অবস্থায় দমদমে একদিন বারুদখানার একজন নিম্নশ্রেণীর খালাসি জলপান করবার জন্যে একটি ব্রাহ্মণ সিপাহির কাছে তার লোটা চেয়ে বসল। সিপাহি

---

২. কেই বলেন যে, ১৮৫৬ ও ১৮৫৭-র জানুয়ারিতে কলকাতা ও মিরাটে যেসব টোটা প্রস্তুত হয়েছিল তাতে গোরুর চর্বি মিশ্রিত ছিল, কিন্তু শুয়োরের চর্বি ছিল না (*History of Sepoy War in India*, vol. I, p. 519)। এবং লর্ড রবার্ট আরো খোলাখুলি স্বীকার করেন যে, এই টোটা গোরু এবং শুয়োর উভয়ের চর্বি মিশ্রিত ছিল (*Ibid*, p. 431-32)। ভারনম্ বার্টলেটও বলেন: "দুঃখের বিষয় যে উলউইচে (ইংল্যাণ্ডে) অস্ত্রাগারে টোটা তৈরি করবার জন্যে এই চর্বি ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে এই কথা অস্বীকার করা হয়েছিল।" (*India*, p. 131)

তার লোটা দিতে অস্বীকার করায় খালাসিটি উদ্ধতভাবে জবাব দিল: "তুমি তোমার জাত নিয়ে তো খুব গর্ব করছ। কয়েকদিন সবুর কর, সাহেবরা যে শুয়োর ও গোরুর চর্বি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা যখন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকে।"[৩] খালাসির এই রূঢ় বাক্য এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে টোটার প্রশ্নটি সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করে সিপাহিদের মধ্যে, প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী একটা উত্তেজনা ও আশংকার সৃষ্টি করল; টোটাই বিদ্রোহের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

এই ঘটনা লেফটেনাণ্ট রাইট তার উর্ধ্বতন অফিসার মেজর বন্টিনকে ২২শে জানুয়ারিতে রিপোর্ট করেন এবং তাতে সিপাহিদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে তাও তিনি জানালেন। মেজর বন্টিনও তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারি প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হিয়ার্সেকে জানালেন। ২৪শে জানুয়ারি হিয়ার্সে এই সংবাদ একটা 'অত্যন্ত জরুরি' মার্কা খামে কলকাতায় অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেলের অফিসে পাঠালেন। কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ এই গুরুতর অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন না।

২৮শে জানুয়ারি হিয়ার্সে আবার সরকারকে লিখলেন: "মতলববাজ কতকগুলি লোক, খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ কিংবা কলকাতার কোনো হিন্দু পার্টির প্রতিনিধি[৪] একটা গুজব রটাচ্ছে যে সিপাহিদের জোর করে খ্রীস্টান করা হবে; তার আগে তাদের জাত নষ্ট করা হবে; সেইজন্যেই এনফিল্ড বন্দুকের টোটার কাগজ শুয়োর ও গোরুর চর্বির দ্বারা তৈরি। এই চিঠিতে হিয়ার্সে আরো লিখলেন যে, এইসব 'ভিত্তিহীন আজগুবি গুজব' নাহয় উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু "রানীগঞ্জে একজন সার্জেণ্টের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় (২য় সিপাহি বাহিনীর একটি অংশ ঐখানে আছে) এবং টেলিগ্রাফ অফিস সমেত আরো এরকম তিনটি অগ্নিকাণ্ড গত চারদিনের মধ্যে এই ব্যারাকপুরে ঘটে

৩. Forrest: *State Papers*, vol. I, p. 25

৪. সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কিভাবে যে ইংরেজ অফিসাররা ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে ওই সময় থেকেই কাজ করেছিলেন, হিয়ার্সের এই উক্তি তার একটি প্রমাণ। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় প্রমাণ হয়েছিল যে, অযোধ্যার নবাব রাজা মানসিং প্রভৃতির প্রতিনিধিরা কোনো কোনো সিপাহি অফিসারের সঙ্গে এই সময় যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই প্রথম থেকে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। (Forrest: *State Papers*, vol. I. p. 155-59)

যাওয়ায়···আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে অসন্তুষ্ট সিপাহিদের দ্বারাই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটছে।"[৫]

জানুয়ারি মাস শেষ হতে না হতে এইভাবে টোটার প্রশ্নটাই সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। ভারতের প্রতিটি সিপাহি ব্যারাকে, বাজারে ও অন্যান্য স্থানে ব্যারাকপুর থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত আন্দোলন শুরু হলো। সিপাহিদের মধ্যে অনেকে আরো সক্রিয়ভাবে ইংরেজ অফিসারদের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে দিল। এই অগ্নিকাণ্ড শুধু ব্যারাক-পুরেই সীমাবদ্ধ রইল না; আম্বালা ও অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিভিন্ন স্থানের অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করার আছে—একই পদ্ধতিতে ইংরেজদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগানো হচ্ছিল। তীরের মুখে একটা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে ধনুক দিয়ে বাংলোতে ছুঁড়ে মারা হতো। কেই বলেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ২য় গ্রেনেডিয়ার বাহিনীর সিপাহিরা সাঁওতালদের কাছ থেকে এই পদ্ধতি শিখেছিল।

সিপাহিদের মধ্যে টোটার জন্যে এত অসন্তোষের কারণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ৬ই ফেব্রুয়ারিতে একটি সামরিক আদালতের অধিবেশনে বহু সিপাহিকে প্রশ্ন করা হয়। সকলেই তখন খোলাখুলি ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, এই টোটা অত্যন্ত সন্দেহজনক চর্বি দ্বারা তৈরি এবং তা তারা কিছুতেই ব্যবহার করবে না। সামরিক আদালতের ইংরেজ অফিসাররা সিপাহিদের অনেক আশ্বাস দিলেন যে,—টোটার কাগজে কোনোরকম সন্দেহজনক চর্বি নেই, এবং এটা একটা সাধারণ কাগজ ব্যতীত আর কিছু নয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই মিথ্যা স্তোকবাক্যে সিপাহিরা ভুলল না। হাবিলদার অযোধ্যা সিং আদালতের কাছে স্বীকার করলেন যে, টোটা ব্যবহার করতে যদিও তাঁর নিজের কোনো আপত্তি নেই, তা হলেও তিনি "তা করতে পারবেন না; তার কারণ অন্যান্য সিপাহিরা তাতে ঘোরতর আপত্তি করবে।"[৬] আদালত স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, টোটার বিরুদ্ধে সকল সিপাহিই একমত এবং দু'একজন সিপাহি অফিসারের ইচ্ছে থাকলেও এই ব্যাপারে সাধারণ সিপাহিদের মতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে না। হিয়ার্সের মতে, এই রকম সংকটের সময় সিপাহি অফিসাররা সরকারের পক্ষে অকেজো হয়ে যায়। তিনি লিখলেন: "বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, তারা তাদের সিপাহিদের অত্যন্ত ভয় করে এবং কোনো কাজ করতে সাহস করে না। এরকম সংকটের অবস্থায় সব সময়ই এরূপ ঘটেছে, এবং

৫. *Ibid*, p. 4
৬. Forrest : *State Papers*, vol. I. p. 9

আমাদের রাজত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এই রকমই ঘটবে। স্যার চার্লস মেটকাফ ঠিকই বলেছিলেন, তিনি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব আর নেই।"[৭]

এই আদালতের সমস্ত তথ্য বিচার করার পর জেনারেল হিয়ার্সে সরকারকে লিখলেন, যে কোনো কারণেই হোক, টোটা যে শুয়োর ও গোরুর চর্বি দ্বারা তৈরি—এই ধারণা সিপাহিদের মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। "এই অবস্থায় আমার মতে, এই ধারণা দূর করার চেষ্টা করা একেবারে বৃথা ও নিতান্ত নির্বোধের কাজ হবে।" হিয়ার্সে তারপর সুপারিশ করলেন—"পূর্বে মাস্কেট বন্দুকের জন্যে যে রকম টোটার কাগজ তৈরি হতো, যদি সম্ভব হয় নতুন বন্দুকের জন্যেও তদনুরূপ কাগজ তৈরির ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুকুম দেওয়া হোক। এই উপায়ের দ্বারাই সিপাহিদের ভিত্তিহীন সন্দেহ ও তাদের আপত্তি শীঘ্র দূর করা সম্ভব হবে।"[৮]

সরকার কিন্তু জেনারেল হিয়ার্সের পরামর্শ মতো কাজ করল না এবং নিজেরাও অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করল না। সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ যতই বেড়ে যেতে লাগল, সংকট দিনের পর দিন ততই ঘনীভূত হতে থাকল। এই বিপজ্জনক অবস্থাটা বুঝতে পেরে ১১ই ফেব্রুয়ারি হিয়ার্সে আবার সরকারকে লিখলেন: "আমরা একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরক বোমার উপর বাস করছি—তার যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।"[৯]

ইতিমধ্যে ব্যারাকপুরের সিপাহিরা গোপনে মিটিং করে তাদের কর্মপন্থা আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। ৫ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর জমাদার দুর্লভ এই স্থানের কমাণ্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার গ্র্যাণ্টকে গিয়ে খবর দিল যে, ৩০০ সিপাহি এই সময় প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা করছে। পরের দিন আবার আর এক জন সিপাহি-অফিসার রামসহায় লালা লেফটেনাণ্ট অ্যালেনকে রিপোর্ট করল যে, সিপাহিদের প্রতিনিধিরা একটা গুপ্ত বৈঠকে বসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে, কিভাবে সিপাহিরা প্রথমত ব্যারাকপুর দখল করবে, তারপর তারা কলকাতায় মার্চ করে যাবে ও ফোর্ট উইলিয়াম ও ট্রেজারি দখল করবে। এই সমস্ত খবর দিয়ে লালা বলল যে, প্রত্যেক রেজিমেণ্টের ৮ জন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার এই রাত্রেই আর একটা সভা হবে। উক্ত সিপাহি আরো জানাল যে, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তার পুড়িয়ে দেওয়া এই ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ, যার ফলে বিদ্রোহের সংবাদ সরকার

---

৭. *Ibid*, p. 29
৮. *Ibid*, p. 7
৯. *Ibid*, p. 24

তাড়াতাড়ি কোথাও পাঠাতে না পারে। এবং সিপাহিরা আরো ঠিক করেছে যে; অন্যান্য স্থান থেকে ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী এসে তাদের পরিকল্পনা পণ্ড করে দেবার আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।[১০]

এইভাবে ব্যারাকপুরের সিপাহিরা বিদ্রোহের জন্যে যখন প্রস্তুত হচ্ছে, তখন সরকার তাদের মিলিত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে সিপাহিদের কোনো বিশেষ কাজ দিয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিতে লাগল। এর ফলে যদিও বা ব্যারাকপুরেব প্রচেষ্টা কিছুদিনের মতো স্থগিত রইল, কিন্তু বাংলার অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ-পরিকল্পনার জাল রীতিমতো বিস্তৃত হতে লাগল।

ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪শ সিপাহি বাহিনীর দুটি অংশ ১৮ই ও ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে এইভাবে বহরমপুর শিবিরে এসে পৌছল। এই সময় ১৯শ সিপাহি বাহিনী বহরমপুরে অবস্থান করছিল। ব্রিটিশরা যখন অযোধ্যা দখল করে তখন ১৯শ ও ৩৪শ — এই বাহিনী দুটি লখনৌ শহরে একই শিবিরে থাকত। অন্যান্য স্থানের মধ্যে বহরমপুরের সিপাহিরাও টোটা সম্বন্ধে খুব উত্তেজিত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ১৯শ বাহিনীর একজন হাবিলদার তাদের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল মিচেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, টোটা সম্বন্ধে যেসব কথা প্রচারিত হচ্ছে তা সত্য কিনা ? "এটা একটা মিথ্যা গুজব", এই বলেই কর্নেল মিচেল তাঁর কর্তব্য শেষ করেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের পুরনো বন্ধু ও সাথী ব্যারাকপুরের সিপাহিদের কাছ থেকে বহরমপুরের সিপাহিরা সমস্ত খবর জানতে পারল। ফলে ইংরেজদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরো প্রবল হয়ে উঠল।

২৬শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় মিচেল হঠাৎ হুকুম দিলেন যে, পরদিন সকালে ১৫ রাউণ্ড গুলী নিয়ে ১৯শ বাহিনীকে প্যারেড করতে হবে। প্যারেডের দিন যখন 'ক্যাপ' বিতরণ শুরু হলো, সিপাহিরা তখন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সিপাহিরা জানত যে কিছুদিন পূর্বেই অনেকগুলি নতুন টোটা কলকাতা থেকে বহরমপুরে পৌছেছে এবং ওইদিন বিকেলে যে কতকগুলি টোটা বারুদখানা থেকে বার করা হয়েছে তাও কয়েকজন সিপাহি দেখেছে।

সিপাহিরা 'ক্যাপ' নিতে অস্বীকার করেছে শুনে কর্নেল মিচেল তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হলেন। সিপাহি-অফিসারদের ডেকে বললেন, "তোমরা যদি টোটা না নাও, তাহলে আমি তোমাদের বর্মা ও চীনে নিয়ে যাবো। সেখানে অতি কষ্টের মধ্যে তোমাদের সকলকে মরতে হবে (If you do not take the cartridges, I will take you to Burma and China (where

১০. *Ibid*, p. 17-18

through hardship you will all die.)।"[১১] এইভাবে সিপাহিদের ভয় দেখিয়ে ইংরেজ বীরপুরুষটি চলে গেলেন। কিন্তু মিচেলের উদ্ধত বাক্যে সিপাহিরা ভয় পাবার পরিবর্তে বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চোখের নিমেষে তারা বাকীখানা আক্রমণ করে তার দরজা ভেঙে মাস্কেট বন্দুক ও টোটা নিয়ে তাদের লাইনে চলে গেল। এ ঘটনা যখন ঘটল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

এদিকে মিচেল তাঁর বাংলোতে ফিরে গিয়ে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদের নিয়ে তৈরি হয়ে বসেছিলেন। সিপাহিদের বিদ্রোহমূলক কাজের খবর পেয়েই আবার তিনি তাঁর লোকজন ও কামান নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সিপাহি-অফিসার-দের সামনে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন—এখনি সিপাহিদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বলো। সিপাহি-অফিসাররা জানালেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অশ্বারোহী ও গোলন্দাজরা কামানগুলি ওখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সিপাহিরা অস্ত্র কিছুতেই সমর্পণ করবে না; আর যদি তা করা হয় তাহলে তারা শান্তভাবে তাদের লাইনে ফিরে যাবে।[১২] মিচেল যদি তখন আবার কোনো রকমের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেন, তাহলে এক মুহূর্তে সমগ্র বাংলাদেশে সেদিন আগুন জ্বলে উঠত। কিন্তু মিচেল ভয়েই হোক আর চাতুর্যেই হোক, তাঁর লোকজন ও কামান নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন, সিপাহিরাও তাদের লাইনে ফিরে গেল। এই সময় সিপাহিদের সংখ্যা ছিল ৮০০, আর মিচেলের সঙ্গে ছিল মাত্র ২০০ ভারতীয় সিপাহি, যাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে মিচেলের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই অবস্থায় বিদ্রোহোন্মুখ সিপাহিদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে সম্ভবত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই শ্রেয় বলে মিচেল মনে করেছিলেন।

বহরমপুরের এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এরই মাত্র ২ মাইল উত্তরে স্বাধীন বাংলার পুরনো রাজধানী মুর্শিদাবাদ। একশত বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদ যে ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল তা আর একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর নবাব নাজিম ফেরেদুন খাঁ (সৈয়দ মনসুর আলি খাঁ) এই শহরে তখন বাস করছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ছিল যথেষ্ট। প্রথমত—তাঁর ভাতা ১৬ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি যে সমস্ত অধিকার ভোগ করতেন ব্রিটিশ সরকার তার কতকগুলি খর্ব করে দিয়েছিলেন; যেমন, দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত না হওয়ার অধিকার লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল; তাঁর সম্মানে ১৯টি তোপধ্বনির বদলে ১৩টির ব্যবস্থা করা হলো। এই ব্যাপারে অবশ্য তখনকার বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডরিখ হ্যালিডে খুশি হয়ে তাঁর

১১. Forrest : *State Papers*, p. 9[...]
১২. *Ibid.*, p. 90

রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, নবাব এত অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও "বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যথাসাধ্য রাজভক্তির সঙ্গে নিজেকে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন; তাছাড়া, আমাদের কি আবশ্যক না আবশ্যক আমরা বলবার আগেই তিনি তা নিজে থেকে অনুমান করবার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকতেন।" (*Bengal Gazetteer*, Murshidabad, p. 96)

একশো বছরের ইংরেজ শাসন ও শোষণের ফলে মুর্শিদাবাদের প্রাচীন গৌরব বিনষ্ট হয়েছিল এবং তার ফলে সেখানকার জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্যেরও অন্ত ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে মিরাট শিবির যেরকম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত, পূর্ব-ভারতে বহরমপুরের স্থানও কতকটা তাই ছিল। এই অবস্থায় নবাবের একটি কথাতেই তারা যে বিদ্রোহী সিপাহিদের পাশে এসে দাঁড়াত, তাতে সন্দেহ ছিল না। কেই এই সম্পর্কে লিখেছেন: "শহরে হাজার হাজার লোক ছিল যারা নবাবের নির্দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করত; এই ব্যক্তিটি নিজে যদিও দুর্বল ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিছনে ছিল একটা গৌরবপূর্ণ শক্তিশালী নামের জোর।"[১৩]

বাংলার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনবার ও বিদেশী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ও বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার এই স্বর্ণ সুযোগ মুর্শিদাবাদের নবাব গ্রহণ করলেন না। সিরাজদ্দৌল্লার সিংহাসনে বসেও তিনি মীরজাফরের অমানুষোচিত পথই বেছে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে কোনো রকম নির্দেশ না পেয়ে মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ ২৬ শে ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে শান্তভাবেই কাটাল। তাঁর মুখ থেকে একটি কথা, কিংবা সামান্য একটুখানি ইঙ্গিতেই সর্বভারতীয় প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম সেখান থেকেই শুরু হতে পারত। এই সম্ভাবনা যে একেবারেই অলীক স্বপ্ন ছিল না, তা ইংরেজ শাসকরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। কেই ঠিকই বলেছিলেন—"এই কথাটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে হাত মেলাত, তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে দেখতে দেখতে আগুন জলে উঠত।"[১৪]

গভর্নর জেনারেল ১৯শ বাহিনীকে বহরমপুর থেকে ব্যারাকপুরে ২২০ মাইল মার্চ করিয়ে এনে নিরস্ত্র করে বরখাস্ত করার হুকুম দিলেন। এই শাস্তির কথা

১৩. "There were thousands in the city who would have arisen at the signal of one who, weak himself, was yet strong in the prestige of a great name." (Kaye, vol. I, p. 498)

১৪. Kaye, pp. 498-99

সিপাহিরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে পারেনি। যাই হোক, একটা গোটা বাহিনীকে নিরস্ত্র করা সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে ব্যারাকপুরের মতো স্থানে যেখানে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব সতেজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু লর্ড ক্যানিং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েই এই হুকুম জারি করেছিলেন। ২৭শে মার্চ তারিখে তিনি লিখে দিলেন—"দমদমে বহুসংখ্যক গোলন্দাজের উপস্থিতি, আমার বডিগার্ড, দুটি ব্রিটিশ রেজিমেন্ট, যাদের একটিকে (৮৪তম রেজিমেন্টকে) এই কাজের জন্যেই বর্মা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, তারা যে কোনো বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে দমন করতে যথেষ্ট হবে।"[১৫] ফেব্রুয়ারি মাসে সিপাহিরা আশংকা করেছিল যে, শীঘ্রই সরকার বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য আমদানি করে তাদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে পণ্ড করে দেবে। তাই ঘটল এক মাসের মধ্যেই।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজধানী কলকাতা শহরের বুকের ওপর ঘটে গেল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১০ই মার্চ রাত্রে ফোর্ট উইলিয়ামের পাহারাদার ২য় বাহিনীর দু জন সিপাহি ট্রেজারির পাহারাদার ৩৪শ বাহিনীর সুবাদারের সঙ্গে দেখা করতে এলো। সিপাহি দুটি সুবাদারকে বলল—ওই রাত্রে তাদের বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং তাঁর ৩৪শ বাহিনী যদি তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে তারা সকলে মিলে সমগ্র কলকাতা শহর সহজেই দখল করতে পারবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্রোহ ভাবাপন্ন ৩৪শ বাহিনীর সুবাদার স্বয়ং কিন্তু এই সিপাহি দুটিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে দিলেন।

এদিকে মার্চ মাসের শেষের দিকে ব্যারাকপুরে সংকট ঘনীভূত হয়ে এলো। গভর্নর জেনারেলের চিঠিতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ওখানে ইংরেজ সৈন্য আমদানি করে ১৯শ বাহিনীকে নিরস্ত্র করার জন্যে ও ব্যারাকপুরের সিপাহিদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যে সরকার প্রস্তুত হচ্ছিল। ২৯শে মার্চ রবিবার, সকালে সিপাহিদের মধ্যে রটে গেল যে, ইংরেজ সৈন্য ব্যারাকপুরের ঘাটে অবতরণ করছে।[১৬]

সিপাহিরা বুঝতে পারল এইবার তাদের সংকট মুহূর্ত এসে গিয়েছে, এখন ইংরেজরা বলপূর্বক তাদের দিয়ে চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করাবে। হয় এই মুহূর্তে আঘাত হানতে হবে, তা না হলে আর কখনো হবে না। অন্তত ৩৪শ বাহিনীর একজন সিপাহির মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না—সে হলো ২৬ বছরের যুবক মঙ্গল পাণ্ডে। পাণ্ডে তার ইউনিফর্ম পরে, কোমরে তলোয়ার ও কাঁধে বন্দুক নিয়ে তার কুঠি থেকে বেরিয়ে এলো এবং তাদের ধর্ম ও সম্মান

১৫. Forrest : *State Papers*, vol. I, p.94
১৬. *Ibid*, p.116

বাঁচাবার জন্যে তার সাথীদের আহ্বান জানাল।

এই ঘটনা ঘটল কোয়ার্টার গার্ডের সামনে, যেখানে ৩৪শ বাহিনীর ২০ জন সিপাহি জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের অধীনে পাহারা দিচ্ছিল। দেখতে দেখতে উত্তেজিত সিপাহিরা পাণ্ডের চারপাশে জমা হতে লাগল। দু'জন অশ্বারোহী ইংরেজ অফিসার, লেফটেনান্ট বগ্ ও সার্জেণ্ট মেজর হিউসন নিকটেই ছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরী পাণ্ডেকে হুকুম দিলেন—মঙ্গল পাণ্ডেকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করতে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। তখন তাঁরা নিজেরা দু'জনে একসঙ্গে মঙ্গল পাণ্ডেকে আক্রমণ করলেন ও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন। পাণ্ডেও গুলী চালালেন, তাতে বগের ঘোড়া নিহত হলো। তখন ইংরেজ অফিসার দু'জন তলোয়ার নিয়ে পাণ্ডেকে যুগপৎ আক্রমণ করলেন। কিছুক্ষণ লড়বার পর পাণ্ডে তার দু'জন ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ক্ষতবিক্ষত করে দিল এবং বগ্‌কে যেই শেষ আঘাত হানবার জন্যে তলোয়ার তুলল, ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ পল্টু নামক একজন সিপাহি পিছন থেকে এসে প্রাণপণে পাণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরল। এই সুযোগে বগ্ ও হিউসন রক্তাক্ত কলেবরে টলতে টলতে পালিয়ে কোনো মতে নিজেদের প্রাণ বাঁচালেন।[১৭]

মঙ্গল পাণ্ডেকে জড়িয়ে ধরে পল্টু পাহারারত সিপাহিদের ও ঈশ্বরী পাণ্ডেকে বারবার আহ্বান করল—মঙ্গল পাণ্ডেকে গেপ্তার করার জন্যে। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় পল্টু বলেছিল—"কিন্তু তারা কেউ এগিয়ে এলোই না, বরং উল্টে সকলেই আমাকে গালাগালি করছিল ও আমাকে এই বলে শাসাচ্ছিল যে, আমি যদি পাণ্ডেকে না ছেড়ে দিই তবে তারা আমাকে গুলী করবে।"[১৮]

ইংরেজ দু'জন পালাবার পর পল্টু পাণ্ডেকে ছেড়ে দিল। পল্টু যদিও তাকে বাধা দিয়েছিল, হিন্দুস্থানি বলে পাণ্ডে কিন্তু তাকে কিছুই বলেনি। বরং ফিরিঙ্গিদের ধ্বংস করবার জন্যে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসতে বলল, সিপাহিদের আবার আহ্বান জানাল: "নিকাল আও পল্টন, নিকাল আও হামারা সাথ।"

এমন সময় ৩৪শ বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল হুইলার এসে উপস্থিত হলেন। কোয়ার্টার গার্ডে এসে তিনি প্রহরারত সিপাহিদের হুকুম করলেন তাঁর সঙ্গে আসতে। বারবার তিনবার এই হুকুম করবার পর সিপাহিরা কয়েক পা অগ্রসর হলো। তারপর হঠাৎ থেমে গেল, আর এক পাও অগ্রসর হলো না। হুইলার হেড কোয়ার্টার্সে এসে এই ঘটনা রিপোর্ট করলেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে জেনারেল হিয়ার্সে দমদম ও চুঁচুড়ার সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের তৎক্ষণাৎ

---

১৭. মঙ্গল পাণ্ডের বিচারকালে বগের সাক্ষ্য—Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 130

১৮. *Ibid*, p.130

আসবার জন্যে হুকুম দিয়ে নিজে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও শিখ সিপাহি সঙ্গে করে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন।

কোয়ার্টার গার্ডের সিপাহিরা হিয়ার্সের আদেশ মতো এবার তাঁর সঙ্গে চলল। হিয়ার্সেকে আসতে দেখেই তাঁকে লক্ষ্য করে মঙ্গল পাণ্ডে তার বন্দুক উঁচু করে তুলে ধরল। কিন্তু এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে বন্দুক নামিয়ে ফেলল। সে দেখল তাঁর সাথীরা কেউই তার সঙ্গে যোগ দিল না, কেউই নিজেদের ধর্ম ও সম্মান রক্ষা করার জন্যে ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল না। সে আরো দেখতে পেলো যে, ফিরিঙ্গি আফিসারের পাশে তারই হিন্দুস্থানি ভাইরা তারই বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে আসছে। তখন সে বিরাগে হতাশায় নিজের বন্দুক নিজের বুকের দিকে লক্ষ্য করে পা দিয়ে ঘোড়া টিপে দিল। গুলী সবেগে তার শরীরে প্রবেশ করল। মঙ্গল পাণ্ডে আহত ও হতজ্ঞান হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল।[১৯]

২৯ শে মার্চের ঘটনায় স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে, সিপাহিদের সহানুভূতি মঙ্গল পাণ্ডের দিকেই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও খোলাখুলিভাবে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। তারা যে নিস্পৃহভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল তা নয়—বরং পরোক্ষে তারা মঙ্গল পাণ্ডেকেই সাহায্য করেছিল। এমনকি পাহারারত সিপাহিরাও বারবার ইংরেজ অফিসারদের হুকুম অমান্য করেছিল। সামরিক কাজে উর্ধ্বতন কর্মচারির আদেশ অমান্য করা যে কত বড় গুরুতর অপরাধ এবং তার জন্যে যে কী ভয়ানক শাস্তি হয়ে থাকে, তা তাদের ভালোভাবেই জানা ছিল। বস্তুত ২৯শে মার্চ সিপাহিদের ব্যবহার রাজদ্রোহিতারই সামিল এবং এই অপরাধে তাদের শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল। তাছাড়া ২৯শে মার্চের ঘটনা একেবারে আকস্মিকও বলা চলে না, বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র দু'তিন মাস ধরেই চলছিল। কিন্তু তবুও মঙ্গল পাণ্ডের উদাহরণ অনুসরণ করে ওইদিন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবার সুযোগ গ্রহণ করল না। সিপাহিদের এই স্ববিরোধী ব্যবহারের কারণ কি—এই প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক।

জানুয়ারি মাস থেকেই যে ইংরেজ-বিরোধী একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অযোধ্যার নবাব, রাজা মানসিংহ প্রমুখের সহযোগীরা ব্যারাকপুরের সিপাহিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহিরাও যে সভা-সমিতি করে এ বিষয়ে আলোচনা করছিল তাও আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু সিপাহিরা কোনো বিশেষ কর্মপন্থায় উপনীত হতে পারেনি। বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত, অথচ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি—এই অবস্থাই সিপাহিদের দোদুল্যমান অবস্থার কারণ। খুব

১৯. রজনীকান্ত গুপ্ত : সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ; ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩

সম্ভব সেই কারণেই ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডের আহ্বানে তারা অগ্রসর হয়ে আসতে পারেনি।

১৯শ বাহিনী ২০শে মার্চ বহরমপুর ত্যাগ করে ব্যারাকপুর থেকে ৮ মাইল দূরে বারাসাতে ৩০ তারিখে এসে পৌছল—অর্থাৎ মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের একদিন পরে—যখন ব্যারাকপুর একটি ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ব্যারাকপুরের কয়েকজন সিপাহি-প্রতিনিধি বারাসাতে ১৯শ বাহিনীর নিকট বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তাব করল। তখন পর্যন্ত ১৯শ বাহিনী সশস্ত্র অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু তবুও তারা বিদ্রোহ করতে অসম্মতি জানাল।

পরদিন ৩১শে মার্চ প্রত্যূষে ১৯শ বাহিনীকে মার্চ করিয়ে ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে আসা হলো। যখন তাদের থামতে হুকুম দেওয়া হলো, তখন তারা সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল—গোরা সৈন্য পরিবেষ্টিত ইংরেজদের কামানের মুখে এসে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এতটুকু এদিক ওদিক হলেই নিমেষে কামানের গোলায় তাদের উড়িয়ে দেওয়া হবে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ১৯শ বাহিনীকে নিরস্ত্র করে তৎক্ষণাৎ তাদের বরখাস্ত করে দেওয়া হলো। যে বাহিনী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় খালসা বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করে ইংরেজের হাতে পাঞ্জাবকে তুলে দিয়েছিল—আজ ৮ বছর পর সেই ১৯শ বাহিনী তার উপযুক্ত পুরস্কার পেল!

নিজের গুলীতে মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যু হয়নি, সে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছিল এবং তার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপই হচ্ছিল। সকলেই বুঝতে পারল কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু অনিবার্য। ৬ই এপ্রিল একটি সামরিক আদালতের বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয়, এবং ৮ই এপ্রিল ব্যারাকপুরের সমস্ত সিপাহিদের সম্মুখে মরণোন্মুখ মঙ্গল পাণ্ডেকে টেনে তুলে, ফাঁসির দড়ি তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়।

একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির দৃশ্য এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডের কেন্দ্রস্থলে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হলো। কামানের শব্দ হওয়া মাত্রই সৈন্যবাহিনী এসে একটি বর্গের (square) তিন দিকে দাঁড়িয়ে গেল। এর এক ধারে ৭০তম, ৪৩শ, ২য় ও ৩৪শ (মঙ্গল পাণ্ডের বাহিনী) সিপাহি বাহিনী আলাদা বর্গ তৈরি করে দাঁড়িয়েছিল, আর তাদের মুখোমুখি হয়ে লাইন করে দাঁড়িয়েছিল গভর্নর জেনারেলের বডিগার্ড ও ৫৩তম ইংরেজ বাহিনী। বর্গের তৃতীয় দিকে লাইন করে ছিল ৮৪তম ইংরেজ বাহিনী, আর তাদের পাশে দুটি ইংরেজ কামান বাহিনী। বডি গার্ডদের একটি অংশ অপরাধীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। তাদেরই পেছনে এলো ইংরেজ সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে কোয়ার্টার গার্ডের কয়েদি সিপাহিরা। এইভাবে সকলে নিজ

নিজ স্থানে দাঁড়াবার পর সিপাহি বাহিনী চারটিকে ফাঁসির মঞ্চের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো হলো।"...মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়ে যাবার পর, "সিপাহিদের আবার ফাঁসির মঞ্চের সামনে দিয়ে মার্চ করিয়ে তাদের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হলো।"[২০]

এইভাবে মঙ্গল পাণ্ডে ভারতের প্রথম জাতীয় মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ হলেন।

মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে দেবার জন্যে ব্যারাকপুরের কোনো লোকই রাজী হয়নি, সুতরাং এই জঘন্য কাজ করার জন্যে "চারজন নীচ জাতীয় নেটিভকে কলকাতা থেকে আসতে বাধ্য করা হয়।"[২১]

বন্দী অবস্থায় মঙ্গল পাণ্ডের কাছ থেকে ইংরেজরা চক্রান্তকারী সিপাহিদের নাম বের করার জন্যে সকল রকম উপায়ই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের হয়নি। তাঁর বিচারের সময় তিনি বলেছিলেন: যে দু'জন ইংরেজ অফিসারকে তিনি আহত করেছিলেন, তাঁদের প্রতি তাঁর কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, এবং যে জন্যে তাঁর ফাঁসি হবে তাতে তিনি তাঁর সহকর্মীদের জড়াতে রাজী নন।[২২]

মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির কয়েকদিন পর ২১শে এপ্রিল জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাঁসি হয় এবং কোয়ার্টার গার্ডের অন্যান্য সিপাহিদেরও দীর্ঘ কারাবাসের হুকুম হয়। পল্টুর রাজভক্তির জন্যে ইংরেজরা অবশ্য তাকে পুরস্কৃত করতে ভুলল না। তাকে আরদালি থেকে হাবিলদার করে দেওয়া হলো। তারপর ৬ই মে তারিখ, অর্থাৎ মিরাট বিদ্রোহের মাত্র ৪ দিন পূর্বে, ১৯শ বাহিনীকে যেভাবে নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হয়েছিল, ৩৪শ বাহিনীকেও সেইভাবে বরখাস্ত করা হলো। ৩৪শ বাহিনীকে বিদ্রোহের অপরাধে এর আগেও একবার বরখাস্ত করা হয়েছিল।

ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকার যে তাদের ভেদনীতির (Divide and Rule Policy) ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সময়কার সরকারি মহলে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, হিন্দু সিপাহিরাই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল, আর মুসলমান ও শিখরা খুব রাজভক্ত।

১৮৪৯ সনে পাঞ্জাব অধিকার করার পর ইংরেজ সরকার এই নীতি অবলম্বন করেছিল যে, বেঙ্গল আর্মিতে পূর্বদেশী প্রাধান্য খর্ব করার জন্যে প্রত্যেক বাহিনীতে ২০০ জন করে শিখ ভর্তি করা হবে। তারপর থেকে বিভিন্ন সম্প্র-

২০. Charles Ball : *History of Indian Mutiny*, vol. I, p.50
২১. *Ibid*, p.50
২২. *Ibid*, p.50

দায়ের সিপাহিদের মধ্যে যাতে জাতীয় মনোভাব বৃদ্ধি না পায়, তার জন্যে তারা সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিল।

বাংলা দেশের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে হিয়ার্সে তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন —"মুসলমান ও শিখ সিপাহিদের একটি সুস্থ মনোভাব দেখা যায়, কিন্তু হিন্দুরা বর্তমান অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য নয়।"[২৩] ৩৪শ বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল হুইলারও এই একই মন্তব্য করেছিলেন : "আমি কেবলমাত্র শিখ ও মুসলমানদের ওপর নির্ভর করতে পেরেছিলাম।"[২৪] কিন্তু ইংরেজ শাসকদের এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ভাঙ্‌তে বেশিদিন লাগেনি। তাদের ইতিহাসবিদ কেই নিজেই বলেছেন : "এপ্রিল মাস শেষ হতে না হতেই লর্ড ক্যানিং বেশ বুঝতে পারলেন যে, এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ এ পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতার ও নিরাপত্তার প্রধান উপাদান বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তা থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। মুসলমান ও হিন্দুরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে দাঁড়াল।"[২৫]

এত সহজে বহরমপুর ও ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ দমন করার পর সরকার ভাবল যে, দেশের অবস্থা এখন তাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছে এবং অপরাধীদেরও যথোপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। বিপদের আর কোনো সম্ভাবনা নেই ভেবে তারা নিশ্চিন্ত হলো। ৮৪তম বাহিনীকে বাংলায় আর রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই মনে করে তাদের ব্রহ্মদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

২৩. Forrest : *State Papers*, vol. I, p.160. ১৮৫৭ সনের মার্চ মাসে ৩৪শ বাহিনীতে ১,০৮৯ জন সিপাহি ছিল—তাদের মধ্যে ৩৩৫ জন ব্রাহ্মণ, ২৩৭ জন ক্ষত্রিয়, ২৩১ জন অন্যান্য হিন্দু, ২০০ জন মুসলমান, ৭৪ জন শিখ ও ২২ জন খ্রীস্টান (*Ibid*, p. 177)। বেঙ্গল আর্মির অন্যান্য বাহিনীগুলিও মোটামুটি এই ধাঁচেই গঠিত ছিল।

২৪. *Ibid*, p.164

২৫. Kaye, vol. 1, p. 565

মিরাট বিদ্রোহ

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, টোটার ব্যাপারে শুধু ব্যারাকপুরেই নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতে সিপাহিদের মন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আম্বালাতে মার্চ মাসে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের বাংলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইখানেই একদিন এপ্রিল মাসে যখন দু'জন ইংরেজ অফিসার ৩৬শ বাহিনীর ব্যারাক পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন, ওই বাহিনীর সুবাদার, তাঁদের 'স্যালিউট' করার পরিবর্তে, তাঁদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গেই বলেছিল: এইসব লোকগুলো আমাদের খ্রীস্টান করার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার কিছুদিন পর, এন্‌ফিল্ড বন্দুক চালনার শিক্ষক লেফটেনাণ্ট মার্টিনকে একজন সিপাহি খুব মর্মাহত হয়ে জানাল যে, যেহেতু সে টোটা ব্যবহার করেছে, সেইজন্যে তার জাত নষ্ট হয়েছে এবং কোনো সিপাহি তাব সঙ্গে আর একত্রে খাবে না। উত্তর-ভারতে প্রায় সর্বস্থানে সিপাহিদের মধ্যে এই নিয়ে একটা উত্তেজনা ও অসন্তোষ লক্ষিত হচ্ছিল।

ভারতে ব্রিটিশ-বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল এন্‌সন এই সময় সিমলায় যাওয়ার পথে নামলেন। টোটার প্রশ্নে সিপাহিদের মন যে কতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তা তিনি সেখানে ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন। ২৩শে এপ্রিল প্যারেডের সময় 'টোটা শুয়োর বা গোরুর চর্বি মিশ্রিত নয়' এই বলে তিনি সিপাহিদের অনেক আশ্বাস দিলেন। প্যারেডের পর একদল সিপাহি-প্রতিনিধি এসে তাঁকে জানালেন যে, তাঁরা নিজেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে রাজী হলেও তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা করবেন না, এবং তাঁরা যদি টোটা ব্যবহার করেন, তা হলেও সামাজিকভাবে তাঁরা জাতিচ্যুত হবেন। টোটা দাঁতে কাটলে শুধু তাঁদের নিজেদেরই জাত যাবে তা নয়, তাঁরা নিজেদের পরিবার ও স্বজনদেরও কলঙ্কিত করবেন।[১]

আম্বালা ছেড়ে যাবার পূর্বে এন্‌সন সিপাহিদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে, একটা বিশেষ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এই টোটাগুলি যাতে আর বিতরণ করা না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এটা ব্রিটিশের পক্ষে একটা সম্মানজনক পন্থা হবে না মনে করে গভর্নর জেনারেল হুকুম দিলেন যে, সিপাহিদের মধ্যে টোটা বিতরণ করা হোক। এই হুকুমের পর থেকেই আবার অফিসারদের বাংলোতে আগুন জ্বলতে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও কোনো অগ্নিসংযোগ-কারীকেই ধরতে পারল না, এবং "অগ্নিসংযোগ এত ঘন ঘন হতে লাগল ও

১. Forrest : *State Papers*, vol. I, Preface, p. 31

তার ধ্বংসকারিতা এতই বেড়ে যেতে লাগল যে সরকার ঘোষণা করল—অপরাধীকে ধরতে পারলে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"[২] ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলো ছাড়াও একজন সিপাহি-অফিসার ও ৫ জন সিপাহির ঘরও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা টোটা ব্যবহার করেছিল।

ভিতরে ভিতরে এত অসন্তোষ জমা হয়ে থাকলেও, সিপাহিদের মধ্যে তার কোনো বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না। আম্বালার কমাণ্ডিং অফিসার জেনারেল বার্নাড ১লা মে তারিখে গভর্নর জেনারেলকে লিখলেন: সিপাহিরাই যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে তা ভাববার কোনো হেতু নেই, কারণ তাদের মধ্যে অসন্তোষের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার লরেন্স এই সময় আম্বালা পরিদর্শন করে এই একই মত ব্যক্ত করলেন। জেনারেল এন্‌সনও জানালেন যে, তাঁর মিষ্টি কথায় যদিও বা কাজ না হয়, তাহলে অন্তত ব্যারাকপুরে ১৯শ বাহিনীর বরখাস্তের উদাহরণটি সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাবকে নিশ্চয় দাবিয়ে রাখবে।[৩]

উচ্চস্থানীয় ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতবর্ষের জনসাধারণ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন ছিল তা উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি থেকেই বোঝা যায়। এটা যে একটা ঝড়ের পূর্বেকার নিস্তব্ধতা, তা তারা মোটেই বুঝতে পারেনি। জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণগুলি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল। মার্চ ও এপ্রিল মাসে উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিল ও জিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে গেল। যে ধরনের আটা, ময়দা, চিনি, ঘি বাজারে আমদানি হতে লাগল তাতে লোকের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। দেখতে দেখতে চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, ইংরেজরা চর্বি মিশ্রিত টোটা দিয়ে শুধু যে সিপাহিদেরই ধর্ম নষ্ট করবে তা নয়, ঘিয়ে শুয়োর গোরুর চর্বি, এবং ময়দা, আটা, চিনিতেও অস্থিচূর্ণ মিশিয়ে সাধারণ লোককেও ধর্মচ্যুত করবে।

ঠিক এই সময়েই উত্তর ও মধ্য ভারতে গ্রাম থেকে গ্রামে চাপাটি বিতরণ হতে লাগল। কোনো গ্রামে হঠাৎ একজন লোক এসে মোড়লের হাতে একটি চাপাটি দিয়ে বলত—"উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম।" মোড়ল গ্রামের সকল লোককে ডেকে চাপাটি বিতরণ করত। তারপর আরো কতকগুলি চাপাটি তৈরি করে চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে একটি কথা বলে ছড়িয়ে দিত। গুরুগাঁও জেলার কালেক্টর ফোর্ড চাপাটি বিতরণের কথা সর্বপ্রথম জানতে পেরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর কলভিনকে জানালেন। কলভিনের আদেশে সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা তদন্ত করে জানালেন যে, চাপাটি বিতরণের তাৎপর্য

২. Ball : *History of Indian Mutiny* vol. I, p. 51
৩. Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 31

হলো এইভাবে সকলকে জানিয়ে দেওয়া যে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা শীঘ্রই ঘটবে। কেউ বললেন—এটা একটা দুষ্টলোকের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার, কেউ কেউ এটাকে অজ্ঞ লোকদের একটা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বলেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু যেসব লোকের মধ্যে চাপাটি বিতরিত হলো তারা বুঝল যে, রুটি ও জাতীয় সম্মানের সংগ্রামে এটা জনসাধারণের ঐক্যের নিদর্শনস্বরূপ। এটা নিশ্চয়ই একটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, যেসব এলাকায় ভালোভাবে চাপাটি বিতরণ করা হয়েছিল সেই এলাকাগুলিই বিশেষভাবে বিদ্রোহেব কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহিদের মধ্যে দমদমের খালাসির কথাগুলি সব থেকে বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এখানেও ব্রিটিশ অফিসারদেব বাংলো-গুলিতে ঘনঘন আগুন জ্বলছিল, এবং সিপাহিরা ইংরেজ অফিসারদের 'স্যালিউট' করা বর্জন করেছিল।

পূর্ব-ভারতে ব্যারাকপুর যে রকম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত,উত্তর-ভারতে মিরাটেরও সেই স্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে, দিল্লি থেকে মাত্র ৩৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই মিরাট সামরিকভাবে (strategically) ভারতেব মধ্যে তখনকার দিনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টের পরিধি ছিল ৫ মাইল ও ভারতের মধ্যে সবথেকে বড় মিলিটারি স্টেশন।

মিরাটের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এখানে সবসময়ই সবথেকে বেশি সংখ্যক গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক ইংবেজ সৈন্য মোতায়েন থাকত। তাছাড়া, মিরাট ছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গোলন্দাজদের শিক্ষাকেন্দ্র। এই-সব কারণে মিরাটের সিপাহিরা যে কোনোদিন বিদ্রোহ করতে সাহস করবে, একথা ইংরেজ শাসকরা একেবারেই ভাবতে পারেনি। মিবাটে ১৮৫৭-র মে মাসে মোট ২ হাজার ইংরেজ সৈন্য ছিল—৬০তম রাইফেল বাহিনী, ৬টি ড্রাগন গার্ডস, আর ৩টি গোলন্দাজ বাহিনী; এবং সিপাহিদের সংখ্যা ছিল মোট ২,৫০০—৩য় অশ্বারোহী, আর ১১শ ও ২০শ পদাতিক বাহিনী।

৩য় অশ্বারোহী বাহিনীটিকে ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহিনী বলে গণ্য করা হতো। ভরতপুর, আফগানিস্তান, আলিওয়াল প্রভৃতি কঠিন যুদ্ধগুলিতে তারা খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল বলে ইংরেজদের কাছে খুব সুনাম অর্জন করেছিল। উত্তর-ভারতের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মুসলমান পরিবারগুলি থেকে এই বাহিনীর অশ্বারোহীদের সংগ্রহ করা হতো।

২৩শে এপ্রিল তারিখে ৩য় বাহিনীর কমাণ্ডার কর্নেল স্মাইদ হুকুম করলেন যে, ওই বাহিনীকে পরের দিন নতুন রাইফেল বাহিনী নিয়ে প্যারেড করতে হবে। ওইদিন সন্ধ্যাবেলা একজন সিপাহি-অফিসার স্মাইদকে জানালেন—সিপাহিরা স্থির করেছে যে তারা টোটা গ্রহণ করবে না। ২৩শ বাহিনীর সমস্ত

ইউনিট থেকেই এই একই খবর আসতে লাগল। একটা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে এই আশংকা করে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার স্মাইদকে আগামী দিনের প্যারেড স্থগিত রাখতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু এই উদ্ধত প্রকৃতির ইংরেজ কর্নেলটি[৪] কারো কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

আদেশ মতো ২৪ তারিখে প্রত্যেক ইউনিট থেকে ১৫ জন করে, সবশুদ্ধ ৯০ জন সিপাহিকে নিয়ে প্যারেড হলো। স্মাইদ ব্যাখ্যা করে বললেন যে,সরকার সিপাহিদের কথা মেনে নিয়েছে এবং সম্মতি জানিয়েছে যে, সিপাহিরা টোটা দাঁতে কাটবার পরিবর্তে হাত দিয়ে ছিঁড়তে পারবে। এই উপায়ে কিভাবে বন্দুক টোটা ভর্তি করতে হয় তা দেখিয়ে দেবার জন্যে তিনি একজন হাবিলদার মেজরকে আদেশ দিলেন। সিপাহি-অফিসার তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করলেন। তারপর স্মাইদ সিপাহিদের মধ্যে টোটা বিতরণ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু ৯০ জন সিপাহির মধ্যে ৮৫ জন টোটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। এই ৮৫ জন সিপাহিকে বন্দী করে রাখা হলো। মিরাটের সামরিক কর্তৃপক্ষ কমাণ্ডার-ইন-চিফের কাছে এই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এই ঘটনার ফলে মিরাট শহরের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং তাদের মধ্যে সর্বত্র এই নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। সিপাহিদেরও প্রত্যহ গুপ্ত বৈঠক বসতে লাগল। শহরের অধিবাসীরা সিপাহিদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল—তারা বন্দী-সিপাহিদের সম্বন্ধে কি করবে। অফিসারদের বাংলোগুলিতে অগ্নিসংযোগের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। যে ৫ জন সিপাহি টোটা গ্রহণ করেছিল তাদের কুঠিগুলোও ভস্মীভূত হলো।

কমাণ্ডার-ইন-চিফের আদেশ মতো ৮ই মে তারিখে সামরিক আদালতের বিচারে বন্দীদের প্রত্যেকের ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো। পরদিন ৯ই মে প্রত্যুষে সিপাহিদের প্যারেডের সময় বন্দীদের নিয়ে আসা হলো। মিরাট ক্যান্টনমেন্টের কমাণ্ডান্ট জেনারেল হিউইট, সামরিক আদালতের রায় বন্দীদের পড়ে শোনালেন। ইংরেজ ইতিহাসবিদ কেই এই সম্বন্ধে লিখেছেন—ইংরেজ সৈন্য, গোলন্দাজ বাহিনী ও কামানগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে, সিপাহিদের মধ্যে এতটুকু বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ পাওয়া মাত্র তাদের মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দিতে পারত।"[৫]

তারপর শুরু হলো ৩ ঘণ্টাব্যাপী অত্যন্ত এক হীন ও অপমানসূচক নাটক। একটি একটি করে 'অপরাধী' সিপাহিদের ইউনিফর্ম খুলে নেওয়া হলো এবং সঙ্গে

৪. Homs : *Sepoy Mutiny*, p.100
৫. Kaye : *Sepoy War in India*, vol. II, p. 51

সঙ্গে হাতুড়ি দিয়ে প্রত্যেকের দুই গোড়ালিতে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হতে লাগল। সমস্ত সিপাহিরা নিশ্চল হয়ে নিস্পলক নেত্রে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য ৩ ঘণ্টা ধরে দেখতে বাধ্য হলো। এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শেষ হলে এই ৮৫ জন 'কয়েদি'কে ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মার্চ করিয়ে মিরাট জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। কমাণ্ডার-ইন-চিফ এই ঘটনার রিপোর্ট পড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, এই রকম প্রকাশ্যভাবে বন্দী-সিপাহিদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। গভর্নর জেনারেল আরো কড়া মন্তব্য করে বলেছিলেন: "এই কাজটি একটি কল্পনাতীত নির্বুদ্ধিতা।" (**Forrest : *State Papers*, vol. I, Appendix, E**)

ওই দিনটি ক্যান্টনমেন্টে একরকম শান্তভাবেই কেটে গেল। ইংরেজ অফিসাররা সিপাহিদের মধ্যে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখতে পেলেন না। বিদ্রোহের মনোভাব অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে—তাদের মাথায় এর বেশি আর কিছু ঢুকল না। সন্ধ্যাবেলা ইংরেজ বীরপুরুষেরা ডিনার টেবিলে মিলিত হয়ে ওইদিনকার সাফল্যের জন্যে পরস্পরকে প্রশংসা করলেন। তাঁরা সকলেই বলাবলি করলেন যে, মিরাটের মতো এত বড শক্তিশালী ইংরেজ প্রধান ক্যান্টনমেন্টে ও পৃথিবীতে তাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোলন্দাজ কেন্দ্রে সিপাহিদের পক্ষে কোনো রকম বিদ্রোহের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা-মাত্র।[৬] বলা বাহুল্য, এই রকম আত্মসন্তুষ্টির ফলে এই রাত্রে তাদের নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি।

সন্ধ্যাবেলায় জেনারেল হিউইট ঐদিনকার ঘটনা বিবৃত করে তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে আত্মপ্রশংসায় গদগদ হয়ে লিখলেন: "মূর্খতা ও অবাধ্যতাই যে তাদের এতখানি হীনাবস্থার কারণ তা অধিকাংশ বন্দীই তীব্রভাবে অনুভব করেছিল। আর অন্যান্য নেটিভ সিপাহিরা স্থির ও সৈন্যোচিতভাবে আচরণ করেছিল।"[৭] এক শ্রেণীর ইংরেজ শাসকরা নেটিভদের যে কতখানি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন তা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবথেকে শক্তিশালী ক্যান্টনমেন্টের অধিনায়কের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এবং আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে হিউইট এসব কথা লিখেছিলেন এমন একটা দিনে, যেদিন মধ্যাহ্নের পর থেকেই সমস্ত মিরাট শহরে একটা প্রচণ্ড হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল এবং শহরের প্রাচীরগুলি দেওয়ালপত্রে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল—যাতে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সকল ভারতবাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছিল।[৮]

৬. *Ibid*, p.56
৭. Forrest : *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p.32
৮. Martin : *Indian Empire*, vol. II, p. 147

১০ই মে ছিল রবিবার। চতুর্দিকে মিরাটের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনা; সর্বত্রই বন্দীদের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। বাজারে কিংবা রাস্তায় কোনো সিপাহি দেখলেই তারা তাদের জিজ্ঞাসা করছিল—তারা ফিরিঙ্গিদের স্পর্ধা ও অপমানের প্রতিশোধ নেবে কিনা। এমনকি স্ত্রীলোকেরাও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের প্রশ্ন করছিল, তাদের সাথীদের এইভাবে অপমান করে ইংরেজদের জেলে পাঠিয়ে দিল, আর তারা কি তা চুপ করে শুধু দেখেই যাবে?

সিপাহিদের উত্তেজিত করেই মিরাটের জনসাধারণ চুপ করে বসে থাকল না। সিপাহিদের আগেই তারা বিদ্রোহের পথে এগিয়ে চলল। কমিশনার উইলিয়ামস তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন: "বন্দুকের কোনো গুলীর আওয়াজ হবার অনেক আগে থেকেই সদর বাজারের অধিবাসীরা তাদের তলোয়ার, বল্লম—যে যা পারল তাই নিয়ে প্রতি গলিতে ও বাজারের রাস্তার ধারে এসে জমা হতে লাগল; এবং শহর ও বাজারের চারদিকে যেসব বস্তি গজিয়ে উঠেছিল তার মধ্য থেকেও এই রকম সশস্ত্র অসংখ্য লোক যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বলে তারা বুঝতে পেরেছিল, তাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছিল।"[৯]

কাজেই আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহিদেরই বিদ্রোহ নয়, এ ছিল মূলত জনসাধারণেরই বিদ্রোহ। বহু যন্ত্রণায় ধুঁকে মরা জীবন একটা অগ্ন্যুদ্গারে ফেটে পড়তে তখন মরীয়া।

অবশ্য মিরাটের সিপাহিরাও ১০ই মে তারিখে চুপ করে বসে ছিল না। শহরের মতোই সিপাহি ব্যারাকগুলিতেও সকলেই খুব উত্তেজিত, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সমস্ত দিন ধরে তারা আলোচনা করছিল—কিভাবে তারা এই সংকটের সম্মুখীন হবে।

সূর্যাস্তকালে ইংরাজেরা রবিবারের প্রার্থনার জন্যে যখন গির্জায় এসে জড়ো হতে লাগল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলীর আওয়াজে তারা চমকে উঠল। এই আওয়াজের মুহূর্ত থেকেই শুরু হলো ১৮৫৭-র সশস্ত্র ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহ। ক্যান্টনমেন্টে ৩য় অশ্বারোহী বাহিনীই বিদ্রোহে অগ্রণী হয়ে বেরিয়ে এলো এবং দেখতে দেখতে ১১শ ও ২০শ বাহিনীর পদাতিক সিপাহিরাও তাদের সঙ্গে অস্ত্র ধারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিরাট শহরে আগুন জ্বলে উঠল।

এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভুলক্রমে সিপাহিদের বিদ্রোহ শুরু হলো সন্ধিক্ষণের আধ ঘণ্টা পূর্বে। ১০ মে ছিল রবিবার। গ্রীষ্ম-

৯. Kaye: *Sepoy War in India*, vol. II, p. 60

কালের জন্যে সেদিনই প্রথম এই নতুন নিয়মটি ইংরেজদের মধ্যে প্রচারিত হলো যে, উত্তাপ বেড়ে যাবার জন্যে ঐদিন থেকে গির্জার প্রার্থনার কাজ আধ ঘণ্টা দেরি করে শুরু হবে। কর্নেল ম্যাকেঞ্জি তাঁর 'মিউটিনি মেময়ার্সে' লিখেছেন : "সময়ের এই পরিবর্তন আমাদের একটা ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তখনকার দিনে ইংরেজ সৈন্যরা প্রায় নিরস্ত্র অবস্থাতেই গির্জার প্রার্থনায় যেত। ...অবশ্য বিদ্রোহীরা এই পরিবর্তনের কথা জানত না। তারা আধ ঘণ্টা আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। ৬০তম ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে গির্জায় সমবেত হওয়া পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করত, তাহলে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় গার্ডদের অভিভূত করে ফেলতে তাদের কতটুকুই বা বেগ পেতে হতো? ...স্বয়ং ভগবান আমাদের সহায় হলেন। বিদ্রোহী অশ্বারোহীদের অগ্রণী স্কাউটরা যখন ইংরেজ সৈন্যদের লাইনে এসে পেঁছিল, তখন তারা দেখতে পেল — ইংরেজ সৈন্যবাহিনী প্যারেডে লাইন করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা (alarm) বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আর রইল না।"[১০]

ব্রিটিশ লাইন দখল করতে অসমর্থ হয়ে বিদ্রোহীরা ক্যান্টনমেণ্ট পরিত্যাগ করে মিরাটের জেল আক্রমণ করতে চলে গেল। এই জেলটি ভারতের অন্যতম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জেল, ; সেখানে ৮৫ জন সিপাহি বন্দী সমেত ৪ হাজার কয়েদি ছিল। সিপাহিরা জেল ভেঙে সমস্ত কয়েদিদের মুক্তি দিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের একটা অংশ ট্রেজারি আক্রমণ করল। কিন্তু যেসব সিপাহিরা ট্রেজারি পাহারা দিচ্ছিল তারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল না; বরং ইংরেজদের ট্রেজারি রক্ষা করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াল। বিদ্রোহীরা দেখল ট্রেজারি দখল করতে হলে নিজেদের ভাইদের রক্তক্ষয় করতে হয়। সুতরাং ট্রেজারি দখল না করেই তারা চলে গেল। কিছুদিন পরে কিন্তু এই রাজভক্ত সিপাহিদেরই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে ইংরেজেরা বরখাস্ত করে দিয়েছিল। সিপাহিদের মধ্যে অনেকের এই রকম সংকট মুহূর্তে দোদুল্যমান মনোভাব, শত্রুকে ঠিক মুহূর্তে আঘাত করার সুযোগ ছেড়ে দেওয়া, তার একমাত্র উদাহরণ এইগুলোই নয় — বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের দুর্বলতা দেখিয়ে তারা নিজেদের ও দেশের স্বার্থের ক্ষতি করেছে। যাই হোক, তারপর বিদ্রোহীরা শহরে এসে কিছু সংখ্যক ইংরেজকে হত্যা করে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিরাটে এই সময় ২,৫০০ সিপাহি আর ২ হাজার ইংরেজ সৈন্য ছিল। সিপাহিদের মধ্যেও সকলেই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫০০। একজন

১০. **Forrest** : ***History of the Indian Mutiny***, vol. I, p. 35

ইংরেজ লেখক বলেছেন : "এই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীরা, কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়ে বিচার করলেও, ইয়োরোপীয় সৈন্যদের সমকক্ষ হতে পারত না।...ক্যাণ্টনমেণ্টে তখন একটি ফিল্ড ব্যাটারি সমেত দুটি ইংরেজ অশ্বারোহী বাহিনীও ছিল—আর অন্যদিকে বিদ্রোহীদের হাতে একটি কামানও ছিল না। আমাদের ড্রাগুনরা অনায়াসে দুটো নেটিভ অশ্বারোহী বাহিনীকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিতে পারত; তাছাড়া আমাদের ৬০তম রাইফেল বাহিনী অন্তত ২ হাজার সিপাহির সমকক্ষ ছিল।"[১১]

এ বিষয়ে ফরেস্টও লিখেছেন : "ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যত সংখ্যক সৈন্য জয় করেছিল, মিরাটে তার থেকে বেশি সংখ্যক ইয়োরোপীয় সৈন্য ছিল, কিন্তু তাদের এই সংকটকালে তাদের কোনো নেতা ছিল না।"[১২] আর একজন ইতিহাসবিদ বল্ লিখেছেন : "মিরাটে এত ইংরেজ সৈন্য ছিল যে তারা অনায়াসে মিরাটে যত সিপাহি ছিল তার তিনগুণ সিপাহিকে কাহিল করে দিতে পারত।"[১৩]

জেনারেল হিউইটকে যখন এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে, কেন তিনি বিদ্রোহীদের দিল্লির পথে অনুসরণ করেন নি, তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মিরাটের 'বদমাশদের'—যারা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই "বিশেষ দুষ্কৃতিকারী বলে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল"—তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে ইংরেজ সৈন্যদের মিরাট শহরেই রাখতে হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মিরাটে যে পরিমাণ ইংরেজ সৈন্য ছিল তা দিয়ে কর্তৃপক্ষ দু'কাজই করতে পারতেন—বিদ্রোহীদেরও অনুসরণ করা সম্ভব ছিল, আর মিরাটের জনসাধারণকেও দাবিয়ে রাখা যেত। কারণ, একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মিরাটের লোক যতই ইংরেজ-বিরোধী হয়ে উঠুক না কেন, তাদের হাতে না ছিল অস্ত্র, না ছিল সংগঠন, না ছিল নেতৃত্ব; আর ইংরেজের হাতে সবই ছিল—বন্দুক অশ্বারোহী ও কামান। ঐ অবস্থায় এই কাজের জন্যে মাত্র দু'চারশো ইংরেজ সৈন্যই যথেষ্ট হতো। আর বিদ্রোহীদের অনুসরণ করবার জন্যেও ইংরেজ সৈন্যের অভাব ছিল না। ইতিহাসবিদ ফরেস্ট লিখেছেন—"যদি কারাবিনারদের মাত্র একটা স্কোয়াড্রন ও দুশো রাইফেলধারী সৈন্য বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করত এবং দিল্লিতে তাদের কয়েক ঘণ্টা পরেও এসে পৌছত, তা হলেও পুরনো রাজধানীকে বাঁচানো সম্ভব হতো।"[১৪]

এ বিষয়ে মিড লিখেছেন : "বিদ্রোহীদের গন্তব্যস্থল ছিল ৪০ মাইল দূরে

১১. Meed : *Sepoy Revolt*, p. 69
১২. Forrest : *History of the Sepoy Mutiny*, vol. I, p. 36
১৩. *Ibid*, vol. II, p. 67
১৪. *Ibid*, p. 38

এবং এই সমস্ত পথটাই ছিল একেবারে সমতল ; তাছাড়া, দুটি নদীও তাদের পার হতে হয়েছিল। রাস্তার মাঝে কয়েকটা কামান এবং ইংরেজ সৈন্য ও অশ্বারোহীদের দ্বারা দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন—তা হলেই বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা যেত।"[১৫]

কিন্তু এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা তৎপরতার সঙ্গে মিরাটের বিদ্রোহ দমন করতে পারল না কেন? কেবলমাত্র বৃদ্ধ জেনারেল হিউইটই এই অক্ষমতার জন্যে দায়ী ছিলেন না। আসল কথা হচ্ছে যে, সিপাহিদের বিদ্রোহের প্রথম আঘাতে সমগ্র ব্রিটিশ কমাণ্ডই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল এবং ভেঙে পড়েছিল। এই কারণেই ইংরেজ অফিসাররা, তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল থাকা সত্ত্বেও, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করতে পারেনি এবং দৃঢ়তা ও প্রত্যুৎপন্নতার দ্বারা মুষ্টিমেয় সিপাহিদের দমন করতে পারেনি। যে কর্নেল স্মাইদ ৯ তারিখে প্যারেড গ্রাউণ্ডে এত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই বীর-পুঙ্গবটিকে পরের দিন বিদ্রোহের সময় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি ; তিনি পালিয়ে গিয়ে শহরের একটি বাড়িতে সমস্ত রাত আত্মগোপন করেছিলেন।[১৬]

সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকেও তাদের ব্যারাক জয় করতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। তারপর তাদের সকলকে যখন প্যারেড গ্রাউণ্ডে সমবেত করা হলো, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। তারপর তারা যখন বিদ্রোহ দমন করার জন্যে সিপাহিদের লাইনে এসে পৌঁছল, সিপাহি ব্যারাকগুলি তখন একেবারে শূন্য—সেই সময় সিপাহিরা জেল ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করে দিচ্ছিল। খুব বীরত্বের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই শূন্যে কতকগুলি গোলাগুলী ছুঁড়ে যখন তারা নিজেদের লাইনে ফিরে গেল, তখন তারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে তাদের বাংলোগুলি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

পক্ষান্তরে, সিপাহিরা যখন বিদ্রোহ করল তখন প্রথম থেকেই তারা প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণের জন্যে রণক্ষেত্রের জয় সম্পূর্ণভাবে তাদের হাতেই ছিল। কিন্তু সিপাহিরা বিশেষ কোনো যোগ্য অফিসার দ্বারা চালিত হচ্ছিল না। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।[১৭] বিদ্রোহ করার পূর্বে তারা কোনো নির্দিষ্ট পন্থা ঠিক করে নেয়নি ; তাদের কোনো বিশিষ্ট লক্ষ্যও ছিল না। কেবলমাত্র প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল

১৫. Meed : *Sepoy Revolt*, p. 70

১৬. Kaye : *Sepoy War in India*, vol II, p. 63

১৭. জেনারেল হিউইট সিমলায় কমাণ্ডার-ইন-চিফকে ১১ই লিখেছিলেন—"আমার দৃঢ় ধারণা যে সিপাহিদের বিদ্রোহটা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না।" (Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 250)

প্রথম দিকে তাদের উদ্দেশ্য—ইংরেজকে ধরো আর মারো। এইরকম ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে তারা তাদের সামরিক বোধশক্তি ও নিয়মানুবর্তিতা হারিয়ে ফেলেছিল। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের প্রথম আঘাতে বেশ কিছু সময়ের জন্যে সামরিক ও বেসামরিক সকল ইংরেজই বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। তারা ভয়ে ত্রাসে অভিভূত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চারিদিকে অসহায়ভাবে ছোটাছুটি করছিল। এই ত্রাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সৈন্যদেরও প্যারেড গ্রাউণ্ডে লাইন করে দাঁড়াতে ও তাদের মধ্যে বন্দুকের গুলী বিতরণ করতে এক ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় লেগেছিল। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, "ইংরেজ অশ্বারোহী ড্রাগুন বাহিনীর সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়তে জানত না, আর জানলেও সকলের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক ঘোড়া ছিল না।"[১৮]

এই অপূর্ব অনুকূল মুহূর্তটিকে সিপাহিরা সামরিকভাবে একেবারেই তাদের কাজে লাগাতে পারেনি। উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে, বিদ্রোহী সিপাহিরা মিরাটের জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এই অনুকূল অবস্থার সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করে মিরাটের ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করে ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রধান সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দিতে পারত এবং উত্তর-ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রটিকে

১৮. ১০ ই মে তারিখের মিরাটের সিপাহিদের বিদ্রোহ আকস্মিক বলেই মনে হয়। ব্যারাকপুর, আম্বালা ইত্যাদি শিবিরের মতো মিরাটেও সিপাহিদের গোপন বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে তখনো হয়তো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও সিপাহিদের তা জানা ছিল না। এ বিষয়ে তদন্ত করবার জন্যে Cracroft Wilson-কে বিশিষ্ট কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছিল; তাঁর রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন: Carefully collating oral information…I am convinced that Sunday, 31st May 1857 was the day fixed for mutiny to commence throughout the Bengal Army; that there were committees of three members in each regiment which conducted the duties; that the sepoys as a body knew nothing of the plan arranged;…The committee conducted the correspondence and arranged the plan of operation, viz. that on the 31st of May parties should be bold off to murder all European functionaries, most of whom would be engaged at church, seize the treasure,…release the prisoners…The Regiments of Delhi and its immediate vicinity were instructed to seize the magazine and fortification." (Kaye: *Sepoy War in India*, vol. II, p. 109)

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে খুব ভালোভাবেই নিজেদের কাজে লাগাতে পারত।

মিরাটের বিদ্রোহের আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের মতো এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহি ও শহরের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শহরে যেদিন বিদ্রোহ হলো, সেদিনই মিরাটের চারপাশের গ্রামগুলিতে দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কৃষক শ্রেণীও তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে প্রথম থেকেই বিদ্রোহের অগ্রভাগে এসে দাঁড়াল। এই কথাটিই কেই শাসকশ্রেণীর ভাষায় বেশ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন: "ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে শুরু করে সমস্ত জেলাতে লুঠ ও হত্যাকাণ্ড ভয়ানকভাবে বিস্তারলাভ করল। বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতি কিংবা ধর্ম—কারোরই আর কোনো সম্মান রইল না। যাদেরই কিছু সম্পদ ছিল এবং যারা তা রক্ষা করতে অক্ষম ছিল, তাদেরই দুর্বৃত্তরা নির্দয়ভাবে লুণ্ঠন করল।[১৯]

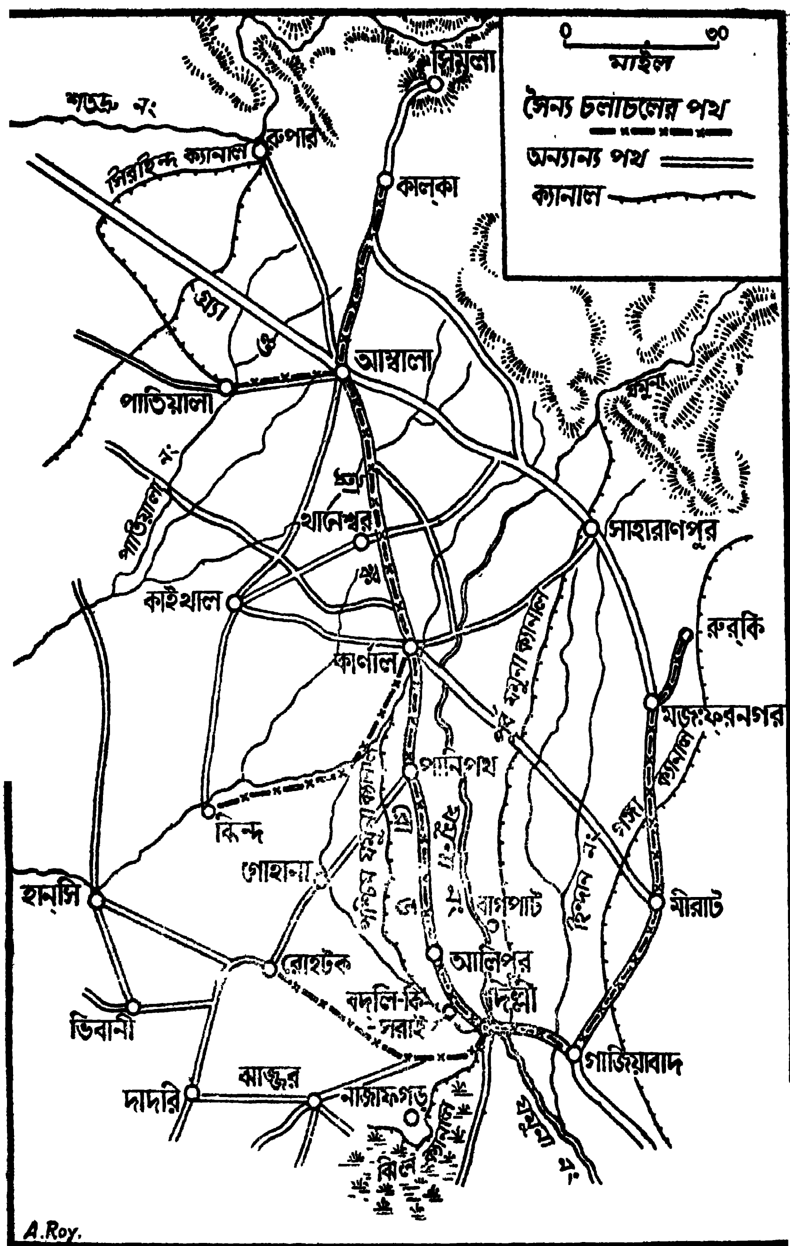
এই 'লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের' দু'একটি উদাহরণও কেই দিয়েছেন। যথা—"খাজনা দিতে না পাবার অপরাধে আদালতের একটা ডিক্রিতে রামদয়ালকে মিরাট জেলে কয়েদি করে রাখা হয়েছিল। ১০ই মে তারিখে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ রাত্রেই সে তার ভোজপুর গ্রামে ফিরে গেল। পরের সকালে সে এক দল লোক সংগ্রহ করে যে মহাজন তার বিরুদ্ধে ডিক্রি নিয়েছিল তার বাড়ি আক্রমণ করে তাকে ও তার পরিবারের আরো ৬ জন লোককে খুন করল।"[২০]

সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মিরাটে সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর পেয়েই তার চারিদিকের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা ড্রাম বাজিয়ে জমায়েত হচ্ছিল।[২১] সর্বত্রই কৃষক ও গুজারেরা ভয়ংকর ভাবে বানিয়া ও মহাজনদের আক্রমণ করছিল। মিরাটের কোতোয়াল বিষ্ণু সিং রেভারির তুলারামের সঙ্গে যোগ দিয়ে কৃষক বাহিনী গঠন করেছিলেন। মিরাট জেলার পশ্চিমে জাঠ নেতা সাহামল ৪ হাজার কৃষক নিয়ে একটা বাহিনী তৈরি করেছিলেন এবং অনেকবার ইংরেজদের সঙ্গে

১৯. *Ibid*, p. 172

২০. *Ibid*, p. 173 (কমিশনার উইলিয়ামসের রিপোর্ট)

২১. **"The whole country (around Meerut) was rising; native drums, the signal to the villagers to assemble, were being beaten in all directions, and crowds were seen moving upto the gathering place ahead." (*Narrative of events regarding the Mutiny in India of 1857-58*, vol. I, p. 265)**



দিল্লির অবস্থান ও ইংরেজ সৈন্য চলাচলের পথ

লড়েছিলেন।[২২] সরকারি রিপোর্টে আরো অনেক কৃষক নেতার নাম পাওয়া যায়; যেমন বানাওয়ারের কালান্দর খান, পরিচিতগড়ের কদম সিংহ, আকলপুরের নরপত সিং, নাজিম খান প্রভৃতি। এইসব কৃষকরা অনেকেই বর্তমান অস্ত্রশস্ত্র ভালোভাবেই ব্যবহার করতে শিখেছিল। দিল্লিতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর এইসব বিদ্রোহী কৃষকদের নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ প্রথম থেকেই সর্বত্র একটা ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। মূলত এই বিদ্রোহ ছিল কৃষক বিদ্রোহ।

কোনো কোনো ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞের মতো ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনও বিজ্ঞের মতো বলেছেন যে, মিরাটের উচ্চপদস্থ অফিসাররা যদি 'সতর্ক ও বিচক্ষণ' হতেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা 'যদি তাদের জড়িমা কাটিয়ে উঠতে পারত' এবং "যদি বিদ্রোহীদের অনুসরণ করা হতো ও তাদের আক্রমণ করা হতো, তাহলে দিল্লিকে বাঁচান যেত, এবং যদিও সাধারণ অসন্তোষের ফলে এখানে-ওখানে কিছু গণ্ডগোল ঘটত, সেগুলিকে সহজেই দমন করা যেত।"[২৩] ড° সেন মহাবিদ্রোহের গভীর কারণগুলি উপেক্ষা করেছেন বলেই অনৈতিহাসিক মন্তব্য করতে পেরেছেন। অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরী একথার জবাবে বলেছেন যে, ভারতের আকাশে যে মেঘ নিঃশব্দে ও বিপজ্জনকভাবে ঘনীভূত হয়ে আসছিল তা যে-কোনো উপলক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই ফেটে পড়ত। [২৪]

---

২২. ১৮ই জুলাই বারাউতে ইংরেজরা সাহামলকে আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে Tinnochy লিখেছেন: **"I gave the second shot which went through him, having entered his back upon which he at once dropped, but recovering himself at a moment...he wounded me at two places...I then had time to draw my sword and give him a gashing wound in the neck." (Ibid, p. 265-66).** এই যুদ্ধের সময় গুরহি ও অন্যান্য গ্রামে ইংরেজরা যেসব পুরুষদের পেয়েছিল তাদের সকলকেই খুন করেছিল। সাহামলের মাথাটা তার দেহ থেকে ছিন্ন করে বাজারের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যে। সাহামলের পৌত্র লুজরাম আরো অনেকদিন বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

২৩. সেন, পৃ. ৬৫; 'দিল্লীকে বাঁচান যেত'—কার জন্যে? ইংরেজের জন্যে?

২৪. **Chaudhury: *Civil Rebellion* etc, p. 64**

বিদ্রোহী দিল্লি

১৮৫৭ সনের ১১ই মে প্রত্যূষে দিল্লির নিদ্রাভিভূত সাধারণ মানুষ 'দিন দিন' 'মারো ফিরিঙ্গিকো' ইত্যাদি ঘন ঘন ভয়ংকর শব্দে জেগে উঠল। মিরাটের ২,৫০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক বিদ্রোহী সিপাহিরা জেল থেকে তাদের বন্দী কমরেডদের মুক্ত করে সমস্ত রাত্রি ৪০ মাইল মার্চ করে যমুনার সেতু পার হয়ে দিল্লির প্রাচীরের নিচে এসে উপস্থিত হলো। একজন ইংরেজ, যিনি বিদ্রোহীদের যমুনার অপর পারে মার্চ করে আসতে দেখেছিলেন তিনি, এইভাবে তার বর্ণনা করেছেন : অগ্রভাগে প্রায় ২৫০ অশ্বারোহী ইউনিফর্মে সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়ে বুকের উপর মেডেল ঝুলিয়ে—যেসব মেডেল তারা পেয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের জন্যে লড়াই করে, আত্মবিশ্বাসে ও দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল। তাদের পিছনে, খুব বেশি পিছনে নয়, ধূলি ধূসরিত লাল ইউনিফর্মে অসংখ্য পদাতিক সূর্যের আলোকে তাদের বেয়নেট ঝকমকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। এই অগ্রগামী জনতার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা সংকোচ ছিল না। তারা যে সফল হবে, এই বিশ্বাস নিয়েই তারা এগিয়ে আসছিল।"[১]

১৮৫৭ সনের শুরু থেকেই দিল্লি খুব একটা উত্তেজিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। দিল্লির উর্দু সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন প্রচার করছিল যে, এই বৎসরে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটবে ; পলাশি যুদ্ধের শতবার্ষিকী বৎসরে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটবে ; রুশিয়া, তুর্কি, ফ্রান্স, পারস্য ভারতের ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করবে। রাস্তায়, ঘাটে, বাজারে সর্বত্র এই একই আলোচনার বিষয়।[২] ঠিক এই সময়ে সিপাহিদের মধ্যে টোটার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ও তাদের অন্যান্য অভাব-অভিযোগ নিয়ে ভীষণ উত্তেজনা, গুপ্ত সভা-সমিতি, কমিটি গঠন ইত্যাদি চলছিল। দেশের এরকম অবস্থায় কোনো সিপাহি-প্রতিনিধি বা

১. Ball : *History of the Indian Mutiny*, I, p. 72. ডঃ মজুমদার শুধুমাত্র ইংরেজের গুপ্তচর মুন্সি মোহনলালের একটা উক্তির ওপর নির্ভর করে বলেছেন যে, মিরাটে বিদ্রোহ করার পর সিপাহিদের দিল্লিতে যাবার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু দিল্লির সিপাহিরা যেরূপ তৎপরতার সঙ্গে মিরাট বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, উভয়ের মধ্যে পূর্ব থেকেই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল।

২. Kaye : *Sepoy War in India*, vol. II, pp. 35-36

অন্যান্য চক্রান্তকারীদের প্রতিনিধি যে বাহাদুর শাহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেনি, তা কেউই জোর করে বলতে পারে না। বিশেষ করে বাহাদুর শাহের মনও যখন ইংরেজদের প্রতি খুব বিরূপ হয়ে ছিল, তখন সিপাহিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্তত কোনো রকমের একটা যোগাযোগ যে উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল তা বাহাদুর শাহের বিচারের সময় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি মুকুন্দলালের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়।[৩]

যখন বাহাদুর শাহ জানালা খুলে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন, সিপাহিরা তাঁকে জানাল—তারা ধর্মের জন্যে ও দেশকে ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ও মিরাটের ফিরিঙ্গিদের খতম করে তারা দিল্লিকেও মুক্ত করবার জন্যে এসেছে; বাদশাহ যদি তাদের সম্রাট হতে স্বীকার করেন তাহলে সমগ্র হিন্দুস্থানকে তারা ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে মুক্ত করবে।

বাহাদুর শাহ সিপাহিদের বলেছিলেন: "ব্রিটিশ সরকারের পেনসনের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হয়। আমার নিজস্ব কোনো ধনাগার নেই, আমি কোথা থেকে তোমাদের বেতন দেব?" জবাবে সিপাহিরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, ইংরেজদের সব ধনাগার দখল করে সব টাকা তারা তাঁর কাছে নিয়ে আসবে। তারপর বাদশাহ সিপাহিদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এই রকম কাজের ফলাফল কি হতে পারে তা তারা ভেবে দেখেছে কিনা ও শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বস্ত থাকবে কিনা? বিদ্রোহীরা সমস্বরে তাদের সম্মতি জানাল। তখন বাহাদুর শাহ বিদ্রোহীদের প্রবেশ করবার জন্যে প্রাসাদের দরজা খুলে দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৪] ১১ তারিখের মধ্যেই যে বিদ্রোহ ঘটে যাবে, বাহাদুর শাহ তার জন্যে

৩. "Question : Before the 11th of May were any proposal sent by the army to the King?

"Mukundlal : I do not know whether any direct proposal came to the prisoner, but the king's personal attendants sitting about the entrance to his private apartments used to converse among themselves, and say that very soon, almost immediately the army would revolt and come to the Palace, when the Government of the king would be re-established." (*Bahadur Shah's Trial*, p. 149)

৪. বাহাদুর শাহের বিচারকালীন তাঁর সেক্রেটারি মুকুন্দলালের সাক্ষ্য (মণ্টোগোমারি মার্টিন: 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' ৩য়, পৃ. ১৬৯ ও মুইর: 'রেকর্ডস্ অব দি ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট' ২য়, পৃ. ৩৬)। অনেকের মতে সিপাহিরা

প্রস্তুত ছিলেন না, হয়তো তাঁর নিকট খবর পৌঁছেছিল বিদ্রোহ শুরু হবে ৩১শে মে। হঠাৎ এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। ১১ই মে সন্ধ্যার সময় বিদ্রোহীদের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন এবং তাঁকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হলো।

ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহের নিজের সিপাহিরা বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাছাড়া, বিদ্রোহী সিপাহিদের আগমন বার্তা মুহূর্তের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা দিল্লিতে দেখতে দেখতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। দেখতে দেখতে হাজার হাজার জনতা সিপাহিদের পাশে এসে দাঁড়াল। বিদ্রোহ আর কেবলমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। অবিলম্বে বহিরাগত মুষ্টিমেয় সিপাহিদের বিদ্রোহ দিল্লির সমগ্র জনসাধারণের বিদ্রোহে পরিণত হলো।[৫]

১১ই মে তারিখের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দিল্লির ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হয়েছিল। নেটিভরা দাস মনোভাবাপন্ন ও তারা কখনো ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস করার জন্যে বিদ্রোহ করার কল্পনাও করতে পারে না—এই রকম বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে ইংরেজ শাসকরা বেশ নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করছিলেন।

দিল্লির ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে সময়মতো মিরাটে সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর পাননি তা নয়। ঐ সিপাহিদের দিল্লিতে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই মিরাটের

জোর করে ও ভয় দেখিয়ে বাহাদুর শাহকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল, একথা মোটেই সত্য নয়। বাহাদুর শাহকে বাঁচাবার জন্যেই তাঁর তথাকথিত হিতৈষী বন্ধুরা এরকম প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল। এ বিষয়ে যা কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাতে এটা প্রমাণ হয় যে, বাহাদুর শাহ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

৫. গণবিদ্রোহ ও বিপ্লবের ইতিহাস ভদ্রলোক ইতিহাসবিদের হাতে কিভাবে বিকৃত হয় তার একটি নমুনা: **"Once the rumour spread that the sepoys had killed the Europeans at Meerut and come to Delhi to fight for the faith, the streets were thronged with a curious mob and the lawless elements soon appeared on the scene. Many of them regarded the English as trespassers and usurpers." (Sen. p. 71)** সত্য কথাই, ভারতীয় জনসাধারণ (**mob**) ইংরেজদের **'trespassers and usurpers'** বলেই মনে করত, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করত না। অধ্যাপক সেন আরো বলেন (পৃ. ৭১) যে, ১১ই মে সন্ধ্যার সময় দিল্লিতে **"the situation became worse and worse." worse**—কাদের জন্যে? ভারতীয়দের জন্যে?

দুর্ঘটনার খবর তাঁরা পেয়েছিলেন।[৬] কিন্তু মিরাটের এই 'নেটিভ রাস্কেলগুলি' ঐ রাত্রেই ডবল মার্চ করে দিল্লিতে হাজির হয়ে তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত করবে তা তাঁরা কি করে বুঝবেন? যাই হোক, সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ইংরেজদের পক্ষে সেলিমগড়ের শক্তিশালী কামানগুলি দিয়ে এই স্বল্পসংখ্যক (১,৫০০) বিদ্রোহীদের যমুনার অপর পারেই ধ্বংস করে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ হতো না। কিংবা আর কিছু না হোক, যমুনার সেতু ভেঙে দিয়েও বিদ্রোহীদের দিল্লি শহরে প্রবেশ বন্ধ করতে পারত। আরো একটি কথা এই যে, বিদ্রোহীদের তখনো পর্যন্ত কোনো কামান ছিল না; এমন কি বিদ্রোহীদের অনেকের কাছে বন্দুক পর্যন্ত ছিল না। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, ১,৫০০ সিপাহিই একসঙ্গে দিল্লি প্রবেশ করেনি। প্রথম যারা এসেছিল ও বাহাদুর শাহের সঙ্গে কথা চালিয়েছিল তারা ছিল মাত্র ২৫০ অশ্বারোহী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ইংরেজরা একটু কর্মতৎপর হলেই দিল্লির ১১ই মে তারিখের বিদ্রোহ অনায়াসে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে পারত। আসলে পরিপক্ক বাস্তব পরিস্থিতিতে কত সহজেই না শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেওয়া যায়!

যাই হোক, দিল্লির রেসিডেন্ট স্যার থিওফিলাস্ মেটকাফ ও কমিশনার ফ্রেজার বিদ্রোহীদের আগমন বার্তা শোনামাত্র ব্রিগেডিয়ার গ্রেভ্‌সকে কাশ্মীর দরওয়াজা ও সেলিমগড় রক্ষা করবার হুকুম দিয়ে নিজেরা কিছু লোকজন নিয়ে লালকেল্লা বাঁচাবার জন্যে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে, বিদ্রোহী জনতা ও সিপাহিরা সিঁড়ি দিয়ে প্রাসাদে উঠতে উদ্যত হয়েছে। ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন ডগলাস্ প্রাসাদ প্রহরীদের হুকুম করলেন বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করবার জন্যে। কিন্তু তাঁদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করল না। ফ্রেজার তখন মরীয়া হয়ে একজন প্রহরীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে একজন বিদ্রোহীকে গুলী করে খুন করে ফেললেন। এইভাবে একজন কমরেডকে খুন হতে দেখে বিদ্রোহীরা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল ও তৎক্ষণাৎ ফ্রেজারকে প্রাসাদের সিঁড়িতে পায়ে দলে তারা হত্যা করল। আরো যে কয়জন ইংরেজ সেখানে

৬. দিল্লির কমাণ্ডিং অফিসার পূর্বদিনকার মিরাট সিপাহিদের বিদ্রোহের সংবাদ খুব প্রত্যুষেই পেয়েছিলেন (বল্: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃ. ১০৯)। বাহাদুর শাহের বিচারকালে সরকার পক্ষের প্রসিকিউটার আদালতকে একটি দলিল দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল: "১১ই মে, রাত্রিতে কমিশনার ফ্রেজার মিরাট থেকে একটি চিঠি পান। তাতে মিরাটের বিদ্রোহের খবর ছিল। কিন্তু তার পরেও নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।" (Martin : *Indian Empire*, vol. II, p. 271)

উপস্থিত ছিল, পাদরি জেনিংস ও তাঁর কন্যাসহ সকলকেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ হারাতে হলো। কেবলমাত্র মেটকাফ কোনোমতে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে মার্টিন যে ডায়েরির কথা উল্লেখ করেছেন তাতে লিখিত আছে যে, মেটকাফ যখন ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিলেন তখন "মুচি ও অন্যান্য কর্মীরা আজমীর দরওয়াজায় তাঁকে লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করে ধরবার ও মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা সফল হয়নি।"[৭] যাই হোক, যে লালকেল্লা থেকে একদিন মোগল সম্রাটরা ভারতবর্ষ শাসন করতেন সেখানে আবার ভারতের স্বাধীন পতাকা উত্তোলিত হলো।

এদিকে ব্রিগেডিয়ার গ্রেভ্‌স কিছু সিপাহি সঙ্গে দিয়ে দুটি কামানসহ মেজর এবটস্‌কে কাশ্মীর দরওয়াজায় পাঠিয়ে দিলেন। আরো দুটি কামান ও একদল সিপাহি সমেত কর্নেল রিপলেকে পাঠালেন সেলিমগড়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্যে। বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হওয়ামাত্র রিপলে তাঁর সিপাহিদের বন্দুক ছুঁড়তে হুকুম দিলেন, তখন তারা বিদ্রোহীদের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত করতে লাগল। বিদ্রোহীরা উচ্চস্বরে 'দিন দিন' রবে স্লোগান দিতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উভয় দল আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। তাদের গুলীতে কর্নেল রিপলে ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসাররা ঐ খানেই প্রাণ হারাল।

বিদ্রোহীদের হাতে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও বিশেষ করে কোনো কামান না থাকাতে দিল্লির অস্ত্রাগার অতি সত্বর দখল করা তাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। লালকেল্লার অনতিদূরে অবস্থিত এই অস্ত্রাগার ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগার ছিল। সেখানে ১০ হাজার বন্দুক, ৯ লক্ষ গুলী, ১০ হাজার ব্যারেল বারুদ, ছোট-বড় প্রচুর কামান ও কামানের অসংখ্য গোলা ছিল। আরো ছিল, দুটি সম্পূর্ণ সিজ ট্রেন (siege-train) ইত্যাদি।[৮] ঐদিন মাত্র ৮ জন ইংরেজ ও একদল সিপাহি নিয়ে লেফটেনান্ট এই অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছিলেন। বিদ্রোহীরা যখন অস্ত্রাগার আক্রমণ করল,তখন উইলোবি তাদের হাত থেকে একে রক্ষা করা অসম্ভব বুঝতে পেরে বারুদে একটি দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দে সমগ্র দিল্লি শহর কেঁপে উঠল। অস্ত্রাগারে উইলোবি সমেত সকলেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তাছাড়া, অস্ত্রাগারের চারদিকে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাসহ দিল্লির বহু নিরীহ অধিবাসীরও জীবন নষ্ট হলো।[৯]

৭. Martin : *Indian Empire*, vol. III, p. 172

৮. Ball : *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 72

৯. Muir : *Records of the Intelligence Department*, vol. II, p. 36. বলের মতে (vol. I, 76) এই বিস্ফোরণের ফলে ২ হাজার নাগরিকের প্রাণ গিয়েছিল।

দিল্লির এই বৃহৎ অস্ত্রাগার এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে বিদ্রোহী পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ধ্বংসস্তূপ থেকে কতকগুলি কামান ও বন্দুক উদ্ধার করে বিদ্রোহীরা তাদের কাজে লাগাতে পেরেছিল। কিন্তু সেই অপর্যাপ্ত বারুদ তারা একটুও পেল না, এবং এই বারুদের অভাবে বিদ্রোহীরা দিল্লির যুদ্ধে কতখানি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল তা প্রসঙ্গত দেখতে পাওয়া যাবে।

উইলোবি যেভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দিল্লির অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়েছিলেন তা যে একটা অসম সাহসের কাজ হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং তাতে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল তাও বলা বাহুল্য। এইজন্যে ইংরেজ লেখকরা যে উইলোবিকে 'হিরো' ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত করবেন, তা তাঁদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। শুধু এইখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। তাঁদের অনেকে উইলোবিকে থারমোপলির বীর যোদ্ধাদের সমতুল্য স্থান দিয়েছেন।[১০] কিন্তু এরকম তুলনা যে একেবারেই অসংগত তা বলা বাহুল্য। কারণ থারমোপলির দেশপ্রেমিকরা নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, এটা যথার্থই প্রকৃত বীরের কাজ; আর উইলোবি প্রাণ দিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের পরদেশ লুণ্ঠন ও দাসত্ব বিস্তারের ঘৃণিত কাজের জন্যে। এটা মহৎ কাজও নয়, বীরের কাজও নয়। চোর, ডাকাত, খুনী বদমাশরাও অনেক সময় খুব সাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু তার জন্যে তাদের বীর বলা যায় না। যাঁরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে, একটা বড় আদর্শের জন্যে, কিংবা মানবতার জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন—তাঁরাই প্রকৃত বীর।

বিস্ফোরণের ফলে এতগুলি মৃত ও আহত স্বদেশবাসীর এই ভয়ানক রক্তাক্ত দৃশ্য জনতা ও সিপাহিদের একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলল। উন্মত্ত হয়ে তারা ছুটল ইংরেজ পল্লীতে—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা নির্বিশেষে একটি ইংরেজও তারা জীবিত রাখবে না। যারাই তাদের হাতের সামনে পড়ল সকলকেই প্রাণ দিতে হলো। ইংরেজদের বাংলো ও অফিসগুলিও আগুন লাগিয়ে ধূলিসাৎ করে দিল।[১১] ইংরেজি ব্যাঙ্ক লুঠ হয়ে গেল ও তার ম্যানেজার বেরেসফোর্ড তাঁর পরিবার সমেত নিহত হলেন। শহরের মুসলমানরা এবং এমনকি কিছু হিন্দুও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং সব থানা ও কোতোয়ালি ধ্বংস করে দিয়েছিল; তারপর বিদ্রোহীরা ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ইয়োরোপীয়ানরা (২ জন

১০. Froud : *Short Studies of Great Subjects*, 3rd ed, p. 378

১১. Muir : *Records of the Intelligence Department*, vol I, p. 76

পুরুষ, ৩ জন স্ত্রীলোক ও ২ জন শিশু) পালাবার কোনো পথ পেল না, তারা নিহত হলো।···ম্যাজিস্ট্রেটের, জজের, কমিশনারের ও অন্যান্য সরকারি অফিস সবই লুঠ করা হয়েছিল ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১২] ইংরেজি সংবাদপত্র 'দিল্লি গেজেটের' অফিসটাও এইভাবে ধ্বংস হলো। যখন পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রান্ত হলো তখন একজন ইংরেজ কর্মচারি শেষ মুহূর্তে কোনোমতে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে এই মর্মে একটা খবর পাঠাতে পেরেছিল—"এখুনি আমাদের অফিস ছেড়ে যেতে হবে। সমস্ত বাংলোগুলি মিরাটের সিপাহিরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তারা আজ সকালে এসেছে। আমরা চললাম, বিদায়।"[১৩] দিল্লির এই দুঃসংবাদ আম্বালা থেকে পাঞ্জাবের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই মুহূর্ত থেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমনের জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ৩৮শ বাহিনীর যেসব সিপাহিরা কাশ্মীর দরওয়াজা পাহারা দিচ্ছিল তারা অস্ত্রাগার বিস্ফোরণে ভারতীয়দের নিদারুণ দুর্গতির সংবাদ পাওয়া মাত্র ইংরেজ অফিসারদের ও যে সমস্ত বেসামরিক ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ কাশ্মীর দরওয়াজায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের একধার থেকে নিহত করতে শুরু করল। মেজর এবট্ যেসব সিপাহি নিয়ে কাশ্মীর দরওয়াজা রক্ষা করতে এসেছিলেন তাদের তিনি যখন বিদ্রোহীদের ওপর গুলী ছুঁড়তে আদেশ দিলেন, তখন তারা তা অমান্য করে জোর করে তাঁকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে—"আমরা আপনাকে এতক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করেছি, কিন্তু আর তা সম্ভব হবে না। এইবার আপনি পালান।"

এইভাবে সন্ধ্যার পূর্বেই সমগ্র দিল্লি শহর থেকে ইংরেজ শাসন একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট তখনো বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়নি; ওখানকার সিপাহিরা তখনো বিদ্রোহে যোগদান করবে কি করবে না, সে বিষয়ে মনস্থির করে উঠতে পারেনি। দিল্লি শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দুশো মাইল দূরে এই ক্যান্টনমেন্ট। আরাবল্লি পর্বতমালার দুটি ছোট শাখা, জুজুলা পাহাড় ও মেজুলা পাহাড়, উত্তর দিকে যমুনা নদী পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই পাহাড় (Ridge) ও যমুনার মধ্যস্থলে দিল্লি অবস্থিত, আর ক্যান্টনমেন্ট ছিল পাহাড়ের পিছন দিকে।

শহর হস্তচ্যুত হয়ে যাবার পর ক্যান্টনমেন্টের কমাণ্ডান্ট ব্রিগেডিয়ার গ্রেভ্‌স সন্ধ্যার আগে দ্বিধাগ্রস্ত সিপাহিদের একত্রিত করবার জন্যে লাইনে দাঁড়াবার হুকুম করলেন। এই হুকুমে সিপাহিরা কোনো কর্ণপাতই করল না। তারা স্পষ্টই

১২. Martin : *Indian Empire*, vol. III, p. 172
১৩. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p. 17

বলে দিল যে, সমস্ত ইংরেজদের তৎক্ষণাৎ ক্যাণ্টনমেণ্ট ছেড়ে চলে যেতে হবে ; তারা আর ইংরেজদের গোলামি করবে না।

যেসব ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা তাদের জীবন বাঁচাতে পেরেছিল তারা সব পালিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টে এসে জড়ো হয়েছিল এবং সর্বক্ষণ মিরাটের দিকে তাকিয়ে ছিল এই আশা করে যে, সেখান থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্যে যে-কোনো মুহূর্তে ইংরেজ সৈন্যদল এসে উপস্থিত হবে। তারা সকলেই নিদারুণ ভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে কেবল হতাশা ও বিশৃংখলা। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যেভাবে পারল ক্যাণ্টনমেণ্ট ত্যাগ করে মিরাটের দিকে ছুটতে লাগল।

মিরাট ও দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গ্রামগুলিতেও বিদ্রোহ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব বিদ্রোহী গ্রামগুলির মধ্য দিয়েই ইংরেজদের পালাতে হচ্ছিল। অদৃষ্টের পরিহাসে ইংরেজ যাদের কালা-আদমি বলে ঘৃণা করত, মুখে ও শরীরে কালি মেখে কালা-আদমি সেজে, তাদেরই পোশাক পরে—কেউবা ফকিরের বেশে, কেউবা সন্ন্যাসীর পোশাক পরে, কবিরের দু'একটি লাইন গাইতে গাইতে কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছিল। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরকম করুণ ও হাস্যকর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অনেকে জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় ও গরমে প্রাণ হারাল। সাধারণত স্ত্রীলোক ও শিশুদের কেউ কোনো অনিষ্ট করেনি ; বরং কয়েকজন গ্রামবাসী পুরুষের সাহায্যে তারা মিরাটে পৌছতে পেরেছিল।

১১ই মে দিল্লি অধিকার করে বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করে দিল্লি ও মুক্ত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা ও সিপাহি বাহিনী পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে বিদ্রোহী নেতারা তৎপর হয়ে উঠলেন। এ বিষয়ে তাঁরা খুবই সচেতন ছিলেন যে, বাহাদুর শাহকে মোগল সিংহাসনে বসাবার অর্থ প্রাচীন মোগল শাসনের ও পুরনো আদব-কায়দা ও রীতি-নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়। প্রাচীন মধ্যযুগীয় মোগল-শক্তি প্রথমত মহারাষ্ট্রীয়দের হাতে ও পরে ইংরেজদের হাতে শেষ হয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীরা সচেতনভাবেই বাহাদুর শাহকে ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবেই সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল ; তাঁর হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা তুলে দেয়নি। ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তাদের রাষ্ট্রনায়ককে তারা বাছাই করে নিয়েছে। ১১ই মে তারিখে যে ঘোষণা-পত্র তারা প্রচার করল তাতে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের কথা থাকলেও, তার প্রধান বক্তব্য হলো হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সংগ্রামী ঐক্য ও বিদেশী শত্রুর

বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।[১৪] এই ঘোষণাপত্রের প্রচারের কয়েকদিন পরেই সিপাহিরা কিভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে একটা Court of Administration স্থাপন করেছিল তা অন্যত্র আলোচিত হবে।

---

১৪. ঘোষণাপত্রটি হলো এই : "To all Hindus and Mussalmans, citizens and servants of Hindustan, the officers of the Army now at Delhi and Meerut send greeting. It is well known that in these days all the English have entertained these evil designs first to destroy the religion of the whole Hindustani Army and then to make the people by compulsion christians. Therefore, we, solely on account of our religion, have combined with the people, and have not spared alive one infidel, and have re-established the Delhi dynasty on these terms. Hundreds of guns and a large amount of treasure have fallen into our hands; therefore, it is fitting that whoever of the soldiers and people dislike turning christians should unite with one heart, and, acting courageously, not leave the seed of these infidels remaining. It is further necessary that all Hindus and Mussalmans unite in this struggle, and following the instructions of some respectable people, keep themselves secure so that good order may be maintained, the poorer classes kept contented, and they themselves be exalted to rank and dignity." ড° মজুমদার তাঁর বইতে এই ঘোষণাপত্রটি উদ্ধৃত করে সিপাহিদের পিঠ চাপড়িয়ে বলেছেন : "a section of the military had a wider vision and rose above mere considerations of personal gains...The idea behind the proclamation was quite good."

বাহাদুর শাহ

দিল্লি শহর ও ক্যান্টনমেণ্ট ইংরেজদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে সিপাহিরা ১১ই মে সন্ধ্যার পর লালকেল্লায় সমবেত হয়ে সর্ব সম্মতিক্রমে মোগল সম্রাটদের শেষ বংশধর অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করল। বাহাদুর শাহ যখন মোগল সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর নাম ছিল আবুল মুজফ্‌ফর সুরাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ বাদশাহ-ই গাজি। সিংহাসনে বসবার পূর্বে তিনি 'আবু জাফর' বলেই পরিচিত ছিলেন এবং এই নামেই তিনি কবিতা রচনা করতেন।

বাহাদুর শাহ তৈমুরলঙ্গের দ্বাদশতম উত্তরাধিকারী এবং চেঙ্গিস্ খানেরও বংশধর। তিনি ছিলেন আকবর শাহ ও তাঁর রাজপুত পত্নী লালবাঈ-এর পুত্র। জীবনের প্রথম থেকেই সুফীবাদের প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল এবং হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি আকর্ষণ তিনি মাতার নিকট থেকে পেয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের মতোই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর প্রাসাদেই হিন্দু কর্মচারিরা রাখীবন্ধন, হোলি, দেওয়ালি উৎসবগুলি পালন করত এবং তাতে তিনি নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন ও হিন্দু কর্মচারিদের বখশিস দিতেন। একজন হিন্দু—লালা মুকুন্দলাল ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। কোনো হিন্দু কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করলে, তিনি মুসলমানকে সাবধান করে দিতেন ও বলতেন: "তোমরা মুসলমানরা যেমন আমার একটা চোখ, তেমনি হিন্দুরাও আমার দ্বিতীয় চোখ"[১]

১. Mahdi Hussain-এর Bahadur Shah II, Delhi 1958 বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। আরো দ্রষ্টব্য, আধুনিক সুফী পণ্ডিত খাজা হাসান নিজামির (১৮৭৮-১৯৫৫)—যাঁর পিতা দিল্লি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন—'খদর-ই-দেহ্লিকে আফসানে' (১৯১৯)। C. F. Andrews তাঁর *Life of Zakau-llah*-তে লিখেছেন (p. 13): **Bahadur Shah was highly respected by the inhabitants of the royal city, Delhi…he was dearly loved by Hindus and Moslems alike…During the reign of Bahadur Shah there was a noticeable amalgamation of customs and usages among the Hindus and Mussalmans…It was evidently a feature of the city of which the inhabitants themselves were**

বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন স্বভাবকবি। কবি হিসাবে গালিবের পরেই তাঁর স্থান ছিল। তাঁর সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, "তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যানুরাগী ও শান্তিপ্রিয় চিন্তাশীল ব্যক্তি। যদিও তিনি বাবর ও আকবরের কতকগুলি দক্ষতায় গুণান্বিত ছিলেন, তবুও তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মতো কর্মঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন না।"[২] ইংরেজের হাতে বাহাদুর শাহকে একরকম বন্দী অবস্থাতেই কাটাতে হয়েছিল, কাজেই কর্মক্ষমতা দেখাবার সুযোগও তাঁর খুব কমই ছিল।

মারাঠা ও রোহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধের পর ইংরেজ সৈন্য জেনারেল লেক-এর অধীনে দিল্লি শহরে ১৮০৩ সনে প্রবেশ করে। আওরঙ্গজেবের পৌত্র শাহ আলম তখন দিল্লির মোগল বাদশাহ। অথর্ব, দুর্বল ও অক্ষম শাহ আলম ইংরেজের এক সন্ধিপত্রে সই করে মোগল সম্রাটদের যেটুকু স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল তাও লুপ্ত করে দিলেন। বছরে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা তাঁর ভাতা ধার্য করা হলো। ১৮০৬ সনে শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর শাহ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন।

১৮৩৭ সনে বাহাদুর শাহ তাঁর ৬৪ বছর বয়সে যখন সিংহাসনে বসলেন তখন মোগল সাম্রাজ্য অনেকদিন হলো লুপ্ত হয়েছে। তাঁর সিংহাসন নামে মাত্র; আর মোগল রাজত্ব তখন কেবল একটা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ অসহায়

---

proud···It was quite common in those days for the two communities to join together in different religious festivals ···This has become a natural local custom···The art of living peacefully with neighbours of a different religion had reached a very high level···The Emperor Bahadur Shah was more punctilious in these matters right upto the end of his life." মূল কথা হচ্ছে, শুধু বাংলাদেশেই নয়, দিল্লি ও আরো অনেক স্থানে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে একটা নবজাগরণ শুরু হয়েছিল এবং দিল্লিতে তা শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জনসাধারণের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২. Forrest: *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 24. P. Spear তাঁর *Twilight of the Moghuls*-এ বলেছেন: "Bahadur Shah was a man of cultured and upright character. In the palace diary of later years there are glimpses of him spending whole days reading and writing, studying and composing verses in the Roshan Ara Garden···as a philosopher prince he would have adorned any court···Delhi in his time was a Weimar with Ghalib for its Goethe." (p. 72)

অবস্থায় বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম বিদেশীদের দাসখতে সই দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনো কিন্তু ইংরেজরা মোগল সিংহাসন অধিকার করতে সাহস করেনি। তখনকার গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মোগল সিংহাসন অধিকার করার বিপজ্জনক পথে না গিয়ে, একটা 'মস্তবড় খেলা' ('a great game') শুরু করলেন—অর্থাৎ মোগল বাদশাহ নামটা থাকবে, কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষমতাই থাকবে না; বাদশাহ থাকবেন জাঁকজমকশালী একটা দৃশ্যরূপে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি থাকবেন ইংরেজের বন্দী ও পুতুলমাত্র হয়ে। বাদশাহ থাকবেন, কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষমতা থাকবে না, রাজা অথচ রাজা নন—একাধারে বাস্তব অথচ ছল—এই ছিল ইংরেজ সরকারের 'মস্তবড় খেলা'। ইংরেজ সাম্রাজ্য তখনো ভারতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে মোগল সিংহাসন সরাসরিভাবে দখল করার শক্তি ইংরেজের তখনো হয়নি। এই খেলার চাতুরীতে মুসলমান নবাব ও অভিজাতরা খুব খুশিই থাকবে, আর জনসাধারণের কাছেও ইংরেজ শাসন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে।

যদিও মোগল বাদশাহ এইভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে রইলেন, তথাপি ভারতের জনসাধারণের নিকট তাঁর সম্মান কিন্তু অক্ষুণ্ণই রইল এবং তারা তাঁকে শক্তির স্তম্ভ বলেই মনে করত। এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ কেই বলেছেন যে, "বাদশাহ শুধু একটা নাম মাত্রে পর্যবসিত হলেও কেবলমাত্র এই নামটাই ভারতীয় রাজাদের ও জনসাধারণের নিকট একটা জীবন্ত ক্ষমতাশালী শক্তি হিসাবে বেঁচে ছিল। দিল্লির বাদশাহী কেবলমাত্র কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল বটে, তবু সকলের নিকট এই কিংবদন্তি একটা গৌরবের বিষয় ছিল, ভারতবাসীর হৃদয়ে এটি গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল।"[৩]

বহুদিন পূর্বেই লর্ড ওয়েলেসলি বুঝতে পেরেছিলেন, যে, বাদশাহ কেবলমাত্র একটা ছায়াতে পরিণত হলেও এবং ছিন্নবস্ত্র পরে থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শাহজাহান নির্মিত দিল্লির প্রাসাদে বাস করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নামটাকে, এই কিংবদন্তিকে, এই ছায়াকে অবলম্বন করেই ভারতবাসীর মধ্যে তাদের অতীত গৌরব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

উনিশ শতকের মধ্যবর্তীকালে ভারতবাসী মোগল পরিবারকে কিভাবে দেখত সে সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন: "যদিও এখন মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল, মোগলের বিজয় পতাকা যদিও এখন ভারতের অনেক স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তথাপি মোগলের ক্ষমতা ও গৌরবের নিকট সকলেই মস্তক অবনত করিতেছিল। এই ক্ষমতা ও গৌরবের কাহিনী এখন জনশ্রুতিতে পরিণত হইলেও, উহা সাধারণের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল যে,

৩. Kaye : *History of Sepoy War in India*, vol. I, p. 2

কেহই সেই জনশ্রুতির অবমাননা করিতে সাহসী হয় নাই। ভারতে বৃটিশ কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, কিছুকাল দিল্লীর মোগল ভূপতির নামে টাকা প্রস্তুত হইয়াছিল।...হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমভাবে একসময়ে মোগলের সরকারে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, উভয়েই সমভাবে মোগলের সৈন্য চালনা করিতেন, রাজনৈতিক বিষয়ে মোগলকে সৎ-পরামর্শ দিতেন এবং মোগলের অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও সৎকার্য্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেন। এখন তাঁহাদের সন্তানগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের সেই ক্ষমতা, সেই প্রাধান্য, সেই প্রভুত্ব বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদের রাজনীতির গুণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মোগলের রাজ্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে গৌরবে সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, ইংরেজের অধিকারে তাঁহাদের সে গৌরব চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহারা ইংরেজ-রাজ অপেক্ষা বর্ত্তমান মোগল অধিপতিকেই অধিকতর শ্রদ্ধা ও অধিকতর সম্মানের সহিত চাহিয়া দেখিতেন।...কবি যেমন উহা (দিল্লী) আপনার কবিত্ব শক্তির উদ্দীপক ভাবিতেন, শিল্পী যেমন উহা আপনার শিল্প চাতুরীর বিকাশক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন, ঐতিহাসিক যেমন উহা আত্মগরিমার পরিচয় স্থল ভাবিতেন, ভারতের হিন্দু-মুসলমানগণও তেমনি উহা আত্মসম্মান ও আত্মগৌরবের নিদর্শনভূমি বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।”[৪]

মোগলরা রাজ্যচ্যুত হলেও, তাঁদের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ভারতের রাজারা তাঁদের সম্রাট বলে সম্মান করতেন ও তাঁদের নিকট থেকে সনন্দ গ্রহণ করতেন। নূতন কোনো গভর্নর-জেনারেল ভারতে পদার্পণ করলে মোগল সম্রাট এই সার্বভৌমত্বের পরিচয়সূচক খেলাত তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। যে ইংরেজ সরকার মোগল বাদশাহকে নিজেদের বৃত্তিভোগী করেছিলেন, সেই ইংরেজ সরকারেরই প্রতিনিধি দিল্লির রেসিডেন্টও যখন বাদ-শাহের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তিনিও জুতো পরে তাঁর সামনে যেতে সাহস করতেন না, কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলতে পারতেন না ; তাঁকেও নগ্নপদে দূর থেকে অভিবাদন করতে করতে বাদশাহের নিকট এসে দাঁড়াতে হতো। ১৮২৭ সন পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি তাঁর অনুজ্ঞা ও তাঁর স্বাক্ষরিত ফরমান ব্যতীত কোনো নতুন প্রদেশ দখল করতে পারত না। এই সময় পর্যন্ত ভারতের মুদ্রাও মোগল সম্রাটের নামেই বের হতো।[৫] কোম্পানির কর্মচারিদের সম্রাটকে,

৪. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২য় ভাগ ; পৃ. ১৪২-৪৩
৫. Russel : *My Diary in India*, vol. II, pp. 63-65
Martin : *Indian Empire*, vol. II, pp. 457-59
Ball ; *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 454

সম্রাট-পত্নীকে ও সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে নজরানা দিতে হতো। ১৮২২ সনে কোম্পানির প্রধান সেনাপতি এই নজরানা দেওয়া বন্ধ করলেন। দিল্লির রেসিডেন্ট কোম্পানির প্রতিনিধি স্বরূপ যে নজরানা দিতেন তাও ১৮২৭ সনে বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবে ১৮৩৬ সনে সব ইংরেজ কর্মচারিই নজরানা দেওয়া বন্ধ করল। ক্রমশ সম্রাটের দিল্লির বাইরে যাবার অধিকারও লুপ্ত হলো। শাহজাদারাও রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে অন্যস্থানে যেতে পারতেন না। তাঁদের জন্যে সম্মান-সূচক তোপধ্বনিও বন্ধ হয়ে গেল। এবং সর্বশেষে ১৮৩৫ সনে দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা তুলে দিয়ে তাব স্থানে কোম্পানির মুদ্রা চালু করা হলো। এইভাবে সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবরের বংশধররা তাঁদের রাজকীয় প্রভুত্ব ও সর্ব প্রকারের সম্মান চিহ্ন হতে বঞ্চিত হয়ে ইংরেজের বন্দীরূপে দিল্লিব প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন এবং তাঁদের প্রতি ইংবেজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবমাননা ও লাঞ্ছনা দিনের পর দিন বেড়েই যেতে লাগল।

১৮৩৭ সনে ২৮শে সেপ্টেম্বব বাহাদুর শাহ মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর বার্ষিক বৃত্তি বাড়িয়ে দেবার জন্যে কোম্পানির ডিরেক্টরদের অনুরোধ করলেন। এরকম চেষ্টা এব পূর্বেও অনেকবার হয়েছিল। ১৮৩০ সনে বাহাদুর শাহের পিতা আকবব শাহ, বামমোহন রায়কে দূত কবে ও তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে[৬] এই বিষযে তদ্বিব করার জন্যে ইংল্যাণ্ড পাঠিয়েছিলেন। এই তদ্বিরের ফলে কোম্পানিব ডিরেক্টরবা এই প্রস্তাব কবেন যে, যদি বাদশাহ তাঁর সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা ও অধিকারগুলি পবিত্যাগ করতে সম্মত হন, তাহলে তাঁবা তাঁর বার্ষিক বৃত্তি ৩ লক্ষ টাকা বাড়িযে দিতে প্রস্তুত আছেন। বার্ষিক এই ৩ লক্ষ টাকাব জন্যে আকবর শাহ নিজ পরিবারেব অবশিষ্ট সম্মান ও গৌরব টুকুকে বিসর্জন দিতে রাজী হননি। এই সময়েই ডিরেক্টবরা স্বীকার কবেছিলেন যে, বাদশাহকে যে পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া হয় তা অতি সামান্য এবং তা দিল্লির বিস্তৃত রাজবংশের ভরণ-পোষণের জন্যে যথেষ্ট নয়।[৭] একথাও মনে রাখতে হবে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাতে মোগল পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে যথোপযুক্ত বৃত্তি দিতে কোম্পানি ধর্মত ও ন্যায়ত বাধ্য ছিল।

বাহাদুর শাহের অনুরোধেও কোম্পানি একই উত্তর দিল: "এই প্রস্তাব (অর্থাৎ মোগল বাদশাহ আপনার অবশিষ্ট ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে রাজী হলে,

---

৬. ইংরেজ সরকার মোগল প্রদত্ত রামমোহনের এই 'রাজা' উপাধি কোনোদিনই স্বীকার করেনি। কিন্তু রামমোহন স্বদেশের সম্রাটের প্রদত্ত এই উপাধিকে সর্বোচ্চ সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন, এবং গর্বের সঙ্গে 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করতেন।

৭. Martin ; *Indian Empire*, vol. II, p. 459

তাঁর বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে) পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মোগল ভূপতি এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা তাঁর উপকারের জন্যে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তা গ্রহণ করা তাঁর অভিপ্রায় নয়।"[৮] রজনীকান্ত গুপ্ত এই সম্বন্ধে ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে "ইহা উপকার নহে, ঘোর অকৃতজ্ঞতা; দয়া নহে, ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা। বণিক কোম্পানী বণিকের বেশে আসিয়া যাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন, যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অনুগ্রহে ভারতে বৃটিশ কোম্পানীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার অসীম দুর্গতির সময় কোম্পানী তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়ার লোভ দেখাইয়া তাঁহার হস্তে যে কিছু ক্ষমতা ছিল, সমস্তই গ্রহণ করিতে উদ্যত হন এবং এইরূপ টাকা দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের পরোপকারের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেন।"[৯]

মোগল বংশের শোচনীয় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এরকম হীন প্রচেষ্টার আশ্রয় নেবে তা তাদের পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। বলা বাহুল্য যে, বাহাদুর শাহ ঘৃণা ভরে এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে তেজস্বিতার ও আত্মসম্মান বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইংরেজের সঙ্গে বাহাদুর শাহের সংঘর্ষের আর একটি প্রধান কারণ ছিল। তা হচ্ছে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে। ১৮৪৯ সনে জ্যেষ্ঠ শাহজাদা দারা বখ্‌তের মৃত্যু হয়। তখন ইংরেজ সরকার স্থির করে যে, শাহজাদা ফকিরউদ্দিনকে তারা মোগল সিংহাসনে উত্তরাধিকারী করবে। তার কারণ সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, "এই রাজকুমার ইংরেজদিগের প্রিয় ছিলেন, ইংরেজ সমাজে যাইতেও তিনি ভালবাসিতেন। সুতরাং ইহাকে রাজসিংহাসন দিলে লর্ড ডালহাউসির বাসনা অনেকাংশে পূর্ণ হইত। ডালহাউসি এই ইংরেজ-প্রিয় যুবককে অনায়াসে হস্তগত করিয়া, তাঁহার প্রভুশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইতেন।[১০]

বাহাদুর শাহের সর্বকনিষ্ঠ বেগম ছিলেন জিন্নৎ মহল। তাঁর কর্মদক্ষতা, তেজস্বিতা ও সৌন্দর্যের সকলেই প্রশংসা করতেন। বেগমদের মধ্যে জিন্নৎ মহলই ছিলেন বাহাদুর শাহের সব থেকে প্রিয়পাত্রী। জিন্নৎ মহলের গর্ভে জোয়ান বখ্‌ত নামে বাহাদুর শাহের যে পুত্রসন্তান হয় তাঁকেই বাদশাহ দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করবেন স্থির করেন। ইংরেজ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

---

৮. Kaye: *History of the Sepoy War in India*, vol. II, p. 12

৯. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২য়, পৃ. ১৫৬

১০. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২য়, পৃ. ১৫৯

করায় স্বভাবতই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহের তিক্ততা আরো বেড়ে গেল।

এই প্রশ্ন ডিরেক্টরদের মধ্যে ও গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে সর্বত্র আলোচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে, ফকিরউদ্দিনকেই উত্তরাধিকারী করা হবে। ডালহাউসি দিল্লির এজেন্ট স্যার টমাস মেটকাফকে ফকিরউদ্দিনের সঙ্গে গোপনে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলতে আদেশ করলেন। মেটকাফের সমস্ত শর্তেই ইংরেজ ভক্ত ফকিরউদ্দিন রাজী হলেন এবং দিল্লির প্রাসাদ পরিত্যাগ করে কুতুবে চলে যেতেও তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই জানালেন। এই অনুসারে একটি অঙ্গীকার পত্রে ফকিরউদ্দিন অনায়াসে স্বাক্ষর করে দিলেন। এই চক্রান্ত অতিশয় গোপনে সম্পন্ন হলেও রাজপ্রাসাদে তা জানাজানি হতে মোটেই বিলম্ব হলো না। কিন্তু ১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে ফকিরউদ্দিন হঠাৎ মারা গেলেন। অনেকে মনে করেন বিষ প্রয়োগের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

যাই হোক, নানা কারণে ইংরেজ সরকার মোগল পরিবারকে দিল্লির প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠল। প্রথমত. ভারতবাসীরা তাদের অতীত গৌরব ও স্বাধীনতার প্রতীক দিল্লির প্রাসাদে অধিষ্ঠিত মোগল বাদশাহকে সামনে রেখে তাদের দেশকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবার জন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে—সেই বিপজ্জনক সম্ভাবনা যে সব সময়েই বিদ্যমান, সে বিষয়ে ইংরেজ শাসকরা খুবই সচেতন ছিল। দ্বিতীয়ত, দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট মোগল বাদশাহকে কেন্দ্র করে অবস্থা বিশেষে যে একটা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষেরও সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্ভাবনার প্রতিও ইংরেজের সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। বিপ্লবী ফরাসি দেশ ও নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ইংল্যাণ্ডের যেরকম ঘোরতর শত্রু ছিল, পরবর্তীকালে রুশিয়ার জার-সাম্রাজ্যও সেই স্থান অধিকার করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে দিল্লির বাদশাহও যে ইংরেজের বিরুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়তে পারেন, সে আশংকাও ইংরেজ-শাসক-বর্গের মনে অনেক সময়েই স্থান পেয়েছিল। এইসব কারণেই মোগলদের এই অবশিষ্ট ছায়াটুকুকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিল। সর্বপ্রথম লর্ড ওয়েলেসলি শাহ আলমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে মুঙ্গেরের প্রাসাদে বাস করতে রাজী হন, তাহলে তাঁর বার্ষিক বৃত্তি বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্বল শাহ আলমের মতো লোকও ইংরেজের এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে রাজী হননি।

ডালহাউসি যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন ভারতে ইংরেজ শাসন ১৮০৫ সনের তুলনায় অনেক বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই অবস্থায় দিল্লির মোগল প্রাসাদ অধিকার করতে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? ১৮৪৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারিতে ডালহাউসি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: “ভারতের

মোগল অধিপতিগণ পূর্বে যাই থাকুন না কেন, এখন তাঁদের রাজকীয় সম্মান অন্তর্হিত হয়েছে। এখন ব্রিটিশ সরকার ভারতের অদ্বিতীয় প্রভু হয়ে উঠেছে। বর্তমান মোগলদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রভুশক্তির মহিমায় আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, এখন আমরা সেই প্রভুশক্তির অধিকারী হয়েছি। সুতরাং এখন দিল্লির নামমাত্র সম্রাটকে আমাদের প্রতিযোগী করে তোলা কোনোমতেই উচিত নয়।"[১১] তাই, ডালহাউসি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানালেন, মোগল বংশধরকে 'ভূপতি' উপাধি থেকে বঞ্চিত করতে হবে ও মোগল পরিবারকে সত্বর দিল্লির প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করতে হবে এই কারণে যে, দিল্লির প্রাসাদের 'রাজনৈতিক ও সামরিক' গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং সেইজন্যে এই প্রাসাদ ইংরেজের হস্তগত হওয়া এই মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ডালহাউসি অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, দিল্লির প্রাসাদের দিকে আর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারলেন না। তারপর লর্ড ক্যানিংও ভারতে পদার্পণ করেই ডিরেক্টরদের ঐ একই দাবি জানালেন: সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় দিল্লির প্রাসাদ আমাদের হস্তগত হওয়া একান্ত জরুরি প্রয়োজন। অনেক আলোচনার পর ডিরেক্টররা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর আর বিশেষ বিলম্ব নেই; তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়; বাহাদুর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার মোগল প্রাসাদ দখল করবে ও তাঁর পুত্র মহম্মদ খোরাসকে 'ভূপতি'র বদলে 'শাহজাদা' উপাধি দিয়ে কুতুবে স্থানান্তরিত করবে; এবং এ সম্বন্ধে বাহাদুর শাহ কিংবা তাঁর উত্তরাধিকারীর সঙ্গে কোনো রকম আলাপ-আলোচনা হবে না, মহম্মদ খোরাসকে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সরকারের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেই হবে।[১২] বলা বাহুল্য, ইংরেজ সরকার শাহ আলমের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করল।

এই সম্বন্ধে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং মোগল পরিবার অতি দুর্বল অবস্থায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও, ইংরেজ শাসকবর্গ বাহাদুর শাহকে জীবিত অবস্থায় মোগল প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করতে শেষ পর্যন্ত ভরসা পায়নি। কারণ, একথা তারা ভালোভাবেই জানত যে, তখনকার ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের অভাবে অতীত ও ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করেই অবস্থা বিশেষে ভারতের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠে

১১. Kaye: *History of Sepoy War in India*, vol. I, p. 16
১২. *Ibid*, p. 30

সংগ্রামশীল আকার ধারণ করতে পারে। এই বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতাকে ভারতীয় বিজ্ঞব্যক্তিরা উপেক্ষা করলেও, ইংরেজ শাসকরা এই বিষয়ে সব সময়েই শঙ্কান্বিত ছিল।

বার্ষিক বৃত্তি বাড়ানোর প্রশ্ন, মোগল বাদশাহের প্রভুশক্তি খর্ব করার বিষয়, উত্তরাধিকারী নির্বাচন, মোগল পরিবারকে দিল্লির প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করার হীন প্রচেষ্টা—এইসব প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে বাহাদুর শাহের সঙ্গে ইংরেজের যে সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, তা শুধুমাত্র বাহাদুর শাহের একটা ব্যক্তিগত স্বার্থেরই ঝগড়া ছিল না। কিংবা মোগল বাদশাহের এই বিরোধকে মৃত মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষকে জীবিত রাখবার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে প্রগতিশীলতার নামে নাসিকা কুঞ্চন করে উড়িয়ে দিলেও চলবে না। সামন্ততান্ত্রিক মোগল বাদশাহের এই বিরোধ ভারতীয় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কোনো শক্তির বিরুদ্ধে ঘটেনি। তাঁর বিরোধ ঘটেছিল পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে—যেমন ঘটেছিল পরবর্তীকালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফগান আমির আমানুল্লা খানের এবং মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলি সেলাসির। এই বিরোধের ফলে যখন বাহাদুর শাহ (এবং ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হজরত মহল প্রভৃতিও) জনসাধারণের পাশে এসে বিদ্রোহের পতাকা উঁচু করে তুলে ধরলেন, তখন তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজস্ব দাবিগুলি বৃহত্তর জাতীয় দাবির সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল।

বাহাদুর শাহের সঙ্গে ইংরেজের এই বিরোধ ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সনের প্রথম দিকে তীব্র হয়ে উঠল। এই কারণে বাহাদুর শাহ ও বেগম জিন্নৎ মহলের ইংরেজের প্রতি তিক্ততা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছিল।[১৩] এইরকম তিক্ত

১৩. "...the position of the king was one of the most intolerable misery long ere the revolt broke out. His palace was in reality a house of bondage ; he knew that the few wretched prerogatives which were left to him, as if in mockery of the departed power they represented, would be taken away from his successors ; that they would be deprived of even the right to live in their own palace, and would be exiled to some place outside the walls. We denied permission to his royal relatives to enter out service ; we condemned them to a degrading existence, in poverty and debt, inside the purlius of their palace, and then we reproached them with their latiness, meanness and sensuality...Better die a hundred deaths than drag on such

মনোভাব নিয়ে বাহাদুর শাহ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো কোনো বিদেশী শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন ও বিক্ষুব্ধ সিপাহি প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবেন তা খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সঠিক কোনো তথ্য এখনো আবিষ্কার হয়নি।[১৪]

বাহাদুর শাহের বিচারের সময় তাঁর সেক্রেটারি মুকুন্দলাল বলেন যে, "বিদ্রোহ শুরু হবার দু'বছর পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শাহ খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। ...বাহাদুর শাহের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মেহবুব আলি এই সময় টাকা দিয়ে সিদ্দি কুম্বার নামক একজন আবিসিনীয়কে পারস্যে দৌত্যকার্য্যে পাঠিয়েছিলেন। দিল্লি ও ও মিরাট বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে বাহাদুর শাহের নিজস্ব কামরায় সিপাহি বাহিনীর মধ্যে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছিল তাই হয়ে উঠেছিল সব সময়ের আলোচ্য বিষয়। প্রাসাদের বাইরেও বাদশাহ পরিবারের লোকেরা এ বিষয়ে খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করতেন।"[১৫]

ঠিক এই সময়েই জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ দিল্লি, লখনৌ ও উত্তর-ভারতের সর্বস্থানে নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। অন্যান্য স্থানের মতো দিল্লির ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে ইংরেজ বিরোধী সত্য-মিথ্যা নানা প্রকারের সংবাদ প্রচার শুরু হলো। সাধারণত এই প্রচারকার্যের মূলসূত্র ছিল এই যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের একশত বৎসর শেষ হতে চলেছে ও তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে ; সারা ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে ; পারস্যের শাহ, তুর্কির অটোমান সম্রাট, রুশিয়ার জার, আফগান আমির দোস্ত মহম্মদ—সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, ইত্যাদি গুজবগুলি সংবাদপত্র মারফত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কেই এর তাৎপর্য বুঝতে পেরে ঠিকই বলেছেন যে, এইসব গুজবের মূলে কোনো সত্য থাকুক বা নাই থাকুক, এসব কথাগুলি যে লোকে বিশ্বাস করে আশান্বিত ও আনন্দিত হয়ে বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সেটাই হচ্ছে অর্থপূর্ণ।

এইসব ঘটনা থেকে পুনরায় এই কথাটাই ভালোভাবে প্রমাণ হয় যে, ১৮৫৭-এর অভ্যুত্থান কেবলমাত্র সিপাহিদের বিদ্রোহের ফলেই ঘটেনি ; মে মাসে মিরাট বিদ্রোহের অনেক পূর্বেই ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। তাই ১১ই মে তারিখে যখন বিদ্রোহী সিপাহিরা মিরাট

a contemptible, degrading existence". (W. H. Russel : *My Indian Mutiny Diary*, Michael Edwardes, 1967 p. 165)

১৪. কেই-র মতে, বাহাদুর শাহ যে রুশ দেশেও দূত পাঠিয়েছিলেন তা সন্দেহ করার কারণ আছে। (*Ibid*, vol. II, p. 40)

১৫. Martin : *Indian Empire*, vol, III, p. 169

থেকে দিল্লি এসে পৌছল, সঙ্গে সঙ্গে তারা দিল্লির জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা তো পেলই, বাহাদুর শাহকেও দলে টানতে তাদের বিশেষ কোনো বেগ পেতে হলো না। বাহাদুর শাহের বিচারের সময় তাঁর কয়েকজন শুভাকাংক্ষী তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তাঁদের সাক্ষ্যে বলেছিলেন: বাহাদুর শাহ স্বেচ্ছায় বিদ্রোহে যোগ দেননি, সিপাহিদের বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনের ফলেই তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি বিদ্রোহের সময় ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন, সিপাহিরা জোর করে তাঁকে দিয়ে সবকিছু করিয়ে নিত ইত্যাদি। এসব কথাই সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং আদালতও এইসব উক্তির কোনো মূল্য দেয়নি। আদালতের নিকট যেসব নথিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণ ছিল, তাতে বাহাদুর শাহের 'অপরাধ' সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। বস্তুত, বাহাদুর শাহ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বদেশানুরক্তির বশেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করা বিদ্রোহীদের পক্ষে খুবই ভুল হয়েছিল, কারণ তাঁদের মতে, এর ফলে শিখ, রাজপুত ও মারাঠাদের মতো যারা মোগলের চিরকালের শত্রু (?) তাদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হলো।[১৬] এই মতবাদও একেবারেই যুক্তিসংগত নয়। বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার প্রকৃত তাৎপর্য অন্তত একজন ইতিহাসজ্ঞ বুঝতে পেরেছেন। জাস্টিন ম্যাকার্থী বলেছেন যে, বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার ফলে, "বিদ্রোহীরা এক মুহূর্তের মধ্যে একজন নেতা, একটি পতাকা এবং একটি আদর্শ পেল, এবং তার ফলে যা ছিল কেবলমাত্র সিপাহিদের একটা সামরিক বিদ্রোহ—এক নিমেষে সেটা একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেল। বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ভুক্ত সব বিদ্রোহীদের নিকট একমাত্র বাহাদুর একটা গ্রহণযোগ্য ও দৃশ্যমান নায়কত্ব দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।...বিদ্রোহীরা অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের একটা অতি সংকটপূর্ণ মুহূর্তকে এইভাবে তাদের আয়ত্তাধীনে আনতে সমর্থ হয়েছিল এবং এইভাবে একটা সামরিক বিদ্রোহকে ধর্মীয় ও জাতীয় যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল।"[১৭]

ভারতের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী ভারতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করা যে সিপাহিদের পক্ষে সব থেকে

১৬. **Forrest : *History of the Indian Mutiny*, vol. III, preface xxv**

১৭. **Justin Mckarthie : *Short History of Our own Times*. 1923 ed, p. 172**

শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক কৌশল হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী মোগল রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, একথা ভাবলে খুবই ভুল করা হবে। বরং বিদ্রোহীরা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (**Constitutional monarchy**) দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সে বিষয়ে প্রমাণের কোনো অভাব নেই।

বাহাদুর শাহ বিদ্রোহে যোগ দেবার দু'এক মাসের মধ্যেই সারা উত্তর-ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সিপাহি বাহিনীগুলি একটার পর একটা বিদ্রোহ করে বাহাদুর শাহের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল, বহুস্থানে জনসাধারণই অগ্রণী হয়ে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাল। নিমেষের মধ্যে ভারতের একটা বিশাল অংশ থেকে বিদেশী শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাহাদুর শাহকে তাদের সর্বাধিনায়ক বলে স্বীকার করে নিল। এমনকি নানা সাহেব পর্যন্ত যেদিন বিদ্রোহ করে পেশোয়াশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে ফতোয়া জারি করলেন, সেদিন তাঁকেও বাহাদুর শাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। সিপাহিরা ভারতের যেখানেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছে, সেখানেই তারা ধ্বনি তুলেছে: 'দিল্লি চলো, দিল্লি চলো'। তারা জানত, তারা বুঝতে পেরেছিল, বিদ্রোহী ভারতের, অবিনশ্বর ভারতের, পূর্বের একতাবদ্ধ স্বাধীন ভারতের কেন্দ্র-স্থল হচ্ছে দিল্লি। তাই তারা বুঝতে পারল—বাহাদুর শাহের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দিল্লিকে রক্ষা করাই হিন্দু-মুসলমান সকল বিদ্রোহীরই প্রধান কর্তব্য।

১৮৫৭ সনের অবস্থায় বাহাদুর শাহের বিদ্রোহে যোগ দেবার বৈপ্লবিক তাৎপর্য,[১৮] আজকালকার নব্যযুগীয় আলোকপ্রাপ্ত কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত না বুঝতে পারলেও, লর্ড ক্যানিং, জন লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ-ভারতের কর্ণধাররা কিন্তু তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী-ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা সম্বন্ধে কেই বলেছেন যে, "এই বৈপ্লবিক ঘটনার প্রচণ্ড রাজনৈতিক তাৎপর্য একজন নির্বোধের পক্ষেও বোঝা কঠিন নয়, এবং

---

১৮. দু'একজন চিন্তাশীল বাঙালি লেখক এদিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্বেই আকর্ষণ করেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগল এ বিষয়ে লিখেছেন: "দিল্লীর বাদশাহের কর্তৃত্ব স্বীকৃতির মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় আদর্শের নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে।"—মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ৭৬

সবথেকে বড় আশাবাদীও তাকে উপেক্ষা করতে পারে না।[১৯] লর্ড ক্যানিং ও জন লরেন্স স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, দিল্লির মোগল প্রাসাদ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাবার জন্যে ও বাহাদুর শাহ কর্তৃক বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করার ফলে বিদ্রোহীদের ইজ্জৎ ও প্রতিপত্তি সারা ভারতের মানুষের কাছে অনেক বেড়ে গেল। বাহাদুর শাহের নামটাই বিদ্রোহীদের পক্ষে ঐক্য ও শক্তির স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল। বস্তুত এই ঘটনা বিদ্রোহীদের সর্ববৃহৎ প্রাথমিক বিজয় ও ইংরেজদের সবথেকে বড় পরাজয়। এরকম বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় এখন থেকে বিদ্রোহী পক্ষের সবথেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল—ভারতব্যাপী এই গণবিদ্রোহকে পরিচালনা করবার জন্যে একটা শক্তিশালী নেতৃত্ব গঠন করা, যার ওপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে তাদের চূড়ান্ত বিজয় অথবা চূড়ান্ত পরাজয়।

১৯. Kaye: *History of Sepoy War in India*, II, p. 1. এই সময় 'এডিনবরো রিভিউ'তে একজন ইংরেজ লিখেছিলেন—"যদি এটাই ঠিক হয় যে, বিদ্রোহীরা তাদের এইসব চাল ও কৌশল পূর্ব থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, তাহলে তাদের এই চালটাই (বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে) সব থেকে ভালো হয়েছিল।"—Ball: *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 68

দিল্লির দুর্গ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দিল্লি সভ্যতা বিস্তারের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এই দিল্লি ইন্দ্রপ্রস্থ নামে মহাভারতের অবিস্মরণীয় গৌরবময় যুগ থেকে রাজপুত শৌর্য ও দেশপ্রেমের এবং মোগলের গৌরব ও সমৃদ্ধির মহান ঐতিহ্য বহন করে আসছে। সুদূর কালের ধারায় এই দিল্লি থেকেই মহাভারতবর্ষকে চিরকাল একীকরণের চেষ্টা হয়েছে। এদিক থেকে দিল্লির ভৌগোলিক কেন্দ্রীয় অবস্থানটিও লক্ষণীয়। দিল্লি কলকাতা থেকে ৯৫০ মাইল, বম্বে থেকে ৯৬০ মাইল, মাদ্রাজ থেকে ১,১০০ মাইল, করাচি থেকে ৯৪০ মাইল, পেশোয়ার থেকে ৬০০ মাইল, শ্রীনগর থেকে ৫০০ মাইল।

হিন্দু, পাঠান ও মোগল রাজবংশের রাজধানী এই দিল্লি শহর তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেকবার স্থান পরিবর্তন করেছে। বর্তমান দিল্লি (নয়াদিল্লি নয়—নয়াদিল্লি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১১ সনে) সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক যমুনা নদীর তীরে ১৬৩১ সনে স্থাপিত হয়। এই বিশাল শহর, তার দুর্গ-প্রাসাদ, জুম্মা মসজিদ, শহরের প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ করতে ১০ বৎসর লেগেছিল এবং ব্যয় হয়েছিল এক কোটি টাকা। টেভারনিয়ের, বারনিয়ের, মানুচি, ফারগুসন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পর্যটকরা,—যাঁরা এই শহর প্রথমাবস্থায় দেখেছিলেন, তাঁরা সকলেই দিল্লির ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

যমুনার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এক মাইল পরিধি বিশিষ্ট শাহজাহানের প্রাসাদ প্রকৃতপক্ষে লাল বালুকা-প্রস্তর দিয়ে নির্মিত একটি বিশাল মজবুত দুর্গ ; এই কারণে এই প্রাসাদ লালকেল্লা নামেও পরিচিত। এই প্রাসাদের পাশেই আর একটি শক্তিশালী দুর্গ—সেলিমগড় অবস্থিত ; যার শক্তিশালী কামানগুলির পাল্লা ছিল যমুনা নদীর উভয়তীরে এক মাইল পর্যন্ত। সাত মাইল পরিধি ব্যাপী একটি সুদৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা শাহজাহান এই শহর ও প্রাসাদ বেষ্টিত করেছিলেন। কোনো স্থানেই এই প্রাচীরের উচ্চতা ২৪ ফিটের কম ছিল না এবং অনেক স্থানে এর উচ্চতা ৬০ ফিট পর্যন্তও ছিল এবং এর বিস্তার ছিল যথেষ্ট। প্রাচীর সংলগ্ন কতকগুলি শক্তিশালী বুরুজও ছিল। এই প্রাচীরে ৭টি সুবৃহৎ গেট ছিল, যার মধ্যে দিল্লি গেট প্রাসাদ থেকে আর কাশ্মীর গেট ক্যান্টনমেন্ট থেকে সবচেয়ে কাছে। প্রাসাদের সম্মুখেই শহরের মধ্যস্থলে দিল্লির বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ অবস্থিত। শাহজাহান এমনভাবেই দিল্লি নির্মাণ করেছিলেন যে, এই শহর সারা ভারতে অন্যতম সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত

হয়েছিল। অনেকের মতে ভরতপুরের দুর্গই ছিল ভারতের সব থেকে শক্তিশালী দুর্গ, আবার কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে এই দিল্লির দুর্গই ছিল ভরতপুরের দুর্গ থেকে অধিকতর শক্তিশালী।[১] বিদ্রোহকালীন ইংরেজরা দলবল নিয়ে যখন দিল্লি অবরোধ শুরু করল, তখন এই বিশাল নগরীর মাত্র উত্তরদিক ও খানিকটা মাত্র উত্তর-পশ্চিম অংশ, অর্থাৎ কাশ্মীর গেট থেকে লাহোর গেট পর্যন্ত অবরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল ; আর বাদবাকি অংশ, অর্থাৎ সাত ভাগের ছয় ভাগ সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের অধীনে ছিল এবং প্রাচীরের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমের গেটগুলি দিয়ে বিদ্রোহীদের স্বাধীনভাবে যাতায়াতের কোনো অসুবিধাই ছিল না।

দিল্লির প্রাচীরের প্রত্যেকটি গেট বুরুজ ও ছোট ছোট দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এ ছাড়া প্রাচীরের বাইরের চারদিক ঘিরে একটি সুপ্রশস্ত ও ২৪ ফিট গভীর পরিখা ছিল। শুধু তাই নয়—প্রাচীরের বহির্ভাগে এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে ছিল একটি গ্লাসিস্ (ঢালু অংশ), যার ফলে কামানের গোলা চালিয়েও প্রাচীরের নিম্নভাগে ছিদ্র করে শহরে ঢোকার পথ তৈরি করে নেওয়া শত্রুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রত্যেকটি বুরুজে ১০টি থেকে ১৪টি পর্যন্ত কামান রাখবার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্রোহের সময়ে এই প্রাচীর দুশো থেকে আড়াইশ' বছরের পুরনো হয়ে গেলেও, তার মূল্য ও তার শক্তি এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি।

দিল্লি শহর ও এই প্রাচীর নির্মাণ করা ব্যতীত শাহজাহান আর একটি মহৎ কাজ করেছিলেন। যমুনা নদী যেখানে পাহাড় থেকে নেমে আসছে, সেখান থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দিল্লির ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের সরবরাহ করবার জন্যে আলি মর্দন খাঁর খাল নামে ১২০ মাইল দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়েছিলেন। এই খাল দিল্লি শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার যমুনায় গিয়ে মিশেছিল। এই খালকেই ১৮২০ সনে পুনরায় খনন করা হয় ও তার নাম রাখা হয় পশ্চিম-যমুনা ক্যানাল।

এইসব দিকগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, দিল্লির রাজনৈতিক গুরুত্ব যতখানি, তার সামরিক গুরুত্বও তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এরকম একটি একাধারে সুসজ্জিত শক্তিশালী দুর্গ ও রাজনৈতিক কেন্দ্র বিদ্রোহীদের হস্তগত হওয়া, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তা ইংরেজ শাসকদের বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি।

১১ই মে তারিখে দিল্লিতে বিদ্রোহের দিনে বিদ্রোহীরা যখন পোস্ট অফিস আক্রমণ করেছিল, তখন একটি কর্মচারি কোনোমতে শেষ মুহূর্তে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে সমর্থ হয়েছিল : "মিরাট থেকে

---

১. Ball : *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 523

বিদ্রোহীরা এসে গিয়েছে। তারা ইংরেজদের হত্যা করছে, শহর লুটপাট করছে। আর সময় নেই, বিদায়।" এই টেলিগ্রাম আবার তৎক্ষণাৎ সিমলা ও লাহোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দু'এক দিনের মধ্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ সম্বন্ধে আরো যেসব খবর পেল তাতে তাদের মনে আর কোনো সংশয় রইল না যে, এ বিদ্রোহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাহিদের বিদ্রোহ নয়, কিংবা শুধুমাত্র একটা স্থানীয় বিদ্রোহও নয়; সে ধরনের বিদ্রোহ তারা পূর্বে কিছু কিছু দেখেছে। এইসব খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উচ্চ পদস্থ ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পারল যে, এটা হচ্ছে বিদেশী শাসনকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্যে একটা জাতীয় বিদ্রোহ। সুতরাং তাদের সম্মুখে এখন প্রধান সমস্যা হলো—কিভাবে বিদ্রোহের এই প্রচেষ্টাকে দাবিয়ে দিয়ে পুনরায় ভারতবর্ষকে জয় করা যায়। কিন্তু এবার ভারতকে পুনরায় জয় করতে হলে, তাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন দিল্লির সুরক্ষিত শক্তিশালী দুর্গকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া—যে দিল্লি এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এক মুহূর্তের মধ্যে ভারতীয় সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজ সরকারের কমাণ্ডার-ইন-চিফ এন্সন এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে সিমলায় বিশুদ্ধ শীতল বায়ু সেবন করছিলেন। মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই ঐ অঞ্চলে অবস্থিত ১ম, ২য় ও ৭৫তম ইংরেজ বাহিনী তিনটিকে তৎক্ষণাৎ তিনি আম্বালা অভিমুখে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন। ফিরোজপুর, জলন্ধর, ফিলুর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে যাতে সব রকম নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তার হুকুমও চলে গেল। ডেরায় অবস্থিত সিরমুর বাহিনীর গুর্খাদের এবং রুরকির স্যাপার্স ও মাইনার্সদের মিরাটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সিমলার উত্তরে জুটোগে অবস্থিত নাসিরি বাহিনীর গুর্খাদের বলা হলো ফিলুর গিয়ে সেখান থেকে সিজ ট্রেন (অবরোধ কামান) সঙ্গে নিয়ে আম্বালায় পৌঁছতে। এই হুকুমের বিরুদ্ধে কিভাবে নাসিরি গুর্খারা বিদ্রোহ করেছিল তা অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

এন্সন ১৫ই মে আম্বালায় এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা জন লরেন্স তাঁকে বলে পাঠালেন যে, দিল্লির কাজটা এখুনি 'সংক্ষেপে' সেরে ফেলতে হবে। অবশ্য এই অত্যধিক আগ্রহের জন্যে লরেন্সকে দোষ দেওয়া যায় না। বিদ্রোহী-দিল্লির গূঢ়ার্থ ইংরেজ শাসকদের মধ্যে বোধ করি তিনিই সব থেকে বেশি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, বিদ্রোহী-দিল্লির একটি দিনের অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন ভারত সাম্রাজ্যের এক একটা অংশের বিদ্রোহের পক্ষে যোগ দেওয়া এবং প্রতিদিন বিদ্রোহী সিপাহিদের বিভিন্ন স্থান থেকে দিল্লিতে আগমনের সুযোগ বাড়ানো ও দিল্লির প্রতিরোধ শক্তিকে অজেয় করে তোলা; বিদ্রোহী-দিল্লির অস্তিত্বকে

যতদিন থাকতে দেওয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত সংক্রামক ব্যাধির মতো পাঞ্জাব ও সীমান্তের বারুদ স্তূপে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। লর্ড ক্যানিং-ও এই একই মত প্রকাশ করলেন এবং দিল্লির ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে সেরে ফেলতে ও একটা 'ভয়ংকর উদাহরণ' স্থাপন করতে বললেন (**'Dispose speedily of Delhi and make a terrible example'**)।

কিন্তু জেনারেল এন্‌সন ও অন্যান্য সামরিক নেতারা দিল্লি পুনরধিকার করার রাজনৈতিক জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলেন না ; সামরিকভাবে তা সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নের ওপরেই তাঁরা বেশি জোর দিলেন। দিল্লি জয় করা রাজনৈতিকভাবে যত জরুরিই হোক-না কেন, উপযুক্ত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় না করে এত বড় একটা বিপজ্জনক কাজে তাঁরা হাত দেন কি করে? তাই এন্‌সন প্রত্যুত্তরে লরেন্সকে জানালেন : "বড় বড় কামানগুলি যদি দাঁড় করানো যায়, তাহলে তা দিয়ে দিল্লির দেওয়াল ভেঙে হয়তো চুরমার করে দেওয়া যায়। হয়তো এইভাবে শহরে ঢুকবার একটা পথ প্রস্তুত করা যেতে পারে। এতে হয়তো আমরা খুব বাধা পাবো না। কিন্তু এত বড় একটা শহরে, যেখানে এতগুলি সরু সরু রাস্তা ও যার অসংখ্য সশস্ত্র অধিবাসীরা প্রত্যেকটি অলিগলির সঙ্গে পরিচিত, সেখানে আমরা মাত্র অল্প কয়েকজন লোক ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়ব।"[২]

মিরাট বাহিনীর কমাণ্ডার-জেনারেল উইলসনও এই একই মত দিলেন। তিনি বললেন ২,৫০০ বিদ্রোহী সিপাহির সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর একটা জনতার সঙ্গে যুদ্ধ করা এক ব্যাপার নয়। উইলসনও বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের কেবলমাত্র একটা সামরিক যুদ্ধই করতে হবে না, তাঁদের সম্মুখীন হতে হবে একটা গণযুদ্ধের বিরুদ্ধে, একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে—সে যুদ্ধে হয় জিততে হবে, নয় মরতে হবে।

কিন্তু বীরপুঙ্গব লরেন্স এসব কোনো যুক্তিতেই কর্ণপাত করতে চাইলেন না। তিনি এন্‌সনকে লিখলেন : "আমি এখনো বিশ্বাস করি যে, দিল্লিতে আমাদের কেউ কোনো রকম বাধা দেবে না। আমার ধারণা যে, আমাদের সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখেই বিদ্রোহীরা হয় পালিয়ে যাবে নতুবা জনসাধারণই বিদ্রোহী-দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে দরজা খুলে দেবে।"[৩] লরেন্স আরো লিখলেন যে, সাধারণ ভারতীয়রা ইংরেজের বিরোধী নয় ; এইসব গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাহি, যারা কয়েকজন চক্রান্তকারীর দ্বারা বিপথে চালিত হয়েছে। লরেন্স আবার কমাণ্ডার-ইন-চিফকে এই বলে উদ্বুদ্ধ

২. Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 34

৩. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p.51

করবার চেষ্টা করলেন : "ভারতের সমগ্র ইতিহাসের কথা চিন্তা করে দেখুন।... যখন আমরা তেজস্বিতার সঙ্গে কাজ করেছি, আমরা কি কখনো অকৃতকার্য হয়েছি ? আর ভীরুতার দ্বারা যেখানে চালিত হয়েছি, সেখানে কি আমরা সফল হয়েছি ? ক্লাইভ তাঁর অফিসারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে মাত্র ১,২০০ লোক নিয়ে যুদ্ধ করে ৪০ হাজার লোককে পরাজিত করে বাংলাদেশ জয় করে ছিলেন।"[৪]

সাম্রাজ্যবাদী বীরপুরুষ লরেন্সের 'ভারতের সমগ্র ইতিহাসের' গভীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পলাশির যুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গে ৩ হাজার সুসজ্জিত ও সুশৃংখল সৈন্য ছিল—১২০০ নয়, আর নবাব সিরাজদ্দৌলার দিকে ছিল—৪০ হাজার নয়—২০ হাজার, যাদের মাত্র ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছিল, আর বেশির ভাগই বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটা সংকট মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। দিল্লির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। দিল্লিতে ইংরেজের নিকট প্রশ্ন হলো—একটা বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া নয়,একটা শক্তিশালী, সুসজ্জিত বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গের সম্মুখে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহী সিপাহি ও সশস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। দিল্লির এই অবস্থা যে এতটুকু অতিরঞ্জিত ছিল না, তা চার মাস ধরে প্রতিটি দিন ও প্রতিপদে ইংরেজরা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

মিরাট বিদ্রোহের ৮ দিন পর, ১৮ই মে তারিখে, ব্রিগেডিয়ার উইলসনের নেতৃত্বে ঐ শহর থেকে প্রথম ব্রিটিশ বাহিনী দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করল। আম্বালা থেকে আর একটি ইংরেজ বাহিনী ২৩ শে মে একই গন্তব্য স্থানে চলল। স্থির হলো, এই দুটি বাহিনী পানিপথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে দিল্লির দিকে অগ্রসর হবে।

আম্বালা থেকে দিল্লির ১০ মাইল উত্তরে আলিপুর পর্যন্ত, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের এই অংশটুকু সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কারণ এইটাই ছিল পাঞ্জাব থেকে দিল্লি পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যদের চলাচল করবার, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য পাঠাবার প্রধান রাস্তা। দিল্লি জয় করতে হলে এই রাস্তার দু'ধারে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন জনসাধারণকে দাবিয়ে রেখে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখতেই হবে। কিন্তু এই কাজের জন্যে ইংরেজ সরকারের তখন সামর্থ্য ছিল না—তাদের যা কিছু লোকবল সবই দিল্লির বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে হচ্ছে। ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে এরকম সংকটের সময়, যখন সমগ্র উত্তর-ভারত

৪. *Ibid*, p. 55

দিল্লী - ১৮৫৭

০ ১
মাইল

দিল্লিকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীদের ব্যূহ রচনা

তাদের হস্তচ্যুত হবার উপক্রম হয়েছে, পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভার শিখ রাজারা ও কর্নালের নবাব এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড মুক্ত রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দিল্লি ও মিরাটের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই কর্নালের জনসাধারণ ইংরেজ ধ্বংসের কাজ শুরু করে দিয়েছিল; এই অবস্থা চলতে থাকলে মিরাট বাহিনীর পক্ষে আম্বালা বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ত এবং দিল্লির বিরুদ্ধে অভিযানও এত শীঘ্র সম্ভব হতো না। কেই তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লিখলেন, "আমাদের পক্ষে খুব সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সন্ধিক্ষণে কর্নালের নবাব, যিনি এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও প্রতিপত্তিশালী বড় জমিদার, তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের দিকে যোগ দিলেন।"[৫]

শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পাতিয়ালার রাজাই ছিলেন প্রধান; তার পরেই কাপুরতলা নাভা ও ঝিন্দ। ফরেস্ট বলেছেন: "পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্য দিয়েই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড গিয়েছে, সে রাস্তা পাঞ্জাবকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আমাদের এই যাতায়াতের রাস্তাটিকে পাতিয়ালার মহারাজা অনায়াসেই বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতেন। এবং খালসা সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত শক্তিশালী পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম নেতা হিসাবে, তিনি সমগ্র শিখ জাতিকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারতেন। সুতরাং আম্বালাতে যখন মিরাট ও দিল্লির হত্যাকাণ্ডের খবর পৌছল, মহারাজা কোন দিকে যাবেন এই ভেবে আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম।"[৬]

বস্তুত এ বিষয়ে ইংরেজদের গভীর উৎকণ্ঠার বিশেষ কোনো গভীর কারণ ছিল না। এই সমস্ত শিখ রাজারা, যারা সব সময় মহারাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করেছিল, যারা ১৮৪৫ ও ১৮৪৯ সনের উভয় শিখ যুদ্ধের সময়ই স্বজাতির বিরুদ্ধে ইংরেজের দিকে লড়েছিল, ১৮৫৭ সনেও নিজেদের স্বার্থবশে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের বিদেশী প্রভুদের পাশে এসে দাঁড়াল। দিল্লির বিদ্রোহের ৩ দিনের মধ্যে পাতিয়ালার মহারাজা ১ হাজার শিখ সৈন্য ও কতকগুলি কামান নিয়ে নিজে থানেশ্বর রক্ষা করবার জন্যে সশরীরে উপস্থিত হলেন; অন্যান্য শিখ রাজারাও পিছিয়ে থাকলেন না।[৭]

৫. Kaye : *History of Sepoy War in India*, vol. II, p.163
৬. Forrest : *State Papers*, vol. I, p.35
৭. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p.36

দিল্লি অবরোধ

৩০শে মে তারিখে মিরাট বাহিনী দিল্লি থেকে ১৫ মাইল পূর্বে হিন্দন নদীর তীরে অবস্থিত গাজিউদ্দিন নগরে (বর্তমান গাজিয়াবাদ) এসে পৌঁছল। অর্থাৎ মাত্র এই ২০ মাইল আসতে তাদের লাগল ১৩ দিন। বস্তুত, মিরাট-দিল্লির রাস্তার দু'ধারে সকল স্থানেই জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল; কোথাও ব্রিটিশ রাজত্বের কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। দিল্লির বিদ্রোহীরা যদি মিরাট বাহিনীর এই অভিযানের মর্মার্থ সত্বর বুঝতে পারত, তাহলে ইংরেজের এই প্রচেষ্টাকে তারা অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিতে পারত। গ্রামবাসীরা, যদিও তাদের কোনো বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তবু ইংরেজ বাহিনীকে পদে পদে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। এই গ্রামবাসীদের সাহায্যে মাত্র অল্প কয়েকজন বিদ্রোহী সিপাহির পক্ষে গেরিলা-কৌশল অবলম্বন করে ইংরেজ বাহিনীকে অচল করে দেওয়া হয়তো সম্ভব হতো।

কিন্তু বাহাদুর শাহ মিরাট বাহিনীর যাত্রার কথা শোনামাত্রই এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং পথিমধ্যে ইংরেজদের আক্রমণ করবার জন্যে সিপাহিদের তাগিদ দিচ্ছিলেন। সিপাহিরা যে কোনো কারণেই হোক তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি।[১] যাই হোক, গাজিউদ্দিন নগরের নিকট যখন শত্রু-বাহিনী এসে গেল, তখন সিপাহিরা দিল্লি থেকে বার হয়ে হিন্দন নদীর লৌহ-সেতুর ধারে একটা টিলার উপর তাদের কামান বসিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলো। ইংরেজরা যাতে নদী পার হতে না পারে তার জন্যে বিদ্রোহীরা লৌহ-সেতুটাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজরা সেতু দখল করে ফেলেছে। এই সেতুর ধারে উভয়পক্ষ থেকে ভয়ংকর ভাবে কামানের যুদ্ধ শুরু হলো, এবং অপরাহ্নে হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চলল যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয়পক্ষ সম্পূর্ণ-ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিকাল ৪টার সময় বিদ্রোহীরা তাদের কামান ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দিল্লি অভিমুখে ফিরে চলল। সারা বিদ্রোহের সময়ই দেখা গিয়েছে যে বিদ্রোহীরা অনেক ক্ষেত্রেই এই ফিরে-আসার আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করেছে।

১. "বাদশাহ বারবার বিদ্রোহীদের মিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু তারা একটা-না একটা কারণ দেখিয়ে শুধু বিলম্বই করতে লাগল।" (Metcuff : *Two Native Narratives*, p.62)

হিন্দনের যুদ্ধ শত্রুর সঙ্গে বিদ্রোহীদের প্রথম সংঘর্ষ। এই যুদ্ধে একজন সিপাহি যে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন, যেরকম উদাহরণ আরো অনেক সিপাহি ও জনসাধারণ মহাবিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে গিয়েছেন, সেকথা একজন বিদেশী ইতিহাসজ্ঞ এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "আমাদের ক্ষতি খুবই সামান্য হতো, যদি আমাদের গোলাবারুদের একটা গাড়িতে বিস্ফোরণ না হতো ; এই ঘটনা যুদ্ধের আকস্মিকতার ফলে ঘটেনি, ঘটেছিল একজন বিদ্রোহীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মবলি দানের ফলে। যে মুহূর্তে অ্যাণ্ডরুজ একদল লোক নিয়ে উক্ত গাড়ির কামানটি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ১১শ বাহিনীর একজন সিপাহি সংগতভাবেই বারুদের মধ্যে গুলী ছুঁড়ে মারল। এই বিস্ফোরণের ফলে সিপাহির জীবন নষ্ট হলো, কিন্তু অ্যাণ্ডরুজ ও তাঁর কয়েকজন সহচরও মারা গেলেন, এবং আরো কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো। এই ঘটনা আমাদের এই শিক্ষা দিল যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে এমন অনেক সাহসী ও মরীয়া লোক আছে যারা জাতীয় আদর্শের জন্যে মৃত্যুবরণ করতে একমুহূর্তও ইতস্তত করবে না। এরকম বীরত্বের উদাহরণগুলিই এই বিদ্রোহের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই ধরনের আরো অনেক উদাহরণ আছে যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি।"[২]

রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'-এ এই কাহিনী বর্ণনা করে আক্ষেপের সঙ্গে বলে গেছেন—"জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে, বীরপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা এই সিপাহীদের বিবরণে বুঝা যায়। ইউরোপ হইলে এই সকল বীরপুরুষদের কীর্ত্তি ঘোষিত হইত। সকলেই আজ পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে জীবন্তভাবে বিচরণ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অনন্তকালের অভিঘাতে, অতীত স্মৃতির সন্তাড়নে সমস্তই নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।" (৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫)[৩]

২. Kaye : *History of Sepoy War in India*, II, pp. 184-85

৩. কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ভারতীয়দের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের উদাহরণগুলি—যা ইংরেজ ইতিহাসবিদরাও অনেক সময় উল্লেখ করেছেন—তা অধ্যাপক সেন ও মজুমদারের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি। অথচ ইংরেজদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করতে তাঁরা পঞ্চমুখ, এবং তার উদাহরণ উভয়েই অনেক দিয়েছেন ; যথা লেফটেনান্ট উইলোবির (যিনি দিল্লির বারুদখানা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন) 'glorious deed of heroism'-এর অর্ধপৃষ্ঠা বর্ণনা দিয়ে অধ্যাপক সেন দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন যে, দিল্লি থেকে পালানোর সময়

পরদিন সকালে বিদ্রোহীরা আবার দিল্লি থেকে বের হয়ে এলো এবং দ্বিপ্রহরে যখন সূর্যের তেজ খুব প্রখর হয়ে উঠেছে, তখন আবার সেতুর এক মাইল দূরে সেই টিলার উপর থেকে কামান দাগতে শুরু করল। ভয়ংকর রৌদ্রের উত্তাপ ইংরেজদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তারই মধ্যে দু'ঘণ্টা ব্যাপী দু'পক্ষের সমানে কামান যুদ্ধ চলল। ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ কেই বলেন: "আমাদের সৈন্যদের তৃষ্ণা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাদের অনেকে সর্দি-গর্মিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল, আর অনেকে ক্লান্তিতে নিঃশেষিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।"[৪]

কিন্তু এই অবস্থায়, যখন ইংরেজদের লড়বার শক্তি শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় বিদ্রোহীরা নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনাকে ধূলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার পূর্বদিনের মতো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দিল্লি অভিমুখে ফিরে চলল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায় সম্পন্ন উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনে বিদ্রোহীরা ব্রিগেডিয়ার উইলসনের

একটা 'viliage mob'-এর হাতে তিনি নিহত হন এবং তাঁর ৫ জন ইংরেজ সাথী, যারা ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পুরস্কার পেয়েছিল, তাদের নামধাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে ভোলেন নি (*Eighteen Fifty Seven*, p. 73)। কুখ্যাত খুনী ও লুণ্ঠনকারী হডসনও তাঁদের মতে একজন মহাবীর, আর নিকলসন 'spiritually belonged to the Heroic Age. (Sen, p. 98)। সম্প্রতি একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন: "'History', someone has written, 'is the propaganda of the victors'. This is particularly true of the Indian Empire unitl 1947···What so many know of the Indian Empire in the 19th century is on the hagiography of Imperialism ··The history of British India has been confused, not to say falsified, by the necessity of imperial propaganda." (Michael Edwardes: *The Necessary Hell*. London, 1958. Introduction)। বীরপূজা সবদেশেরই একটা বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে যেসব দেশের পরদেশ জয় করা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ঝোঁক বেশি। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও দেখা যায় 'হিরো'দের দেবতার আসনে বসানো হয়েছে, যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ বংশও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় hagiolatry। সারাজীবন ভারতীয় ইতিহাসবিদরা ইংরেজ লিখিত এইসব ইতিহাসই অধ্যয়ন করেছেন; এবং তার দ্বারা যে কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছেন তা মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্পষ্টভাবেই দেখা গেল, বিশেষ করে তা অধ্যাপক সেন ও মজুমদার এবং তাঁদের অনুগামীদের লেখার মধ্য দিয়ে প্রতি লাইনে প্রকাশ পেয়েছে।

৪. Kaye: *History of Sepoy War in India*, vol. II, p.186

বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলতে পারত—একথা যে একেবারেই অত্যুক্তি নয় তা কেই-র কথাতেই বোঝা যায়। তিনি বলেন: "বিদ্রোহীরা দিল্লি থেকে এসে যদি আমাদের একবার আক্রমণ করত, তাহলে আমাদের সৈন্যরা, যারা ঐদিন-কার যুদ্ধে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তারা শত্রুর আর একটা আক্রমণ প্রতি-রোধ করতে পারত কিনা তা খুবই সন্দেহের বিষয়। কিন্তু ১লা জুন শত্রুর দিক থেকে কোনো আক্রমণই দেখা গেল না, উপরন্তু মেজর রীডের অধীনে ৫০০ গুর্খা আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলো।"[৫]

স্বভাবতই ইংরেজরা হিন্দনের যুদ্ধকে নিজেদেরই জয় বলে গণ্য করল, এবং মিরাট ও দিল্লির অপমানজনক পরাজয়ের পর তাদের মানসিক অবস্থার (morale) দিক থেকে এরকম জয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল।[৬]

হিন্দনের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেছিলেন শাহজাদা আবু বকর। যুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁর কোনো রকম ধারণাই ছিল না, সেই শাহজাদারই কৃতিত্ব সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর এক বর্ণনা পাওয়া যায়: "সেনাপতি আবু বকর হিন্দন নদীর ধারে সেতুর নিকটেই একটা বাড়ির ছাদের উপর উঠে যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি গোলন্দাজদের বলে পাঠাতে লাগলেন যে, তাদের কামানের গোলা শত্রু বাহিনীতে কী ভয়ংকর ধ্বংসের সৃষ্টি করেছে। তিনি সেতুর নিকটে একটি কামান স্থাপন করে ইংরেজদের সঙ্গে গোলাগুলী বিনিময় করছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ইংরেজের একটি গোলা এসে তাঁর কামানের নিকট ফাটলো ও তাঁর গোলন্দাজকে ধূলোয় ভর্তি করে দিল। জীবনে এই প্রথম গোলার বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে সেনাপতি তাড়াতাড়ি ছাদের উপর থেকে নেমে পড়লেন এবং ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দৌড়তে শুরু করলেন, সিপাহিদের চিৎকারে কোনোরূপ কর্ণপাত করলেন না। তারপরে সিপাহিরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।"[৭]

দিল্লির যুদ্ধে বারবার দেখা যাবে যে, অনেক চেষ্টা করেও সিপাহিরা নিজেদের যোগ্য নেতৃত্ব সংগঠন করতে পারেনি এবং নিজেদের ঝগড়াঝাঁটি করে বারবার তারা এইসব অযোগ্য শাহাজাদাদেরই শরণাপন্ন হয়েছে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ বাহিনীর প্রধান অংশ আম্বালা থেকে যাত্রা করে ৫ই জুন দিল্লির ১০ মাইল উত্তরে আলিপুরে এসে পৌছল। ২৬শে মার্চ কর্নালে জেনারেল এন্‌সনের মৃত্যু হওয়ায় জেনারেল বার্নার্ড ইংরেজ বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত

৫. *Ibid*, p 187

৬. ফরেস্টের মতে হিন্দনের যুদ্ধ সিপাহিদের 'ক্রমবর্ধমান অহংকারকে খর্ব করে দিল।' (*History of the Indian Mutiny*, vol. I, p.76)

৭. Metcuff: *Two Native Narratives*, p.62

হলেন। ক্রাইমিয়ার সেবাস্তপোলের যুদ্ধে বার্নার্ড খুব নাম করেছিলেন। আলিপুরে এসে বার্নার্ড মিরাট বাহিনী ও অবরোধ-কামানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিরাট বাহিনী হিন্দনের যুদ্ধের পর বাঘপথে যমুনা নদী পার হয়ে ৭ই জুন বার্নার্ডের বাহিনীর সঙ্গে আলিপুরে এসে মিলিত হলো। এবং ঠিক এই সময়েই ২৮টি বিভিন্ন ধরনের অবরোধ-কামানও এসে পৌছল। এখন ইংরেজ বাহিনীর শক্তি হলো ২,৪০০ পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী[৮]; অর্থাৎ বিদ্রোহীদের এই সময়কার সংখ্যার (২,৫০০) চেয়ে বেশি। এই ইংরেজ বাহিনীতে ৫০০ গুর্খা ও কিছু পাঠানও ছিল। ইংরেজ বাহিনী ৭ই জুন মধ্যরাত্রে আবার যাত্রা শুরু করল এবং পরদিন প্রত্যূষে দেখতে পেল যে দিল্লির ৫-৬ মাইল উত্তরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে বদলি-কি-সরাই নামে একটি গ্রামে বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। এখানে ছিল পুরনো মোগল ওমরাহদের বড় বড় দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কতকগুলি বৃহৎ বাড়ি; শত্রুকে বাধা দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

এইবার সিপাহিরা আর একজন শাহজাদা, মির্জা খিজির খানের সেনাপতিত্বে[৯] অনেকগুলি কামান এনে বদলিতে বসিয়েছিল এবং এর ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল। দু'দিক থেকে তুমুল গোলাবর্ষণ শুরু হলো এবং "ইংরেজরা তাদের জায়গায় টিকে থাকতে পারবে কিনা সে বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্যে সন্দেহ হলো।"[১০] জেনারেল বার্নার্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ গোলন্দাজরা সিপাহিদের যখন ব্যস্ত করে রাখছিল, ঠিক সেই সময় ইংরেজ অশ্বারোহীরা ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্র্যাণ্টের নেতৃত্বে ক্যানাল পার হয়ে বিদ্রোহীদের পার্শ্বদিক আক্রমণ করল। তারপর

৮. অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেল নর্মানের "Narrative of the campaign of Eighteen Fifty Seven (Delni)"—Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 435

৯. Metcuff : *Two Native Narratives*, p.63

১০. Kaye : *History of Sepoy War in India*, vol. II, p. 191. নর্মান তাঁর 'ন্যারেটিভে' লিখেছেন যে, প্রত্যূষে আমরা যেই মুহূর্তে কামান দাগতে শুরু করলাম, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুরাও উত্তর দিতে আরম্ভ করল। "শত্রুপক্ষের গোলা আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় করে তুলল। আমাদের বড় কামানগুলি টানবার জন্যে যে বলদগুলি ছিল গাড়োয়ানরা সেগুলি নিয়ে পালিয়ে গেল; আমাদের একটা বারুদের গাড়িতে বিস্ফোরণ হলো; আমাদের লোকেরা দ্রুত মরতে লাগল। আমাদের অফিসার স্টাফও শত্রুদের ভালো লক্ষ্য জুগিয়েছিল; দু'জন তো মারাই গেলেন।" (Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 435)

চলল হাতাহাতি যুদ্ধ—"যার মধ্যে বিদ্রোহীরা তাদের কামানগুলিকে দৃঢ়ভাবেই রক্ষা করেছিল। তারা ভালোভাবেই দেখিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক আছে। তাদের অনেকেই খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বেয়নেট দিয়ে হত্যা না করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কামানগুলি ছেড়ে দেয়নি।"[১১]

কিন্তু সিপাহিদের অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহস সত্ত্বেও অনুপযুক্ত নেতৃত্বের জন্যে বদলি-কি-সরাই'এর যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলো। বদলির যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে দিল্লির জনসাধারণ তার ফলাফল উদ্বিগ্নচিত্তে লক্ষ্য করছিল। তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজদের যদি বদলিতে রুখতে না পারা যায়, তাহলে দিল্লি শহরের অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়বে। বদলিতে সিপাহিরা এবার খুব ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তাদেরই বিজয় হবে বলে তারা খুব আশা করেছিল। কিন্তু যখন তারা সিপাহিদের নতমস্তকে ফিরে আসতে দেখল, "তখন তারা তাদের কাপুরুষ বলে গালাগালি দিতে শুরু করল; আর সিপাহিরাও উল্টে অশ্বারোহী সিপাহিদের এই বলে অভিযুক্ত করল যে, তারা এত তাড়াতাড়ি দিল্লিতে ফিরে এলো কেন?"[১২]

সিপাহিদের পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—এই বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতার অভাব ছিল। নেতৃত্ব যেখানে এত দুর্বল, সেখানে কার্যকরী সহযোগিতা (co-ordination) সংগঠন করাও খুব কঠিন। হিন্দনের যুদ্ধ থেকে সিপাহিরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। হোপ গ্র্যাণ্ট যখন অশ্বারোহীদের নিয়ে বিদ্রোহী গোলন্দাজদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করলেন, তখন তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে বদলিতে বিদ্রোহীদের কোনো অশ্বারোহী বাহিনী উপস্থিত ছিল না। গোলন্দাজদের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে হয়তো অশ্বারোহীদের দিল্লিতে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র কামানের গোলা দিয়ে যে শত্রুকে ধ্বংস করা যায় না, এই চিন্তাটা বোধ হয় বিদ্রোহী সেনাপতির মাথায় আসেনি। বিদ্রোহীদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করার জন্যে হোপ গ্র্যাণ্টের অশ্বারোহীদের একটা অসমতল ছোট রাস্তা দিয়ে আসতে হয়েছিল—যা অশ্বারোহীদের চলাচলের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক; সুতরাং এই সময়ে তাদের প্রতিরোধ করা খুব কঠিন হতো না। কিন্তু ঘটনাস্থলে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর অভাবে বিদ্রোহীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। হোপ গ্র্যাণ্টের এই দুঃসাহসী কৌশলই বদলি যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় করল। সর্বশেষে বিদ্রোহীরা যখন বদলির যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দিল্লিতে ফিরে

১১. *Ibid*, p. 192

১২. **Metcuff** : ***Two Native Narratives***, **p. 118**

যাচ্ছিল, তখন এই ইংরেজ অশ্বারোহীরাই বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষতি করে সিপাহিদের ভালো ভালো ১৩টি কামান ও অনেক সাজ-সরঞ্জাম হস্তগত করল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বদলি থেকে শহরতলি সবজিমণ্ডি হয়ে দিল্লিতে প্রবেশ করেছে। সবজিমণ্ডি থেকে আবার একটা শাখা দিল্লির রিজের (টিলা) পাশ দিয়ে সোজা ক্যাণ্টনমেণ্টে চলে গিয়েছে—যে ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে একমাস পূর্বে ইংরেজদের রাত্রের অন্ধকারে কোনোরকমে পালাতে হয়েছিল। বদলিতে ইংরেজ বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ চলে গেল বার্নার্ডের নেতৃত্বে ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে, আর একদল থাকল সবজিমণ্ডিতে উইলসনের নেতৃত্বে।

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, বিদ্রোহীরা ক্যাণ্টনমেণ্ট রক্ষা করার জন্যে কোনো রকম ব্যবস্থাই করেনি। হয়তো তারা ভাবতেই পারেনি যে, ইংরেজরা এত তাড়াতাড়ি দিল্লি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে। যাই হোক, এক রকম বিনা বাধাতেই ইংরেজরা ক্যাণ্টনমেণ্ট অধিকার করল, যদিও বিদ্রোহীরা শহর থেকে কামান দেগে তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। এইভাবে, দিল্লি শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে এই 'সর্বোৎকৃষ্ট ঘাঁটিটি', বলা যেতে পারে, ইংরেজকে একরকম উপহারই দেওয়া হলো।

উইলসনও সবজিমণ্ডিতে বিশেষ বাধা পেলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি হিন্দুরাও-এর বাড়ির নিকট পৌছলেন। হিন্দুরাও-এর বাড়ি দিল্লির টিলার দক্ষিণাংশে ও শহরের মোরি বুরুজ থেকে ১,২০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বস্তুত এই বাড়িই ছিল ক্যাণ্টনমেণ্ট ও টিলার চাবিকাঠি, কাজেই দিল্লির যুদ্ধে এর সামরিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অল্প সংখ্যক সিপাহি এই বাড়ি দখল করেছিল। প্রথমত ইংরেজ সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করেও যখন এই সিপাহিদের বিতাড়িত করতে পারল না ও বেলা ১টার সময় তারা যখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন মেজর রীডের অধীনে সিরমুর গুর্খাদের—যারা গত ১৬ ঘণ্টা ধরে অনবরত যুদ্ধ করে আসছিল—হুকুম দেওয়া হলো ওই বাড়ি আক্রমণ করতে। মাস খানেক পূর্বে জুটোগে গুর্খাদের বিদ্রোহের ফলে, ইংরেজরা এই সিরমুর বাহিনীর গুর্খাদের উপরও খুব ভরসা করতে পারছিল না। ইংরেজ অফিসারদের অনেকেরই এইসব গুর্খাদের রাজভক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। গুর্খাদের হিন্দুরাও-এর বাড়ি আক্রমণ করার মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক ইংরেজের চোখই এইদিকে নিবদ্ধ ছিল, কারণ এই আক্রমণের ফলাফলেই বোঝা যাবে গুর্খারা সত্যই রাজভক্ত কিনা। এবং আরো একটি কথা, ইংরেজরা ভালো করেই জানত এই সমস্ত গুর্খা ও অন্যান্য 'নেটিভদের' রাজভক্তির ওপরই ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। যাই হোক, গুর্খারা হিংস্র জানোয়ারের মতো সিপাহিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সিপাহিরাও মরীয়া হয়ে পাণ্টা আক্রমণ করল। এইভাবে ৪ ঘণ্টা ধরে হাতাহাতি লড়াই চলল। মুষ্টিমেয় সিপাহির মধ্যে

প্রায় সকলেই নিহত হলো। গুর্খাদেরও অনেকেরই প্রাণ গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাও-এর বাড়ি তারা দখল করল—যে হিন্দুরাও-এর বাড়ির ওপরই সমস্ত ইংরেজ শিবিরের নিরাপত্তা নির্ভর করছিল। এবং সেই বাড়িই দিল্লির যুদ্ধে এখন থেকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল।

সিরমুর গুর্খারা এইভাবে তাদের ভাইদের হত্যা করে বিদেশী প্রভুদের নিকট তাদের রাজভক্তি প্রমাণ করল। ইংরেজরা তাদের গলা ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত চেঁচামেচি করে, জড়িয়ে ধরে, গুর্খাদের খুব আপ্যায়িত করল। ইংরেজ অফিসাররা গুর্খাদের এইরূপ 'মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ' ব্যবহারে এতই চমৎকৃত হলেন যে হিন্দুরাও-এর বাড়ি রক্ষা করবার 'সম্মান' এই গুর্খাদেরই দেওয়া হলো। ক্রমশ অবজারভেটরি, ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ার ইত্যাদি অন্যান্য বিপজ্জনক ঘাঁটি-গুলির রক্ষার ভারও গুর্খাদের উপর ন্যস্ত করা হলো। পেশোয়ারের একজন মার্কা-মারা দাগী অপরাধী জান ফিসান খানের নেতৃত্বে যে সমস্ত পাঠান ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে এসেছিল তারাও এইরূপ 'মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ' কাজের জন্যে অনুরূপ 'সম্মান' লাভ করল।

ক্যান্টনমেণ্ট দখল করার একদিন পর, পাঠানদের নিয়ে গঠিত 'গাইড কোর' এবং আরো কিছু গুর্খা সমেত প্রায় ১ হাজার সৈন্য ইংরেজের শিবিরে এসে উপস্থিত হলো। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে—"গুর্খাদের সঙ্গে ও তাদের পাশে পাশে, এই গাইড বাহিনী তাদের খ্যাতি অনুসারে শত্রুর সম্মুখে একটা লৌহবেষ্টনী গড়ে তুলল। গাইডদের আগমনে সামরিকভাবে আমাদের যেমন লাভ হলো, রাজনৈতিক দিক থেকেও আমরা সেই রকম লাভবান হলাম। কারণ, পাঞ্জাবের এই শ্রেষ্ঠ বাহিনীটি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করছে, এই ঘটনাটাই পাঞ্জাবিদের মধ্যে আমাদের ইজ্জত বাড়িয়ে দিল।"[১৩]

বাস্তবিক পক্ষে এর একটা নৈতিক দিকও আছে। বিদ্রোহীরা, যারা চেয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে লড়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে বিদেশী শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে, যারা চেয়েছিল বিদেশী দস্যুদের লুণ্ঠন থেকে নিজেদের দেশের মানুষকে বাঁচাতে, তারা যখন দেখল যে, একদল বিপথগামী ভাড়াটিয়া ভারতীয় সব সময়েই ইংরেজের দিকে লড়ছে ও ইংরেজের প্রত্যেকটি সংকটের সময় বিদ্রোহী-দের আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে এই ভাড়াটিয়া ভারতীয়রাই মাথা পেতে নিয়ে বারবার বিদেশী শত্রুদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছে (এবং এখন থেকে প্রতিটি যুদ্ধেই সর্বত্র এই বৈশিষ্ট্যটিই দেখা যাবে)—তখন এই অবস্থাটাই সংগ্রামী বিদ্রোহীদের নিকট সবথেকে বেশি পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল ও তাদের মনে একটা ব্যর্থ ও হতাশার সৃষ্টি করল।

১৩. Gibbon : *The Lawrences of the Punjab*, p.273

দিল্লি থেকে বিতাড়িত হবার প্রায় এক মাস পর ৭ই জুন তারিখে ইংরেজরা দিল্লির টিলা ও ক্যান্টনমেন্ট অধিকার করে বসল। ইংরেজের পতাকা, বিদ্রোহী পতাকার সামনাসামনি তাকে চ্যালেঞ্জ করে, আবার দিল্লির টিলার উপর সগর্বে উড়তে শুরু করল। এই টিলা শহরের সমতলভূমি থেকে ৫০।৬০ ফিট উঁচু; ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে শুরু হয়ে হিন্দুরাও-এর বাড়ির কিছুটা দক্ষিণে হঠাৎ যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে, সে স্থানটা শহরের উত্তর-পশ্চিমে কাবুল গেটের খুবই সন্নিকট। টিলার পশ্চাৎভাগ দিয়ে চলে গিয়েছে যমুনা-ক্যানাল। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে ঐ বছর এমনকি জুন মাসেও, যখন সাধারণত তার জল প্রায় শুকিয়ে যায়, ক্যানাল বিশুদ্ধ পানীয় জলে ভর্তি ছিল। এই ক্যানাল আর টিলার মাঝখানে অবস্থিত ছিল ক্যান্টনমেন্ট। টিলা ইংরেজের হস্তগত হওয়ার ফলে ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যানাল রক্ষা করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ হলো, এবং দিল্লি আক্রমণ করবার এই শ্রেষ্ঠ ঘাঁটিতে একটা স্বাভাবিক নিরাপত্তাও পেল। উপরন্তু এই টিলা ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে পাঞ্জাবের চলাচলের পথটাও ইংরেজ বাহিনীর জন্যে নিরাপদ করে রাখল।

বস্তুতপক্ষে কোনো আক্রমণকারী বাহিনী এইরকম প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত ও সুবিধাজনক একটি ঘাঁটি এর আগে হস্তগত করতে পারেনি। ফ্রেড রবার্টস্ (পরবর্তীকালে ফিল্ড মার্শাল আর্ল রবার্টস্) ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাঁর পিতাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "এই জায়গাটিতে আমাদের অবস্থান প্রকৃতির দ্বারা যারপরনাই নিরাপদ হয়েছে। …ঈশ্বর স্বয়ং সর্বপ্রকারে আমাদের সহায়ক হয়েছেন। প্রথম থেকেই আবহাওয়া ভালোই যাচ্ছে এবং এই ক্যান্টনমেন্টে সৈন্যদের যে রকম ভালো স্বাস্থ্য দেখা যাচ্ছে, তা আর কোথাও দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কলেরা দেখা দেয় বটে, কিন্তু এত বড় একটা ক্যাম্পে যেখানে এতগুলি সৈন্যের বাস, সেখানে সব সময়ই তা আশংকা করা যেতে পারে। আমাদের বামদিক ও সম্মুখ দিক যমুনা নদীর দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে, আর একটা বড় ঝিল, যেটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। বৎসরের এই সময়টায় ওদিক দিয়ে মাইলের পর মাইল পার হওয়া অসম্ভব, যার ফলে আমাদের দক্ষিণ দিকে শত্রুর কোনো আকস্মিক আক্রমণের ভয় নেই; সুতরাং আমদের শিবিরের তিন দিক পাহারা দেবার জন্যে মাত্র কয়েকজন অশ্বারোহীই যথেষ্ট। এই জন্যে শত্রুর অকস্মাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মুখ ভাগ রক্ষা করার ব্যাপারে আমরা সমস্ত বাহিনী নিয়োগ করতে সমর্থ হচ্ছি। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ যখনই হয়, প্রায় তখনই প্রত্যেকটি সৈন্যকেই এই কাজে লাগতে হয়।"[১৪]

ইংরেজ বাহিনীর প্রধান এঞ্জিনিয়ার কর্নেল বেইর্ড স্মিথ তাঁর অসমাপ্ত 'স্মৃতি কাহিনী'তে লিখেছিলেন: "আমাদের স্বপক্ষে অনেকগুলি আশ্চর্য রকমের দৈব-

১৪. *Letters written during the Indian Mutiny*, p.34

ঘটনা থেকে মনে হয় যে ঈশ্বর ইংরেজদের প্রতি বিশেষভাবে সদয় হয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে একটি হলো এই যে, বিদ্রোহের আগের বছরে এত বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল যে, ১০০ বর্গমাইল পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটাই আকণ্ঠ জলে পূর্ণ হয়েছিল। এই বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু জল যে আমাদের স্বাস্থ্য ও আরামের পক্ষে কতখানি মূল্যবান ছিল সে সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করে না বললেও চলে। এই জল না পেলে, ২ মাইল দূর থেকে যমুনার জল নিয়ে আসতে হতো, নতুবা নির্ভর করতে হতো ক্যান্টনমেন্টের কুয়োর লোনা জলের ওপর।…এই ঝিল সামরিক-ভাবে আমাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে যেমন অত্যাবশ্যক হয়েছিল, তেমনই আমাদের শিবিরের স্বাস্থ্য ও আরামেরও ব্যবস্থা করেছিল।”[১৫]

ক্যাণ্টনমেণ্ট ও টিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দুটি, যা সহজেই কামানের সাহায্যে রক্ষা করা যেত এবং যার ওপর দিল্লির ভাগ্য নির্ভর করছিল, তাকে যেমনভাবে প্রায় বিনা যুদ্ধেই বিদ্রোহীরা শত্রুকে ছেড়ে দিল তা থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের নেতৃত্ব তখনো কতখানি দুর্বল ও অদূরদর্শী ছিল। হিন্দন ও বদলি-কি-সরাই’এর লড়াইতে এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট ও টিলা পরিত্যাগ করে বিদ্রোহীরা যে মারাত্মক ভুল করল, তা অনেক প্রায়শ্চিত্ত করেও তারা আর সংশোধন করতে পারেনি।

টিলার সম্মুখেই একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র, যার একধারে ছিল দিল্লি শহরের উত্তর দেওয়াল, সে দিকটা ছিল প্রায় এক মাইল ব্যাপী চওড়া, আর একধারে যমুনা। এই ত্রিকোণ ক্ষেত্র জুড়ে ছিল অনেকগুলি পুরনো বাড়ি; দিল্লি শহর আক্রমণের জন্যেই হোক, আর রক্ষা করার জন্যেই হোক এই বাড়িগুলির সামরিক গুরুত্ব অনেক। এর মধ্যে হিন্দুরাও-এর বাড়িই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের প্রথম দিকে একজন মারাঠা সর্দার এই প্রকাণ্ড মজবুত বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। বাড়ির চারদিকে মস্ত বড় একটা বাগান এবং শহরে ও ক্যাণ্টনমেণ্টে যাবার জন্যে দুদিকেই ভালো রাস্তা। তাছাড়া, এই বাড়ির সংলগ্ন কতকগুলি বহির্বাটিও ছিল। হিন্দুরাও-এর বাড়িকে একটা ছোটখাট দুর্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বাড়ি দখল করেই ইংরেজরা এটাকে তাদের সবথেকে শক্তিশালী আত্মরক্ষার ঘাঁটি তৈরি করে নিল। সেখানে গুর্খাদের মোতায়েন করে তিনটি শক্তিশালী আত্মরক্ষা-কামানের ঘাঁটি প্রস্তুত করল—একটি স্বামীর মন্দিরে, দ্বিতীয়টি ক্রোজ্‌ নেস্টে ও তৃতীয়টি সবজিমণ্ডির সংকীর্ণ গিরি সংকটের উপর—সেখান দিয়ে পশ্চিম যমুনা ক্যানাল ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অতিক্রম করেছে। এই ঘাঁটিগুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে একটি পরিখাও খনন করা হলো। বিদ্রোহীরা জানত যে, হিন্দুরাও-এর বাড়ি পুনর্দখল করতে পারলে ইংরেজদের ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বিতাড়ন করা খুব

১৫ Kaye : *History of Sepoy War in India*, II, p. 515

কঠিন কাজ হবে না। এইজন্যে তারা তিন মাসের মধ্যে ২৬ বার ঐ বাড়ি আক্রমণ করেছিল, এবং তার মধ্যে একবারের আক্রমণ চলেছিল একটা সম্পূর্ণ দিন-রাত্রি ধরে। তাছাড়া, মোরি বুরুজ থেকেও সর্বদাই এই বাড়ির উপর কামানের গোলা ছোঁড়া হতো। এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, দিল্লি যুদ্ধের শেষে ১ হাজার গুর্খা সিপাহির মধ্যে ৫০ জনও প্রাণ নিয়ে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারেনি। ১৪ই সেপ্টেম্বর, যেদিন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহী দিল্লিকে শেষ আঘাত হানবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই ভয়ংকর পরীক্ষার দিন ১০০ জন গুর্খাকেও সমর্থ অবস্থায় এই কাজের জন্যে পাওয়া যায়নি। এই বাড়ির উত্তরে টিলার উপর অবস্থিত অম্বরের জ্যোতির্বিদ রাজা জয়সিংহ কর্তৃক ১৬৯৩ সনে নির্মিত যন্তর-মন্তর (যা আজও রয়েছে) পর্যবেক্ষণাগারটিও (observatory) হিন্দুরাও-এর বাড়ি রক্ষার কাজে ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

হিন্দুরাও-এর বাড়ির আরো কিছুটা উত্তরে অবস্থিত ছিল ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার —একটি মজবুত গোলাকৃতি দোতলা বাড়ি—টিলা ও যমুনার মধ্যবর্তী ত্রিকোণ জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। এই টাওয়ারের একেবারে সামনাসামনি, প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল মেটকাফ হাউস,—কাশ্মীর গেট থেকে প্রায় ১ মাইল উত্তরে যমুনা নদীর তীরে মস্তবড় এক বাগানের মাঝখানে একটা বিরাট বাড়ি। এই বাড়িটা বিদ্রোহীরা কোনো সময়েই দখল করার চেষ্টা করেনি। সুতরাং এখানেও ইংরেজদের একটা ঘাঁটি তৈরি করে নিতে বেগ পেতে হলো না। মেটকাফ হাউস থেকে দিল্লি দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল খুসিয়াবাগ, দিল্লির সম্রাটদের গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্যে একটা পুরনো প্রাসাদ। তারপর, কাশ্মীর গেটের ১ হাজার গজ উত্তরে ছিল লুডলো ক্যাস্‌ল নামে একটি নতুন বাড়ি; সুতরাং কাশ্মীর গেট রক্ষা করবার জন্যে অথবা আক্রমণ করবার জন্যে এই বাড়ির সামরিক প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সর্বশেষে, টিলা থেকে শুরু হয়ে একটি নালা লুডলো ক্যাস্‌ল ও খুসিয়াবাগের নিচ দিয়ে চলে গিয়েছিল যমুনা পর্যন্ত। দিল্লির যুদ্ধে এই নালাটিরও সামরিক গুরুত্ব কম ছিল না। দিল্লি থেকে উত্তর-পশ্চিমে, যমুনা থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত সবজিমণ্ডিতে ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকগুলি পুরনো বাড়ি, বনজঙ্গলে, বড় বড় গাছপালা ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। হিন্দুরাও-এর বাড়ির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত বলে, এইখানে তিনমাস ধরে অনবরত যুদ্ধ হয়েছে। সবজিমণ্ডি ও শহরের মধ্যে আরো কয়েকটি শহরতলি ছিল—কিষেণ-গঞ্জ, পাহাড়িপুর ও তালেবর। এই স্থানগুলি ইংরেজদের আক্রমণ করার পক্ষে বিদ্রোহীদের নিরাপদ গমনাগমনের পথ ছিল। এই হলো দিল্লি যুদ্ধের পটভূমি।

বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে : ১ গৃহশত্রু

১১ই মে তারিখে দিল্লি থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হবার পর শহরের ভিতর কি কি ঘটনা ঘটল ? লালকেল্লার উপর আবার যখন ভারতের স্বাধীন পতাকা উড়তে লাগল, তখন বাদশাহের দরবারের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও শাহজাদারা, শহরের ধনী ও বণিক সম্প্রদায়, জনসাধারণ ও সিপাহিরা, এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া শুরু হলো ? অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের কাঁধের ওপর এরকম একটা বিরাট গুরুদায়িত্ব যখন চেপে বসল, তখন তিনিই বা কিভাবে এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন ? সিপাহি, জনসাধারণ ও ধনীদের মধ্যে কি রকম সম্পর্ক স্থাপিত হলো ? এবং সর্বোপরি সিপাহিরা কিভাবে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ?—এই প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র কৌতূহল নিবারণের জন্যেই নয়, ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর খোঁজা নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু বিদ্রোহকালীন দিল্লির অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য না থাকাতে এই কাজটি খুবই কঠিন। ১৮৫৭-র গণবিদ্রোহের অনুরূপ বিদেশী-গণ অভ্যুত্থানগুলি সম্বন্ধে (যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসি বিপ্লব, প্যারি কমিউন, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ইত্যাদি) কোনো রকম তথ্যেরই অভাব নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৫৭-র বিদ্রোহ সম্বন্ধে যাকিছু প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় সবই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইংরেজদের দ্বারা লিখিত। তাতে অনেক রকম তথ্য ও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকলেও, তাদের এই 'মিউটিনি সাহিত্য' সর্বতোভাবে স্বভাবতই অসম্পূর্ণ এবং ভুল ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। যেসব ভারতীয় এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অথবা দিল্লি লখনৌ ইত্যাদি স্থানে বাস করছিলেন, তাঁদের কেউই এ বিষয়ে কোনো ইতিহাস কিংবা স্মৃতিকাহিনী লিখে যাননি, কিংবা লিখে থাকলেও তা প্রকাশিত হয়নি। তবে একটা বিচিত্র উৎসের ওপর নির্ভর করলে বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে কী ঘটছিল সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা সম্ভব হয়। এই অদ্ভুত উৎসটি হলো, মইনউদ্দিন হাসান খান, মুন্সি জীবনলাল[১], রজ্জব

১. মইনউদ্দিন, জীবনলালের মতোই, দিল্লির দৈনন্দিন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেই একটি দিনপঞ্জী লিখেছিল। সি. টি. মেটকাফ ১৮৯৮ সনে

আলি, প্রভৃতি ইংরেজের গুপ্তচর, গোলাম ও উচ্ছিষ্ট ভোগীদের দিনপঞ্জী, গুপ্ত রিপোর্ট, সংবাদ সরবরাহমূলক চিঠিপত্র ইত্যাদি। কিছু ভুল ও অতিরঞ্জিত খবর থাকলেও এইসব রিপোর্ট ও চিঠিপত্রের তথ্যগুলি ইংরেজ প্রভুরা মোটামুটি সঠিক বলেই গণ্য করত।

এরকম একটি দিনপঞ্জী বাহাদুর শাহের বিচারের সময়ও সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এই দিনপঞ্জীতে আমরা দেখতে পাই যে, ১২ই মে তারিখে বাহাদুর শাহ মইনউদ্দিন হাসান খানকে দিল্লির প্রধান কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত করে তাকে কোতোয়ালিতে বাস করবার হুকুম করলেন ও তার অধীনে এক রেজিমেণ্ট সিপাহি দিয়ে তাকে শহরে লুঠপাট বন্ধ করে শান্তি স্থাপন করতে বললেন। মইনউদ্দিন লুঠপাট বন্ধ করতে না পেরে বাদশাহকে রিপোর্ট করল। বাদশাহ তখন সব সুবাদারকে ডেকে হুকুম করলেন—দিল্লি গেটে ও প্রাসাদের গেটে এক-এক রেজিমেণ্ট এবং আজমীর, লাহোর, কাশ্মীর, ফরাসখানা গেটে এক-এক কোম্পানি করে সিপাহি মোতায়েন করা হোক। বাদশাহ তাদের এই কথাটা জানালেন যে, দিল্লির অধিবাসীদের লুণ্ঠিত হওয়া তিনি দেখতে চান না এবং হুকুম করলেন—এ লুণ্ঠন থামাতেই হবে।

যে কোনো সরকারই হোক, বিশেষ করে যে সরকার বিদেশী শত্রুর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, সেখানে পুলিশের প্রধান কর্মকর্তার পদ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং বিদ্রোহী দিল্লির প্রথম কোতোয়াল মইনউদ্দিন কি চরিত্রের লোক তা এখন বিচার করে দেখা যাক। তিনি ছিলেন দিল্লির কোনো একজন নবাবের পুত্র, সুতরাং মোগল দরবারে তার অবাধ যাতায়াত ছিল। নবাবপুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজের কেরানির চাকুরি নিতে তার সম্মানে বাধেনি। কিন্তু তার 'মেধার' বলে শীঘ্রই সে দিল্লির রেসিডেণ্ট স্যার চার্লস্ মেটকাফের সহায়কের পদে উন্নীত হয়। এহেন ব্যক্তিটিই বিদ্রোহের পর প্রধান কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হলো। মইনউদ্দিনের কীর্তি-কাহিনী সম্বন্ধে সে নিজেই তার দিনপঞ্জীতে যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় যে, সিপাহিরা রাজনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে কতখানি অনভিজ্ঞ ও অক্ষম ছিল।

Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi নাম দিয়ে ঐ দিনপঞ্জীর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। জীবনলাল বিদ্রোহের পূর্বে ইংরেজের চাকুরি করত ও চার্লস্ মেটকাফের অধীনে হিসাব-রক্ষকের কাজে উন্নীত হয়েছিল। এই সূত্রে বাদশাহের দরবারে তারও খুব ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। সুতরাং এই দু'জনই ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে ও ইংরেজ প্রভুদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহের কাজের জন্যে ছিল খুবই উপযুক্ত।

"১৪ই মে—গেটের কাছে ভলান্টিয়ার পদাতিক বাহিনীর একটা কোম্পনিকে দেখতে পেলাম। আমি যেন একজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক এই ভান করে, তাদের সুবাদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—তারা তাদের বেতন পেয়েছে কিনা?…তখনো তাদের কোনো অফিসার নিযুক্ত হয়নি ও তারা বেতন পায়নি। আমি তাদের এই বলে বাদশাহকে অনুরোধ করতে বললাম যে, আমাকে যেন ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। আমি তাদের আমার নাম বললাম ও তাদের বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হলাম। তারা সানন্দে রাজী হলো।…এই বাহিনীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করবার জন্যে আমি আমার নিজের পকেট থেকে তাদের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বিতরণ করলাম। সেই রাত্রেই এই বাহিনীর সঙ্গে বাস করবার জন্যে আমি চলে গেলাম"।[২]

পরদিন, কাশ্মীর গেটের দু'জন সিপাহি, যারা এই বিশ্বাসঘাতকটিকে চিনত, তারা মইনউদ্দিনকে অনুসরণ করতে লাগল। নিজের কোম্পানিতে ফিরে গিয়ে মইনউদ্দিন ঐ দুই সিপাহির বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করল যে, এই সিপাহি দুটি তাকে সেলাম দেয়নি। "তখন দু'পক্ষে কথা কাটাকাটি শুরু হলো; কাশ্মীর গেটের সিপাহিরা তখন খোলাখুলি ভাবেই বলল যে, আমি নাকি কয়েকজন ইংরেজকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার লোকেরা তাদের খুব গালাগালি করল; কিছুক্ষণ পর সিপাহি দু'জন চলে গেল। আমি তখনই স্যার থিওফিলাসকে (মেটকাফকে) খবর পাঠালাম যে, পরিস্থিতি মোটেই ভালোর দিকে যাচ্ছে না।…স্যার থিওফিলাসের নিরাপত্তার জন্যে আমার খুব ভাবনা হলো, কারণ তাঁকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, এই মর্মে বাদশাহ এক ফতোয়া জারি করেছেন"।[৩] তারপর মইনউদ্দিন লিখেছে—কিভাবে বিদ্রোহী বাহিনীর 'কর্নেল'-এর পদে সুরক্ষিত হয়ে সে মেটকাফ ও আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজকে (যাদের সে নিজে লুকিয়ে রেখেছিল) দিল্লি থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দিল।

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দিল্লির বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিল যে, দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের বশেই ইংরেজদের সাহায্য করছিল। তাই তারা তাদের গোপনে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছিল।[৪] কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকদের সঠিকভাবে জেনেও

২. Metcuff: *Two Native Narratives*, pp. 55-56

৩. *Ibid*, pp. 56-57

৪. ১২ই মে তারিখে পলাতক ইংরেজদের লুকিয়ে রাখার সন্দেহে সিপাহিরা নবাব হামিদ আলি খানের বাড়ি ঘেরাও করে। হামিদ আলি এই অভিযোগ অস্বীকার করাতে তাঁকে যখন সিপাহিরা টেনে বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেল,

নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে এইসব গৃহশত্রুদের বিরুদ্ধে তারা কোনো কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারছিল না। বাদশাহের উজির নবাব মেহবুব আলি খান, তাঁর শ্বশুর (জিন্নৎ মহলের পিতা) মির্জা এলাহি বক্স প্রভৃতি লোকগুলির প্রতি প্রথম থেকেই সিপাহিরা অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। সিপাহিরা যে এইসব বিশ্বাসঘাতকদের ঠিকই সন্দেহ করেছিল এবং এই লোকগুলি যে প্রথম থেকেই শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ইংরেজের পক্ষে কাজ করছিল, সে বিষয়ে এই দিনপঞ্জী ও রিপোর্টগুলিতে প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। এরা যে ইংরেজকে আশ্রয় দিয়ে, তাদের পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে ও আরো নানা উপায়ে তাদের ব্যক্তিগতভাবেই উপকার করছিল তাই নয়; তারা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বারবার অনুরোধ করছিল এই বলে যে, বিদ্রোহীরা তাদের সংগঠনকে সবল করে গড়ে তুলবার এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাদশাহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হবার আগেই যেন তারা দিল্লি আক্রমণ করে।[৫] (খুব সম্ভব, এই ধরনের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই কমাণ্ডার-ইন-চিফ এনসনকে তৎক্ষণাৎ দিল্লি আক্রমণ করতে বলা হয়েছিল এবং সগর্বে লেখা হয়েছিল, যে-মুহূর্তে দিল্লিবাসীরা প্রাচীরের অভ্যন্তরে ডজন খানেক শাদা মুখ দেখতে পাবে, সেই মুহূর্তে তারা আত্মসমর্পণ করবে ও সিপাহিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবে।[৬]

এইসব গুপ্তচরদের মধ্যে আর একজনের নাম হলো মৌলভি রজ্জব আলি।

তখন উজির মেহবুব আলি তাঁকে ছেড়ে দিতে বলল। সিপাহিরা বলল, "হামিদ আলির বাড়ি তল্লাস করে যদি কোনো ইংরেজকে না পাওয়া যায় তবেই তারা তাঁকে ছেড়ে দেবে। আর যদি তাঁর বাড়িতে ইংরেজ পাওয়া যায় তাহলে হামিদ আলিকে তারা যা খুশি করবে।" (*Ibid*, p. 85)

৫. *Ibid*, p. 92

৬. দিল্লি দখল করার হুকুম দেবার পর থেকেই কলকাতার ইংরেজ রাজপুরুষরা ভাবতে শুরু করলেন, যে-কোনো মুহূর্তে দিল্লি তাদের হস্তগত হবে। জুন মাসে দিল্লির পতনের কয়েকটা রিপোর্টও তাঁরা পেয়েছিলেন। এরকম একটা রিপোর্টকে বিশ্বাস করে ক্যানিং বিলেতে ইণ্ডিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে ৪ঠা জুলাই লিখেছিলেন: "The latest news from Delhi is that the town was in our hands on the 14th June; that there had been great slaughter of the rebels; and that those who remained of them had retreated into the Palace or Fort. This is by telegraph through central India." এমনকি এলাহাবাদে ইংরেজরা ১৪ই জুন দিবসটিকে বিজয়-দিবস বলে পালনও করেছিল। (Kaye: *History of Sepoy War in India*, vol. III, p. 180)

ধার্মিক বলে তার খ্যাতি ছিল ও বাদশাহের দরবারে তার ছিল অবারিত দ্বার। প্রথম থেকেই সে ইংরেজের গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত ছিল এবং প্রতিদিন বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সে ব্রিটিশ ক্যাম্পে পাঠাত।[৭] এই বকধার্মিক ব্যক্তিটিকে বাহাদুর শাহ বিশ্বাস করতেন, তারই সুযোগ নিয়ে সে সর্বদা বাহাদুর শাহকে ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিত। ৭ই আগস্ট চুরিওয়ালান বারুদখানায় যে বিস্ফোরণ ঘটে আসাদুল্লার সহযোগিতায় সে-ই তা ঘটিয়েছিল। এতদিন সিপাহিরা তাকে বুঝতে পারেনি ; বিস্ফোরণের পর তার কার্যকলাপ ধরা পড়ে যায়। কিন্তু সেইদিনই সে দিল্লি থেকে পালিয়ে যায়।

একটি দিনপঞ্জীতে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ আছে : "বিদ্রোহী সিপাহিরা তাদেব অফিসারদের নিয়ে দরবারে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা একটি চিঠি দেখিয়েছিল। সে চিঠিটি তারা দিল্লি গেটে ধরে ফেলে। এই চিঠিতে হাকিম আসাদুল্লা ও নবাব মেহবুব আলির সিলমোহর আঁকা ছিল। এই চিঠিতে তারা ইংরেজদের তখুনি দিল্লিতে এসে শহর দখল করে জওয়ান বখ্‌তকে সিংহাসনে বসাতে বলেছিল এবং ইংরেজরা এলেই বিদ্রোহীদের ধরে তাদের হাতে তুলে দিতে বলেছিল।"[৮] অবশ্য প্রকাশ্য দরবারে অভিযুক্ত হয়ে ঐ সম্মানীয় ব্যক্তিদ্বয় চিঠির বিষয় সব অস্বীকার করে, এবং পবিত্র কোরান স্পর্শ করে বলে যে, ঐ চিঠি তাদের দ্বারা লিখিত হয়নি। কিন্তু সিপাহিরা তাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। তারা আরো অভিযোগ করেছিল যে, ইংরেজ বন্দীদের এখনো

---

৭. "The old Maulvi, with fidelity and zeal which it is impossible to over-estimate in that crisis, rigid Mohammedan though he was, daily forwarded from the very heart of the city···a slip of paper containing the news of all that was passing in the city which it behoved us to know And so great was his tact that not a shadow of suspicion rested upon him. Like the two ends of an electric wire Rajjab Ali in the city and Hudson in the camp ; through them passed daily the most authentic intelligence of the rebel plans and movements." (Rev. J. C. Browne : *Panjab and Delhi in 1857*). On the 29th July Rajjab Ali "suggested to the king to throw open the gates and admit the English Force, as by that course though he may lose his life, his family would have great claims on the British." (*Punjab Mutiny Records*, vol. VIII pt. I, p. 281)

৮. Martin : *Indian Empire*, vol. III, pp.176-77

জীবন্ত রাখা হয়েছে এইজন্যে যে, ইংরেজরা এসে পৌঁছলে তাদের প্রত্যর্পণ করা হবে। তারপর সিপাহিরা, বাহাদুর শাহ যে ৫২ জন ইংরেজ বন্দীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের প্রাসাদ থেকে বের করে নিয়ে হত্যা করেছিল।

মে ও জুন মাসে প্রায় প্রতিদিনই সিপাহিরা এইভাবে কোনো-না কোনো বিশ্বাসঘাতক সম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করছিল। ২৬শে মে আবার আসাদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো (ইতিমধ্যে মইনউদ্দিনের স্থানে আসাদুল্লাকে দিল্লির কোতোয়াল নিযুক্ত করা হয়েছে) যে, সে ইসলামগড় বুরুজের কামানগুলির মধ্যে বালি সুরকি ও পাথর ঢুকিয়ে রেখেছে। সিপাহিরা এবার এতই ক্ষিপ্ত হলো যে,আসাদুল্লা ও মেহবুব আলিকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সিপাহিরা আরো অভিযোগ করল যে, এই দুই ব্যক্তি চক্রান্ত করছিল—কি করে সিপাহিদের দিল্লির বাইরে ইংরেজের সঙ্গে লড়বার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, যাতে তারা ধ্বংস হতে পারে। ২৭শে মে সিপাহিরা আবার দেখতে পেল কতকগুলি কামানকে নষ্ট করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। "এর ফলে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হলো ও সকলেই বলতে লাগল যে, শহরে ইংরেজদের অনেক শক্তিশালী বন্ধু আছে।"[৯]

এবার সিপাহিরা মেহবুব আলি ও আসাদুল্লাকে গ্রেপ্তার করে তাদেরই বাড়িতে আটক করে রাখল এবং তাদের বাহাদুর শাহের সঙ্গেও দেখা করা বন্ধ করে দিল। ২৯শে মে তাদের খুব প্রহার করা হলো। কয়েকদিন পর বিচারের জন্যে তাদের দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দুটি আবার কোরান স্পর্শ করে বলল যে, তারা এসব কাজ করেনি, অথবা ইংরেজদের সঙ্গে কোনো চিঠি লেখালেখিও করেনি—যে চিঠি ধরা পড়েছে সে চিঠি তারা লেখেনি, তাতে তাদের নাম জাল করা হয়েছে। এরপর এই বিশ্বাসঘাতক দুটিকে আবার বাহাদুর শাহের কথায় ছেড়ে দেওয়া হলো। ১৪ই জুন মেহবুব আলির স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়।[১০] পাতিয়ালার রাজার ভাই রাজা অজিত সিং বিদ্রোহের সময় দিল্লিতে বাস করছিলেন। একদিন সিপাহিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে দরবারে নিয়ে

৯. Metcuff: *Two Native Narratives*, pp. 10:-4. একজন ভারতীয় গুপ্তচর দিল্লি থেকে ২৮শে জুলাই তার ইংরেজ প্রভুদের লিখেছে: "If I have your permission I will introduce my younger brother on some trifling pay into General Bakht Khan's office, and then we shall get authentic news of everything. But I require a written guarantee of your consent to this plan."—*Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. I, p. 280)

১০. *Two Native Narratives*, p. 104-7

এসে বাদশাহের নিকট হাজির করল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর ভাই ইংরেজবন্ধু পাতিয়ালার রাজার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। বাদশাহ বললেন যে, অজিত সিং তাঁর ভাইয়ের কাজের জন্যে দায়ী নন। সুতরাং বাদশাহ তাঁকেও ছেড়ে দিতে হুকুম করলেন।[১১]

সম্ভ্রান্তবংশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কিছু করতে না পারলেও, অন্যান্য অপরাধীদের সম্বন্ধে সিপাহিরা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে চিঠি বিনিময় করার সময় যখন আলিপুরের থানাদার ধরা পড়ল, তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়ালিতে এনে গুলী করে মারা হলো ও তার মৃতদেহ জনসমক্ষে একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখা হলো।[১২] পাঁচজন কসাই যখন ইংরেজ শিবিরে মাংস পাঠাচ্ছিল, তখন তাদের গলা কেটে ফেলা হয়েছিল। এবং আরো যারা এই-রকম কাজে ধরা পড়েছিল, তাদেরও একই শাস্তি দেওয়া হয়।[১৩] ইংরেজকে সংবাদ সরবরাহ করার সময় পিয়ামল নামক একজন ধনী মাড়োয়ারি ব্যবসা-দারও সিপাহিদের হাতে ধরা পড়ে।[১৪]

কিন্তু বারবার এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার ফলে এইসব সম্ভ্রান্তবংশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাহস অনেক বেড়ে গেল এবং কয়েকদিনের জন্যে দরবারে তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠল যে, বেসামরিক লোকের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম অভিযোগ করা, তা যতই যুক্তিসংগত হোক-না কেন, খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠল। দিল্লির সরাইগুলির তত্ত্বাবধায়ক আলি খান ও খোদাবক্স ২৫ শে জুন দরবারে অভিযোগ করলেন যে, লুঠপাট করার জন্যে যেসব দুশ্চরিত্রদের হাতে-হাতে ধরা হয়েছিল তাদের আসাদুল্লা ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, তাছাড়া শহরে যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয় ও ব্যবসাবাণিজ্য আবার শুরু হয় তার জন্যেও সুব্যবস্থার দাবি করলেন। কিন্তু আসাদুল্লার শাস্তির পরিবর্তে তাকে অপবাদ দেওয়ার জন্যে এই অভিযোগকারী দু'জনকে দিল্লি থেকে বহিষ্কারের হুকুম দিতে দরবার বাহাদুর শাহকে বাধ্য করল।[১৫]

এরকম অরাজক অবস্থায় দিল্লির জনসাধারণ যে খুবই হতাশ হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি? জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছে: "শহরে এরকম অবস্থা দেখে জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও নিজেদের বিপন্ন বোধ করতে লাগল। একদিকে যেমন শহরের বাইরে ও ভিতরে ভারতবাসীদের মধ্যেই

---

১১. Metcuff : *Two Indian Narratives*, p. 11

১২. *Ibid*, p. 11

১৩. *Ibid*, p. 143

১৪. *Ibid*, p. 117

১৫. *Ibid*, p. 127

অনেক শত্রু রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ক্রোধোন্মত্ত ইংরেজের উদ্যত আক্রমণের করাল ছায়া।”[১৬]

জুলাই মাসের শেষদিকে ও আগস্ট মাসের প্রথমে দিল্লির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে উঠল যে, ৪ঠা আগস্ট একদল সিপাহি-অফিসারদের প্রতিনিধি বাদশাহের নিকট গিয়ে পুনরায় অভিযোগ করলেন, এখনো আসানুল্লা ইংরেজদের কাছ থেকে আদেশ-নির্দেশ পাচ্ছে। পূর্বের মতো বাহাদুর শাহ এই অভিযোগে এবারও কর্ণপাত করলেন না।[১৭] এই ঘটনার মাত্র ৩ দিন পরে বেগম সমরুর বাড়িতে অবস্থিত বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটল, যার ফলে ৪৯৪ জন মারা গিয়েছিল ও মাত্র ১৩ জনের প্রাণ বেঁচেছিল। সিপাহিরা এই দুষ্কর্মের জন্যে আসানুল্লা ও নবাব হাসান আলি খানকে সন্দেহ করল ও তাদের ধরবার জন্যে প্রাসাদে গেল। বিশ্বাসঘাতক দু'জন তখন প্রাসাদের উপাসনা ঘরে লুকিয়ে রইল। এবার কিন্তু সিপাহিরা এত সহজে ছেড়ে দিতে চাইল না। রাত্রে তারা আবার প্রাসাদ ঘেরাও করে বাদশাহের নিকট দাবি করল যে, আসানুল্লাকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা ধরে বাদশাহ সিপাহিদের এই দাবি অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি তাদের সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। শহরে আরো অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে গ্রেপ্তার করা হলো। এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলো মুন্সি জীবনলাল স্বয়ং।[১৮] স্বভাবতই শহরে

১৬. *Ibid*, p. 122

১৭. *Ibid*, p. 180. সিপাহিদের এই রকম অভিযোগ যে একেবারেই অসত্য ছিল না, সে সম্বন্ধে গুপ্তচর জীবনলাল নিজেই লিখেছে যে, ৪ঠা আগস্ট স্যার জন মেটকাফের নিকট থেকে সে একটি চিঠি পেয়েছিল। সে চিঠিতে তিনি তাকে আশ্বস্ত করে লিখেছিলেন যে, ইংরেজরা শীঘ্রই দিল্লি দখল করবে। (*Ibid*, p. 182)

১৮. *Ibid*, p. 185-86. গৌরীশঙ্কর নামক আর একজন ইংরেজের গুপ্তচর দিল্লির ঐদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে তার প্রভুদের কাছে নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠিয়েছিল : “সিপাহিরা গতকাল হাকিম আসানুল্লার বাড়ি লুঠ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাকিম লালকেল্লায় বন্দী হয়ে আছেন। তাদের হাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক বলে সিপাহিরা দাবি করল, এবং যদি তা না করা হয় তাহলে বাদশাহকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মেরে ফেলা হবে বলে তারা ভয় দেখাল। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ হাকিমকে সিপাহিদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তাদের তিনি বললেন যে, যদি হাকিমের কোনো অনিষ্ট হয় তাহলে তিনিও আর বাঁচবেন না।…জিন্নৎ মহলও সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন।… একদল প্রহরী তাঁর বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, তা নইলে তা লুঠ হয়ে যাবে। কোনো

খুব একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। বিশেষ করে দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, ধনী, ব্যবসায়ী ও আরো অনেকের বাড়ির দরজা খোলা হলো না এবং এইসব লোক ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বের হলো না। এমনকি জিন্নৎ মহলকেও সিপাহিরা সন্দেহ করতে শুরু করল ও তাঁর বাড়িতেও পাহারা বসাল। বাহাদুর শাহ নিজেও আসাদুল্লার জন্তে এত ভয় পেয়েছিলেন যে, তাঁর তিন ছেলে মেহদি, খিজির ও আবদুল্লাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—যে-কোনো উপায়েই হোক আসাদুল্লার জীবন বাঁচাতে হবে। বাদশাহ সিপাহিদের ভয় দেখিয়েছিলেন যে, যদি তারা আসাদুল্লাকে হত্যা করে তাহলে তিনি নিজে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন।

আসাদুল্লার বাড়ি তল্লাসি করে সিপাহিরা ইংরেজ শিবির থেকে লিখিত একটি চিঠি পেয়েছিল।[১৯] অনেক নবাব, সম্ভ্রান্ত ও ধনীদের বাড়িও সিপাহিরা তল্লাসি করেছিল। প্রায় ৫০ জন সিপাহি যখন নবাব সদরউদ্দিন খানের বাড়ি তল্লাসি করতে যায়, সেখানে ৭০ জন সশস্ত্র লোক তাদের বাধা দিয়েছিল এবং সেই বাধা পেয়ে সিপাহিরা ফিরে যায়। এইভাবে যখন শাহজাদা আবদুল্লার ২০০ লোক নিয়ে আমিনুদ্দিন ও জিয়াউদ্দিনের বাড়িতে যান তখন তারা আরো বেশি লোক নিয়ে বাধা দিয়েছিল। এই লোক দুটির নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল।[২০] এই দিনও বিদ্রোহীদের যে কোনো সঠিক পরিকল্পনা ছিল না, তা নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায়।

শাহজাদা আবুবকর অনেকগুলি মহাজন ও সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং এদের মধ্যে ৩০ জনের বিচার করলেন শাহজাদা মির্জা মোগল, তাদের মধ্যে মুন্সি জীবনলালও ছিল একজন। আর মির্জা এলাহি বক্স, নিজে একজন প্রধান আসামী হওয়ার পরিবর্তে হলেন এইসব অভিযুক্তদের উকিল। এলাহি বক্সের যুক্তি শুনে দুর্বলচিত্ত মির্জা মোগল তাদের সকলকেই খালাস করে দিলেন।[২১] যখন দরবারে শাহজাদা খিজির সুলতান প্রস্তাব করলেন—যে, সমস্ত সন্দেহজনক লোকদের ও ইংরেজের গুপ্তচরদের গ্রেপ্তার করে বন্ধ করে রাখা হোক, তখন তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলো।[২২]

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আজ দরবারে যাননি। কাউকেই শহরের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।" (*Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p. 304). "The sepoys suspect Hakim Ahsanullah of being in treacherous correspondence with us, and between ourselves. I believe they are not far wrong." (Kieth Young : *Delhi*, p. 186)

১৯. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p. 310

২০. Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 191

২১. *Ibid*, pp. 188-89

২২. *Ibid*, p. 192

১০ই আগস্ট হাকিম আসানুল্লাকে ছেড়ে দেওয়া হলো এই শর্তে যে, সে শুধুমাত্র হাকিমি ব্যবসা করবে ও অন্য কোনো কাজে থাকবে না। বাদশাহের অনুরোধে মির্জা মোগল, খিজির খাঁ ও আবদুল্লা আসানুল্লাকে তার বাড়িতে পৌছে দিয়ে এলেন। যে সমস্ত শ্রমিক বারুদখানায় প্রাণ হারিয়েছিল, বাহাদুর শাহ তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলেন।[২৩]

উপরের ঘটনাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জেনেশুনেও বাহাদুর শাহ বারবার মেহবুব আলি, এলাহি বক্স, আসানুল্লা প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদের রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। বাহাদুর শাহ নিজে যে তাদের হীন চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো প্রমাণ নেই।[২৪] বরং এটাই দেখা যায় যে, বাহাদুর শাহের শুভাকাংক্ষীরা যখন দু'একবার তাঁকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে ইংরেজের নিকট চিঠি লিখতে পরামর্শ দিয়েছিল, তখন তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এইসব বিশ্বাসঘাতকরাই ছিল তাঁর আজীবনের সহচর, এবং এই দুর্বলতাবশত বৃদ্ধ বয়সে তাদের ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে সিপাহিরাও, তাদের নিজেদের ক্ষমতাসম্পন্ন একটা কোর্ট থাকা সত্ত্বেও, এইসব বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে সময়মতো কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি। তাদের এই দুর্বলতার, সুযোগ নিয়ে এবং বাহাদুর শাহের আশ্রয়ে থেকে এইসব দুর্বৃত্তরা তাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পেরেছিল।

বিদ্রোহীদের আরো একটা মারাত্মক গৃহশত্রু ছিল—তা হলো সাম্প্রদায়িকতাবাদ। এতে গোঁড়া হিন্দুও যেমন ছিল, গোঁড়া মুসলমানও তেমন ছিল—এদের

২৩. *Ibid*, p. 193; *Punjab Mutiny Records*, vol. III, part I, p. 352

২৪. যদিও বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া যায় যে বাহাদুর শাহ ও আরো অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন (জগতে এমন বিদ্রোহ বা বিপ্লব কি ঘটেছে যেখানে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নেই?), তাতেও এই গণবিদ্রোহের মূল চরিত্রের কিছুমাত্র লাঘব হয় না। অধ্যাপক চৌধুরী ঠিকই বলেছেন : "This does not by any means indicate that the objective of the Indians was anything less than the overthrow of the British Rule. The movement in Delhi was directed to that end and achieve its purpose for the time being despite individual apathy or even opposition which counted very little in the surging tide of revolt that swept over the country in the glorious days of 1857." (*Civil Resistance* etc., p.75)

মধ্যে অনেকের সঙ্গেই ইংরেজদের যোগাযোগ ছিল। এরা গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে এবং ইংরেজের প্ররোচনায় সিপাহিদের ও জনসাধারণের সংগ্রামী ঐক্য ভাঙবার বহু চেষ্টা করেছে। বাহাদুর শাহ এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম থেকেই যে দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

৯ই জুলাই, ঈদের সময় একটা ভয়ানক দাঙ্গার চক্রান্ত হয়েছিল। এই সময়ে বাহাদুর শাহ ও বিদ্রোহী নেতারা যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার ফলে কোনো দাঙ্গা ঘটতে পারেনি। ১লা আগস্টের ঈদের সময়ও আবার সেই দাঙ্গার চেষ্টা হলো। এবার টিলার ক্যাম্পে ইংরেজরা খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এবারও ইংরেজদের নিরাশ হতে হলো। একজন ইংরেজ অফিসার আতঙ্কিত হয়ে লিখলেন: এ কি ব্যাপার, বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি না করে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুকে আক্রমণ করছে! ভয়ংকর যুদ্ধ ছাড়া দিল্লি পুনর্দখল করার আর কোনোই আশা রইল না।[২৫]

---

২৫. *Kieth Young*, pp. 160, 171

বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে : ২ ধনী – মহাজন

১১ই মে, যেদিন দিল্লিতে সিপাহিরা ও জনসাধারণ ইংরেজদের হত্যা করল ও তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, স্বভাবতই সেদিন ধনী, মহাজন, ব্যবসাদার ও দোকানদারদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তার পরদিন, ১২ই তারিখেও শহরের কোনো দোকান খোলা হলো না। ফলে, কেবলমাত্র ২,৫০০ সিপাহিই নয়, শহরবাসীরাও কোনোরকম খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস কিনতে পেল না। ঐ দিন কিছু দোকানপাট লুঠ হয়েছিল, তবে সিপাহিরা তাতে অংশগ্রহণ করেছিল কিনা সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। বিদ্রোহের সময় প্রায় সর্বত্রই দেখা গিয়েছে যে, সাধারণত সিপাহিরা সাধারণ মানুষের দোকান ও বাড়িঘর লুঠপাটের বিরোধী ছিল।[১] একথা সত্য যে, তারা অনেকে

১. দিল্লির এই সময়কার অবস্থার বিষয়ে অধ্যাপক মজুমদার বলেছেন যে, **"indiscriminate plunder by the sepoys was the order of the day···The sepoys also quarrelled among themselves over the share of the loot they had secured from the shop keepers and rich citizens of Delhi." (p. 73)** কথাটা কি ঠিক 'নিরপেক্ষ' ইতিহাসজ্ঞের মতো হলো? মোটকথা হলো, ইংরেজ বাহিনী ছিল ভাড়াটিয়া (**mercenary**) সৈন্যদের নিয়ে তৈরি, তাতে নানা রকমের লোকই থাকত – ভাগ্যান্বেষী, গুণ্ডা, বদমায়েশ যেমন থাকত, ভালো সৈন্যও তেমনই থাকত। **Mead** তাঁর ***Sepoy Revolt*** (**p. 99**)-এ এক '**native reporter**'-এর কথায় বলেছেন যে – **"they (mutineers) considered it *huram* and would not condescend to touch the body themselves."** কাপুরতলার রাজার গোমস্তা ১৩ই মে দিল্লি থেকে লিখেছিল, – **"The sepoys are ready to give their lives and to take the lives of others ..The civilization of 53 years has been destroyed in 3 days...The sepoys are without a leader."** এইভাবে অনেক সিপাহি বিদেশী শত্রুর হাত থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্যেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু আবার কিছু কিছু সিপাহির দৃষ্টি ছিল লুঠপাটের দিকে। দিল্লির উর্দু সংবাদপত্র 'আকবর' ৩১শে মে লিখেছিল যে, কিছু কিছু বিদ্রোহী সিপাহি লুঠপাট করে খুব ধনী হয়ে গিয়েছে এবং আরো কিভাবে তারা তাদের ধনসম্পদ বাড়াবে

ইংরেজ সরকারের ধনাগার লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্যে তারা তা করেনি ; এই লুঠের অর্থ তারা সমষ্টিগতভাবে বিদ্রোহের কাজেই লাগিয়েছিল। ১১ই মে, দিল্লিতে দেখা গিয়েছিল যে, উন্মত্ত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে তারা ইংরেজ নিধন করতে ও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতেই ব্যস্ত ছিল। লুঠপাট যারা করেছিল তারা শহরের গুণ্ডা, বদমায়েশ, দুশ্চরিত্রের দল। সর্বদেশে, সর্বসময়ে ১১ই-১২ই মে'র মতো দিল্লির পরিস্থিতি এই দুশ্চরিত্রদের স্বর্ণ সুযোগ করে দেয়। কঠিন হাতে সত্বর এদের দমন না করতে পারলে তারা যে-কোনো গণবিদ্রোহকে সহজেই বিপন্ন করে তুলতে পারে।

১২ই মে সিপাহিরা প্রথম বাদশাহের দরবারে অংশগ্রহণ করল ও ৩টি সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করল : শহরে লুঠপাট দমন করতে হবে ও শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে ; দোকানপাট সব খোলার ব্যবস্থা করতে হবে ; সিপাহিদের রেশনের বন্দোবস্ত করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহের দু'একদিন পরেই বাহাদুর শাহ কোতোয়ালকে সিপাহিদের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ লুঠপাট দমন করতে হুকুম করেছিলেন। এ ছাড়াও, সঙ্গে সঙ্গে "বাদশাহ মির্জা মোগলকে একদল সিপাহি নিয়ে লুঠপাট থামাবার জন্যে হুকুম করলেন। সেই অনুসারে শাহজাদা হাতি চড়ে কোতোয়ালিতে গেলেন ও টমটম দিয়ে শহরে ঘোষণা করে দিলেন যে, যারাই লুঠ করবে তাদের ধরে নাক-কান কেটে দেওয়া হবে এবং যদি কোনো দোকানদার তার দোকান না খোলে, অথবা সিপাহিদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ না করে, তাহলে তাকে বন্দী করা হবে ও তাকে জরিমানা দিতে হবে।[২]

কিন্তু এসব করার পরও শহরের দোকানপাট খুলল না। তখন সিপাহিদের অনুরোধে বাহাদুর শাহ স্বয়ং হাতিতে চড়ে দু'দল সিপাহি নিয়ে ও জওয়ান বখতকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদনিচকে গেলেন ও দোকানদারদের দোকান খুলতে ও সিপাহিদের নিকট জিনিসপত্র বিক্রি করতে বললেন।[৩] বাদশাহের এই রকম অনুরোধের পরও যখন দেখা গেল যে, অনেক বড় বড় দোকানদার তাদের দোকান খুলল না, তখন তিনি আবার সিপাহিদের অনুরোধে দ্বিতীয়বার শহরে গেলেন ও পুনরায় দোকানদারদের দোকান খুলে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে

তার চেষ্টা করেছে। এক শ্রেণীর ইতিহাসবিদ আছেন যাঁদের দৃষ্টি এইসব সিপাহিদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে, কানা চোখে স্বদেশপ্রেমিক সিপাহিদের দেখতে পান না।

২. Martin : *Indian Empire*, vol. III, pp. 273-74

৩. *Ibid*, p. 274

বললেন।[৪] সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হলো। কাহী খান, গামা পালোয়ান, সরফরাজ খান ও কতকগুলি কুখ্যাত গুণ্ডাকে বন্দী করে রাখা হলো, আর যারা লুঠপাট করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল তাদেরও খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হলো।[৫] এসব ছাড়াও, বাহাদুর শাহ আর একটি কাজ করলেন। তিনি শহরের প্রধান ব্যবসাদার ও মহাজনদের তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন ও তাদের বললেন খাদ্যশস্যের দাম ধার্য করে দিতে, দোকান খুলতে ও যাতে সিপাহিরা তাদের রেশন পায় তার ব্যবস্থা করতে।[৬]

বাহাদুর শাহ ও সিপাহিদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ কোনো ফল হলো না। শহরের প্রধান প্রধান মহাজন ও ব্যবসাদাররা, যারা ইংরেজের রাজত্বে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়ে উঠেছিল, তারা বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও শত্রুতা শুরু করে দিল। অন্যান্য দোকানদাররাও যাতে তাদের নিজেদের দোকান না খোলে, তার জন্যেও তারা সচেষ্ট হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দামও খুব দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল।[৭] সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহিদের সম্বন্ধে নানা রকম জঘন্য গুজব ছড়িয়ে জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করল। স্বভাবতই সিপাহিরাও এইসব কারণে মহাজন ও

৪. Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 87

৫. Martin : *Indian Empire*, vol. III, p. 174. যখন সংবাদ পাওয়া গেল সবজিমণ্ডিতে, তালেবরে ও ক্যাণ্টনমেণ্টে গুণ্ডারা দোকানপাট লুঠ করছে. বাহাদুর শাহের হুকুমে মির্জা আবু বকর তৎক্ষণাৎ একদল অশ্বারোহী নিয়ে ঐ গুণ্ডাদের গ্রামে গিয়ে সমস্ত গ্রামটিকে জ্বালিয়ে দিলেন। (Ibid, p. 174)। আর একটি উদাহরণ : "দুজন তাঁতি সিপাহি পোশাক পরে নাগরিকদের লুঠপাট করছিল। তাদের ধরা হলো। লাহোর গেটের দোকানদাররা থানাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তাদের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা ঘুষ দাবি করেছে ; এই টাকা না দিলে সে সকলকে বন্দী করবে বলে ভয়ও দেখিয়েছে। থানাদারকে গ্রেপ্তার করা হলো।" (*Ibid*, p. 177)

৬ *Ibid*, p.174

৭. একজন 'native reporter' লিখেছে যে—"**supplies have been stopped, everything becoming exceedingly dear, viz. attah 13 seers, wheat 18 seers, ghee one and a half seer etc . After plundernig Delhi, 200 troopers proceeded to Gurgaon··· plundered the treasury, bringing away Rs. 7 lakhs and ৪4 thousand rupees, which is kept in the palace guarded by them and the kings troops.** " (**Mead, p. 101**)

দোকানদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হতে লাগল।

১৪ই মে, সিপাহি-অফিসাররা দরবারে মিলিত হয়ে বাহাদুর শাহকে জানালেন যে, সিপাহিদের জন্যে যদি অবিলম্বে রেশনের কোনো ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তাদের শহর লুঠ করতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তখনি বাহাদুর শাহ সিপাহিদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে নবাব মেহবুব আলি ও আসানুল্লাকে হুকুম করলেন।[৮] বাদশাহ আবার মহাজনদের দরবারে ডেকে পাঠালেন ও সিপাহিদের সংকল্পের কথা বলে তাদের বললেন : হয় তাদের এবার দোকান খুলতে হবে, তা নইলে যেন তারা সিপাহিদের দ্বারা লুঠপাটের জন্যে তৈরি থাকে। এবার আশ্চর্য রকমের ফল হলো; কয়েক মিনিটের মধ্যে দিল্লির সমস্ত দোকান খুলে গেল ও শহরের জীবনযাত্রা একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেল।

কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান হলো তো সঙ্গে সঙ্গে আরো গুরুতর আর একটি সমস্যার আবির্ভাব হলো। দোকানপাট খোলা হলো বটে, কিন্তু সিপাহিরা খাদ্য-দ্রব্য কিনবে কি করে? বাদশাহের নিজের কোনো ধনাগার কিংবা সঞ্চিত ধন ছিল না—যার থেকে তিনি সিপাহিদের বেতন দিতে পারেন। রাজস্ব আদায় করে ধনাগার পুনর্গঠন করা—তা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু সিপাহিদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা, এই ন্যূনতম চাহিদা মেটানোও যে আশু কর্তব্য। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল ধনী মহাজনদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। বিদ্রোহীদের এই সংকটপূর্ণ সময়ে এরকম দাবি মোটেই অসংগত হয়নি।

দরবার কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির লক্ষপতিরা এর প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল ও তার থেকে রেহাই পাবার জন্যে নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছে যে, ১৮ই মে "কয়েকজন মহাজন মেহবুব আলির নিকট গিয়ে জানাল, তারা কোনো অর্থ দিতে পারবে না, কারণ তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের সাবধান করে দেওয়া হলো যে, তারা যদি সিপাহিদের তহবিলে নিজে থেকে টাকা না দেয়, তাহলে সিপাহিরাই জোর করে তাদের টাকা কেড়ে নেবে।"[৯] মহাজনরা এর পর বাদশাহের সঙ্গে দেখা করল, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না। শেষ পর্যন্ত তারা টাকা দিতে বাধ্য হলো। ২১শে মে বাদশাহের চেষ্টার ফলে নবনিযুক্ত অফিসাররা বেতন দেবার জন্যে মহাজনদের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হলো।[১০]

৮. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 99
৯. *Ibid*, p. 105
১০. *Ibid*, p. 99

কিন্তু এই সামান্য অর্থে সিপাহিদের ন্যায্য দাবির একটা ভগ্নাংশও মেটানো সম্ভবপর হলো না। একটা সাময়িক প্রতিকার হিসাবে বাহাদুর শাহ প্রস্তাব করলেন যে, অশ্বারোহীদের প্রত্যেককে ৯ টাকা ও পদাতিকদের ৭ টাকা করে দেওয়া হোক। কিন্তু এই নিয়ে সিপাহিদের মধ্যেই এবার বিবাদ শুরু হয়ে গেল। মিরাটের অশ্বারোহীরা ৩০ টাকা দাবি করল, আর দিল্লির পদাতিকরা ৭ টাকা হিসাবে নিতে রাজী হলো।[১১]

এইভাবে জুন মাস এসে গেল, কিন্তু বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সমাধানই হলো না। মহাজন ও ধনীরা তাদের অসহযোগ পুরোমাত্রায় চালিয়ে যেতে লাগল। ১লা জুন "বাদশাহের ধনাগারে ৩ লক্ষ টাকা দেবার জন্যে গিরবার সিংহ ও গিরধারী লাল নামক দু'জন মহাজনের ওপর হুকুম হলো। না দিলে তাদের সমস্ত সম্পত্তি তো বাজেয়াপ্ত করা হবেই, অন্য শাস্তিও দেওয়া হবে। তার ফলে দুই মহাজন ২ লাখ কয়েক হাজার টাকা দিল।"[১২]

এই বিষয়ে সিপাহিরা আরো দাবি করল যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার জন্যে কেবলমাত্র মহাজনদের কাছ থেকেই টাকা আদায় করলে হবে না, দিল্লির দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নবাব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও টাকা আদায় করতে হবে। নবাব আমিনউদ্দিন আহম্মদ খান ও নবাব জিয়াউদ্দিন আহম্মদ খানের নিকট টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা যখন টাকা দিতে অস্বীকার করলেন, বাহাদুর শাহ তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন না।[১৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এইসব ব্যক্তিরা ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময় করেছিল ও তাদের বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে তাদের নিজস্ব বাহিনীও ছিল।

অনেক সময় এইসব সন্দেহজনক ধনীদের সম্পত্তি লুঠ হতো ও তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। "এইরকম পাইকারি ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ধনীদের একটা সভা হলো। সেখানে একটা কমিটি করে ঠিক হলো যে, এক একটা বাহিনীকে মাসিক কিছু টাকা দিয়ে তাদের ওপর শান্তি রক্ষার ভার দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা সফল হলো এবং কিছুকালের জন্যে এইসব ব্যক্তিরা নিরাপদে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু যেসব শাহজাদাদের এইসব বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁরা দ্রুত এই চুক্তির বিরুদ্ধে

১১. *Ibid*, p. 105
১২. *Ibid*, p. 111
১৩. *Ibid*, p. 66

আপত্তি জানালেন এবং উক্ত কমিটির লোকদের ডেকে জরিমানা আদায় করলেন ও তাঁদের বন্দী করে রাখলেন।"[১৪]

ইত্যবসরে জুন মাসের মাঝামাঝি হতে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন বিদ্রোহী বাহিনীগুলি দিল্লিতে এসে পৌছতে লাগল। তার ফলে সিপাহিদের সংখ্যা শহরে খুব বেড়ে যেতে লাগল। প্রথমত, ১২ই জুন আলিগড় থেকে ও ১৪ই জুন ঝাঁসি থেকে দুটি ছোট বাহিনী এসে পৌছল। তারপর ১৯শে জুন মধ্য-ভারতের নাসিরাবাদ থেকে এলো একটি বড় বাহিনী, ২২শে জলন্ধর বাহিনী। এইসব সিপাহিদের আগমনের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি একদিকে যেমন বর্ধিত হলো, অন্যদিকে তেমনি দিল্লির বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক সমস্যা খুবই জটিল হয়ে উঠল এবং তার সঙ্গে আরো অনেক রকম সমস্যার আবিভাব হলো।

এইভাবে ২রা জুলাই যখন বখ্‌ত খানের নেতৃত্বে শক্তিশালী বেরিলি বাহিনী দিল্লিতে পৌছল তখন সকলেই মনে করেছিল যে, এখন থেকে হয়তো শহরের অবস্থা ভালো হতে থাকবে। বখ্‌ত খানের আসার সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর শাহ ও সিপাহি-দরবার (Military Court) তাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। বখ্‌ত খান প্রথমেই শহরের মহাজন, ধনী, নবাব ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে শহরের পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্যে তাঁদের একটা সভায় ডেকে পাঠালেন। কিন্তু সভায় আসার পরিবর্তে তাঁরা বাদশাহের দরবারে গিয়ে নালিশ করলেন যে, বখ্‌ত খান নিজের বাড়িতে তাঁদের ডেকেছেন এবং এই অনুরোধ তিনি চিঠির দ্বারা না জানিয়ে পুলিশের দ্বারা হুকুম করে পাঠিয়েছেন, —এতে তাঁরা খুব অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করছেন।[১৫] এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা গেল যে, বখ্‌ত খানের সঙ্গেও তাঁরা অসহযোগ চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প। যাই হোক, বখ্‌ত খান ১৪ জন হিন্দু ও ১৪ জন মুসলমানকে নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করলেন, যার কাজ হলো কার কত টাকা দিতে হবে সেটা ধার্য করা ও সেই টাকা আদায় করা।[১৬] সঙ্গে সঙ্গে বখ্‌ত খান কাছাকাছি বিদ্রোহী জেলাগুলিতে লোক পাঠিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্যেও চেষ্টা করতে লাগলেন। যেমন, হাসান আলি খানকে পাঠালেন জাজরের রাজার নিকট থেকে ৩ লক্ষ টাকা বাকি রাজস্ব আদায় করবার জন্যে।[১৭] বখ্‌ত খান ঋণ

১৪. *Ibid*, p. 59

১৫. *Ibid*, p. 59

১৬. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p. 316

১৭. Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 173

সংগ্রহ করারও চেষ্টা করলেন।[১৮]

কিন্তু এত চেষ্টার পরও বিদ্রোহী সরকার জুলাই ও আগস্ট মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যার কোনোই সমাধান করতে পারল না। আগস্ট মাসে দরবার থেকে ঘোষণা করা হলো যে, দিল্লির প্রতিটি গৃহস্বামীকে ৩ মাসের ট্যাক্স অগ্রিম দিতে হবে, এবং কেউ যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার গুরুতর শাস্তি হবে। কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টায় মূল সমস্যার কোনো প্রতিকারই হলো না, বরং অরাজকতা ও বিশৃংখলা আরো বেড়ে গেল। বিদ্রোহী সরকারের এরকম দুর্বলতার প্রধান কারণ হলো, সিপাহিরা ও বিদ্রোহী জনসাধারণ তাদের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়নি, এবং কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক সামন্ত ও উচ্ছৃংখল শাহজাদাদের দ্বারা গঠিত বাদশাহের দরবারেরও এই কঠিন কাজটি সম্পাদন করার মতো কোনো যোগ্যতা ছিল না।

বস্তুত, শাহজাদাদের যথেচ্ছাচার দিল্লির এই বিশৃংখল পরিস্থিতিকে আরো বিপজ্জনক করে তুলল। তাদের বিরুদ্ধে বলপূর্বক টাকা আদায় করার ও নানা-রকম অত্যাচারের অভিযোগ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ৫ই জুলাই, বাদশাহের এক পুত্রবধূ ইমানী বেগম বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন যে, পূর্বরাত্রে আবু বকর মাতাল অবস্থায় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে; তারপর আবু বকর তাঁর বাড়ি লুঠ করেছিল। বাদশাহ শুনে খুব রাগান্বিত হলেন ও আবুকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন। সেই সঙ্গে "বাহাদুর শাহ অফিসারদের জানিয়ে দিলেন, যদি শাহজাদারা কোনো রকম অত্যাচার করে তাহলে তাদের সাধারণ লোকের মতো গণ্য করতে হবে।"[১৯] বাদশাহ আর একটি হুকুমের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাকে সিপাহি বাহিনীর পদ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন।[২০] পরদিন ৬ই জুলাই তিনি প্রকাশ্য দরবারে মির্জা আবদুল্লা ও আরো কয়েকজন শাহজাদাকে তাদের দুর্ব্যবহারের জন্যে ভর্ৎসনা করলেন এবং "তারা যে টাকা মহাজনদের নিকট থেকে জোরপূর্বক আদায় করেছে, তাদের সেই টাকা ধনাগারে দিতে আদেশ করলেন; অন্যথায় তাদের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।"[২১]

১৭ই আগস্ট বখ্‌ত খান আবার বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন :

১৮. শহরের অন্যতম দু'জন বড় মহাজন, রামজীমল ও জীতমলকে বখ্‌ত খান ৫ লাখ টাকা ধনাগারে ঋণ দিতে বললেন। জীবনলালকেও এইভাবে ২৫ হাজার টাকা দিতে বলা হলো। (*Ibid*, pp. 172-73)

১৯. *Ibid*, p. 139

২০. Metcuff : *Two Native Narratives*, p.137

২১. *Ibid*, p. 140

শাহজাদারা সিপাহিদের বেতন দেবার অজুহাতে আবার মহাজনদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছে, কিন্তু সিপাহিরা সে টাকার কিছুই পায়নি। বাহাদুর শাহ বখ্‌ত খানকে সব টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্যে খিজির সুলতানকে হুকুম করলেন এবং আরো বললেন যে, ভবিষ্যতে কোনো টাকা আদায় হলে নাগরিকদের সামনে সেই টাকা বখ্‌ত খানকে দিয়ে দিতে হবে।[২২] কয়েকদিন পর স্বর্ণকাররা দরবারে অভিযোগ করল যে, খিজির সুলতান তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করেছেন।[২৩]

কিন্তু শাহজাদারাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিল না। তারা বখ্‌ত খানের বিরুদ্ধে চারদিকে রটাতে শুরু করল যে, তিনি ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। এইরকম গুজব রটানোর পক্ষে শাহজাদাদের একটা সুবিধা এই ছিল যে, বখ্‌ত খান তখনো পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনোরকম কৃতিত্বই দেখাতে পারেন নি। যাই হোক, বখ্‌ত খান দরবারে কোরান সাক্ষী করে শপথ করে বললেন যে, এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বাহাদুর শাহ এইরকম কুৎসা রটনা করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।[২৪]

আবার আগস্ট মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু সিপাহিরা তাদের বেতন পেল না। ২৫শে, অফিসারদের একটি প্রতিনিধিদল বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে সিপাহিদের বেতন দাবি করলেন। বাদশাহ তাঁর নিজের ঘরে গেলেন ও সমস্ত অলংকার এনে তাঁদের দিলেন। কিন্তু অফিসাররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন ও বললেন: "রাজ-অলংকার আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু আমরা এই দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, আপনি আপনার জীবন ও সম্পত্তি দিয়ে আমাদের বাঁচাতে প্রস্তুত আছেন।"[২৫] সিপাহিদের অর্থনৈতিক সংকটের জন্যে তারা কোনোদিনই বাহাদুর শাহকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করেনি।

বিদ্রোহীদের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্যে তারা নিজেরাও কম দায়ী ছিল না। দিল্লি আসার পূর্বে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজের ধনাগার তারা হস্তগত করতে পেরেছিল। প্রথম দিকে যেসব বিদ্রোহীদল দিল্লিতে এসেছিল তারা তাদের এই অর্থ বাদশাহের হাতে তুলে দিয়েছিল, যদিও তার পরিমাণ বেশি ছিল না। কিন্তু জুলাই মাসে বেরিলি বাহিনী আসার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল। এই বাহিনী যখন বেরিলিতে বিদ্রোহ করে,তখনঐ শহরের ধনাগার দখল করে তারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিল এবং তা থেকে প্রত্যেক সিপাহিকে ৬ মাসের বেতন

২২. *Ibid*, p. 197

২৩. *Ibid*, p. 209

২৪. *Ibid*, p. 205

২৫. *Ibid*, p. 207

অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। তারপর যা থাকল, তার পরিমাণও কম নয়, তা তারা দিল্লিতে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ; কিন্তু তা বাহাদুর শাহের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের কাছেই রেখে দিল। ঝাজর নবাবের উকিল কাশীপ্রসাদ তখন দিল্লিতে ছিলেন। তিনি ইংরেজের নিকট এক রিপোর্টে লিখেছেন : "বিদ্রোহী সিপাহিরা যেসব অর্থ নিয়ে এসেছিল তা তারা বাদশাহকে দিয়ে দেয়, কিন্তু ৩ সপ্তাহের মধ্যেই তা খরচ হয়ে যায়। বাদশাহ এই টাকা আলাদা করে রেখেছিলেন এবং কেবলমাত্র সিপাহিদের জন্যে ও যুদ্ধের গোলাবারুদের জন্যেই খরচ করেছিলেন। তিনি নিজের জন্যে এই টাকা খরচ করেন নি ; তাঁর নিজের প্রয়োজনের জন্যে শহরের মহাজনদের কাছ থেকে ধার করেছিলেন।··· বেরিলি বাহিনীর আগমনের পর থেকে বাদশাহকে আর কোনো বাহিনী টাকা দেয়নি। বেরিলি বাহিনী তাদের সিপাহিদের ৬ মাসের বেতন দিয়ে দিয়েছিল, আর বাকিটা তারা নিজেরাই রেখে দিয়েছিল। পরে যেসব বাহিনী এসেছিল, তারাও এই উদাহরণ অনুসরণ করেছিল।"[২৬]

এর পরে যেসব বিদ্রোহী বাহিনী দিল্লিতে এসেছিল তারাও বেরিলি বাহিনীর পন্থা অনুসরণ করতে লাগল। এই অর্থ তারা কিভাবে খরচ করেছিল সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এরকম খামখেয়ালি ব্যবস্থা সিপাহি বাহিনীগুলির পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও ও ঝগড়াঝাঁটির একটা প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াল। রাজদরবারের লোকদের সিপাহিরা বিশ্বাস করতে পারেনি ও সেই কারণে তারা তাদের হাতে টাকা তুলে দেয়নি—এ কথাটা বোঝা যেতে পারে। কিন্তু নিজেদের সিপাহি-কোর্টকে তারা কেন এই টাকা দিল না তা বোঝা খুবই কঠিন। বস্তুত যে পরিমাণ অর্থ সিপাহিদের নিজেদের নিকট ছিল এবং যে পরিমাণ টাকা দিল্লির ধনীদের কাছ থেকে তারা আদায় করতে পেরেছিল, তা যদি সব একত্রিত করা হতো ও সিপাহি-কোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো, তাহলে তাদের এই সংকট দেখা দিত না এবং যুদ্ধের কাজ তারা ভালোভাবেই চালিয়ে যেতে পারত। সিপাহিদের এই ব্যর্থতাই তাদের পরাজয়ের একটি কারণ হয়ে দাঁড়াল।

চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে আগস্ট মাসের শেষ দিন সিপাহিরা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও জানিয়ে দিল যে, তারা যদি দু'একদিনের মধ্যে বেতন না পায় তাহলে তারা শহরের সব ধনীদের লুঠ করবে। এই সংকট সমাধান করবার জন্যে একটা বিশিষ্ট দরবারে ৫০০ ধনী, মহাজন, নবাব ও অফিসাররা সমবেত হলেন। আসানুল্লা, জিয়াউদ্দিন, আমিনউদ্দিন সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহাজনরা ও স্বর্ণকাররা অভিযোগ করল যে, মির্জা মোগল ও মির্জা খিজির সুলতান তাদের কাছ

২৬. *Records of the Intelligence Dept.*, vol. II, p. 39

থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করেছে। কিন্তু শাহজাদারা বললেন যে, তাঁরা মাত্র ৪০ হাজার টাকা আদায় করেছেন। দু'পক্ষে খুব কথা কাটাকাটি হতে লাগল। অফিসাররা বললেন যে, যদি এই টাকা সিপাহিদের না দেওয়া হয় তাহলে তারা শাহজাদাদের বন্দী করবেন। অফিসাররা আরো বললেন যে, সিপাহিদের এখুনি বেতনের ব্যবস্থা না করলে কেউ তাদের শহর লুঠ করা বন্ধ করতে পারবে না। তখন বাদশাহ বললেন, "লুঠ করবার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আমার হাতি, ঘোড়া, সোনা, রূপা যাকিছু আছে সব বিক্রি করে সিপাহিদের বেতন দিয়ে দেব। যদি আমি তা না দিই, তাহলে তোমরা সকলে দিল্লি ত্যাগ করে চলে যেতে পারো, বিশেষ করে আমি যখন তোমাদের এখানে আসতে বলিনি। যদি তোমরা শহর লুঠ করো তাহলে তার আগে আমাকে হত্যা করতে হবে। তারপর তোমরা যা খুশি করতে পার।"[২৭] এই বলে বাদশাহ তাঁর নিজের শয়নঘরে চলে গেলেন।

অফিসাররা তখন মির্জা এলাহি বক্স, আসামুল্লা, সৈয়দ আলি খানকে ঘেরাও করল। ৬টা পর্যন্ত উত্তেজিতভাবে তর্কাতর্কি চলল। তারপর ঠিক হলো যে, একদিনের মধ্যে সিপাহিদের বেতনের অর্ধেক টাকা দিয়ে দেওয়া হবে, আর বাকি অর্ধেক বেগম জিন্নৎ মহল নিজে ১৫ দিনের মধ্যে শোধ করে দেবেন। এই বন্দোবস্তের ফলে যে ৩টি বাহিনী শহর লুঠ করবার জন্যে বাইরে আদেশের অপেক্ষা করছিল, তারা তাদের শিবিরে ফিরে গেল। কোনো শাহজাদাকে যেন প্রাসাদে ঢুকতে দেওয়া না হয়, এই হুকুম দিয়ে ৩টি কোম্পানিকে পাহারায় বসিয়ে অফিসাররাও চলে গেলেন।

পরদিন দরবার হিসেব করে দেখল যে, প্রতি মাসে সিপাহিদের জন্যে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার প্রয়োজন।[২৮] প্রতিশ্রুত দিনে সিপাহিদের এইভাবে কিছু কিছু করে দেওয়া হলো—রিসালদার ১২ টাকা, সুবাদার ৪ টাকা, জমাদার ৩ টাকা ও সিপাহি ২ টাকা।[২৯] বাদশাহ তারপর এলাহি বক্স, আসামুল্লা, মির্জা মোগল, সৈয়দ আমির আলি খানের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা নামের তালিকা তৈরি করলেন; ঠিক হলো এইসব ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা তোলা হবে।[৩০] বাহাদুর শাহ বললেন, এই টাকাগুলি হবে ধার; রাজস্ব আদায় হলেই এই টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

বাদশাহ ঐদিন ঢাক পিটিয়ে এক ঘোষণাপত্রের· দ্বারা দিল্লির অধিবাসীদের

২৭. *Ibid*, pp. 215-16
২৮. Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 216
২৯. *Ibid*, p. 217
৩০. *Ibid*, p. 218

জানালেন যে, শাহজাদাদের যেন আর কেউ কোনোরকম অর্থ না দেয় ; কিন্তু সিপাহিদের কোর্ট যে টাকা দাবি করবে তা দিতেই হবে।[৩১] বাহাদুর শাহের নিজের কোনো অর্থ ছিল না, কিন্তু তাঁর সব অলংকার তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। তাঁর সমস্ত রূপার দ্রব্য সংগ্রহ করে টাঁকশালে টাকা তৈরি করবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।[৩২] এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে সিপাহিরা পরের দিন ইংরেজদের আক্রমণ করতে রাজী হলো।

পূর্বের মতো এবারও ধনীদের অনেকে টাকা দিতে অস্বীকার করল। বিশেষ করে যুগলকিশোর, শিউপ্রসাদ, দেবী সিং, সালিগ্রাম প্রমুখ বড় বড় ব্যাঙ্কাররা কিছুই দিল না। কিন্তু এবার সিপাহিরাও তাদের সহজে নিষ্কৃতি দিতে রাজী হলো না। সৈয়দ আলি খান, দেওয়ান মুকুন্দলাল, বদরউদ্দিন খান, হাকিম আবদুল হক, নবাব কুলি খান প্রভৃতি যারা সিপাহিদের কোর্টের হুকুম অমান্য করল তাদের গ্রেপ্তার করে প্রাসাদের গার্ড-রুমে বন্দী করে রাখা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা টাকা দিতে রাজী হলো।[৩৩] বিশেষ করে, যারা ইংরেজের রাজত্বে অনেক টাকা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সিপাহি-কোর্ট এবার খুবই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করল। তোরাব আলি নামক ইংরেজের গুপ্তচর তাদের এক চিঠিতে জানাল : "মুন্সি আগা জান ও মুন্সি সাদাত আলি (যারা উভয়েই ইংরেজদের মুন্সি ছিল) গত চারদিন থেকে খুব কড়া বন্দীতে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা টাকা না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কিছু খেতে দেওয়া হবে না। ··· সিপাহি-কোর্ট গতকাল সিদ্ধান্ত করেছে যেসব লোক ইংরেজ শাসনের অধীনে ধনী হয়েছে ও যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে রাজী হচ্ছে না, তাদের বাড়ি লুঠ করা হবে।"[৩৪]

উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দিল্লির ধনিক শ্রেণী বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করে ছিল। তাদের শ্রেণীস্বার্থ ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের সঙ্গে জড়িত ; তাই তারা ইংরেজদেরই জয় কামনা করেছিল। একজন ভারতীয় লেখক বলেছেন : **"Indeed, it can be safely stated that the merchants of Delhi were partly responsible for the defeat of the Indian forces by withholding them provisions as they were for the victory of the British forces and maintained a regular supply of them."**[৩৫]

৩১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p. 7
৩২. *Ibid*, p. 34
৩৩. Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 225
৩৪. *Punjab Mutiny Records*, vol, VIII, pt. I, p. 443
৩৫. N. K. Nigam : *Delhi in 1857*, p. 81

একদিকে সিপাহি ও জনসাধারণ এবং অন্যদিকে ধনী, মহাজন ও অভিজাতদের মধ্যে চারমাস ব্যাপী এই অন্তর্দ্বন্দ্বে সিপাহি ও জনসাধারণই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। এই অবস্থায় তারা যদি আর কিছুদিন সময় পেত ও নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিতে পারত, তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের এই জয় হলো অনেক দেরিতে। এই জয়কে দৃঢ়ভাবে সংগঠন করার পূর্বেই দিল্লির ওপর ইংরেজদের চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হয়ে গেল।

বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে : ৩ সিপাহি-কোর্ট

বাহাদুর শাহকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে সিপাহিরা যে মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক মোগল বাদশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়নি, তা তাদের পরবর্তী কার্যকলাপেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিপাহিরা ও জনসাধারণ তাদের গণতান্ত্রিক দাবি সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন ছিল—একথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নেওয়ার কোনো কারণই নেই। দিল্লিকে মুক্ত করে ও বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে সিপাহিরা সঙ্গে সঙ্গে দাবি করল : প্রতিদিন দরবার বসাতে হবে, সেখানে সিপাহিদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখে গিয়েছে : "১২ই মে থেকে সিপাহিরা প্রাসাদের অফিসগুলি দখল করেছে এবং দেওয়ান-ই-খাসে তাদের পাহারা বসিয়েছে। তারা দাবি করেছে যে, প্রতিদিন দরবার বসাতে হবে ও সেখানে তাদের প্রতিনিধি থাকবে। বাহাদুর শাহের শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্যে যেসব লোক থাকত, তাদের জায়গায় তারা নিজেদের লোক নিয়োগ করেছে।"[১] এর থেকে এ কথাটাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সিপাহি ও জনসাধারণের মনে একটা আইনসংগত রাজতন্ত্র স্থাপনের আশা বা পরিকল্পনা ছিল। এরকম গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও চেতনা যতই অপরিণত হোক-না কেন, কিংবা অঙ্কুরেই থাকুক না কেন, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু এখানেই সিপাহিরা থেমে যায়নি। তারা আরো এগিয়ে চলল। যে পরোয়ানার দ্বারা সিপাহিরা বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল, সেই একই পরোয়ানার দ্বারা তারা আরো প্রচার করল যে, সিপাহিরা যে সামরিক-কোর্ট স্থাপন করেছে সেটাই হবে নতুন শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সংগঠন।[২]

এই কোর্ট সঠিক কোন তারিখে স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায় না, কিন্তু দিল্লি সিপাহিদের হস্তগত হওয়ার পরই, মে মাসেই যে তা হয়েছিল তাতে সন্দেহ

১. Metcuff : *Two Native Narratives*, pp. 60-61

২. সতীন্দ্র সিংহ : *Political Organisation of the Indian Mutineers*, — Indian Journal of Political Science, 1947 January-March

নেই। এর নাম দেওয়া হলো প্রশাসনিক-কোর্ট (জলসা-ই-ইনতিজান-ই ফৌজি-ওয়া মুলকি)। এইরকম কোর্ট লখনৌতেও স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম দিকে এই কোর্টের সভ্য ছিল ১০ জন। ৬ জন সিপাহিদের প্রতিনিধি ও ৪ জন বেসামরিক দপ্তরগুলির প্রতিনিধি। সিপাহিদের ৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে সামরিক বিভাগের তিনটি শাখা—পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—প্রত্যেকটি থেকে ২ জন করে নির্বাচিত হলেন। সিপাহিদের মধ্যে যাঁরা 'বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ' তাঁদের মধ্য থেকেই তাঁরাই অধিক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হলেন। বেসামরিক বিভাগগুলির প্রতিনিধিরাও তাঁদের স্ব স্ব বিভাগের দ্বারা এইভাবে নির্বাচিত হলেন।

কোর্টের এই ১০ জন প্রতিনিধির মধ্যে একজনকে সভাপতি (সদর-ই-জলসা) ও আর একজনকে সহ-সভাপতি (নাইব-ই-জলসা) অধিকাংশ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত করা হলো। আর অবশিষ্ট প্রতিনিধিদের ওপর তাদের নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব থাকল। আবার, প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সাহায্য করবার জন্যে ৪ জন নিয়ে এক একটি কমিটি হলো। কোর্টের প্রতিনিধিদের মতো এই ৪ জনও একইভাবে নির্বাচিত হলেন। প্রত্যেকটি কমিটি তার প্রয়োজন অনুসারে যত জন খুশি সম্পাদক বা সেক্রেটারি নিয়োগ করতে পারত। একটি কমিটিতে সংখ্যাধিক ভোটে কোনো প্রস্তাব পাশ হলে, তাকে কোর্টের নিকট অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হতো।

কোর্টের প্রত্যেক সভ্যকে নিম্নলিখিত শপথটি গ্রহণ করতে হতো: "আমি সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমার কর্তব্য পালন করব। আমি কোনো আত্মীয় পোষণ করব না এবং খুব গভীর চিন্তা করে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কাজ করব, ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা বলপ্রয়োগের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করব না, বা পক্ষপাতিত্ব দেখাবো না। প্রশাসনিক ঐক্য ও জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমার কর্তব্য পালন করব। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমি কোর্টের কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ করব না।"

সমস্ত প্রশাসনিক বিষয়গুলি এই কোর্টের দ্বারা বিবেচিত হবে, তারপর সংখ্যাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সাহির-ই-আলম বাহাদুরের (অর্থাৎ মির্জা মোগল) নিকট সম্মতির জন্যে পেশ করা হবে এবং তাঁর সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্তগুলি বাদশাহের অবগতির জন্যে তাঁর নিকট পেশ করা হবে। কোর্টের বিনা সিদ্ধান্তে, সাহির-ই-আলমের বিনা সম্মতিতে এবং বাদশাহের বিনা অবগতিতে সামরিক বা বেসামরিক কোনো হুকুমই দেওয়া হবে না। যদি সাহির-ই-আলমের সঙ্গে কোর্টের মতানৈক্য ঘটে, কোর্ট তার পুনর্বিচার করবে। তার পরেও যদি মতানৈক্য থেকে যায়, তাহলে বিষয়টি সম্রাটের নিকট তাঁর বিচারের

জন্মে উপস্থিত করা হবে এবং তাঁর মতই হবে চূড়ান্ত ও উভয় পক্ষকেই তা মেনে নিতে হবে।[৩]

কোর্টের যে-কোনো অধিবেশনে বাদশাহের ও মির্জা মোগলের উপস্থিত থাকার অধিকার ছিল। বাদশাহের বিনা স্বাক্ষরে কোর্টের কোনো প্রস্তাবই কার্যকরী হতে পারত না। বাদশাহ কোনো প্রস্তাবে আপত্তি জানালে, কোর্টকে সেই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে হতো। বস্তুত, অন্যান্য দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও বাহাদুর শাহকে রাষ্ট্রের নায়ক বলেই স্বীকার করে নেওয়া হলো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হতো এবং সচরাচর কোর্টের প্রস্তাবে বিনা প্রতিবাদে বাদশাহ তাঁর সিলমোহর বসিয়ে দিতেন।

স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল দিল্লির বিদ্রোহী সরকরারে সংগঠন সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "এটাকে একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মতো বলেই মনে হয়। বাদশাহ বাদশাহই থাকলেন, তাঁকে বাদশাহের মতোই সম্মান করা হতো, যেমন আইন-সংগত রাজাকেও করা হয়। পার্লামেন্টের পরিবর্তে ছিল সিপাহিদের একটা পরিষদ, যার হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা। ইংল্যাণ্ডের রাজা যেমন সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনানায়ক, বাদশাহ তাও ছিলেন না। সব দরখাস্ত বাদশাহের নামেই করা হতো, কিন্তু বাদশাহ এইসব দরখাস্তগুলিকে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিতেন ঐ কোর্টের নিকট, যেটা গঠিত হয়েছিল কয়েকজন কর্নেল, ব্রিগেড-মেজর ও সেক্রেটারিকে নিয়ে। এঁরা হচ্ছেন সেইসব সিপাহি—যাঁরা নিজেদের কাজে খুব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।[৪]

কোর্টের দু'রকমের অধিবেশন হতো। তার সাধারণ অধিবেশন বসত প্রতিদিন লালকেল্লায় ৫ ঘণ্টার জন্যে। তাছাড়া জরুরি অধিবেশন বসত মাঝে মাঝে বিশেষ কাজের জন্যে (সতীন্দ্র সিংহের প্রবন্ধ—বাণ্ডল্ ৫৭, ফোলিও নং ৫৩৯-৪১, রোল নং ৩ ও ১১. উর্দু)। কোর্টের দায়িত্ব ছিল সমষ্টিগত। কোনো সভ্যের অনুপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা ঐ অনুপস্থিত সভ্যের দপ্তরেও প্রযোজ্য হতো। সমস্ত ব্যাপারই অধিকাংশ ভোটের দ্বারাই স্থির হতো (ঐ, রোল নং ৮, ৯, ১০)। কোর্ট একটা সিদ্ধান্তের দ্বারা বাহাদুর শাহকে অনুরোধ করল যে, কোর্টের কাজে শাহজাদারা যেন বাধা না দেয়, এবং এই মর্মে তিনি যেন তাঁদের নির্দেশ দেন (*Press List of Mutiny Papers*, '57,

---

৩. কোর্টের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই Razvi and Bhargava প্রণীত *Freedom Struggle in Uttar Pradesh*, vol. I-এ (pp. 419-21) সংকলিত।

৪. George Campbell : *Memoirs of Indian Career*, vol. II, p. 336

p. 352)। আরো কতকগুলি সিদ্ধান্তের দ্বারা কোর্ট সিপাহি-অফিসারদের জানিয়েছিল যে, বাদশাহ তাঁদের শত্রুর ট্রেঞ্চগুলি দখল করবার জন্যে আদেশ দিয়েছেন এবং এই কাজে যেসব সিপাহির প্রাণ নষ্ট হবে তাদের পরিবারের ভরণপোষণের ভার তিনি নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (*Ibid*, pp. 429, 431-33, 437, 443-44, 445, 470)

কোর্টের জন্যে রাজস্ব আদায় করা, ঋণ গ্রহণ করা, যুদ্ধ পরিচালনা করা, শাসনকার্য পরিচালনা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা বাহাদুর শাহ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক মেনে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন : "কোর্ট যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তার ওপরে কেউ কথা বলতে পারবে না ; রাষ্ট্রের কোনো কর্মচারি বা শাহজাদারা কেউই এর বিরুদ্ধে যেতে পারবে না।" (বাণ্ডল ১৫৩, ফোলিও ১২ ফোর্সি ; ১৯ আগস্ট)[৫]

উপরিউক্ত পরোয়ানাতে এটাও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যদি কোনো সভ্য সভাপতির অনুমতি ছাড়া গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করে দেন, তাহলে কোর্টের সভ্যপদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে, কিংবা তাঁরা কেউ যদি রাষ্ট্রকে ঠকান অথবা কোনো ব্যক্তির প্রতি বা সমষ্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, তাহলে তাঁকে ঐ একই শাস্তিভোগ করতে হবে (ঐ, রোল নং ৪, ৬, ৮)। এই আইনটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আত্মীয়-পোষণ, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি যাতে প্রশ্রয় না পায় তার জন্যেই এই আইন। প্রকৃতপক্ষে, যদিও সিপাহি-নেতাদের মধ্যে নানা প্রকারের মতভেদ ও তীব্র কলহ বিদ্যমান ছিল, তা সত্ত্বেও সে কলহ সাম্প্রদায়িকতার স্তরে কোনোদিনই নেমে আসেনি। ইংরেজের গুপ্তচর ও উচ্ছিষ্টভোগীরা নানা ভাবে উস্কানি দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের সংগ্রামী ঐক্যকে ভেঙে দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সব সময়ই ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণেই বিদ্রোহীরা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহের জাতীয় চরিত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিল।

৮ই আগস্ট তারিখের একটা পরোয়ানায় দেখা যায় যে, শহরের সুশাসনের ব্যবস্থা, সৈন্যবিভাগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, সৈন্য বিভাগের কর্মক্ষমতা বর্ধিত করা, সরকারি পদগুলির উন্নততর বণ্টন, মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ—এইসব সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যে কোর্টের একটি বিশিষ্ট সভা ডাকা হয়েছিল (ঐ, বাণ্ডল ৫৭, ফোলিও নং ২৮৪, উর্দু ; ৮-৮-১৮৫৭)।

৫. *Rebellion 1857* (ed. by P. C. Joshi, New Delhi, 1957)-এ Talmiz Khaldun তাঁর প্রবন্ধ *Great Rebellion*-এ এই সিপাহি-কোর্ট সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়েছেন।

এসব ছাড়াও, সিপাহি বাহিনীর শৃংখলা, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কোর্ট আদেশপত্র প্রচার করেছিল।

সিপাহিদের এই কোর্টই ছিল বিদ্রোহী সরকারের সর্বোচ্চ আদালত ; সুতরাং তারই ওপর ছিল শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার চরম দায়িত্ব। এই কোর্টই বিচারালয় স্থাপন করত, বিচারক নিয়োগ করত ও বিচারপদ্ধতি নির্ণয় করে দিত। যে-কোনো বিষয়ে সিপাহি-কোর্টের নিকট সকলেরই পুনর্বিচারের জন্যে দাবি করার অধিকার ছিল। অর্থনৈতিক বিষয়েও এই কোর্টেই ছিল সর্বশক্তিমান। রাজস্ব আদায় করা, রাজস্ব আদায়কারী নিযোগ করার অধিকার একমাত্র কোর্টেরই ছিল। ট্যাক্সের বোঝা যাতে গরিবদের ওপর না পড়ে ধনীদের ওপরই পড়ে, এই ছিল কোর্টের নীতি। কোর্ট ছাড়া আর কারো সরকারের জন্যে ঋণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা ছিল না। কেউ ঋণ দিতে অস্বীকার করলে কোর্ট ছাডা আর কারো তাকে বন্দী করবার ক্ষমতা ছিল না। খিজির খান ও অন্যান্য শাহজাদাবা যখন ব্যক্তিগতভাবে ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন, তখন কোর্ট দৃঢভাবে বাদশাহের নিকট প্রতিবাদ জানায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অভিযোগের ফলে বাহাদুর শাহ প্রকাশ্য দরবারে কিভাবে সমস্ত শাহজাদাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন ও তাদের সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। যখন মির্জা মোগল ও আবু বকর রাজস্ব আদায় করবার জন্যে বাদশাহের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন, তিনি সে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন : একমাত্র সিপাহি-কোর্টেরই এই অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। বস্তুত, বাহাদুর শাহ অনেক বিষয়েই কোর্টের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করেছিলেন, আবার অনেক বিষয়ে বিরোধিতাও করেছিলেন। যেসব চোরা-কারবারী ও মুনাফাখোর জনসাধারণকে লুণ্ঠন করে অত্যধিক মুনাফা করবার চেষ্টা করত, তাদের বিরুদ্ধেও কোর্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল এবং সব পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল।[৬]

সিপাহি-কোর্টের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যে সিদ্ধান্ত সব চেয়ে বৈপ্লবিক হয়েছিল, তা হচ্ছে কৃষকদের জমির ব্যবস্থা সম্বন্ধে। ১০ই জুলাই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে কোর্ট স্থির করে যে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে যারা জমি চাষ করে, তাদেরই মালিকানার অধিকার দিতে হবে। প্রস্তাবটি ছিল এইরকম : "যদি দলিল পরীক্ষা করে ও কানুনগো, পাটোয়ারি প্রভৃতি স্থানীয় বিশ্বস্ত লোকদের সাক্ষ্যের দ্বারা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হয় যে দাবিদার সত্যই জমির অধিকারী…তাহলে জমির বন্দোবস্ত তারই পক্ষে হবে।" (বাণ্ড্ল ১৯৯, ফোলিও

৬. এ বিষয়ে সতীন্দ্র সিংহের প্রবন্ধে উল্লেখ (বাণ্ড্ল নং ১৯৯, ১৫৩, ১২৯) দ্রষ্টব্য।

১৩৭ উর্দু ; ১০ই জুলাই)। আদর্শগত ভাবে (ideologically) সিপাহিরা ও জনসাধারণ সে সময়ে খুব একটা অগ্রসর অবস্থায় ছিল না,তা বলাই বাহুল্য। সেই অবস্থায় দেশের অর্থনীতি, কৃষি, রাজনীতি ইত্যাদির পুনর্গঠন সম্বন্ধেও তাদের ধারণাগুলি অস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের মতো একটি বিষয় যে কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছিল এই ঘটনা মহাবিদ্রোহের ইতি-হাসে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রধান চ্যালেঞ্জ। ক্রমবর্ধমান শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতেই বিদ্রোহীদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল—সমাজ পুনর্গঠনের চিন্তা করার সময়ও তারা একেবারেই পায়নি।

এই একটিমাত্র প্রস্তাবেই প্রামাণিত হয় যে, ১৮৫৭ সনের জাতীয় বিদ্রোহ মূলত ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ হলেও এটা একটা সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণঅভ্যু-ত্থানের সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহী সিপাহিরা অধিকাংশই কৃষক শ্রেণী থেকে এসেছিল। সুতরাং কৃষক শ্রেণীর জমি-সমস্যা সম্বন্ধে তারা যে খুবই সচেতন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দিল্লির চতুর্দিকে ও অন্যান্য বিদ্রোহী অঞ্চলে বিদ্রোহের প্রথম থেকেই কৃষকরা কিভাবে ইংরেজ-সৃষ্ট সর্বস্বত্বভোগী জমিদারদের উৎখাত করে জমি দখল করছিল, তার উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের এই মহাবিদ্রোহকে যেসব পণ্ডিতেরা কয়েকজন মধ্যযুগীয় রাজা-বাদশাহের সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা শেষ প্রয়াস বলে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন, তাঁরা এ বিষয়ে নিজেদেরই অজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। দু'একজন রাজা-বাদশাহের সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা ভারতের তখনকার অবস্থায় থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও প্রবলতর শক্তি ছিল ভারতের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ। জনসাধারণের এই গণতান্ত্রিক চেতনাই তার প্রভাব বিস্তার করেছিল এই সামরিক কোর্টের ভিতর দিয়ে।[৭]

৭. ড. মজুমদার ও অধ্যাপক সেন উচ্চকণ্ঠে তাঁদের নিজেদের বস্তুনিষ্ঠা সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ড মজুমদার সিপাহিদের এই কোর্ট সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। আর অধ্যাপক সেন একটি প্যারাতেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন ও বলেছেন যে—"they (tое sepoys) could not altogether escape the influence of western ideas and English institutions··· On paper, the court was a democratic body···But in practice, it achieved nothing." (p. 75) ১৮৭১ সনের Paris Commune-এর জীবনকাল ছিল মাত্র আড়াই মাস। এই অল্প সময়ের মধ্যে Commune-ও

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সিপাহি-কোর্ট বিদ্রোহের একেবারে প্রথম দিকেই স্থাপিত হয়েছিল। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, সিপাহি-নেতাদের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতার দরুণ এই কোর্ট যেসব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার কোনোটারই সমাধান করতে পারেনি। সমস্ত মে ও জুন মাসব্যাপী বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক সংকট খারাপ থেকে অধিকতর খারাপ হলো ; দিল্লির শাসনকার্যে শৃংখলা স্থাপিত হলো না ; অরাজকতার উৎস শাহজাদাদের সম্বন্ধেও বিশ্বাসঘাতক সম্রান্তদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো না এবং সিপাহিদের পক্ষে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, ইংরেজ আক্রমণকারীদের তারা অনেক চেষ্টা করেও একটা যুদ্ধেও পরাস্ত করতে পারল না। এইসব কারণে জনসাধারণের নিকট সিপাহি-কোর্টের ক্ষমতা ও ইজ্জত স্থাপিত হতে পারেনি।

জুন মাসের শেষদিক থেকে কোর্ট যখন খুব একটা সংকটময় অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তখন শক্তিশালী বেরিলি বাহিনীর নেতৃত্বে জেনারেল বখত খান ২রা জুলাই তারিখে দিল্লিতে পৌঁছলেন। সেইদিনই বাহাদুর শাহ কোর্টের সম্মতিক্রমে বখ্‌ত খানকে সমগ্র সিপাহি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তাঁর হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করলেন।[৮] স্বভাবতই এর ফলে সিপাহি-কোর্টের শক্তি আবার বেড়ে গেল। শাহজাদারা ও সম্রান্তরা, যাঁরা তখনো পর্যন্ত অনেকখানি ক্ষমতা ভোগ করছিলেন, বাহাদুর শাহের এই কাজ খুব একটা পছন্দ করলেন না। ৬ই জুলাই বখ্‌ত খান মহম্মদ কুলি খানকে দিল্লির ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসাদুল্লা কোতোয়াল হিসাবে তার ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাবে বলে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করল (মেটকাফ সম্পাদিত 'টু নেটিভ ন্যারেটিভস্', পৃ. ১৪৩)। শাহজাদা মির্জা মোগল এতদিন পর্যন্ত দিল্লির বিদ্রোহী বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-

---

বিশেষ কিছু করতে পারেনি—'achieved nothing'। কিন্তু ভবিষ্যৎ শ্রমিক সংগ্রামে Commune-এর উদাহরণই শ্রমিকদের পথ দেখিয়েছিল। ১৮৫৭ সনে ভারতের জনসাধারণ নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল—এই শিক্ষাটাও ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যাবে না।

৮. মির্জা মোগলের অনুগামী একদল সিপাহি এতে আপত্তি করেছিল। আসাদুল্লার মতে, "the troops as a body were offended at the title of Governor-General having been granted to Bakht Khan. They actually addressed to the king in which they signified their unwillingness to be commanded by Bakht Khan." quoted by Majumdar, p.120, from Kaye's *Mutiny Papers*.

চিফ ছিলেন। ৭ই জুলাই তিনি বাহাদুর শাহের নিকট অভিযোগ করলেন: "বখ্‌ত খানের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিনই বিনা বাধায় ইংরেজের সঙ্গে লড়াই হচ্ছিল। তাঁর আসার পরেও কয়েকটা যুদ্ধ হয়েছে। আজ যখন শত্রুকে আক্রমণ করার জন্যে আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে শহরের বাইরে যাই, তখন জেনারেল বখ্‌ত খান বাধা দেন ও আমার বাহিনীকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কার হুকুমে সিপাহিরা শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং বলেছিলেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে তারা আর এক পদও অগ্রসর হতে পারবে না। তারপর তিনি সিপাহিদের ফিরে যেতে বাধ্য করলেন।"[৯]

ক্ষমতাচ্যুত হবার পর থেকে মির্জা মোগল বিভিন্ন সিপাহি বাহিনীগুলির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করার দিকেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। বেরিলি ব্রিগেড আসার পর দিল্লিতে আরো দুটি শক্তিশালী বাহিনী এসেছিল—নিমক ও নাসিরাবাদ ব্রিগেড। কোর্টের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ও আরো অনেক বিষয় নিয়ে বেরিলি বাহিনীর সঙ্গে বিশেষ করে বখ্‌ত খানের সঙ্গে নিমক ও নাসিরা-বাদ বাহিনীর বিবাদ খুব তীব্র হয়ে উঠল। শেষোক্ত বাহিনী দুটির পক্ষ সমর্থন করে মির্জা মোগল এই বিবাদে ইন্ধন জোগাতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কোর্ট দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে গেল। যখন একটা বাহিনী ইংরেজদের আক্রমণ করত, অন্য বাহিনীগুলি নির্লিপ্তভাবে এই দৃশ্য দেখে যেত, যুদ্ধরত সিপাহিদের সাহায্যে তারা অগ্রসর হতো না। ৪ঠা জুলাই আলিপুর, ৯ই জুলাই সবজিমণ্ডি, ১৪ই জুলাই সবজিমণ্ডি ও টিলা, ১৮ই জুলাই কাশ্মীর গেট ও লুডলো ক্যাসেলের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলিতে এইরকমই ঘটেছিল। সিপাহিদের এই আত্মকলহই ছিল তাদের বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এই রকম বাধা সত্ত্বেও বখ্‌ত খান ও সিপাহি-কোর্টের ক্ষমতা দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। অবশ্য শাহজাদারা মহাজনদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে এটা বে-আইনি এবং তার জন্যে তাঁদের অনেক সময় শাস্তিও ভোগ করতে হতো। অবশেষে ১৯শে আগস্ট বাহাদুর শাহ কোর্টের এই ক্ষমতা নতুন ফরমানের দ্বারা একেবারে পাকাপোক্ত করে দিলেন।[১০] এই ফরমানে বাদশাহ পুনরায় ঘোষণা করলেন যে, এই সিপাহি-কোর্টই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিশালী সংগঠন; তার হাতেই শাসনযন্ত্র চালাবার, শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার, রাজস্ব আদায় ও ঋণ সংগ্রহ এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ফরমানে বাদশাহ আরো

৯. সতীন্দ্র সিংহের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
১০. *Ibid*, Bundle no. 153, folio, 22 ; 19-8-1857

ঘোষণা করলেন : "কোর্টের কাজে শাহজাদারা কিংবা অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

এর থেকে দেখা যায় যে, দিল্লিতে সিপাহি ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছুকাল ধরে চলেছিল, তাতে সিপাহিদের সংগঠন 'কোর্টই' তার চূড়ান্ত আধিপত্য স্থাপন করতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছিল। বাদশাহের উপরিউক্ত ফরমান ঘোষিত হবার পর সিপাহিদের দিল্লিতে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। এখন থেকে তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো নিজেদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিদেশী শত্রুকে পরাজিত করা। সেই চরম অগ্নিপরীক্ষায় সিপাহিরা যে সফলতা লাভ করতে পারেনি, তার জন্যে তথাকথিত সামন্ত-তান্ত্রিক নেতৃত্ব দায়ী নয়। তাদের বিফলতার সর্বপ্রধান কারণ হলো, তারা এই ইতিহাস-নির্ধারিত বিরাট কাজটির জন্যে কখনো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। শ্রেণীগত বিচারে সিপাহিরা ছিল এইরূপ বৈপ্লবিক কার্য সমাধানের জন্যে তখনো অপরিণত। শাহজাদাদের সঙ্গে সিপাহি-কোর্টের দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত ঝগড়াই ছিল না। এর পেছনে ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের শক্তির দ্বন্দ্ব।[১১]

১১. নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতিটি বাহাদুর শাহ তাঁর বিচারকালে সামরিক আদালতে পেশ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিয়েছিলেন কিংবা তাঁর শুভাকাংক্ষীরা এই বিবৃতিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। সে যাই হোক, বিদ্রোহী শিবিরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-বিরোধ যে খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল, তা এই ধরনের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিবৃতিটি হচ্ছে : "The mutinous soldiers had established a court in which all matters were deliberated upon, and decisions taken···As regards the orders under my seal and under my signature, the facts are that from the day soldiery came and killed the European officers, and made me a prisoner, I remained so thereafter. They caused to have prepared papers they thought fit, brought them to me and compelled me to affix my seal. Sometime they brought the rough draft orders and had thier copeis made by my Secretary···Frequently, they had my seal fixed on empty un-addressed envelops. I neither knew the contents of the letters nor as to whom they were being sent···My life···being in danger, I could not do anything in the matter. They accused my officials···and Queen Zeenat Mohal of being in league with the British. They even threa-

দিল্লিতে নতুন নতুন বিদ্রোহী বাহিনীর আগমনের ফলে, সিপাহি-কোর্টের সংগঠনে স্বভাবতই অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। নতুন বাহিনীগুলির প্রতিনিধিদেরও কোর্টের সভ্য করে নেওয়া হলো, যার ফলে কোর্টের আয়তন অনেক বেড়ে গেল। তোরাব আলি নামক ইংরেজের একজন গুপ্তচরের চিঠিতে দেখা যায় যে, ১লা সেপ্টেম্বরে সিপাহি-কোর্ট নিম্নলিখিতভাবে গঠিত ছিল :[১২]

জেনারেল ঘাউস মহম্মদ খান	নিমথ ব্রিগেড
ব্রিগেডিয়ার হীরা সিং	নিমথ ব্রিগেড
জেনারেল বখ্‌ত খান	বেরিলি ব্রিগেড
রেসালদার মহম্মদ সুফি	৮ম সাময়িক অশ্বারোহী
রেসালদার হিম্মাৎ খান	২৪তম সাময়িক অশ্বারোহী
সুবাদার কাদির বক্স	স্যাপার্স অ্যাণ্ড মাইনার্স
সুবাদার সুখো	৭২তম পদাতিক বাহিনী
সুবাদার হরদৎ	৯ম পদাতিক বাহিনী
সুবাদার } নাম অজ্ঞাত	১১শ পদাতিক বাহিনী
সুবাদার } নাম অজ্ঞাত	৭৪তম পদাতিক বাহিনী
সুবাদার } নাম অজ্ঞাত	হরিয়ানা ব্যাটালিয়ান

এইসব বাহিনীর আগমনের পূর্বে যেসব বাহিনী উপস্থিত ছিল, তাদের ৫ জন প্রতিনিধি এই কোর্টের সভ্য ছিলেন। তাছাড়া আরো সভ্য ছিলেন—আলোয়ারের মৌলভি ফজল হক, বেরিলির মৌলভি সফরাজ আলি ও ফুলুনের মৌলভি ইমদাদ আলি। শেষোক্ত দু'জন মৌলভি সব সময়েই বাদশাহের পাশে দরবারে উপস্থিত থাকতেন।[১৩] জনসাধারণের উপরও তাঁদের বেশ প্রভাব ছিল। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, আসাহুল্লা, এলাহি বক্স প্রভৃতি দরবারের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তাদের স্থানে এইসব মৌলভিরাই হলেন বাহাদুর শাহের প্রধান পরামর্শদাতা। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবেই এইসব মৌলভিদের কোর্টের সভ্য করে নেওয়া হয়েছিল। পরে বেসামরিক প্রতিনিধিদেরও এর সভ্য করে নেওয়ার ফলে, কোর্ট সিপাহি ও জনসাধারণ উভয়েরই সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে, বিদ্রোহী দিল্লিতে একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি সংকুচিত হতে থাকল, অন্যদিকে তেমনি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সম্প্রসারিত হতে লাগল।

tened to kill them and wanted me to hand over the Queen to them as a hostage." *Trial of Bahadur Shah*, pp.137-40

১২. *Punjab Mutiny Records*, vol. Vll, part II, p.8

১৩. *Ibid*, p.9

বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে : ৪ জনসাধারণ

১১ই মে তারিখে দিল্লিতে মিরাটের বিদ্রোহী সিপাহিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে জনসাধারণেরও অভ্যুত্থান হয়েছিল তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১] এর দু'দিন পরে, ১৩ই মে তারিখে "কোতোয়াল সকলকে জানিয়ে দিলেন, যেসব লোক বাদশাহের-জন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়।"[২] এই আহ্বানের জবাবে যে প্রচুর লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৩]

বিদ্রোহ শুরু হবার দু'একদিন পরেই কিভাবে ইংরেজের গুপ্তচর মইনউদ্দিন হাসান খান এরকম একটি ভলান্টিয়ার বাহিনীর কমাণ্ডার হলো, তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

পুনরায় ২রা জুলাইতে যেদিন জেনারেল বখ্‌ত খান কমাণ্ডার-ইন-চিফ নিযুক্ত হলেন সেইদিনই তিনি ঘোষণা করলেন, "দিল্লির প্রত্যেকটি নাগরিককে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ির মালিক ও দোকানদারকেও অস্ত্র রাখতে

১. "Thousands of people collected, each wielding a stick or broken lathi or sword and with the help of a gun which they had managed to carry from the Lahore gate to Kotwali, they made an attack on the British troops and drove them back."— এই হলো জাহির ডেলভি নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ১১ই মে তারিখের বর্ণনা (দস্তান-ই-খাদর); Mahdi Hussain কর্তৃক তাঁর *Bahadur Shah II*, Delhi, 1958. p. 278-এ উদ্ধৃত।

২. Montogomery Martin : vol III, p. 174

৩. শুধু দিল্লি শহরের নয়, রোটক, হিসার, রেওরি, সিসরা, বাদশাপুর অঞ্চল থেকেও বহু স্বেচ্ছাসেবকদল বাহাদুর শাহের নিকট দরখাস্ত করেছিল যে তারা তাঁর জন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং তাদের অনেকে দিল্লিতে এসেও গিয়েছিল। (*Trial of Bahadur Shah*, pp. 173-74) যুদ্ধ করার জন্যে হিন্দুরা মুসলমানদের মতোই আগ্রহ দেখিয়েছিল (ঐ, পৃ. ৬৬)। দুঃখের বিষয়, দিল্লির সিপাহি-নায়করা এবং অন্যান্য নেতারা এই স্বেচ্ছাসেবকদের সুসংগঠিত করতে পারেন নি।

হবে। যাদের কোনো অস্ত্র নেই, তাদের এখুনি কোতোয়ালিতে যেতে হবে, সেখানে তাদের বিনা পয়সায় অস্ত্র দেওয়া হবে। দিল্লিতে যেন কাউকেও বিনা অস্ত্রে না দেখা যায়।" দিল্লির নাগরিকরা ছাড়াও বহু লোক বিভিন্ন বিদ্রোহী অঞ্চল থেকে এসে শহরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।[৪] ২৪শে জুন জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছিল, "৪০০ জেহাদি গুরগাঁও এবং অন্যান্য জেলা থেকে এসে পৌঁছেছে ও বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেছে।"[৫]

তারপর, বাহাদুর শাহের আবেদনের জবাবেও অনেক স্থানীয় রাজা-নবাবরাও দিল্লির যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে কিছু কিছু লোক পাঠিয়েছিলেন। এইসব স্বেচ্ছাসেবকরা যে প্রায়ই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ দিত এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা যে সিপাহিদের চেয়ে বেশি সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিত, তার উদাহরণের অভাব নেই। ইংরেজের গুপ্তচর গৌরীশঙ্কর ২রা সেপ্টেম্বর তার রিপোর্টে লিখেছিল: "গতরাত্রে শহর-ব্রিগেডের ভলান্টিয়ার কামানের ব্যাটারি পাহারা দিচ্ছিল। মধ্যরাত্রে পাহারা বদলের সময় নিমথ-ব্রিগেডের সিপাহিরা পাহারার কাজে হাজির হলে শহর-ব্রিগেডের লোকেরা এইসব 'পলাতকদের' স্থান ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি।"[৬]

দিল্লির ও আশপাশের সহস্র সহস্র লোক এইভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেও, এইসব স্বেচ্ছাসেবকদের যথোপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে বিশেষ কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ কিছু ছিল না এবং তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বেরও যথেষ্টই অভাব ছিল। জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছে: "কয়েকজন অশ্বারোহী সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিল; বাদশাহ তাদের বললেন যে, তাদের দেবার মতো অর্থ তাঁর নেই। কয়েকজন নিরস্ত্র সিপাহি বন্দুকের জন্যে দরখাস্ত করেছিল। বাদশাহ উত্তর দিলেন যে, তাদের দেবার জন্যে তাঁর কাছে সঞ্চিত কোনো অস্ত্র নেই।"[৭]

এইসব স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা যে সিপাহিদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের একজন গুপ্তচরের মতে—১৮ই জুন দিল্লিতে সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার পদাতিক ও ১,৩০০ অশ্বারোহী (*Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p. 155)। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লিতে এই সময় যেসব বিদ্রোহী সিপাহি ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৫০০। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বেচ্ছাসেবক

---

৪. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 60
৫. *Ibid*, p. 127
৬. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, p. 16
৭. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 157

সৈনিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার অর্থাৎ সিপাহিদের চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি। এবং একথাও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে আরো অনেক লোক ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। এই ঘটনা থেকে পুনরায় প্রমাণ হয় যে, ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ মূলত জনসাধারণেরই বিদ্রোহ ছিল। উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা, শক্তিমান নেতৃত্ব ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পেলে নাগরিকদের এই ভলান্টিয়ার বাহিনী যে একটা অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হতে পারত, তাঁতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিপাহিদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও তাদের অন্তর্বিরোধ সংক্রামক ব্যাধির মতো বিস্তারলাভ করে এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকেও দুর্বল করে ফেলল। এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রকার সংগঠন না থাকাতে তাদের সিপাহিদের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হতো। আবার, সিপাহিদের রাজনৈতিক চেতনা অনগ্রসর অবস্থায় থাকার জন্যে তারাও জনসাধারণের সামরিক শক্তির তাৎপর্য উপলব্‌ধি করে তাকে বিদ্রোহ সফল করার কাজে লাগাতে পারেনি।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ভারতের অন্যান্য বিদ্রোহী অঞ্চলে মহিলারা যেরকম নানা কাজে অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন ও অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দিল্লিতেও তার কোনোরকম ব্যতিক্রম হয়নি। জীবনলাল ২০শে জুলাই তার ডায়েরিতে লিখেছিল: "সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়ে গেল, তাতে একজন স্ত্রীলোক সিপাহির পোশাক পরে খুব সাহসিকভাবে যুদ্ধ করেছিলেন; এমনকি যখন সিপাহিরা সব যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখনো তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং কতিপয় ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে একা লড়ে তাদের কয়েকজনকে বধ করেছিলেন।"[৮]

এই স্থায়ী ভলান্টিয়ার বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশেষ কাজের জন্যে আরো নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানানো হতো। যেমন ১২ই আগস্ট "সমস্ত শহরে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হলো যে, ঐদিন রাত্রে বাদশাহ স্বয়ং ইংরেজের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন ও তাদের একেবারে ধ্বংস করবেন। সব নাগরিককে অস্ত্র ধারণ করতে ও অগণিত সংখ্যার জোরে সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে আহান জানানো হলো। এই কাজের জন্যে হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই শপথ গ্রহণ করতে বলা হলো। এই আহ্বানের ফলে ১০ হাজার মুসলমান কাশ্মীর গেটে সমবেত হয়েছিল।"[৯]

৮. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 158

৯. *Ibid*, p. 229. "Did I tell you that they took a woman

বিদ্রোহের সময় যেসব সংবাদপত্র দিল্লি থেকে বার হতো সেগুলির নাম ছিল —দিল্লি-আকবর, সিরাজুল-আকবর, সাদিকুল-আকবর, মাজারুল-আকবর, জাফর-আকবর—এগুলি সবই ছিল উর্দুতে। হিন্দি ভাষায় বার হতো—বুদ্ধিপ্রকাশ। দিল্লি-আকবর শুরু হয়েছিল ১৮৩৬ সনে মহম্মদ বকিরের সম্পাদনায়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বকির প্রথম থেকেই ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা করে আসছিলেন। বিদ্রোহের সময় তিনি পুরোপুরি বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানান এবং দিল্লি-আকবরে সব সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর জোর দেন। দিল্লির পতনের পর হাডসন তাঁকে গুলী করে হত্যা করেছিলেন।[১০]

আগস্ট মাসের শেষে ও সেপ্টেম্বরের প্রথমে যতই শহরের ওপর ইংরেজের আক্রমণ ঘনীভূত হয়ে আসতে লাগল ততই এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সিপাহি ও নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা চলতে লাগল। ২৮শে আগস্ট তোবাব আলি দিল্লি থেকে প্রভুদেব জানাল: "মৌলভি ফজল হকের দিল্লিতে আসা অবধি ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে নাগরিক ও সিপাহিদের উত্তেজিত কবে তোলবার কাজে তাঁকে ব্যবহাব করা হচ্ছে। তিনি বলে বেডাচ্ছেন যে, তিনি আগ্রা গেজেটে পডেছেন, ইংবেজবা দিল্লি শহরকে ধ্বলিসাৎ করতে ও শহবেব

prisoner the other day, who they made out was leading a charge of Cavalry and who killed two of our men with her own hand ?" (Keith Young, *Delhi* 1857, p. 143). "A Joan of Arc was made prisoner yesterday ; she is said to have shot one of our men and to have fought desperately." (Greathead : 'Letters written during the Siege of Delhi,' p. 130). Syed Mubarak Shah says : "frequently two old withered Mussalman women from Rampur led the rebels···They put their menfolk to shame when they failed to follow where they led. When the sepoys tried to shirk battle on the false excuse of lack of ammunition, they would offer to bring supplies. These women frequently did bring supplies of cartridges to the men in batteries and walked fearlessly in perfect showers of grapes, but by the will of God were never hit." (S. N. Sen : 'A New Account of the Siege of Delhi', *Bengal : Past and Present*, Jubilee Number, 1957)

১০. Mahdi Hussain : *Bahadur Shah II*, p. 29

প্রত্যেকটি নাগরিককে হত্যা করতে প্রস্তুত হচ্ছে।"[১১]

তিনমাস ধরে ইংরেজের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করার ফলে প্রচুর সংখ্যক সিপাহি হতাহত হয়েছিল। এই কারণেও দিল্লি রক্ষার জন্যে ভলান্টিয়ারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বেড়েই গিয়েছিল। কতকটা এরূপ অভিযানের ফলে ও কতকটা সিপাহি-কোর্টের সাংগঠনিক উন্নতির ফলে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকে হাজার হাজার নাগরিক ও সিপাহি ইংরেজের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্যে শপথ গ্রহণ করতে লাগল। প্রতিদিন তাদের প্যারেড হতে থাকল ও অন্যান্য প্রস্তুতিও চলতে লাগল। নাগরিক ও সিপাহিদের উৎসাহ ও দৃঢ়তা অনেক বেড়ে গেল। যেসব বিশ্বাসঘাতক ভলান্টিয়ার বাহিনীতে প্রবেশ করে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনেকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হলো। ২৮শ পদাতিক ভলান্টিয়ার বাহিনীর লোকেরা তাদের কমাণ্ডাণ্টকে ধরে বাদশাহের কাছে নিয়ে হাজির হলো ও ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।[১২]

এইরকম আন্দোলন ও অভিযানের ফলে দিল্লির জনসাধারণের মধ্যে যে আবার নতুন করে একটা বৈপ্লবিক চেতনা ও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। ইংরেজের শেষ আক্রমণের দুদিন পূর্বে, ১২ই সেপ্টেম্বর, ইংরেজের এক গুপ্তচর তাদের লিখেছিল,—"গতকালের যুদ্ধে দিল্লির নাগরিকরা অংশ গ্রহণ করেছিল এবং থানেশ্বর জিলার হাবির মৌলভি নওয়াজিস আলি ২ হাজার লোক নিয়ে লড়েছিলেন। সিপাহিরা ইংরেজের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে শহিদের মতো মৃত্যুবরণ করবে বলে শপথ গ্রহণ করেছে। সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতকদের ধরে এনে তাদের সকলের সামনে অপমান করা হচ্ছে।···শহরবাসীরা শুনতে পাচ্ছে যে ইংরেজরা মুসলমানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে, কিন্তু হিন্দুদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এই কারণে মুসলমানরা যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। এই ধরনের রিপোর্টের প্রতিবাদ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে বিদ্রোহ আরো ছড়িয়ে পড়বে।"[১৩]

দিল্লি থেকে ১১ই সেপ্টেম্বরের এরকম আর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, "কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বাদশাহের নিকট এসেছিল ও বলেছিল যে, তারা ১২টি কামান দখল করেছে। তারা বাদশাহকে অনুরোধ করল যে, তাঁর নিজস্ব বডিগার্ড বুশেরা বাহিনীকে তাদের সঙ্গে আবার যাবার অনুমতি দিতে হবে। তাতে বাদশাহ জানালেন যে, তাদের ইচ্ছে থাকলে তারা যেতে পারে। এই

---

১১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p.443

১২. Metcuff : *Two Native Narratives*, p.22

১৩. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, pp. 33-34

শিখরাই তাদের একবার যুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তাদের অনেকেই মারা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও বুশেরা বাহিনী শিখদের সঙ্গে আবার গেল। আজ অশ্বারোহীদের প্রচুর লোক হত ও আহত হয়েছে। কিন্তু এই যে এত উৎসাহ দেখানো হচ্ছে তার জন্যে বিদ্রোহীরা সকলেই খুব সন্তুষ্ট। সকলেই বলাবলি করছে, যদি এইরকম তেজের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করা হতো, তাহলে এতদিন ধরে লড়ার প্রয়োজন হতো না এবং অনেক আগেই ইংরেজ-শাসনের শেষ চিহ্নটুকু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যেত।”[১৪]

১২ই সেপ্টেম্বরে জীবনলালের ডায়েরিতেও লেখা আছে যে, শহরে সিপাহি ও জনসাধারণের মধ্যে খুবই একটা আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে—“বিদ্রোহী বাহিনীগুলির সকলেই শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্যে প্রস্তুত। এখন আর কেউই বাহিনী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে না।”[১৫]

তারপর যখন ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের শেষ আক্রমণ শুরু হলো “তখন বাস্তবিকই দেখা গেল, যেসব বিদ্রোহীরা দিল্লি রক্ষা করার জন্যে লড়ছিল তাদের বেশির ভাগই হলো ধর্মোন্মত্ত জেহাদি ও শহরের জনসাধারণ।”[১৬]

এরপর থেকে ইংরেজকে দিল্লির প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়তে হয়েছে। ইতিহাসবিদ ফরেস্ট লিখেছেন, যেদিন ইংরেজরা চাঁদনিচক আক্রমণ করল সেদিন দিল্লির নাগরিক ও সিপাহিদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে “ইংরেজরা দলে দলে ধরাশায়ী হতে লাগল এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা অর্থাৎ জুম্মা মসজিদ দখল করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। অবশেষে আমরা পিছু হঠতে বাধ্য হলাম ও গির্জায় রক্ষিত বাহিনীর মধ্যে আশ্রয় নিতে হলো।”[১৭]

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা দাবি করে থাকে—শিখরা নাকি সকলেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ছিল। এই উক্তি সত্য কি মিথ্যা, তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দিল্লির যুদ্ধে অনেক বিদ্রোহী শিখ স্বেচ্ছাসেবক যে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তা উপরের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ও কাপুরতলার রাজাদের বাহিনীর শিখ সৈন্যরা ইংরেজের পক্ষে লড়তে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তারা এই হীন অবস্থাটাকে সানন্দে স্বীকার করে নেয়নি। ১লা জুন দিল্লির দরবারে বিশ্বস্তসূত্রে খবর এসেছিল যে, “পাতিয়ালার রাজার সমস্ত সৈন্য ইংরেজবিরোধী। যে সময় ভারতবাসীরা তাদের ধর্মরক্ষা করার জন্যে লড়ছিল তখন ইংরেজের পক্ষে যাবার জন্যে

১৪. *Punjab Mutiny Records*, vol. II, p.55
১৫. *Ibid*, p.56
১৬. Cooper : *Crisis in the Punjab*, p. 200
১৭. Forrest : *State Papers*, vol. I, p.477

মহারাজাকে এইসব সৈন্যরা খোলাখুলিভাবে ভর্ৎসনা করেছিল।"[১৮] এই সংবাদ যে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত ছিল না তারও প্রমাণ পাওয়া যেত যখন মাঝে মাঝে এইসব রাজাদের অধীনস্থ ও অন্যান্য শিখ সৈন্যরা সুযোগ পেলেই দলত্যাগ করে দিল্লিতে এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিত। জীবনলাল এ সম্পর্কে তার ডায়েরিতে ২৯শে জুলাই তারিখে লিখেছে—"পাতিয়ালার রাজার বাহিনীর কতিপয় শিখ সৈন্য ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং রিপোর্ট করেছে যে, ইংরেজদের অনেক কামান থাকলেও কামানগুলি টানবার জন্যে ঘোড়ার খুবই অভাব।"[১৯]

এইসব শিখরা দিল্লির ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়ে সব সময়েই ইংরেজের বিরুদ্ধে খুবই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। ৫ই আগস্ট দেখা যায় যে, "কয়েকজন শিখ-প্রতিনিধি বাদশাহের নিকট একটি আবেদন করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা যখন ইংরেজদের শিবির আক্রমণ করতেন, তখন পুরবিয়া সিপাহিদের নিকট থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে তাঁদের বারবার ফিরে আসতে হয়। সুতরাং তাঁরা বাদশাহের নিকট আবেদন জানালেন যে, দিল্লির অন্যান্য বাহিনীগুলির মতো শুধু শিখদের নিয়েই একটা স্বতন্ত্র বাহিনী গঠন করা হোক এবং তাদের হাতে দুটি কামান ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলে ইংরেজদের তারা কিছুটা সফলতার সঙ্গে আক্রমণ করতে পারবে।"[২০] কয়েকদিন পরে পৃথকভাবে এই শিখ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দেখা যায় যে, বিদ্রোহীরা হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী ঐক্য বজায় রাখবার জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। ইংরেজরাও জানত যে, এই ঐক্য ভাঙতে পারলে তাদের কাজ সহজ হয়ে পড়বে—তাই তারা তাদের গুপ্তচরদের মারফৎ ও আরো বিভিন্ন উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ঘটাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করার আবশ্যকতা যে কতখানি, বাহাদুর শাহ নিজেও তা খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ৯ই জুলাই তারিখে ঢোল পিটিয়ে সারা শহরে ঘোষণা করে দিলেন—দিল্লিতে আর গো-হত্যা হতে পারবে না। যদি কাউকে গো-হত্যা করতে দেখা যায় তাহলে তাকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে।[২১]

বেরিলিতে যেদিন বিদ্রোহ হয় ওখান বাহাদুর খান বিদ্রোহী-সরকারের

১৮. Metcuff : *Two Native Narratives*, p.110
১৯. *Ibid*, p. 172
২০. *Ibid*, p. 183
২১. *Ibid*, p. 144

শাসনভার গ্রহণ করেন, সেদিন তিনিও গো-হত্যা বন্ধ করার জন্যে অনুরূপ ঘোষণা করেছিলেন। তখনকার পরিস্থিতিতে গো-হত্যা নিবারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এরকম ঘোষণায় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ খুশিই হয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজের গুপ্তচররা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। আসানুল্লা, রজব আলি প্রভৃতি ধর্মান্ধদের উস্কানি দিতে লাগল যাতে বকর-ঈদের দিন প্রকাশ্যভাবে গো-হত্যা করা হয়। রজব আলি তার বিদেশী প্রভুদের গদ্গদ ভাবে জানাল, "মুসলমান ধর্মান্ধরা অত্যধিক বিক্ষুব্ধ হয়েছে ও তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, বকর-ঈদের দিন প্রকাশ্য রাজপথে তারা গো-হত্যা করবে। যদি তখন হিন্দু সিপাহিরা বাধা দিতে আসে তাহলে তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে এবং হয় তাদের জয় করবে, নয়তো ধর্মের জন্যে শহিদের মতো প্রাণ দেবে।...ঈদের দিন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লড়াই হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল।"[২২]

কিন্তু বাহাদুর শাহ অনেক বিষয়ে যেমন দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, এ বিষয়েও তিনি তেমনি কারো কাছে মাথা নিচু করলেন না। ১৮ই জুলাই আবার তিনি ঘোষণা করে দিল্লিতে সকলকে জানালেন যে, বকর-ঈদের দিনও কেউ গোরু কোরবানি করতে পারবে না। তাছাড়া "বাদশাহ জেনারেল বখ্‌ত খান ও অন্যান্য অফিসারদের হুকুম করলেন যে, তাঁরা যেন ঈদের দিন কোনো গোরু কোরবানি করতে না দেন এবং যদি কোনো মুসলমান গোরু কোরবানি করে তাহলে তাকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করতে হবে। হাকিম আসানুল্লা এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বললেন যে, তিনি মৌলভিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এর ফলে বাদশাহ এতই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন যে, তিনি দরবার বন্ধ করে তাঁর শয়নকক্ষে চলে গেলেন।"[২৩]

হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ, সন্দেহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার জন্যে ইংরেজরা আরো যেসব উপায় অবলম্বন করেছিল, তার মধ্যে একটি হলো নানারকম সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রচার করা। এইভাবে দিল্লিতে জুলাই মাসে প্রচার হলো যে, ইংরেজরা আগ্রায় সমস্ত মুসলমানদের কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে এবং দিল্লিতেও তারা ঠিক এই রকম করবে।[২৪]

দিল্লিতে আরো প্রচার হলো যে, আগ্রার জুৎসিপ্রসাদ, উত্তর-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মহাজন, যিনি লক্ষ-লক্ষ টাকা ইংরেজ সরকারকে ঋণ দিয়েছিলেন,

২২. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p.280
২৩. Metcuff : *Two Native Narratives*, p.170
২৪. *Ibid*, p.162

তিনি আগ্রায় ছোটলাটের কাছে এই বলে আবেদন করেছেন, যেহেতু হিন্দুরা সাধারণত রাজভক্ত সুতরাং তাদের শাস্তি দেওয়া অন্যায় হবে। এইসব গুজবে যে কোনো ফল হয়নি তা বলা চলে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও দিল্লিতে অন্যান্য স্থানের মতো হিন্দু জনসাধারণ ইংরেজের বিপক্ষে ছিল এবং অধিকাংশ স্থলে হিন্দু সিপাহি ও হিন্দু কৃষকরাই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তবুও বানিয়া, মহাজন, ধনী, দোকানদার প্রভৃতি লোকেদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই শ্রেণীর লোকেরা যে বিদ্রোহী দিল্লি সরকারের সঙ্গে ভালোভাবে সহযোগিতা করছিল না, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছিল।

দিল্লিতে ইংরেজের শেষ আক্রমণের একদিন পূর্বে চারদিকে আবার রটে গেল, ইংরেজরা সমস্ত মুসলমানদের হত্যা করবে, কিন্তু হিন্দুদের স্পর্শও করবে না। স্বভাবতই কিছু মুসলমান এইসব হিন্দুদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। "সমস্ত দিন মুসলমানরা হিন্দুদের গালাগালি করল এবং তাদের খুন করবে বলে ভয় দেখাল। বাদশাহ তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করলেন...এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, পরদিন তিনি নিজে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাহিনীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালনা করবেন।"[২৫]

ইংরেজের বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থ হলো এবং দিল্লির চূড়ান্ত যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান সিপাহি ও জনসাধারণ একই সূত্রে মিলিত হয়ে বিপুল মহিমায় শত্রুর সম্মুখীন হলো।

---

২৫. *Ibid*, p.213

ভাগ্য পরিবর্তন

আগস্ট মাসে সিপাহি-নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব খুবই তীব্র হয়ে উঠল। ৪ঠা তারিখের দরবারে বাহাদুর শাহ তাঁদের খুব তিরস্কার করলেন। দরবারে উপস্থিত ১৫০জন অফিসার খুবই লজ্জিত হলেন। বাদশাহকে তাঁরা আশ্বস্ত করলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ করতে বললেন। একে একে এসে তাঁরা বাদশাহের সামনে দাঁড়ালেন এবং বাদশাহ তাঁদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে বললেন: "শীঘ্র যাও, টিলা জয় কর।"[১] পরের দিন সিপাহিদের এক সাধারণ প্যারেডে তাদের তিন ভাগ করে ৩ জন জেনারেল—মির্জা মোগল, ঘাউস মহম্মদ ও বখ্‌ত খানের অধীনে দেওয়া হলো।

কিন্তু এতেও দিল্লির অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলো না। বখ্‌ত খানও বেরিলি বাহিনীর সঙ্গে সিরধারা সিং ও নিমখ বাহিনীর বিবাদ আরো তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল।[২] শাহজাদারা এই কলহে ইন্ধন জোগাতে লাগল, এবং মির্জা মোগলের সঙ্গে নিমখ ও নাসিরাবাদ বাহিনীর ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে গেল। বিদ্রোহীদের অর্থনৈতিক সমস্যা এই বিবাদকে আরো ঘনীভূত করে তুলল। পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব রটতে লাগল, যেমন—বখ্‌ত খান ইংরেজের গুপ্তচর। এই গুজব রটানোর ব্যাপারে ইংরেজদের দিক থেকেও ত্রুটি ছিল না। ২০শে আগস্ট একজন শিখ বন্দীকে দরবারে ধরে আনা হলো। "সে বলল যে, জেনারেল বখ্‌ত খান ইংরেজের সঙ্গে গোপনে চিঠি লেখালেখি করছেন।...শিখ বন্দীকে লক্ষ্য করে বাদশাহ বললেন—লোকটা গুপ্তচর, বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে ঝগড়া বাধাবার জন্যে ও এখানে এসেছে।"[৩]

ইংরেজের একজন গুপ্তচর এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিল: "সমগ্র সিপাহি বাহিনী খুব নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। রাজস্ব আদায় করবার জন্যে জেনারেল বখ্‌ত খান কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন। অন্যান্য জেনারেলরা এতে হিংসাপরায়ণ হয়ে বাদশাহের নিকট আবেদন করলেন যে, সমস্ত সিপাহি-নেতার মত ছাড়াকাউকে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ার প্রথা বন্ধ করতে হবে। এর ফলে খুব ঝগড়া হচ্ছে। দৈনন্দিন ঝগড়াঝাঁটি ও রেষারেষির অন্ত

১. Metcuff: *Two Native Narratives*, p.181
২. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p.303
৩. Metcuff: p. 201

নেই। ২০ দিন হয়ে গেল সিপাহিরা কোনো বেতন পায়নি। সিপাহিরা খুব গণ্ডগোল শুরু করেছে ও তাদের অনেকেই দলত্যাগ করবে বলছে। ৬ই তারিখে কুমন্দ খান ১ হাজার লোক নিয়ে দিল্লিতে এসেছেন।"[৪]

এই অন্তর্বিরোধের মধ্যে ইংরেজের দালালরা ও গুপ্তচররা তাদের অন্তর্ঘাতী কাজের এক মহা সুযোগ পেয়ে গেল। ৪ঠা আগস্ট একটা বড় অগ্নিকাণ্ডে অনেক বাড়িঘর পুড়ে গেল ও অনেকের জীবন নষ্ট হলো এবং শহরে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। তারপরই, ৭ই তারিখে বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ৪০০ কর্মীর মৃত্যু হলো।[৫] কিন্তু জীবনলালের মতে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৯৪ এবং প্রাণ রক্ষা হয়েছিল মাত্র ১৩ জনের। হাডসনের নিকট থেকে রজ্জব আলির মারফৎ এক চিঠি পাবার পর হাকিম আসাদুল্লা খানই যে বেগম সমরুর বাড়িতে বারুদের কারখানা উড়িয়ে দিয়েছিল, সেকথা কুপার তাঁর বইতে উল্লেখ করে লিখেছেন : "এই নিপুণ কাজটির ফলে শত্রুদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ খুব বেড়ে গিয়েছে।...তাদের শক্তি, সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যবোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সভাপতির নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সিলের অনবরত সভা হচ্ছে।"[৬]

বারুদখানার বিস্ফোরণ যে বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা গুরুতর আঘাত তাতে সন্দেহ নেই। কিছুকাল পূর্ব থেকেই বিদ্রোহীদের গোলাবারুদের যথেষ্ট ঘাটতি পড়ছিল। বারুদ তৈরি করবার জন্যে দিল্লিতে সোরার অভাব ছিল না, কিন্তু গন্ধক অতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট বারুদ তৈরি হওয়া অসম্ভব ছিল, আর নিকৃষ্ট ধরনের বারুদ যাও-বা তৈরি হচ্ছিল তা প্রতিদিনকার প্রয়োজন মেটাতে পারত না। এই সময় রজ্জব আলি তার মনিবদের জানিয়েছিল, "শীঘ্রই যেটুকু গন্ধক আছে তাও ফুরিয়ে যাবে ; তারপর যে খারাপ বারুদ তৈরি হচ্ছে তাও আর হবে না।"[৭] ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্মকর্তা মুইর ২১শে আগস্ট জেনারেল হ্যাভলককে লিখেছিলেন : "বিদ্রোহীদের কিষেণগঞ্জে মর্টার কামান আছে, কিন্তু তাদের মর্টার কামানের গোলাগুলী হাউইটজার কামানের গোলার মতো অত ভালো নয়। লক্ষ্য তাদের ঠিকই হয়, কিন্তু তাদের গোলাগুলী ফাটে না। আমার মনে হয় এর কারণ হচ্ছে -- তারা যে বারুদ তৈরি করছে তা নিকৃষ্ট ধরনের।"[৮]

৪. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p.315

৫. *Ibid*, p.315

৬. *Crimes in the Punjab*, p. 206-7. রজ্জব আলিকে বারুদখানার দারোগা নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৮ই জুলাই সে ইংরেজদের কাছে জানায়, বারুদখানায় বারুদের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে।

৭. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p.317

৮. *Records of the Intelligence Dept*, vol. II, p. 135

কিন্তু বিদ্রোহীদের যত দুর্বলতাই থাকুক, তাদের কর্মতৎপরতার অভাব ছিল না। বেগম সমরুর বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবার পর, তারা দরিয়াগঞ্জে হাসান আলি খানের বাড়িতে পুনরায় বারুদের কারখানা স্থাপন করল। শহরে যা-কিছু গন্ধক ছিল সব সংগ্রহ করার চেষ্টা হলো এবং অন্যান্য স্থান থেকেও সংগ্রহ করার জন্যে লোক পাঠানো হলো। একজন গুপ্তচর লিখল : "সমস্ত দোকান থেকেই গন্ধক সংগ্রহ করা হচ্ছে। মহম্মদ জাকারিয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে দেবীদাসের দোকান থেকে ৩৫ মণ গন্ধক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।"[৯]

এইভাবে বিদ্রোহীদের চেষ্টার ফলে বারুদ-সমস্যার অনেকখানি সমাধান হলো। গৌরীশঙ্করের ২৯শে আগস্টের চিঠিতে জানা যায় যে, "বারুদখানার কাজ ঠিক ভাবেই চলছে। সেখানে ৫০ মণ বারুদ প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে এবং এই পরিমাণই বিদ্রোহীদের প্রতিদিনকার প্রয়োজন।"[১০]

বিদ্রোহীরা যখন আত্মকলহে নিমজ্জিত, ইংরেজরা তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাদের শেষ সম্বল সংগ্রহ করে দিল্লি দুর্গ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলো। ৭ই আগস্ট ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নিকলসন নতুন গঠিত 'মুভেব্‌ল কলামের' অগ্রগামী অংশকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি শিবিরে এসে পৌছলেন। তার ৭দিন পর ১৪ই আগস্ট 'মুভেব্‌ল কলামের' সমগ্র অংশটাই এসে গেল। এই নতুন বাহিনী বাছাই করা লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ইংরেজ, পাঠান, শিখ ও বালুচি। আর রণজিৎ সিংহের খালসা বাহিনীর কয়েকজন পুরনো শিখ সৈন্য, যারা মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে সোব্রাওন ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ শিবিরে নির্মমভাবে গোলাবর্ষণ করে শত্রুর মনে এক ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সেই পূর্বতন শত্রুকে আজ তারা ভুলে গেল। ভুলে গেল তাদের জাতীয় আত্মসম্মান ও গর্বের কথা। দিল্লির ঐশ্বর্যের অবাধ লুণ্ঠন ও ইংরেজের আরো অনেক রকমের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে তারা দিল্লির দুর্গ চুরমার করে দেবার জন্যে রাজধানীর বহিরঙ্গনে এসে উপস্থিত হলো।

কিন্তু নতুন বাহিনী এসে গেলেও, তখনো তাদের ৩০টি কামানের 'সিজ-ট্রেন' অনেক পিছনে পড়ে ছিল। "এই সিজ-ট্রেন ১০ই আগস্ট ফিরোজপুর থেকে যাত্রা করে রোটক-দিল্লির কঠিন রাস্তা দিয়ে আসছিল। এই সিজ-ট্রেনটা ছিল ৮ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ একটা লাইন ; প্রথমে ছিল হাউইটজার, মর্টার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কামান, যা অনেকগুলি হাতিতে টেনে আনছিল ; তার পরেই ছিল সর্বপ্রকারের গোলাগুলী ও সাজসরঞ্জামে ভর্তি প্রচুর গোরুর গাড়ি।"[১১]

৯. *Punjab Mutiny Records*, vol.VIII, part I, p.352

১০. *Ibid*, vol. VII, part II, p. 2

১১. Colonel Burshier: *Eight Months Campaigning During the Mutiny*, pp.46-47

এই সিজ-ট্রেন না পৌছনো পর্যন্ত ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে দিল্লি আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। তাই ইংরেজের এই সিজ-ট্রেন আক্রমণ করে দিল্লিকে রক্ষা করবার এটাই ছিল বিদ্রোহীদের পক্ষে শেষ সুযোগ।

ফিরোজপুর থেকে সিজ-ট্রেনের যাত্রার খবর পেয়ে ১২ই আগস্ট সকালে "সিপাহি-অফিসারদের একটি সাধারণ সভা বসেছিল। এক ঘটি জলের মধ্যে প্রত্যেকে একটু করে নুন দিয়ে দিল অর্থাৎ তারা জানিয়ে দিল যে, যদি তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে তাহলে লবণ যেমন করে জলে গলে গেল, ঠিক সেইভাবে তারাও যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়।...যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ আর ফিরে আসবে না – তাকে হয় যুদ্ধে মরতে হবে, না হয় তাকে জয়ী হতে হবে।"[১২]

তখন বিদ্রোহীদের অনুকূলে অনেকগুলি দিক ছিল। তাদের মধ্যে একটি হলো এই যে, ব্রিটিশ শিবিরে যেসব শিখ সৈন্য ছিল তাদের অনেকেই তাদের অবস্থার জন্যে খুব সুখী ছিল না, এবং তারা কিছুটা দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। একজন বিশ্বাসঘাতক দিল্লি থেকে তার প্রভুদের জানাল: "ইংরেজ শিবিরের শিখ-অফিসারদের কাছ থেকে দিল্লিতে শিখ-বিদ্রোহীদের কাছে একটা চিঠি এসেছে; তাতে তাঁরা লিখেছেন যে, তাঁদের মন দিল্লির বাদশাহের দিকেই আছে। যদি শিখরা পৃথকভাবে আক্রমণ করে তাহলে ইংরেজ শিবিরের শিখরা তাদের দিকে চলে আসবে। ঐ শিবির থেকে প্রায় ১২৫ জন ও অন্যান্য স্থান থেকে ১০০ জন অশ্বারোহী বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছে।"[১৩]

ঠিক এই সময়েই দিল্লির চারপাশে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৯শে আগস্ট প্রায় ২ হাজার রংঘুর হিসার শহর আক্রমণ করে।[১৪] এই বিদ্রোহী রংঘুরদের দমন করার জন্যে ইংরেজ শিবির থেকে হাডসনকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি রোটক ছাড়িয়ে আর যেতে পারলেন না। সেখানে রংঘুরদের নেতা বাবর শাহের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি রোটক দখল করতে পারলেন না। ২২শে তারিখে তাঁকে শিবিরে ফিরে যেতে হলো।

ইংরেজরা তাদের গুপ্তচরদের মারফৎ যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাতে দেখা যায় যে, ১৪ই আগস্ট দিল্লিতে বিদ্রোহী সিপাহিদের শক্তি ছিল – ৪,৪২০ পদাতিক, ৩,৫৯০ অশ্বারোহী ও ৩০টি কামান।[১৫] এই তথ্যগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করে পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কমিশনার জি. সি. বারনেস্ রিপোর্ট

১২. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p.394
১৩. *Ibid*, vol. VIII, part I, p. 383
১৪. *Ibid*, vol. VIII, part I, p. 429
১৫. *Ibid*, vol. VIII, part I, pp. 429-42

করেছিলেন : "মোটামুটি দিল্লিতে বিদ্রোহী-সিপাহিদের সংখ্যা ৪ হাজার অশ্বারোহী ও ১২ হাজার পদাতিক ধরা যেতে পারে। আর বাদবাকি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলের বিশৃংখল ১ হাজার অশ্বারোহী ও ৩ হাজার পদাতিক—যারা একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিদ্রোহীদের সংখ্যার এতই ওঠা-নামা হচ্ছে যে, তাদের শক্তির সঠিক হিসেব দেওয়া অসম্ভব; কিন্তু উপরিউক্ত সংখ্যাটাই প্রায় ঠিক, যদিও বেশি করে ধরা হয়েছে।"[১৬] কিন্তু নর্মানের মতে "বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল খুব কম করে ৩০ হাজার, তাদের কামান ছিল অসংখ্য এবং গোলাবারুদ অফুরন্ত।"[১৭] নর্মান যে অত্যধিক বাড়িয়ে বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি দিল্লিতে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজারের বেশি ছিল না।

অন্যদিকে নতুন সেনাবাহিনী ইংরেজ শিবিরে পৌঁছবার পর ১৫ই আগস্ট ইংরেজদের শক্তি হয়ে দাঁড়াল নিম্নরূপ :[১৮]

		ব্রিটিশ	ভারতীয়
গোলন্দাজ	···	৫৪৮	৪৭৭ (শিখ)
স্যাপার্স অ্যাণ্ড মাইনার্স			৬৭৩ (শিখ)
অশ্বারোহী	···	৪৮৫	৭৬৯
পদাতিক	···	২,৭০৩	২,৪৬৭
		৩,৭৩৬	৪,৩৮৬=৮,১২২
১৫ই আগস্টে শিবিরে রোগীদের সংখ্যা :			১,৫৩৫
মোট সংখ্যা :			=৯,৬৫৭

উপরের সংখ্যাগুলি থেকে দুটো বিষয় খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথমত, সিপাহিদের সংখ্যা ইংরেজদের চেয়ে খুব মারাত্মক ধরনের বেশি ছিল না। বেশির ভাগ ইংরেজ লেখকই দিল্লিতে সিপাহিদের সংখ্যা ৪-৫ গুণ বেশি করে দেখেয়েছে, তা অবশ্যই অতিরঞ্জিত। বস্তুত সিপাহিদের সংখ্যা ইংরেজদের তুলনায় দ্বিগুণও ছিল না। সরকারি তথ্য থেকে দেখা যায়, সিপাহিরা সংখ্যায় সামান্যই বেশি ছিল। দ্বিতীয়ত—ইংরেজ শিবিরের সৈন্যদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিল ভারতীয় ভাড়াটিয়া সিপাহি—ঔপনিবেশিক শাসনের একটি অনিবার্য বিষময় সৃষ্টি। এশিয়াবাসীদেরই এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে—এই

১৬. *Ibid*, vol. VIII, part I, pp. 432
১৭. Forrest : *State Papers*, vol. I, p.449
১৮. *Ibid*, p. 463

নীতি শুধুমাত্র বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি নয়—এ নীতি কার্যে পরিণত করবার কৌশল অনেকদিন পূর্বেই ইংরেজদের ভালোভাবেই জানা ছিল।

২৫শে আগস্ট প্রায় ৫ হাজার বিদ্রোহী ১৫টি কামান নিয়ে লাহোর গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে নজফগড় দখল করল। তাদের পক্ষে যে এটা একটা কৃতিত্ব-পূর্ণ সাফল্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৌসুমি বৃষ্টির জন্যে এই সমস্ত এলাকাটা তখন জল আর কাদায় ভর্তি হয়েছিল; রাস্তা দিয়েও চলাচল করবার উপায় ছিল না। কিন্তু এতসব বাধা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা নিজেরা তো জল-কাদা পার হলোই, এমনকি তারা ১৫টি কামান ও গোলাবারুদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে সমর্থ হলো। তারপর নজফগড়ে এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু'ধারে দুটি স্থান অধিকার করে বসল। এই রাস্তাই ইংরেজদের সিজ-ট্রেনের যাবার রাস্তা।

কিন্তু এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, বেরিলি ও নিমথ বাহিনী একত্রিতভাবে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেই তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যাত্রা করেছিল এবং নজফগড়েও ভিন্ন ভিন্ন স্থান দখল করেছিল। জীবনলালের মতে, জেনারেল বখ্‌ত খান নজফগড়ে পৌঁছবার পর নিমথ বাহিনীর সেনানায়কদের ওখানে থামতে বলেছিলেন ও শত্রুকে একসঙ্গে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তাবও করেছিলেন। নিমথ বাহিনীর নেতারা তাতে কর্ণপাত না করে এগিয়ে গেলেন ও পৃথকভাবে একটা অগ্রবর্তী স্থান দখল করলেন। এইসময় ইংরেজরা হঠাৎ কতকগুলি শক্তিশালী কামান নিয়ে নিমথ বাহিনীকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের ক্ষতি হয়েছিল খুবই—১ হাজার জন হতাহত ও ১২টি কামান খোয়া গিয়েছিল।[১৯]

এই ঘটনাই যদি সত্য হয়, তাহলে বখ্‌ত খানের কার্যক্রম একেবারেই সমর্থন-যোগ্য নয়। নিমথ বাহিনী যখন ইংরেজদের সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন যদি বখ্‌ত খান সদলবলে শত্রুকে আক্রমণ করতেন তাহলে বিদ্রোহীদের এরকম শোচনীয় পরাজয় হতো না, বরং তাদের জিতবারই সম্ভাবনা ছিল।

এদিকে ব্রিটিশ শিবির থেকে জেনারেল নিকলসন ২,৫০০ সৈন্য ও ১৬টি কামান নিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্যে বেরিয়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, জেনারেল সিরধারা সিং আর কর্নেল হীরা সিং-এর অধীনে নিমথ বাহিনী একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি অধিকার করে আছে। তিনি তাদের প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলেন। নিমথ বাহিনীও হঠবার পাত্র নয়। তারা মরীয়া হয়ে ইংরেজদের প্রতি-আক্রমণ করল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিন ধরে ভয়ানকভাবে যুদ্ধ চলল। এই সমস্ত সময়টা ধরে নিমথ বাহিনী যখন এককভাবে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল, তখন বখ্‌ত খানও বেরিলি বাহিনী চুপ করে এই লড়াই দেখছিল

১৯. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 208

—যেন এটা একটা মস্ত বড় তামাশা! দিন শেষ হবার আগেই বখ্‌ত খান, ৪ঠা জুলাই আলিপুরে যা করেছিলেন, এবারও সেইরকম একটি গুলীও না ছুঁড়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে দিল্লি ফিরে গেলেন। বলা বাহুল্য, নিমখ বাহিনীও পরাজিত হয়ে সন্ধ্যার পর শহরে আশ্রয় নিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী সেনানায়কদের মধ্যে এইরকম বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। যেমন, ইয়োরোপে সাত-বছরের (১৭৫৬-১৭৬৩) যুদ্ধের সময় সামন্ততান্ত্রিক ফরাসি দেশ যখন দ্রুত অধোগতির দিকে যাচ্ছিল, তখন ফরাসি জেনারেলদের আত্মঘাতী ব্যবহার তাদের দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল। সেই সময় 'ভিলিং হাউসেনের যুদ্ধে' ফরাসি জেনারেল ব্রগ্‌লি শত্রুকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু আর একজন ফরাসি জেনারেল সুবিস—যাঁর কথা ছিল ব্রগ্‌লিকে সাহায্য করা এবং যিনি নিকটেই ছিলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাহায্য করার জন্যে এক পা-ও অগ্রসর হলেন না। এর ফলে ব্রগ্‌লির পরাজয় হলো।[২০]

যাই হোক, এ পর্যন্ত যা লড়াই হয়েছে তার মধ্যে নজফগড়ের পরাজয় বিদ্রোহীদের সবচেয়ে একটা বড় পরাজয়। কিন্তু এ পরাজয় যেমন নিরর্থক, তেমনই সিপাহি-নায়কদের নির্বুদ্ধিতা ও সংকীর্ণ মনোভাবেরই পরিচায়ক। নিমখ বাহিনীর সিপাহিরা যারপরনাই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা যদি তাদের বেরিলি বাহিনীর কমরেডদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেত, তাহলে তাদের জিতবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কেই লিখেছেন: "সিপাহিরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রতিরোধে মেতে উঠেছিল। আমাদের লোকেরা যেরকম বীরত্ব দেখিয়েছে, তারাও তার চেয়ে কিছু কম যায়নি। সিপাহিরা ভালোভাবেই যুদ্ধ করছিল ও বীরের মতোই মরছিল। শেষ পর্যন্ত এটা একটা রক্তাক্ত হাতাহাতি যুদ্ধে পরিণত হলো।...কিন্তু আমাদের অবস্থা খুব আশাপ্রদ ছিল না। আমাদের তাঁবু, খাদ্য ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম কিছুই তখনো এসে পৌঁছয় নি। আমাদের সৈন্যরা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও সিক্ত অবস্থায় বিনা আহারে জলাজমির উপর সব রকমের কষ্ট স্বীকার করে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হলো।...আমাদের অবসাদগ্রস্ত সৈন্যদের সেই রাত্রিতে অথবা পরের দিন সকালে কোনো শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়নি।"[২১]

২০. **Plekhanov:** ***Role of the Individual in History*****, p. 29**

২১. **Kaye:** ***History of Sepoy War in India*****, vol. II, pp. 654-56.** দিল্লির এইসব যুদ্ধে সিপাহিদের হিংস্রতা জেনারেল বার্নার্ডকে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল (Kieth Young, 69-71)। Bourchier (p. 37) লিখেছিলেন যে, দিল্লির যুদ্ধ Sevastopole-এর যুদ্ধের মতোই হয়েছিল।

ইংরেজ ইতিহাসবিদের এই বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, বখ্‌ত খান যদি ইংরেজদের ঐ রাত্রে কিংবা তার পরদিনও আক্রমণ করতেন, তাহলে শুধু নজফগড়ের ফলাফলই নয়, সমস্ত ভারতের পরবর্তী ইতিহাসই অন্য রকম হতে পারত।

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, নজফগড়ে ব্রিটিশ বাহিনীতে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা বেশির ভাগই ছিল পাঠান, শিখ ও বালুচি। বলা বাহুল্য, হতাহতের সংখ্যাও তাদের মধ্যেই বেশি হয়েছিল। এই যুদ্ধে একজন সুদক্ষ ব্রিটিশ অফিসার, লম্‌সডেনও নিহত হন। নিমথ ব্রিগেডের ৩টি বাহিনীর সর্বসমেত ৫০০ কি ৬০০ সিপাহি জীবিত অবস্থায় ফিরতে পেরেছিল, আর বাদবাকি প্রায় ১,৫০০ লোক প্রাণ দিয়েছিল। এই হতাহতের সংখ্যা থেকেই প্রমাণ হয়, বিদ্রোহীরা কী সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। এই যুদ্ধে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই অঞ্চলের নঙ্গলি গ্রামের অধিবাসীরা সিপাহিদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল ও তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল।[২২]

নজফগড়ের পরাজয় যে দিল্লির নাগরিকদের খুবই অভিভূত করে ফেলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। একজন গুপ্তচরের চিঠিতে জানা যায় যে, নিমথ বাহিনীর এরূপ শোচনীয় পরাজয়ের জন্যে শহরবাসীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং সিপাহিরাও খুব ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছে। কিন্তু বখ্‌ত খানের বাহিনী এখনো আশান্বিত এবং তারা খুব গর্ব করে বেড়াচ্ছে।[২৩]

বাহাদুর শাহও যে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এক দূতের মারফৎ তিনি বখ্‌ত খানকে জানিয়েছিলেন যে, এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে তিনি নিমকহারামির কাজ করেছেন। বাদশাহ তাঁকে প্রাসাদে ঢুকতে নিষেধ করলেন।[২৭]

২৮শে আগস্ট তারিখে দিল্লি থেকে গুপ্তচর গৌরীশঙ্কর নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখেছিল: "নিমথ বাহিনীর লোকেরা তাদের কামানগুলির জন্যে অশ্রুপাত করছে। তারা বলছে, এই কামানগুলির মতো কামান আর কোথাও নেই। এর গোলায় আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রৌদ্রেই হোক আর বৃষ্টিতেই হোক, সেগুলি সব সময়েই ভালো কাজ দিত। ১ হাজার অতি উৎকৃষ্ট গোলাও ছিল; এখন আর তার একটাও নেই। ... বাদশাহ বখ্‌ত খানের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং নিমথ বাহিনীকে সময় মতো

২২. *Punjab Mutiny Records*, vol. III, part I, p.441

২৩. *Ibid.*

২৪. Metcalf: *Two Native Narratives*, p.209

সাহায্য না দিয়ে বখ্‌ত খান তাকে ধ্বংস করেছে, এই বলে অভিযোগ করেছেন বখ্‌ত খানকে আর মুখ দেখাতে হবে না, সকলেই তাকে গালাগালি দিচ্ছে বখ্‌ত খান দ্বিতীয়বার নজফগড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। নজফগড়ে জমিদাররা তাঁকে সমস্ত রকমের সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং পানিপ ও শোনপথেরও অনেক জমিদার তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বাহাদুরগড়ে নেতা বাহাদুর আলি শাহ সমস্ত অঞ্চলটাকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন ও বখ্‌ত খানকে খবর পাঠিয়েছেন যে, সমস্ত অঞ্চলটাই তাঁর পক্ষে আছে। কয়েকজন সিপাহিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন পাঞ্জাবে গিয়ে মাঞ্ঝা অঞ্চলের শিখদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করে। অস্থায়ী অশ্বারোহী বাহিনীর অনেকেই, যারা হরিয়ানা জিলা থেকে এসেছে তারা ঐ অঞ্চলটাকে বিদ্রোহীদের দিকে টেনে আনবার জন্যে দিল্লি থেকে রওনা হয়েছে। রোটক জেলায় সানসি গ্রামে একটা বড় রংঘুর বিদ্রোহীদের দল জমায়েত হয়েছে…হরিয়ানা জেলার তোসান গ্রামে আর একদল বিদ্রোহী জমায়েত হয়েছে…গ্রামের লোকদের এইসব বিদ্রোহগুলি সিপাহিদের বিদ্রোহের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ের কারণ।"[২৫]

দেখা যাচ্ছে, নজফগড়ের পরাজয় সত্ত্বেও বিদ্রোহী গ্রামবাসীরা একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি। তখনো সবল নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেওয়া বখ্‌ত খানের পক্ষে অসম্ভব হতো না।

২৫. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. I, pp. 443-44

ইংরেজের দিল্লি আক্রমণ

নতুন সৈন্যদল এসে পৌঁছবার পর ১৫ই আগস্ট ইংরেজ শিবিরের সৈন্যসংখ্যা ছিল—৯,৬৫৭। ১লা সেপ্টেম্বর তাদের শক্তি হলো :[১]

ব্রিটিশ পদাতিক	...	৩,২৪১
'নেটিভ' পদাতিক (শিখ, গুর্খা, পাঠান, বালুচি)	...	৩,৬৬৬
কাশ্মীর কন্টিনজেন্ট (ডোগরা রাজপুত)	...	২,০০০
পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ বাহিনী (শিখ)	...	১,০০০
	মোট	৯,৯০৭

এই ১০ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইংরেজ, আর বাদ-বাকি দুই-তৃতীয়াংশই ছিল ভারতীয়। ৬ই সেপ্টেম্বর আরো কিছু নতুন সৈন্য এসে পৌঁছল। তাতে ইংরেজ শিবিরের মোট সৈন্যসংখ্যা হলো ১১,৭২৫। তাছাড়া, 'দিল্লি অধিকারের কৃতিত্ব নেবার জন্যে' নাভার রাজা স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হলেন।[২]

সিজ-ট্রেনের ৩০টি অবরোধ-কামান এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা তাদের কাজ শুরু করে দিল। এত ত্বরান্বিত করার অবশ্য বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হলো যে, ইংরেজ সৈন্যরা এই অত্যধিক পরিশ্রম সহ্য করতে পারছিল না—তাদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত হয়ে পড়ছিল, অথবা অসুখের ভান করছিল। ইংরেজ নায়করা এজন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রবার্টস শিবির থেকে লিখলেন : "আমি হিসেব করে দেখেছি যে, ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমরা দিল্লির অভ্যন্তরে পৌঁছব,···বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ হবে। এখন থেকেই আমাদের লোকেরা পীড়িত হতে শুরু করেছে।"[৩]

দ্বিতীয় কারণটি আরো গুরুতর। ভারতীয় ভাড়াটিয়া সিপাহিদের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার ইংরেজদের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময় রবার্টস আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমাদের সঙ্গে যেসব ভারতীয় সৈন্য আছে, তারা মনে করে মৃত সিপাহিদের কাছ থেকে তারা অনেক টাকা লুঠ করতে পারবে ; আমাদের লুঠ করার সুযোগ আর নেই বলে তারা এখন ঠিক করেছে যে, কিছু

১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p.14
২. Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 465
৩. Roberts : *Letters*, p.46

না পাওয়ার চেয়ে 'প্যাণ্ডি'দের লুঠ করাই ভালো; তাই আমাদের পাশে তাদের দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ হবে। এদের কয়েক-জনকে সেদিন বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ছিল বারুদখানার সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকজন নেটিভ গোলন্দাজ। ইয়োরোপীয়ানের অভাবে আমরা এদের নিযুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু তারা যে রাজভক্ত থাকবে, তা একেবারেই ভাবা যায় না, এবং তারা আমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, তা চিন্তা করলেও ভয় হয়।"[৪]

তারপর, একজন গুপ্তচর ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লি থেকে লিখেছিল: "বিদ্রোহী শিখরা খুব ভালোভাবেই লড়েছিল, হিন্দুস্থানিদের চেয়ে অনেক ভালো। এমন একটা দিনও যায় না, যেদিন কিছু-না কিছু শিখ ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে এদিকে এসে যোগ না দেয় ও সেখানকার সমস্ত খবর সরবরাহ করে। শহরের আফগান গাজিরা রোজ বেরিয়ে চলে যায় এবং নির্ভীকভাবে ইংরেজ শিবিরের আফগানদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং সব রকমের সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।"[৫]

সত্বর দিল্লি আক্রমণ করার আর একটি কারণ ছিল—দিল্লির অভ্যন্তরীণ বিশৃংখল অবস্থা। এইজন্যে ইংরেজ নায়করা সত্যই ভেবেছিলেন যে, "শহরের মধ্যে প্রথম ইংরেজ বাহিনী ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ঊর্ধ্ব-শ্বাসে পালাতে শুরু করবে।"[৬] কিন্তু বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক বিশৃংখলা ইংরেজ-দের আক্রমণের পক্ষে যতই অনুকূল হোক-না কেন, তারা যে সিপাহিদের রণকুশলতা সম্বন্ধে আবার একটা মস্ত বড় ভুল করল, তা তারা কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল।

বস্তুত আসন্ন ইংরেজের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্যে বিদ্রোহীরা শেষ মুহূর্তে খুব তৎপর হয়ে উঠল। একজন গুপ্তচরের ২রা সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে জানা যায়—"গতকাল সন্ধ্যার সময় নিমচ, বেরিলি ও নাসিরাবাদ বাহিনীর অফিসাররা জেনারেল বখ্‌ত খানের গৃহে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের তলোয়ার মাঝখানে রেখে তাঁরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁরা জীবন-মৃত্যু পণ করে মিলিতভাবে লড়বেন।"[৭] ৮ই তারিখের দরবারে অফিসারদের নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হলো এবং শহর রক্ষা করার জন্যে কতকগুলি ব্যবস্থাও

৪. Roberts : *Letters*, p. 52
৫. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p. 54
৬. *Ibid*, p. 15
৭. *Ibid*, p. 17

অবলম্বন করা হলো।

বিদ্রোহীরা যে কতখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ইংরেজের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, তা ইংরেজের দুটি গুপ্তচরের চিঠিতেই পরিষ্কার-ভাবে বোঝা যায়। ১০ই সেপ্টেম্বর ফতে মহম্মদের বিবরণীতে আছে: "হুকুম মতো আমি গতকাল সন্ধ্যার সময় ফোর্ট ও শহরের অন্যান্য স্থান দেখে এসেছি। ফোর্টে, লাহোর গেটে ও দিল্লি গেটে দেখতে পেলাম যে, পাহারাদাররা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে সব ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। প্রত্যেক গেটেই একটা করে বড় কামান দাঁড় করানো হয়েছে। দেওয়ান-ই-আমেও চারটি কামান আছে। সেলিমগড়ের দুর্গ খুব ভালোভাবেই সজ্জিত হয়েছে এবং তার চারদিকেই কামান দাঁড় করানো হয়েছে। লাহোর গেট থেকে কাশ্মীর গেট পর্যন্ত প্রচুর সিপাহি মোতায়েন করা হয়েছে এবং প্রধান রাস্তাগুলির ধারে প্রত্যেকটি বাড়ির উপর থেকে নিচে সিপাহিতে ভর্তি। অশ্বারোহীরা ব্যাঙ্ক, লালদিঘি ও আটা কারখানায় জমায়েত হয়েছে। তাদের আরো একটা বড় দল রয়েছে দিল্লি গেটের নিকট বাদশাহী মসজিদে। আরো অনেকে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক গেটেই একটা করে কামান প্রস্তুত আছে, আর কাশ্মীর গেটে আছে ৪টি। শহরের চারদিকে বুরুজগুলিতেও কামান দাঁড় করানো হয়েছে। দেওয়ালের চতুর্দিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পাহারাদার বসানো হয়েছে ও তারা বেশি করে পাহারা দিচ্ছে। ধর্মোন্মত্তরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছে ও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।"[৮]

দ্বিতীয় চিঠিখানা গৌরীশঙ্করের, এবং ঐ ১০ তারিখেই লেখা: "শহরের প্রত্যেকটি গেট—সবসুদ্ধ ১৩টি—মোটামুটি ভাবে সুসজ্জিত হয়েছে, বিশেষ করে কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর ও আজমির গেট···গতকাল যখন আক্রমণ আশা করা গিয়েছিল, কেতোয়ালির কাছে লাহোর গেটে যাবার রাস্তার উপর দুটি শক্তিশালী কামান প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং আর একটি কামান দাঁড় করানো হয়েছিল লালা হরনারায়ণের বাড়ির ছাদের উপর। কাশ্মীর ও লাহোর গেটের মাঝামাঝি চৌরাস্তার মুখে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে কামানের একটা ব্যাটারি প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। শাহবুরুজের পিছনে বিদ্রোহীরা বালির বস্তা দিয়ে একটা ব্রেস্টওয়ার্ক তৈরি করেছে এবং এইভাবে দেওয়ালের প্রত্যেকটি গর্ত তারা মেরামত করছে। ফোর্টে দুটি বাহিনী আছে। কর্নেল স্কিনারের বাড়িতে ৯ম ও ২০শ বাহিনী মোতায়েন; কাবুল গেট আর পানি গেটের মাঝে রয়েছে ১৬শ বাহিনী, গির্জায় রয়েছে আগ্রার পুলিশ ব্যাটেলিয়ান; কাছারিতে ৩৮শ বাহিনী, লাহোর গেটে ৫ম বাহিনী; সীতারাম

৮. *Ibid*, p. 52

বাজার ও অজলি মহল্লা থেকে তুর্কম্যান গেট পর্যন্ত রয়েছে ৩য়, ৬১ তম ও ৩০শ বাহিনী ; আর দিল্লি গেটের নিকট বাজারে রয়েছে ৭৪ তম বাহিনী। দরিয়াগঞ্জে রাখা হয়েছে ৫টি বাহিনী—১৫শ, ৩০শ ও নাসিরাবাদের ৩টি বাহিনী। দরিয়াগঞ্জে আরো আছে ৪র্থ ও ৯ম সাময়িক এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম রেগুলার অশ্বারোহী দল, এবং সৈয়দউদ্দিন খানের লোকেরা। বেগম সমরুর বাগানে রয়েছে ৩য় অশ্বারোহী এবং আরো অনেকে। শহরের সব সেতুগুলি ভালো অবস্থাতেই আছে।"[৯]

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এই সময় বাহাদুর শাহ পুনরায় ভারতীয় রাজাদের বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানিয়ে কতকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখা যায় যে—"৪ঠা সেপ্টেম্বর বাদশাহের স্বাক্ষরিত চিঠি জয়পুর, যোধপুর, বিকানির ও আলোয়ারের রাজাদের পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ইংরেজদের নিশ্চিহ্ন করতে চান এবং তাঁব সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু এই বিদ্রোহ সংগঠন ও পরিচালন করবার মতো কোনো দক্ষ ব্যক্তি তাঁর নেই, সেহেতু তিনি একটা দেশীয় রাজ্যের সংসদ (Confederation of states) গঠন করতে ইচ্ছা করেন। এবং তিনি এখন যেসব রাজার নিকট চিঠি পাঠাচ্ছেন তাঁরা যদি এই কাজের জন্যে একত্রিত হন, তাহলে তিনি তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে প্রস্তুত আছেন।"[১০]

বাহাদুর শাহের নিকট থেকে রাজাদের কাছে এরূপ চিঠি এই প্রথম নয়। বিদ্রোহের প্রথম থেকেই তিনি অনেক রাজাকেই বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'টু নেটিভ ন্যারেটিভ্‌স'-এ উল্লিখিত জীবনলাল তার ডায়েরিতে ১৪ই মে, অর্থাৎ দিল্লির বিদ্রোহের ৩ দিন পরে লিখেছিল : "জয়পুর, যোধপুর ও বিকানিরের রাজাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বাদশাহের সমর্থনে তাঁরা যেন স্বয়ং দরবারে উপস্থিত হন কিংবা সৈন্য পাঠিয়ে দেন।" বাদশাহ যে এরকম আদেশ বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক রাজার নিকট পাঠিয়েছিলেন তা বাহাদুর শাহের বিচারের সময় আসানুল্লা এবং আরো কয়েকজনের সাক্ষ্যে জানা যায়।

কিন্তু ৪ঠা সেপ্টেম্বরের চিঠিতে যে প্রস্তাবটি নতুন, সেটি হচ্ছে একটা ভারতীয় রাজ্যের সংসদ (Confederation of states) সংগঠনের প্রস্তাব। এরকম একটা সন্ধিক্ষণে এহেন একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ,

---

৯. *Ibid*, p. 53-54

১০. Metcuff : *Two Native Narratives*, pp.219-20

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্ত রাজ্যগুলিতেই তখন জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ ধূম্রায়মান। গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও মধ্যভারতের অনেক রাজ্যের অধিবাসীরা বিদ্রোহে যোগ দিয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এটাও অবিদিত নয় যে, প্রত্যেক রাজ্যের দরবারেই একটা অংশ ছিল যাঁরা সবাই ইংরেজ বিরোধী ছিল। এবং তারা বিদ্রোহে যোগ দিতে খুবই উৎসুক ছিল। এই সময় যখন বিদ্রোহ চারদিকে প্রসারলাভ করছে, অনেক রাজাদেরও মন তখন ইংরেজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। বাতাস কোন দিকে বইছে, এটাই তাঁরা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে রাজপুত রাজারা তখনো পর্যন্ত শিখ রাজাদের মতো সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হয়ে আসেন নি। যদি সেপ্টেম্বর মাসেই বিদ্রোহী দিল্লির পতন না হতো, যদি আরো কয়েকমাস বিদ্রোহীরা দিল্লিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত, তাহলে বাহাদুর শাহের উক্ত প্রস্তাবের ফলাফল কি হতো বলা যায় না।

বাহাদুর শাহ ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা কেউই অস্বীকার করেন না, কিন্তু সঠিক চিঠিখানি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। সাভারকারের বইতে ('ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'—ফিনিক্স পাবলিকেশন্স, বম্বে; পৃ. ৩৩৪) এবং সুন্দরলালের 'ভারত মে আংরেজী রাজ' (২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১৩-১৪) গ্রন্থে যে চিঠিখানি পাওয়া যায়, তার সূত্র (source) সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও, জীবনলালের উক্তির সঙ্গে এই চিঠিখানির যে সামঞ্জস্য আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চিঠিখানি হলো এই: "যে কোনো উপায়েই হোক ফিরিঙ্গিদের হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত করাই হচ্ছে আমার একান্ত ইচ্ছা। সমগ্র হিন্দুস্থান স্বাধীন হোক এই আমার আন্তরিক বাসনা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে বৈপ্লবিক যুদ্ধ আজ চলছে, তা কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বিদ্রোহকে পরিচালিত করবার জন্যে একজন সুযোগ্য লোক অগ্রসর হয়ে আসছেন,—যিনি এই আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে সমর্থ ও যিনি জাতির বিভিন্ন শক্তিগুলিকে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত করে দেশের সকল লোককে নিজের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করতে পারবেন। ইংরেজদের বিতাড়িত করবার পর ভারতবর্ষকে শাসন করবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই এবং আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিস্তার করবারও কোনো বাসনা নেই। আপনারা দেশের রাজন্যবর্গ যদি শত্রুকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবার জন্যে যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত হন, তাহলে আমি আমার সার্বভৌম ক্ষমতা একটা সংঘবদ্ধ রাজন্যবর্গের হাতে (Confederacy of Indian Princes)—যাঁরা এই কাজের জন্যে নির্বাচিত হবেন—তুলে দিতে প্রস্তুত আছি।"

৭ই সেপ্টেম্বর অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা তাদের প্রথম কামানের ব্যাটারি প্রস্তুত করতে শুরু করল। মোরি বুরুজের মাত্র ৫০০

গজ দূরে এই ব্যাটারি তৈরি করা খুবই শক্ত কাজ ছিল। তাছাড়া, এক রাত্রের মধ্যেই এর প্রস্তুতি শেষ করা প্রয়োজন ছিল। কারণ দিনের আলোতে বিদ্রোহীরা দেখতে পেলেই মোরি বুরুজের কামান দিয়ে ইংরেজদের এই প্রচেষ্টা পণ্ড করে দেবে, এই ভয় ছিল। এই ব্যাটারি দাঁড় করাবার জন্যে খুব শক্ত পাথুরে জমির ভেতর দিয়ে একটা পরিখা খনন করে তার মধ্যে অনেকগুলি লোককে কাজ করতে হয়েছিল ও উট দিয়ে বড় বড় কাঠের থাম ও বালির বস্তা আনতে হয়েছিল। কাজের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মোরি বুরুজের লোকেরা রাত্রে একবার অন্ধকারে কতকগুলি গোলাগুলী ছুঁড়ে মেরেছিল, তাতে ইংরেজ পক্ষের কিছু লোকও মারা গিয়েছিল। এ সম্পর্কে মেডলি তাঁর বইতে বলে গেছেন, "আমাদের কাজ শুরু হবার পর হঠাৎ মোরি বুরুজ থেকে সশব্দে কতকগুলি গোলা এসে আমাদের কর্মক্ষেত্রে পড়ল ও কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে আবার এইরকম কতকগুলি স্থিরলক্ষ্য গোলা এসে আরো কয়েকজনকে অক্ষম করে দিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, 'প্যাণ্ডি'রা জানত না তাদের গোলার লক্ষ্য কী চমৎকার নির্ভুল এবং মনে হলো, আমরা যে কাজে ব্যস্ত আছি সে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, কেবল তারা গোলা ছুঁড়েই সন্তুষ্ট।"[১১] ইংরেজরা তাদের কাজে এই একবার মাত্র বাধা পেয়েছিল।

ব্যাটারির কাজ শেষ হতে না হতে যখন ভোর হয়ে এলো, তখন বিদ্রোহীরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আক্রমণ শুরু করল। "কেবলমাত্র মোরি বুরুজ থেকেই যে আক্রমণ আসছিল তা নয়, আমাদের পরিখার সামনেই বিদ্রোহীরা খাদ কেটে কতকগুলি ছোট কামান নিয়ে এসে আমাদের ওপর অনবরত গোলাগুলী চালিয়ে খুবই বাধা দিচ্ছিল। অশ্বারোহীরাও বেরিয়ে এসেছিল।···আমাদের ৭০ জন লোক পরিখার মধ্যে মারা গেল।·· বিদ্রোহীরা বীরদর্পে তাদের কামান-গুলি রক্ষা করছিল।···মোরি বুরুজ যেন আস্তে আস্তে নিঃশব্দ হয়ে গেল ; কিন্তু তা মাত্র কিছু সময়ের জন্যে ; কারণ ৪ দিন পর, ১২ তারিখে চার্লস রীড তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন : 'আমরা এখনো ছিদ্র করতেই ব্যস্ত ; মোরি এখন নিঃশব্দ হয়নি, যদিও আমরা তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। এদের চেয়ে সাহসী গোলন্দাজ আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি। তারা শেষ পর্যন্ত লড়বে এবং প্রত্যেকটি গোলন্দাজ তার কামানের পাশে দাঁড়িয়ে মরবে'।"[১২]

কিন্তু তাদের এই আক্রমণের কোনো সুনির্ধারিত পরিকল্পনাও ছিল না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ছিল না। মধ্যাহ্নের মধ্যে অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও ইংরেজরা তাদের প্রথম ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে ফেলল। এই ব্যাটারি ৪টি

১১. **Medley : *A year's Campaigning in India*, p.75**
১২. **Tylor : *Life of General Sir Alex Tylor*, p.296-97**

৯ পাউণ্ডার ও ২টি ২৪ পাউণ্ডার শক্তিশালী হাউইটজার কামান দিয়ে তৈরি হয়ে ২টি শাখায় ভাগ হয়ে গেল—একটি হলো মোরি বুরুজের কামানগুলিকে ধ্বংস করার জন্যে, আর একটি হলো কাশ্মীর গেট দিয়ে বিদ্রোহীরা যাতে সদলবলে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করতে না পারে তা বন্ধ করার জন্যে।

ব্যাটারি প্রস্তুত করেই ইংরেজরা তার শক্তিশালী কামানের গোলা দিয়ে মোরি বুরুজকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অকর্মণ্য করে দিল। দিল্লি রক্ষার জন্যে মোরি বুরুজ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম চাবিকাঠি। তাছাড়া, এই ব্যাটারি ইংরেজদের আরো একটা মহা উপকার সাধন করল। বিদ্রোহীরা ভেবেছিল যে, দেওয়ালের পশ্চিম অংশেই ইংরেজরা আক্রমণ করবে; এই ভ্রান্ত ধারণাও এরকম একটা সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বিদ্রোহীদের কম ক্ষতির কারণ হয়নি। যে মুহূর্তে বিদ্রোহীরা শত্রুকে তাদের একেবারে নাকের সামনে ব্যাটারি প্রস্তুত করতে সুযোগ দিল এবং উপরন্তু নিজেরাও প্রতারিত হলো, সেই মুহূর্ত থেকে তারা প্রারম্ভিক সুযোগ (initiative) থেকে বঞ্চিত হয়ে দিল্লির শেষ যুদ্ধে পরাজিত হতে শুরু করল। ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান এঞ্জিনিয়ার বেইর্ড স্মিথ বলেছিলেন—"এই প্রথম ব্যাটারিটি হলো দিল্লির সমগ্র অবস্থানের চাবিকাঠি; এর সফলতার ওপরই নির্ভর করছিল আক্রমণকারীদের শহরের প্রবেশপথ। এবং এর কার্যকারিতার ওপরই প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করছিল আমাদের অন্যান্য ব্যাটারিগুলির নির্মাণ ও অগ্রগতি।" বস্তুত এই সংরক্ষণকারী ব্যাটারিটি কার্যকরী হবার পর উত্তর প্রাচীরের সম্মুখে অন্যান্য ব্যাটারিগুলি নির্মাণ করা ইংরেজদের পক্ষে আপেক্ষিকভাবে সহজ হয়েছিল।

শুধু বিদ্রোহীদেরই নয়, ইংরেজ শিবিরেও সকলেরই ধারণা ছিল যে, শহর পশ্চিম দিকের প্রাচীর দিয়ে আক্রান্ত হবে, কারণ তখন পর্যন্ত ইংরেজদের সর্বপ্রধান ব্যাটারিগুলি ঐদিকেই বসানো হয়েছিল। ঊর্ধ্বতন ৩-৪ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই জানতেন না যে, উত্তরদিক থেকেই আক্রমণ হবে। এদিকে ইংরেজরা প্রায় তিনধারে সুরক্ষিত। এদিকে আর একটি সুবিধা এই যে, প্রাচীর থেকে চাঁদনিচক ও প্রাসাদ পর্যন্ত সব জায়গাটাই প্রায় মুক্ত, যার জন্যে প্রাচীর ভেদ করার পরই আক্রমণকারীদের শহরের সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে পড়তে হবে না এবং খোলা জায়গায় সৈন্য সমাবেশের জন্যে তারা প্রচুর স্থান পাবে। উপরন্তু, বিদ্রোহীরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পশ্চিম দিকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল এবং উত্তর দিকে তাদের সতর্কতা শিথিল ছিল।

উত্তর প্রাচীরে তিনটি শক্তিশালী বুরুজ—পানি বুরুজ, কাশ্মীর বুরুজ ও মোরি বুরুজ। এই দিকের প্রাচীর ২৪ ফিট উঁচু ও ১২ ফিট চওড়া। প্রাচীরের বাইরে ১৬ ফিট গভীর ও ২০ ফিট বিস্তৃত একটি পরিখা। তাছাড়া প্রাচীরকে রক্ষা করার জন্যে ছিল ৮ ফিট পর্যন্ত ঢালু একটা গ্ল্যাসিস।

উত্তর প্রাচীর আক্রমণ করতে হলে ইংরেজের সর্বপ্রথম প্রয়োজন লুডলো ক্যাস্‌ল অধিকার করা। জুন মাসে ইংরেজরা যখন ক্যান্টনমেণ্ট ও টিলা অধিকার করে, সেই সময় তারা লুডলো ক্যাস্‌ল এবং মেটকাফ হাউসও দখল করেছিল। পরে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের তাড়িয়ে লুডলো ক্যাস্‌ল অধিকার করে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক মেটকাফ হাউস ইংরেজদের হাতেই থেকে যায়। যদি বিদ্রোহীরা মেটকাফ হাউসও দখল করে থাকত, তাহলে ইংরেজের পক্ষে এই সময় লুডলো ক্যাস্‌ল আক্রমণ করা বা দখল করা খুবই কঠিন হতো। যতক্ষণ পর্যন্ত লুডলো ক্যাস্‌ল বিদ্রোহীদের হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষে টিলা থেকে যমুনা পর্যন্ত দুই বর্গমাইল জায়গার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হবে, এবং এই অবস্থায় ইংরেজের পক্ষে তাদের আক্রমণ-পরিকল্পনা কার্যকরী করাও সম্ভব হবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লির প্রাচীরের গ্ল্যাসিস এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে কামানের গোলা নিচের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে কোনো ফলই হবে না; আবার উপরের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে উপরের অংশ ভাঙলেও তার দ্বারা শহরে প্রবেশপথ তৈরি করা যাবে না। ইংরেজ নায়করা তাই আর একটা উপায় অবলম্বন করলেন; সেটা হলো, বুরুজের পাশে দেওয়ালের নিচে ছিদ্র তৈরি করে শহরে প্রবেশ করা। তা করতে হলে ইংরেজদের তিনটি কাজ করা প্রয়োজন: ১. ছিদ্রকারী ব্যাটারি (Breaching Battery) বুরুজের একেবারে সামনাসামনি বসাতে হবে; ২. তাকে প্রাচীরের খুব নিকটেই বসাতে হবে যাতে করে গোলাগুলী প্রাচীর বিদীর্ণ করতে সক্ষম হয়, এবং ৩. কামান আর প্রাচীরের মাঝখানে কোনোরকম বাধা থাকবে না।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে প্রথমেই ইংরেজদের প্রয়োজন লুডলো ক্যাস্‌ল অধিকার করা। এই বাড়ি কাশ্মীর গেট থেকে ৭৫০ গজ সম্মুখে ও হিন্দুরাও-এর বাড়ি থেকে সোজা ১ হাজার গজ দক্ষিণে। একদল সিপাহির ওপর এই বাড়ি রক্ষা করার ও পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু অন্যান্য সিপাহিদের মতো এদের শৃংখলা খুব শিথিল হয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা ফ্ল্যাগ-স্টাফ টাওয়ার থেকে দেখতে পেত যে, পাহারা বদলের সময় পুরনো পাহারা-দারদের নতুন পাহারাদারদের স্থান গ্রহণ করতে অনেক সময় লাগত। বিদ্রোহীদের এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে তারা সমস্ত অঞ্চলটা যে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে, সিপাহিরা তার কিছুই টের পায়নি। তাছাড়া, যে নালাটা টিলা থেকে শুরু হয়ে উত্তর প্রাচীর ও লুডলো ক্যাস্‌লের মাঝখান দিয়ে যমুনায় গিয়ে পড়েছে, সেই নালা সম্বন্ধেও বিদ্রোহীরা খুব উদাসীন ছিল। এই অরক্ষিত ও উপেক্ষিত নালা ইংরেজদের নিকট ঈশ্বর প্রদত্ত বলেই মনে হয়েছিল। তার আশ্রয় না পেলে তাদের পক্ষে লুডলো ক্যাস্‌ল অধিকার করা ও তারপর

প্রাচীরের উত্তরদিকে ছিদ্রকারী কামানের ব্যাটারিগুলি নির্মাণ করবার জন্যে সাজসরঞ্জাম এত কম ক্ষতিতে বিদ্রোহীদের অজ্ঞাতে যথাস্থানে নিয়ে যেতে পারত না এবং উত্তর প্রাচীরে আক্রমণের পরিকল্পনাও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপনীয় রাখতে পারত না।

উত্তর প্রাচীর আক্রমণের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইংরেজ নায়কদেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। জেনারেল উইলসন লিখেছিলেন: "এই আক্রমণের ফলাফল নির্ভর করবে পাশা খেলার মতো সম্পূর্ণভাবে দৈবের ওপর। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে আমি এরকম জুয়া খেলতে প্রস্তুত আছি, বিশেষ করে আমি নিজে যখন এর চেয়ে ভালো কোনো পরিকল্পনা দিতে পরেছি না।"[১৩] ইংরেজ নায়করা জানতেন যে তাঁদের এই পরিকল্পনার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছিল বিদ্রোহীদের অসতর্কতার ওপর। উত্তরদিক থেকেই আক্রমণ হবে, বিদ্রোহীরা যদি এটা বুঝে ফেলে ও সতর্ক হয়ে পড়ে, তাহলে তার ফলে ইংরেজদের যে ক্ষতি হবে, তারপর তাদের পক্ষে আক্রমণ করা আর সহজ হবে না।

৮ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্সের অধীনে ইংরেজরা ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ লুডলো ক্যাস্‌ল আক্রমণ করল। বিদ্রোহীরা এই আক্রমণের জন্যে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। ঘুম ভাঙার পর ঘটনাটা যখন তারা বুঝতে পারল, তখন শত্রুকে তারা একবার শেষ হাতাহাতি যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করল এবং সকলেই তাতে প্রাণ বিসর্জন দিল। ইংরেজরা লুডলো ক্যাস্‌ল ও খুশিয়াবাগ দখল করল। কেই বলে গেছেন, "কিন্তু এই জয় তাদের অত্যধিক মূল্য দিয়ে কিনতে হয়েছিল।" তাদের প্রচুর হতাহতের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স।

লুডলো ক্যাস্‌ল দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা 'বৃচিং' (ছিদ্রকারী) ব্যাটারি নির্মাণের কাজে লেগে গেল। তাদের দ্বিতীয় ব্যাটারি কাশ্মীর বুরুজ থেকে ৫০০ গজ দূরে লুডলো ক্যাস্‌লের ঠিক সামনের প্রাচীরে ছিদ্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে ৯ই ও ১০ই সমস্ত দিনরাত কাজ করার পর সফল হলো, এবং ১০ই তারিখ থেকেই এখান থেকে প্রাচীরে গোলাবর্ষণ হতে লাগল। তৃতীয় ব্যাটারি নির্মিত হলো কাস্টম্‌স হাউসের প্রাঙ্গণে পানি বুরুজ থেকে মাত্র ১৮০ গজ দূরে। এ স্থানটি সম্পর্কে মেডলি তাঁর 'এ ইয়ার্স ক্যাম্পেনিং ইন ইণ্ডিয়া' (পৃ. ২৫৮) বইতে বলে গেছেন: "কাস্টম্‌স হাউস পানি বুরুজ থেকে মাত্র ১৬০ গজ দূরে একটা বড় বাড়ি এবং শত্রুরা তাদের অবহেলার জন্যে এই বাড়িটা ভেঙেও ফেলেনি কিংবা দখলও করেনি। আমরা তখনি বাড়িটা

১৩. **Kaye & Malison : *History of Indian Mutiny*, vol. IV, p. 4**

অধিকার করলাম।...কিন্তু মাত্র ১৬০ গজ দূরে যেখানে শত্রুরা দেওয়ালের পাশে বন্দুক নিয়ে জমায়েত হচ্ছে ও যেখান থেকে তারা আমাদের অনায়াসে গুলী করতে পারে, সে রকম একটা জায়গায় ব্যাটারি নির্মাণ করা অনেক সাহস ও দক্ষতার প্রয়োজন।...'প্যাণ্ডি'রা অবশ্য জানত না যে, আমরা কি কাজ করছি। তবে তারা দেখতে পেয়েছিল যে, আমরা ওখানে একটা কিছু করছি, এবং সমস্ত রাত ধরে তারা এমনভাবে গোলাগুলী বর্ষণ করতে লাগল যে, কর্মরত লোকদের মধ্যে ৩০ জন হতাহত হলো। এইসব লোকেরা ছিল নিরস্ত্র নেটিভ পাইওনিয়ার্স, সৈন্য নয়। নেটিভদের নীরব অথচ ভয়হীন এই কাজের মধ্যে যখন তাদের সহকর্মীরা গোলার আঘাতে একের পর এক পড়ে যেতে লাগল, তখন তাদের জন্যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করে ভূপতিত বন্ধুদের ভালোভাবে শুইয়ে দিয়ে তারা আবার পূর্বের মতো কাজে হাত লাগাত।" আর চতুর্থ ব্যাটারি তৈরি করা হলো ২য় ও ৩য় ব্যাটারির মাঝামাঝি খুশিয়াবাগের পশ্চিমে। এই চতুর্থ ব্যাটারির কাজ হলো কাশ্মীর বুরুজের পাশে প্রধান প্রবেশপথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ব্যাটারিকে সাহায্য করা।

দ্বিতীয় ব্যাটারিও ১ম ব্যাটারির মতো. দুই অংশে তৈরি হয়েছিল। তার দক্ষিণ অংশে বসানো হয়েছিল ৭টি খুব শক্তিশালী ও সর্ববৃহৎ হাউইটজার ও ২টি ১৮ পাউণ্ডার কামান, আর তা বাম দিকে একটি পরিখা দিয়ে সংযুক্ত; ২০০ গজ দূরে দাঁড় করানো হয়েছিল ৯টি ২৪ পাউণ্ডার কামান। ৩য় ব্যাটারিতে ছিল ৬টি ১৮ পাউণ্ডার এবং ৪র্থটিতে ছিল ১০টি ভারি মর্টার কামান। ১১ই তারিখের মধ্যেই সমস্ত ব্যাটারির সবসুদ্ধ ৪০টি কামান একসঙ্গে ১৪ তারিখ পর্যন্ত, অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা ধরে অনবরত উত্তর প্রাচীরে গোলাবর্ষণ করে যেতে লাগল।

বলা বাহুল্য যে, বিদ্রোহীরা এই দৃশ্য নিষ্ক্রিয় ভাবে দেখে যাচ্ছিল না। ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস 'ফর্টি ওয়ান ইয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া' (১ম খণ্ড, পৃ. ২২০-২১) গ্রন্থে লিখেছিলেন: "সঠিক লক্ষ্য নিয়ে শত্রুরাও আমাদের ওপর গোলা ফেলছিল।...আক্রমণের দিন, ১৪ তারিখ পর্যন্ত আমরা এক মিনিটের জন্যেও আমাদের ব্যাটারি ছেড়ে যাইনি। সমানে গোলাবর্ষণের দ্বারা দিনরাত আচ্ছন্ন করে ফেলা হলো। অবশ্য সবই আমাদের ইচ্ছামতো হচ্ছিল না। যে ৩টি বুরুজে আমরা গোলা ছুঁড়ছিলাম, তার থেকে কামান দাগতে না পেরে বিদ্রোহীরা কতকগুলি কামান খোলা জায়গায় নিয়ে এলো ও সেখান থেকে আমাদের ব্যাটারির উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগল। তাদের মার্টেলো টাওয়ার থেকে তারা রকেটও ছুঁড়তে লাগল এবং প্রাচীরের বাইরে পরিখা থেকে ও দেওয়ালের উপর থেকে অনবরত বন্দুক চালাতে লাগল। এমন কোনো অংশ ছিল না যেখানে তাদের কামানের গোলা এসে পড়েনি।...আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ৭ই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩২৭ জন অফিসার ও সৈন্য হতাহত হয়েছিল।"

বর্মানও তাঁর 'ভারেটিড' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন (ফরেস্ট : 'স্টেট পেপার্স', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯-৭০)। মেডলি—যিনি ব্যাটারি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর বইতে লিখেছেন : "আরো বিপদের কারণ হলো এই যে শত্রুরা আমাদের দক্ষিণ দিকের প্রান্তে একটা ব্যাটারি নির্মাণ করেছিল। সেখানে আমাদের টিলার কামানের গোলা গিয়ে পৌছত না এবং সেখান থেকে শত্রুরা আমাদের ১নং ও ২নং ব্যাটারির উপর মারাত্মক ভাবে গোলা বর্ষণ করতে লাগল।"

যাই হোক, ইংরেজদের এইসব কার্যকলাপ দেখে বিদ্রোহীরাও একেবারে শেষ মুহূর্তে খুবই তৎপর হয়ে উঠল এবং শত্রুদের 'বৃচিং' (ছিদ্রকারী) ব্যাটারিগুলির অবস্থা খুবই বিপজ্জনক করে তুলল। এঞ্জিনিয়ার টাইলর, যিনি ব্যাটারিগুলির নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, লিখেছেন : "পরের দিন, রবিবার ১৩ই তারিখ—আমাদের ২নং ও ৩নং ব্যাটারি থেকে প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষিত হতে লাগল। এর জবাবে শত্রুরাও আমাদের ব্যাটারির উপর আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি করে গোলা ফেলতে লাগল। আমাদের প্রচুর হতাহত হতে লাগল এবং আমাদের গোলন্দাজরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমরা অনেক অপ্রীতিকর সম্ভাবনার ভয় করতে লাগলাম। শত্রুরা দেওয়ালের পাশে যে কামান দাঁড় করাতে ব্যস্ত ছিল তা আমরা জানতাম; সেখান থেকে হয়তো তারা আমাদের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করবে। যদি তারা তাই করতে আরম্ভ করে দেয় তাহলে আমাদের ব্যাটারিগুলি রক্ষা করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়বে। আমরা তাই আশা করছিলাম যে, সন্ধ্যার মধ্যেই প্রাচীরে ছিদ্র করা সম্ভব হবে এবং পরদিন সকালে আমরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।"[১৪]

৭ই থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর—এই চূড়ান্ত মীমাংসার সপ্তাহটা ছিল উভয় পক্ষেরই সময়ের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। যে মুহূর্তে বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিল উত্তরের প্রাচীর দিয়েই ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ হবে, সেই মুহূর্ত থেকে তারাও তাদের শক্তিশালী কামানগুলি দিয়ে প্রাচীরের পাশে ব্যাটারি নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। তারা যদি এই কাজের জন্যে আরো দু'একটা দিন সময় পেত, তাহলে "তারা অতি সহজেই আমাদের সব-চেয়ে শক্তিশালী ব্যাটারিকেও গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারত এবং আমাদের প্রাচীর ছিদ্র করার আশাকেও বিলীন করে দিতে পারত।"[১৫]

মেডলিও তাঁর 'এ ইয়ার্স ক্যাম্পেনিং ইন ইণ্ডিয়া'তে এ সম্পর্কে লিখেছেন : "বিদ্রোহীরা এত তাড়াতাড়ি প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের পরবর্তী

১৪. A. C. Tylor : *Life of General Sir Alex Tylor*, p.308
১৫. *Ibid*, p.251

আক্রমণ যদি আরো ৪৮ ঘণ্টা দেরি করে শুরু হতো, তাহলে আমাদের আর একেবারেই আক্রমণ করা হতো না, বরং আমাদের ব্যাটারি থেকে বিতাড়িত হতে হতো অথবা আমাদের সকলকেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে হতো।"

কিন্তু বিদ্রোহীরা সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেল। ৭২ ঘণ্টা ধরে অনবরত কামানের গোলাবর্ষণ করে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজরা দিল্লির দুর্ভেদ্য প্রাচীর বিদীর্ণ করে ফেলল এবং বিদ্রোহীরা এত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও সুপরিচালিত সংগঠনের অভাবে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। এই সংকট মুহূর্তে বিদ্রোহীদের উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে সমর্থ ব্যক্তি ছিলেন মোগল রাজবংশের শাহজাদা ফিরোজ শাহ। কিন্তু বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তখনো দিল্লি এসে পৌঁছতে পারেন নি।

দিল্লির পতন

১৪ই সেপ্টেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকেই ইংরেজরা তাদের ব্যাটারিগুলি থেকে উত্তর প্রাচীরে ও বুরুজে অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করল, যাতে করে বিদ্রোহীরা ছিদ্রের নিকট প্রতিরোধ করবার জন্যে জমায়েত হতে না পারে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জন এক নিমেষে থেমে গেল এবং ব্রিগেডিয়ার নিকলসনের হুকুমে ৬,৫০০ সৈন্য একসঙ্গে শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে মাত্র ২ হাজার ছিল ইংরেজ, আর বাদবাকি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিল ভাড়াটিয়া ভারতীয়। আক্রমণকারীরা ৫টি কলামে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে ৫ দিক থেকে আক্রমণ করেছিল।[১]

প্রথম কলাম—১,০০০জন, নিকলসনের নেতৃত্বে কাশ্মীর বুরুজে;

দ্বিতীয় কলাম—৮৫০ জন, ব্রিগেডিয়ার জোনসের নেতৃত্বে পানি বুরুজে;

তৃতীয় কলাম—৯৫০ জন, কর্নেল ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে কাশ্মীর গেটে;

চতুর্থ কলাম—৮৬০ জন, মেজর রীডের নেতৃত্ব কিষেণগঞ্জের মধ্য দিয়ে লাহোর অথবা কাবুল গেটে। কাশ্মীর-মহারাজার ১,২০০ ডোগরাও এই আক্রমণে যোগ দিয়েছিল।

পঞ্চম কলাম—১,৫০০ জন, ব্রিগেডিয়ার লংফিল্ডের নেতৃত্বে প্রয়োজন মতো যে কোনো স্থানে।

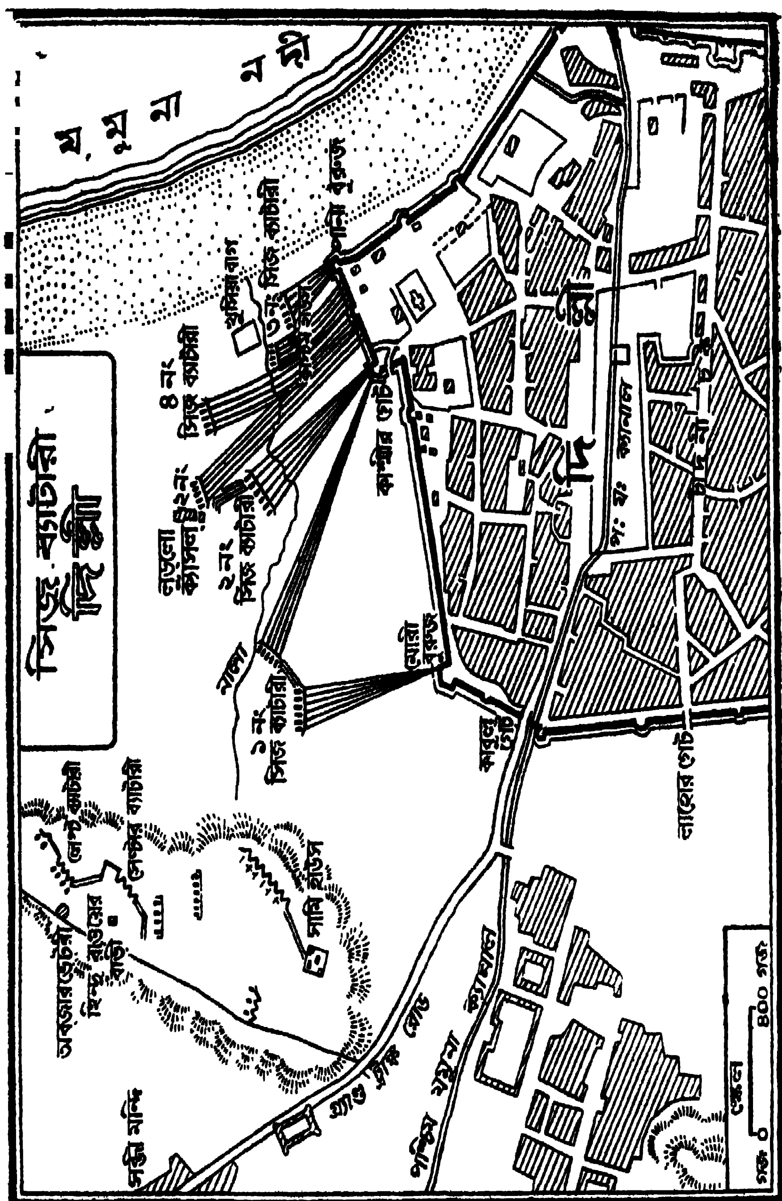
৭২ ঘণ্টা ধরে অবিরাম গোলাবর্ষণের পরও শহরের বিদ্রোহীরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি। তারা আরো মরীয়া হয়ে প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হলো। যে মুহূর্তে আক্রমণের হুকুম দেওয়া হলো, সেই মুহূর্ত থেকে ইংরেজদের প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়তে হয়েছিল। বিদ্রোহীরা ইংরেজদের দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন তো করলই না—যা তারা করবে বলে অনেক ইংরেজ-নায়ক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—বরং তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াল। ফরেস্ট এ সম্বন্ধে লিখেছেন: "প্রথম কলামের সম্মুখ দিকের সৈন্যদের দেখবামাত্র বিদ্রোহীরা চারদিকে গুলীর ঝড় বইয়ে দিল এবং অফিসার ও সৈন্যরা গ্ল্যাসিসের ধারে সমানে ভূতলশায়ী হতে লাগল।"[২]

কাশ্মীর গেটে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের ফলে বারবার আক্রমণকারীদের ব্যর্থ হতে হলো। তারপর অন্য আর কোনো উপায় না দেখে ইংরেজরা বারুদে আগুন

---

১. Forrest : *State Papers*, vol. I., pp. 471-72

২. Forrest : *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p.136



বিদ্রোহী দিল্লির ওপর ইংরেজের সর্বশেষ আক্রমণ।

জাগিয়ে গেট ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করল। লেফটেনান্ট স্যালকভ ও হোম ৪ জন ইংরেজ ও ১০ জন শিখের সঙ্গে কতকগুলি বারুদের বস্তা নিয়ে গিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। কাশ্মীর গেট চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সকলে হতাহত হলো। এইভাবে প্রথম কলাম কাশ্মীর গেটে প্রবেশ করতে সমর্থ হলো। দ্বিতীয় কলামও কাবুল গেট দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। কিন্তু লাহোর গেটের কাছে রাস্তা এত সরু যে পাশাপাশি দু'জন লোকেরও যাওয়া কঠিন এবং এখানে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধও খুব প্রবল। এখানে নিকলসন মারাত্মকভাবে জখম হলেন এবং এই আঘাতের ফলেই কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হলো। তাছাড়া আরো ৯ জন ইংরেজ অফিসার ও অনেক লোক মারা গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় কলামকে কাবুল গেট থেকে ফিরে যেতে হলো। তৃতীয় কলাম জুম্মা মসজিদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদেরও গির্জায় ফিরে যেতে হলো।

এদিকে চতুর্থ কলাম নিয়ে যখন মেজর রীড আক্রমণে যাচ্ছিলেন, তখন সবজিমণ্ডিতেই বিদ্রোহীরা তাঁকে তীব্রভাবে প্রতি-আক্রমণ করল, যার ফলে রীডের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করাই শ্রেয় মনে করল। এরকম যে ঘটবে, ইংরেজ-নায়করা তা কল্পনাও করেন নি। কিছুক্ষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর রীড আহত হয়ে পড়েন। "তাঁর আহত অবস্থার জন্যে গুর্খাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেল।"[৩] কাশ্মীরের ডোগরারা এই সুযোগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একেবারে চম্পট দিল। তারা তাদের কামানগুলিও সঙ্গে নিয়ে গেল না। তাদের পুনর্গঠন করে আবার রণাঙ্গনে পাঠাবার অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। বস্তুত মহারাজা গোলাব সিং প্রেরিত এই ডোগরারা ইংরেজের লাভের জন্যে সিপাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে খুব আগ্রহান্বিত ছিল না। কাশ্মীরের মহারাজা তাদের এক-রকম জোর করেই পাঠিয়েছিলেন।

এই কাশ্মীর-রাজ গোলাব সিং সম্পর্কে ইতিহাসবিদ গিবন এক পরিচয় রেখে গেছেন: "নির্ভুল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে গোলাব সিং তাঁর নিজের স্বার্থ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন—এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্থির করেছিলেন যে, তাঁর 'সমস্ত টাকাই' ইংরেজ ঘোড়ার পক্ষে বাজী রাখবেন।"[৪] রণজিৎ সিং-এর দরবারের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা গোলাব সিং প্রথম শিখযুদ্ধের সময় লাহোর দরবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি টাকার বদলে ১৮৪৬ সনে পেয়েছিলেন কাশ্মীর রাজ্য। একদিকে প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন যেমন

৩. Forrest: *State Papers*, vol. I, p.473
৪. Gibbon: *Lawrences of the Punjab*, p. 298

নির্দয়, অন্যদিকে তেমনি তাঁর ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের ও উদারতার অন্ত ছিল না। বিদ্রোহের সময় ইংরেজকে সাহায্য করার এত আগ্রহের কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর 'নির্ভুল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির' দ্বারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর রক্ষক ইংরেজরা ভারত থেকে বহিষ্কৃত হলে, তাঁকেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাদের সঙ্গেই যেতে হবে।

কিষেণগঞ্জে সিপাহিদের আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়েছিল। "একটা সময়ে শত্রুরা তাদের বিজয়ে উৎফুল্ল হয়ে, লাহোর গেট থেকে অধিক সংখ্যায় চতুর্থ কলামকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে লাগল। আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তারা যে আমাদের অরক্ষিত শিবিরে প্রবেশ করতে পারে, কিংবা আমাদের আক্রমণরত সৈন্যদের পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করতে পারে, এই বিপদের সম্ভাবনা ছিল।"[৫] যে হিন্দুরাও-এর বাড়ি ভিত্তি করে ইংরেজরা তাদের সমগ্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, সেই বাড়িও বিদ্রোহীরা প্রায় দখল করে ফেলেছিল, "এবং আমাদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সর্বনাশের কারণ হতো, যদি-না একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটত।"[৬]

এই আকস্মিক ঘটনা হলো ব্রিটিশ শিবিরে ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্র্যান্টের অধীনে একদল অশ্বারোহীর উপস্থিতি। দিল্লি শহরের মতো একটা সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল গোলন্দাজ, পদাতিক ও এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। এরকম আক্রমণে অশ্বারোহীদের বিশেষ কোনো কাজই নেই, কাজেই এইসব ইংরেজ অশ্বারোহীরা শিবিরের মধ্যেই অবস্থান করছিল। বিদ্রোহীরা যখন চতুর্থ কলামকে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ-শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই সময় হোপ গ্র্যান্ট তাঁর অশ্বারোহীদের নিয়ে শিবির রক্ষা করলেন। "এই অশ্বারোহীদের উপস্থিতিই আমাদের বাঁচিয়ে ছিল ও শত্রুর দ্বারা আমাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।"[৭]

কাশ্মীর ও পানি বুরুজের পাশে পরিখা-প্রাচীর ভেদ করে ও অনেকক্ষণ ধরে হাতাহাতি যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রথম ও দ্বিতীয় কলাম শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু তারপর তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের আর নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না। কেই লিখেছেন: "যারা এই দিনকার রক্তাক্ত যুদ্ধের পর বেঁচে ছিল,…তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তাদের একেবারে অক্ষম করে দিয়েছিল। শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার মতো

৫. Forrest: *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 141

৬. Kaye: *History of the Sepoy War in India*, vol. III, p. 511

৭ *Ibid*, p. 615

একটা বিপজ্জনক কাজের জন্তে তারা আর সমর্থ ছিল না।[৮]

প্রথম দিনকার যুদ্ধের ফলাফল বিচারকালে শিবিরের ইংরেজের-নায়করা মোটেই খুশি হয়নি। যেটুকু সামান্ত জমি তারা দখল করতে পেরেছিল, তার জন্তে তাদের মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক। ফরেস্ট বলেছেন : "আক্রমণকারী কলামগুলির ৪ জন নায়কের মধ্যে তিনজনই অক্ষম হয়ে পড়লেন। এক—১ম বেঙ্গল ফুজিলিয়ার্সরাই (ইংরেজ বাহিনী) তাদের ৯ জন অফিসারকে হারাল। আর এঞ্জিনিয়ারদের ১৭ জন অফিসারের মধ্যে ১ জন মৃত আর ৮ জন গুরুতর-ভাবে আহত হলেন।"[৯]

১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের হতাহতের সংখ্যা ছিল ৬৬ জন অফিসার ও ১,১০৮ জন সৈন্য, অর্থাৎ যারা সেদিন যুদ্ধে নেমেছিল তার এক-তৃতীয়াংশ।[১০] ফরেস্টের মতে ৭ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে "বিদ্রোহীদের ১,৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং যাদের তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রচুর লোক আহত হয়েছিল।"

এই দিনকার যুদ্ধের আংশিক সফলতামাত্র দেখে জেনারেল উইলসন অত্যধিক ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লেন। যখন তিনি তাঁর স্টাফকে সঙ্গে নিয়ে, ম্যাপ হাতে করে ঘোড়ায় চড়ে শহরে এলেন এবং সব ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, তাঁর অবশিষ্ট বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের পুনরায় টিলার পিছনে সুরক্ষিত স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।"[১১]

উইলসন ইংরেজ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবারই প্রায় সিদ্ধান্ত করে ফেলে-ছিলেন, কিন্তু তাঁর কয়েকজন অফিসার—বিশেষ করে প্রধান এঞ্জিনিয়ার বেইর্ড স্মিথ বোঝালেন যে, যেটুকু জয় করা হয়েছে, অনেক বিপদ থাকা সত্বেও তা আঁকড়ে ধরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

পরের দিন, ১৫ই সেপ্টেম্বর। সেদিনটা ছিল ইংরেজদের পক্ষে একটা অত্যন্ত 'শোচনীয় শূন্য দিবস'। ইংরেজ বাহিনীর প্রত্যেকটি সিপাহিকে—সে ইংরেজই হোক আর ভারতীয়ই হোক—প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তাকে দিল্লি লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে। দিল্লির ঐশ্বর্য, তার সোনা রূপা হীরা মণি মুক্তা, মূল্যবান রেশম পশম কার্পেট ইত্যাদির কথা সর্বজনবিদিত। যুদ্ধের 'পুরস্কার' স্বরূপ এ সবই তাদের হয়ে যাবে। যদিও প্রথম দিন তারা শহরের

৮. *Ibid*, p.616

৯. Forrest : *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p.146

১০. Forrest : *State Papers*, vol. V, p.473

১১. Kaye : *History of the Sepoy War*, vol. III, p.617

মাত্র সামান্ত একটু অংশ দখল করেছে, তবুও এরকম লুণ্ঠনের লোভ ও সুরার আকর্ষণ তাদের উন্মাদ করে তুলল। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইংরেজ বাহিনীর সৈন্যদের কীর্তি-কাহিনীর সুন্দর একটি বর্ণনা কেই দিয়ে গেছেন: "একটি কালো বা সবুজ রঙের বিয়ার কিংবা ব্র্যাণ্ডি অথবা মদের বোতল একটি হীরার হারের চেয়েও মূল্যবান ছিল। শত্রুরা এটা ভালোভাবেই জানত এবং তাদের জাতীয় ধূর্ততার সঙ্গে তারা ইচ্ছে করেই প্রচুর পরিমাণে এই উত্তেজক পানীয়টি লুণ্ঠনকারীদের হাতের নিকট রেখে গিয়েছিল। ইয়োরোপীয়রা (অর্থাৎ ইংরেজরা) তাদের লোভ কোনো ভাবেই সংবরণ করার চেষ্টা না করে এই তরল মূল্যবান বস্তুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা চতুরভাবে যে ফাঁদ পেতে গিয়েছিল তাতে যদি আমরা ধরা পড়তাম তাহলে আমাদের যে কী বিষম বিপদ হতো, তা বলা কঠিন। কিন্তু পরম দয়ালু ঈশ্বর, যিনি একবার তাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন, তাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করেছেন এবং তাদের বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করেছেন, তিনি আর একবার তাদের মতলবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিলেন। কিষেণগঞ্জের শহরগুলি তখনো তাদের অধিকারে; লাহোর বুরুজ এবং শহরের আরো অনেকগুলি শক্তিশালী কেন্দ্রে তারা তখনো দলবদ্ধ; আর আমাদের টিলার শিবির মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা রক্ষিত এবং তাদের মধ্যে আবার অনেকেই অসুস্থ। ঠিক এ রকম অবস্থায় বিদ্রোহী নেতৃত্বের একটা সাধারণ সুপরিকল্পিত আঘাতই আমাদের সমগ্র বাহিনীকে অভিভূত করে ফেলতে পারত এবং মোগল বাদশাহ বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন। এই শোচনীয় ১৫ই সেপ্টেম্বরে একটা বিরাট ঘন মেঘ আমাদের মাথার ওপর ঝুলছিল। এটা ছিল আমাদের সবচেয়ে ঘোরতর বিপদের দিন। এই মহাসমরের এই দিনটাতেই প্রথমবারের জন্যে ও শেষবারের জন্যে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিল এবং ভাগ্যলক্ষ্মী কার প্রতি প্রসন্ন হবেন, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কোনো মহাপুরুষেরও সাধ্য ছিল না।"[১২]

শুধু জেনারেল উইলসনের মতেই নয়, আরো অনেক ইংরেজ অফিসারের মতে তাদের প্রথম দিনকার অভিযান 'বড় একটা কিছু সাফল্য লাভ করেনি'। রবার্টস একটা চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমাদের প্রত্যেকটি কলাম পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়েছিল।...অফিসারদের মধ্যে নর্ম্যান, জন্সন এবং আরো দু'এক জন ছাড়া আর কেউই কোনো রকম কাজের উপযুক্ত ছিলেন না। সব পুরনো অফিসাররাই একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। আরো বিপজ্জনক ব্যাপার হলো এই যে, মতলব করে কিনা আমি বলতে পারি না, তবে শহরের সব মদের দোকানগুলি খোলা রাখা হয়েছিল এবং আমাদের লোকরা একেবারে মাতাল

১২. *Ibid*, pp. 619-20

হয়ে গিয়েছিল। নেশার ঝোঁকে তারা তাদের বাহিনী খুঁজেই পাচ্ছিল না এবং বিগত ৫-৬ দিনের কঠিন কাজ যেন সকলকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।"১৩

১৪ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের পর ইংরেজ বাহিনী একটা অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থার মধ্যে পড়ল। তাদের প্রচুর সংখ্যক সৈন্য তো হতাহত হলোই, তাছাড়া যারা জীবিত রইল তারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাদের অবস্থা আরো খারাপ হলো, যখন তারা একেবারে মাতাল হয়ে চেতনা হারিয়ে 'পশুর মতো গড়াগড়ি' দিতে লাগল। ঐদিনকার যুদ্ধে বিদ্রোহীদেরও কম ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তা হলেও তাদের লোকবলের অভাব ছিল না; তাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা ও নৈতিক বল বিনষ্ট হয়নি; শত্রুকে প্রতিরোধ করার আকাংক্ষা তখনো তাদের প্রবল। উপযুক্ত নেতৃত্বের পক্ষে এই সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করে দিল্লির যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তখনো, এই শেষ মুহূর্তেও সম্ভব ছিল। কিন্তু সিপাহি-নেতারা এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হলেন না। বৈপ্লবিক দুঃসাহসিকতা ও অনুভূতি তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁদের মানসিক কাঠামো ও চেতনাশক্তি সামন্ততান্ত্রিক যুগের সীমানা পার হয়ে বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। তাই যেটাকে সুবর্ণসুযোগ বলে ধরে নিয়ে প্রতি-আক্রমণের জন্যে যেখানে সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত ছিল, সেখানে তাঁরা সেই ১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধকে পরাজয় বলেই মেনে নিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে, ইংরেজরা দিল্লির সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করে শহরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে, তখন এটাকে তাঁরা নিজেদের পরাজয় বলে ধরে নিয়ে দিল্লি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। কেই-র কথায়: ঈশ্বর যে ইংরেজদের প্রতি প্রসন্নই ছিলেন, তা কে আর অস্বীকার করতে পারে?

১৫ই সেপ্টেম্বর যখন ব্রিটিশ বাহিনীর মাতাল সৈন্যরা রাস্তায় ও নর্দমায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল, বিদ্রোহীরা তখন কিষেণগঞ্জ পরিত্যাগ করে ফিরে এলো। সেইদিন সন্ধ্যার সময় উইলসন একটি বিশিষ্ট দল গঠন করে সমস্ত মদ নষ্ট করে ফেললেন। পরের দিন ১৬ই তারিখে স্বয়ং জেনারেল উইলসনের তত্ত্বাবধানে আবার পূর্বের মতো রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হলো। এই দিনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে উইলসন সন্ধ্যার সময় তাঁর রিপোর্টে লিখলেন: "আজ সকালে আমরা ম্যাগাজিন দখল করতে পেরেছি।...এর ফলে কিছুটা আমরা অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু আমাদের কাজ ভয়ানক মন্থর গতিতে চলেছে; এক-এক ইঞ্চি করে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বাহিনীর একটা বড় অংশের ওপর, জম্মু সৈন্যদের বাদ দিয়েও, আমি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আমার যেটা সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ—শত্রুর চেয়েও বেশি, সেটা হচ্ছে যে, প্রচুর পরিমাণে

১৩. *Letters*, p.64

মদ আমাদের ইয়োরোপীয় (!) ও নেটিভ সৈন্যদের হাতে পড়ছে, যা পান করে তারা পশু হয়ে পড়ে ও নিজেদের কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়। আমাকে সেগুলি ধ্বংস করবার সময়ও দেয় না। আমি দিনের পর দিন অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ছি; শরীর ও মন দুইই নিঃশেষ হয়ে আসছে।...আমি আর চলতে ফিরতে পর্যন্ত পারছি না এবং দু'এক দিনের মধ্যে আমাকে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হতে হবে।...আমাদের সামনে এখনো একটা দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম অপেক্ষা করছে। আশা করি আমি যেন এটার শেষ দেখতে পারি।"[১৪]

জেনারেল উইলসনের অবশ্য এতখানি ভীত হবার কোনো কারণ ছিল না। ১৪ই তারিখের পর বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব বলে আর কিছু রইল না এবং সুসংগঠিত প্রতি-আক্রমণের কোনো সম্ভাবনাও রইল না। কিন্তু নেতৃত্বের অক্ষমতা সত্ত্বেও তখনো বিদ্রোহীদের মধ্যে নির্ভীক লোকের অভাব ছিল না, যারা—ইতিহাসবিদ কেই'র মতে—উন্মাদও নয়, ধর্মান্ধও নয়; যারা সাহসী ও দিল্লির বাদশাহের অনুগত প্রজা এবং যারা তখনো মরীয়া হয়ে শত্রুকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। ১৬ই তারিখে বারনেস্ সরকারের নিকট দিল্লি থেকে টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠালেন: "বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়েছে এবং বাড়ির ছাদ থেকে যুদ্ধ করছে।"[১৫] বাহাদুর শাহের বিচারের সময় তাঁর ভূতপূর্ব সেক্রেটারি মুকুন্দলালের সাক্ষ্যে জানা যায়,—"১৬ই তারিখে বাদশাহ ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে প্রাসাদের গেট থেকে ৪০০ গজ দূরে খান আলি খানের বাড়ি পর্যন্ত একটা খোলা গাড়ি করে গিয়েছিলেন।"[১৬]

১৭ই তারিখেও বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পেল না। ইংরেজ ইতিহাসবিদ এইভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন: "আমাদের সৈন্যরা প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করল—যে প্রাসাদ আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্যস্থল; কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা তাদের হঠিয়ে দিচ্ছিল। বিদ্রোহীরা তখনো একেবারে দমে যায়নি। অনেকে দিল্লি ত্যাগ করেছিল,... কিন্তু তখনো শহরে তাদের অনেকেই রয়ে গিয়েছিল, যারা আমাদের দুর্বল বাহিনীর লোকেদের কাজ খুবই কঠিন করে তুলল। ম্যাগাজিন ও ব্যাঙ্ক আমরা দখল করেছিলাম, কিন্তু লাহোর গেট তখনো তাদের হাতে ছিল। নিকলসন আহত হবার পর থেকে আমরা ওদিকে একেবারেই অগ্রসর হতে পারিনি।... এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, আমাদের সৈন্যদের এরকম যুদ্ধের জন্যে ক্ষুধা একেবারেই বাড়েনি এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সম্মুখ-যুদ্ধের কায়দা

১৪. *History of the Sepoy War in India*, vol. III, p.622
১৫. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p.57
১৬. Martin : *Indian Empire*, vol. III, p. 170

ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো চাতুরিপূর্ণ উপায় বের করতে হবে। আমাদের অল্প-সংখ্যক লোকদের শত্রুর সামনে ফেলে দিয়ে বিপদাপন্ন করা বন্ধ করতেই হবে। এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। এরকম ভাবে অগ্রসর হতে তারা আর রাজী নয়; আর যদি রাজী হয়ও, তাহলে খুব অনিচ্ছা সত্বেই হবে।"[১৭]

সমস্ত দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করার পর ১৭ই তারিখে ইংরেজরা মাত্র ব্যাঙ্কের বাড়িটা দখল করতে পেরেছিল। অ্যাডজুটান্ট জেনারেল সেদিন এই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন: "ব্যাঙ্ক ও ম্যাগাজিনের মধ্যবর্তী স্থানটি শুধু আমরা দখল করে আছি। ব্যাঙ্কের নিকট সমস্ত দিন ধরে সংঘর্ষ চলেছে। প্রাসাদ ও সেলিমগড়ে আমরা অনবরত গোলা ফেলছি। শত্রুরা একশো-দুশো করে দলবদ্ধ হয়ে মথুরা দিয়ে গোয়ালিয়রের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। সকল রকমের অগাধ ঐশ্বর্য শহরে পড়ে আছে।...প্রত্যেক অঞ্চলে মৃত সিপাহিদের সংখ্যা খুবই বেশি।"[১৮] ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন আর একটা টেলিগ্রামে জানালেন: "আমাদের সৈন্যদের শৃংখলা অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। তারা এখন চারদিকে ছড়িয়ে লুঠপাট করছে আর মাতলামি করছে।"[১৯] ১৭ই তারিখে সমস্ত দিন ধরে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ একটুও হ্রাস পায়নি এবং সেলিমগড়ের কামান থেকে ইংরেজের গোলার জবাবে তারাও সমানে উত্তর দিয়েছিল। ১৮ই তারিখেও উভয়পক্ষে সমানে যুদ্ধ চলল। বিদ্রোহীরা তখনো বিনা যুদ্ধে শত্রুকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

১৮ই তারিখে বিপজ্জনক 'রাস্তার যুদ্ধ' পরিহার করে অ্যালেক্স টাইলর তাঁর এঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটা একটা করে বাড়ির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। এই কৌশল যদিও খুব নিরাপদ, কিন্তু তার অগ্রগতি খুবই মন্থর এবং সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বাড়ি ইংরেজরা দখল করতে পেরেছিল; এবং তাও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল। ঐদিন ইংরেজরা একবার লাহোর গেটও আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে তাদের পালাতে হয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও ইংরেজ সৈন্যদের আচরণ জেনারেল উইলসনের মুষড়ে-পড়া মেজাজকে আরো মুষড়ে দিল। আক্রমণের ৫ দিন পর তিনি ১৮ই তারিখের রিপোর্টে লিখলেন: "আমরা গতকাল যে স্থানে ছিলাম, আজও সেইখানেই আছি। আজ সকালে লাহোর গেট দখল করার একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা বিফল হলো এই কারণে যে

১৭. *History of the Sepoy War in India*, vol. III, p.625-26
১৮. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p.61
১৯. *Ibid*, p. 61

ইয়োরোপীয় সৈন্যরা তাদের অফিসারদের অনুসরণ করতে রাজী হয়নি। একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই লাহোর গেট অনায়াসে আমাদের হয়ে যেত, কিন্তু তারা অস্বীকার করে বসল। ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমাদের লোকরা 'রাস্তার যুদ্ধ' একেবারেই পছন্দ করে না ; এতে তারা শত্রুকে দেখতে পায় না—শুধু দেখতে পায় যে, ছাদের উপর কিংবা অন্য কোনো স্থানে লুক্কায়িত শত্রুর গুলীতে তাদের কমরেডরা কেবল ধরাশায়ী হয়ে পড়ছে। তার ফলে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে ও আর অগ্রসর হতে রাজী হয় না। এটা খুবই দুঃখের বিষয় এবং আমার পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমার মনে হয়, আমরা যেটুকু দখল করেছি সেটুকু অধিকার করে থাকতে পারব, কিন্তু এর বেশি আর কি করা যেতে পারে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। শহরে আমার মাত্র ৩,১০০ পদাতিক আছে—নতুন সৈন্য পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই অবস্থায় আমাকে যদি শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে হয়, তাহলে সৈন্যরা শহরের অগণিত গলি ও অসংখ্য বাড়ির মধ্যে কোথাও হারিয়ে যাবে, কিংবা তাদের ফিরে আসতে হবে। এটা সত্য যে বেশ কিছু সংখ্যক শত্রু পালিয়েছে, কিন্তু এখনো আজমির ও দিল্লি গেটের মাঝে তাদের একটা মস্ত বড় শিবির আছে এবং যারা শহর থেকে চলে গিয়েছে, তারা যখন জানতে পারবে আমরা আর অগ্রসর হতে পারছি না, তখন তাদের ফিরে আসারও সম্ভাবনা আছে।"[২০]

উইলসনের এই রিপোর্ট থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, ইংরেজরা এই সময় কী ভয়ানক একটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্রোহীদের একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের পক্ষে তখনো শত্রুদের একেবারে নির্মূল করে দেওয়া খুবই সম্ভব ছিল ; একটিমাত্র নির্মম আঘাতের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ তারা ওলট-পালট করে ফেলতে পারত।

পরদিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজরা 'গৃহঝম্প' ও 'রাস্তার যুদ্ধ'—এই দুই কৌশলই একসঙ্গে চালাল। এর ফলে তাদের অগ্রগতি ভালোই হলো এবং সন্ধ্যার দিকে এমন একটা বাড়ি দখল করল যেটা ঠিক লাহোর বুরুজের পশ্চাতে

২০. Kaye : *History of the Sepoy War in India*, vol. III, p. 630
পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি ব্র্যাণ্ডরেথ দিল্লির ইংরেজ বাহিনীর এই সংকটজনক অবস্থার কথা জানিয়ে ভারত সরকারকে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন : "Our army sadly diminished by sickness (in Delhi) and this terrible struggle ; but no means exist of reinforcing it. We have no more loyal troops to spare from the Punjab, and even if we had, they could not reach Delhi in time to render effective aid." (*Punjab Mutiny Records*, vol. VII, pt. I, p. 57)

অবস্থিত। এই লাহোর বুরুজেরই ৭টি কামান ইংরেজদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে লাহোর বুরুজকে রক্ষা করার কোনো উপায় না দেখে বিদ্রোহীরা রাত্রিকালে বুরুজ ত্যাগ করে নিঃশব্দে চলে গেল। কিন্তু অন্যদিকে কেই বলছেন: "লাহোর বুরুজের কেবলমাত্র নামটাই আমাদের মধ্যে এতবড় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করত যে, যদিও তা আমাদের হাতে খুব সহজে এসে গিয়েছিল ও শত্রুর পক্ষ থেকে আর কোনোরকম বাধাও আসেনি, তা সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে তাকে অধিকার করতে আমাদের সৈন্যদের সুস্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল। বুরুজ পরিত্যাগ করা থেকে তাদের নিরস্ত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ছিল।"[২১]

১৯ তারিখে ইংরেজদের ভাগ্য এভাবে প্রসন্ন হবার পূর্বে গ্রেটহেড কেবলমাত্র ইংরেজদের নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী ও দুটি কামান নিয়ে লাহোর গেট আক্রমণের চেষ্টা করছিলেন। তারা যখন একটা নিরাপদ সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ একদল বিদ্রোহী চাঁদনিচকের নিকট তাদের ভয়ংকরভাবে আক্রমণ করল। ইংরেজ বীরপুরুষরা তাদের কামান দুটি ফেলে দিয়ে যে যেখানে পারল আশ্রয় নিল। গ্রেটহেড আবার তাদের পুনর্গঠনের চেষ্টা করলেন। অকৃতকার্য হয়ে ৭৫তম বাহিনীকে হুকুম করলেন বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে, কিন্তু তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যরা এক পা-ও অগ্রসর হলো না। ৮ম বাহিনীর লোকরাও অনুরূপ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করল। বিদ্রোহীরা 'আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিল' এবং শত্রুর কামান দিয়েই শত্রুর ওপর গোলাবর্ষণ করেছিল। গ্রেটহেড, "যিনি মানুষের জীবনের মূল্য জানতেন, এরকম অবস্থায় কোনো জীবন নষ্ট না করে, বিজ্ঞতার সঙ্গে··· তাঁর লোকদের ফিরিয়ে নেওয়াই ঠিক করলেন।" কিন্তু ইংরেজ বীরপুরুষরা তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে এতটুকু নড়ল না—তারা এক-পা এগোবেও না, এক-পা পেছনেও যাবে না। অবশেষে সন্ধ্যার পর, যারা লাহোর বুরুজের পিছনের বাড়িটা দখল করেছিল, তাদের সাহায্যে গ্রেটহেড তাঁর লোকদের 'কৃতিত্বের সঙ্গে' ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।[২২]

১৯ তারিখে ইংরেজদের জুম্মা মসজিদের উপর আক্রমণ বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু চাঁদনিচকের দিকে তারা খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। তাছাড়া সেলিমগড়ের কামানগুলিও, যার উপর ১৪ই তারিখ থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ হচ্ছিল, ক্রমশ এদিন নিস্তব্ধ হয়ে পড়তে লাগল। ঐদিন অনেক বিদ্রোহীকে নৌকার সেতু পার হয়ে চলে যেতে

২১. Kaye, p. 627
২২. *Ibid*, p. 628-29

দেখা গিয়েছিল।

একদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৮ই তারিখে উইলসনের নিকট গুপ্তচররা বিশ্বস্ত খবর নিয়ে এসেছিল যে, বাদশাহ ও শাহজাদারা, বাদশাহের তিনটি বাহিনী ও কিছু বিদ্রোহী অশ্বারোহী ও পদাতিকদের নিয়ে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রাসাদ রক্ষা করবার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[২৩]

বাদশাহ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই পরিকল্পনাই কার্যে পরিণত করতেন, তাতেও বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা শেষ আশা ছিল এবং ইংরেজের পক্ষে প্রাসাদ অধিকার করা খুব সহজ হতো না। কিন্তু ইংরেজের সৌভাগ্য যে, প্রাসাদে তাদের শক্তিশালী বন্ধুর অভাব ছিল না। আসাহুল্লা ও মির্জা এলাহি বক্স বেগম জিন্নৎ মহলের সাহায্যে বাহাদুর শাহের এই সংকল্প পরিবর্তন করাতে সমর্থ হলো এবং বাহাদুর শাহ এদের প্ররোচনায় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে কুতুবে আশ্রয় নিতেও সম্মত হলেন। ঠিক এরকম সময়ে বখ্‌ত খান বাহাদুর শাহকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে লখনৌ চলে যেতে। কিন্তু বাদশাহ এই প্রস্তাবে সম্মত হননি।[২৪]

১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় দিল্লির ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খবর পেল — বাহাদুর শাহ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।

২০শে সেপ্টেম্বর একজন ইংরেজ স্টাফ অফিসার যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে দিল্লির যুদ্ধের বাস্তব অবস্থাটা ভালোভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে: "আমাদের প্রধান বিপদ দিল্লির অভ্যন্তরেই হয়েছিল।...প্রতিটি রাস্তায় শত্রুরা প্রত্যেক ফুট জমির জন্যে লড়েছিল এবং সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে একটার পর একটা স্থান দখল করেছিল।...প্রকৃত পক্ষে আমরা নিজেদের অভিনন্দন জানাতে পারি যে, আমরা নিকৃষ্টতম সংখ্যা নিয়ে শহর আক্রমণের চেষ্টা করিনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শহরের একটা অংশ অধিকার করবার পর আমাদের বাহিনী এতদূর বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল যে, এরকম একটা অর্ধবিজিত অবস্থা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠল।...সত্য ঘটনা এই যে, আক্রমণের পরের দিন থেকে আমাদের একটা ভয়ানক আশংকার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। আমাদের অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর, যাদের আমরা যুদ্ধ করতে নামাতে পেরেছিলাম তাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, এবং শত্রুরা যে তাদের ঘাঁটিগুলি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তাতে আমাদের নায়করা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন।...বস্তুত আমরা ইচ্ছে করেই নৌকার সেতু কামান দিয়ে ধ্বংস করে দিইনি। আমরা আনন্দের সঙ্গেই পলায়নরত শত্রুদের এই সেতু ছেড়ে দিয়েছিলাম।

২৩. Martin : *Indian Empire*, vol. III, p.158
২৪. Metcuff : *Two Native Narratives*, p.70

আমি মনে করি না যে, আমাদের কামানের গোলা শত্রুকে পালাতে বাধ্য করেছিল। আমাদের সৈন্যরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা এক মাইলও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে সমর্থ হয়নি।"[২৫]

বাদশাহ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবার পরও যুদ্ধ থেমে যায়নি। ২০শে তারিখে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে অনেকবার হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। প্রাসাদের প্রধান গেট থেকে ব্যাঙ্কে ইংরেজদের ওপর গোলা বর্ষিত হলো। জুম্মা মসজিদের নিকট বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিদ্রোহীরা ভয়ানকভাবে শত্রুকে বাধা দিল। অপরাহ্নে ইংরেজরা প্রাসাদ ও সেলিমগড় দখল করতে সমর্থ হলো। এই শেষ অবস্থায়ও বিনা যুদ্ধে ইংরেজরা প্রাসাদ দখল করতে পারেনি। মৃত্যুবরণ করতে বদ্ধপরিকর একদল লোক প্রতিটি গেটে, প্রতিটি দরজায় বন্দুক হাতে শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে ইংরেজকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়েছিল।[২৬] ৭ দিন ধরে শহরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে ইংরেজরা ভারতের প্রাচীন রাজধানীতে আবার তাদের অধিকার স্থাপন করল।

একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ বলেছেন: "কেবলমাত্র ২০ তারিখে সকালবেলায় নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল যে, দিল্লির এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রায় শেষ হতে চলল।" ১৯ তারিখ পর্যন্ত দিল্লির ভাগ্য সম্পূর্ণ দোদুল্যমান ছিল। যদিও ইংরেজরা দিল্লির প্রাচীর ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল ও শহরের একটা অংশ দখল করতে পেরেছিল, তবে তার জন্যে তাদের এত বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল যে, এই অতি কঠিন পরীক্ষার সময় তাদের প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে ইংরেজ নায়করা অনুভব করছিল যে, তারা যেন একটা ফাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে এবং যুদ্ধের ফলাফল একেবারেই অনিশ্চিত। ১৯ তারিখ পর্যন্ত তাদের চরম জয় সম্বন্ধে তারা খুবই সন্দিহান ছিল। বিদ্রোহী সিপাহি ও নাগরিকরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শহর রক্ষা করে যাচ্ছিল। তাদের দিক থেকে বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের কোনোই অভাব ছিল না।

ইংরেজ পক্ষে যে ১০ হাজার লোক দিল্লির শেষ আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল, সাত দিনের যুদ্ধে তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা হয়েছিল ১ হাজার ও গুরুতর আহতদের সংখ্যা ৩ হাজার। ফরেস্ট বলেন: "এই ক্ষতি আমাদের সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত ঘটনাগুলিকে মনে করিয়ে দেয়।"[২৭] তার পরেই ফরেস্ট সেবাস্তপোলের যুদ্ধের (১৮৫৬) সঙ্গে দিল্লির যুদ্ধের তুলনা করে বলেছেন যে, সেবাস্তপোলের যুদ্ধে ৯৭,১৭৪ ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল

২৫. Martin : *Indian Empire*, vol. III, p.133
২৬. *History of Sepoy War in India*, vol. III, p. 633
২৭. Forrest : *History of the Indian Mutiny*, vol. III, p. 150

১৩, ৯৫৯—যা তখন খুবই বেশি বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু দিল্লির যুদ্ধে এই অনুপাতে হতাহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি হয়েছিল।[২৮]

ইংরেজ হতাহতের সংখ্যা		এঞ্জিনিয়ার্স	গোলন্দাজ	অশ্বারোহী	পদাতিক
সেবাস্তপোলে	...	৮%	৭'১৫%	৪'৪২%	১৭'৪৩%
দিল্লিতে	...	১৩%	২২'৬%	৭'৩%	৩৭'৭%

বিদ্রোহীদের একমাত্র প্রধান সমস্যা ছিল নেতৃত্বের সমস্যা। সঠিক ও সবল নেতৃত্বের দ্বারা এই শেষ মুহূর্তেও ইংরেজকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে চূড়ান্ত বিজয় শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল না। ইংরেজরা দিল্লির শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তাদের নিজস্ব শক্তির বলে নয়, তারা জয়লাভ করেছিল বিদ্রোহীদের নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্যে। বিদ্রোহীদের বীরত্ব, সাহস ও আত্মোৎসর্গের কোনোই অভাব ছিল না। কিন্তু সিপাহি-অফিসাররা তাঁদের চূড়ান্ত সমস্যা, অর্থাৎ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-গঠনের কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দিল্লিতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব নয়। দিল্লির সামন্ত-সম্রান্ত ও সিপাহিদের অন্তর্দ্বন্দ্বে সিপাহিরাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছিল। রাজধানীতে নিজেদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েও সিপাহি-নেতারা সবল নেতৃত্ব গঠন করতে পারলেন না। তাঁদের এই অক্ষমতার প্রধান কারণ এই যে, সিপাহি-নেতারা আদর্শগতভাবে (ideologically) পশ্চাৎপদ কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত (petty bourgeois) শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। এই শ্রেণীর অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও, এককভাবে এদের পক্ষে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গঠন করা সম্ভবপর হয় না। এই সময়কার ইংরেজদের মতো একটা অগ্রসর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মতো মানসিক ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এইসব নেতাদের ছিল না। একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণী কিংবা শ্রমিক শ্রেণী এরকম জাতীয় বিদ্রোহে সফল নেতৃত্ব দিতে সমর্থ। কিন্তু ভারতীয় ধনিক শ্রেণী তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, কাপুরুষতা ও অনভিজ্ঞতার জন্যে এই বিদ্রোহ থেকে দূরে সরে ছিল; আর বর্তমান শ্রমিক শ্রেণী তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। সিপাহি-নেতারা তাঁদের আদর্শগত ও মানসিক অনগ্রসরতার জন্যেই এত সুবিধা পেয়েও কোনো রকম বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেন নি; এবং ১৫ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে তাঁরা যে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তার কিছুই

২৮. *Ibid*, pp.151-53

কাজে লাগাতে পারেন নি। এই কারণেই বিদ্রোহী-দিল্লির ইতিহাস হচ্ছে হারানো সুযোগের এক শোকাবহ ইতিহাস।

২১শে সেপ্টেম্বর গর্বিত দিল্লি পুনরায় বিদেশী আক্রমণকারীদের পদতলে সম্পূর্ণরূপে ধরাশায়ী হলো। ১২০ দিন ধরে দিল্লির সাধারণ নরনারী সিপাহিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে যেভাবে নিজেদের সহস্র সহস্র জীবন বিসর্জন দিয়েছিল তা একদিকে যেমন তাদের মহান আদর্শের নিদর্শন, অন্যদিকে তা ইংরেজের ভাড়াটিয়া বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডব আর সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার জলন্ত নিদর্শন। ৭ দিনের অমানুষিক হিংস্র যুদ্ধের ফলে ভারতের প্রাচীন রাজধানী একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। যে বিরাট শহর দু'দিন পূর্বেও লক্ষ-লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত ছিল, আজ সেই শহরেরই রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর জনমানব বর্জিত। সবজিমণ্ডি থেকে লাহোর গেট পর্যন্ত চারদিকে কেবল শবদেহ – উট, ঘোড়া, গোরু ও মানুষের রোদে-পোড়া অস্থিসার অগণিত দেহগুলি গাদাগাদিভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।[২৯] বড় বড় গাছগুলি কোথাও-বা শাখাপত্র-শূন্য হয়ে দণ্ডায়মান, কোথাও বা ধরাশায়ী। ধনীদের বাগান বাড়িগুলির ধ্বংসাবশেষ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। শহরের অভ্যন্তরের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। কাশ্মীর গেট থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাড়ি বিধ্বস্ত ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে কৃষ্ণাভ।

দিল্লিতে যে পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও অবাধ লুণ্ঠন ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হলো, তা কেবলমাত্র যুদ্ধের উন্মাদনার বশেই ঘটেনি। এই হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন

---

২৯. "Dead bodies of sepoys and city inhabitants by scattered in every direction, poisoning the air for many days and raising a stench which was unbearable." (Griffiths, p. 200) উর্দু কবি গালিব – যিনি দিল্লিতেই বাস করছিলেন এবং এইসব দৃশ্য দেখছিলেন – তাঁর 'দস্তাম্বু'তে লিখেছিলেন : "Here is a vast ocean of blood before me, God alone knows what more I have still to behold.···Thousands of my friends died. Whom should I remember and to whom should I complain. Perhaps none is left even to shed tears on my death···God alone knows the number of persons who were hanged. The victorious army entered the city along the main road. Whomsoever they met on the way was killed. The white men on their entry started killing helpless and innocent persons. In two or three Mohallas the English both looted the property and killed the people."

সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব-পরিকল্পিত। এর উদ্দেশ্য ছিল 'নেটিভ'-দের মনে সর্বত্র এমন একটা ভয়ংকর আতঙ্কের সৃষ্টি করা যে, তারা যেন আর কখনো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কল্পনাও না করতে পারে। জেনারেল আউটরাম প্রমুখ বড় বড় ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক নায়করা খোলাখুলি ভাবেই বলেছিলেন যে, সমগ্র দিল্লি শহরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলতে হবে। দিল্লিতে ইংরেজ আক্রমণকারীরা এই কাজের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। এই সময় রবার্টস দিল্লি শিবির থেকে লিখেছিলেন: "আমি আশা করি শহর থেকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কারণ আমরা একবার দিল্লিতে প্রবেশ করলে কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না।"[৩০]

দিল্লির হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস জেনারেল নীল কর্তৃক সংঘটিত এলাহাবাদ ও কানপুরের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতার সঙ্গেই তুলনীয়। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে কাউকেই বাদ দেওয়া হয়নি। কৃষ্ণবর্ণের মানুষ দেখামাত্রই 'সুসভ্য' ইংরেজ পূর্ব-পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ধীর মস্তিষ্কে তাকে হত্যা করেছে।[৩১] এইভাবে কত সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশুকে যে খুন করা হলো তার কোনো হিসাবই নেই। কেবলমাত্র 'দোষী' লোকদেরই যে এরকম নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো, তা নয়। কেই লিখেছেন: "যারা কোনোদিন আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করেনি, যারা শান্তভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজ করে গিয়েছে এবং

৩০. *Letters*, p.37

৩১. জাহির ডেলাভি একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁর 'দস্তান-ই-খাদর'-এ ইংরেজদের দিল্লি হত্যাকাণ্ডের এই বর্ণনা দিয়েছেন: "Sometimes innocent persons were killed along with the sinners. This is what happened after the Mutiny. The English soldiers began to shoot whomsoever they met on the way. Among the men who remained in the city, there were some whose equal has never been born. Mian Muhammad Amin Panjakush, an excellent writer, Maulavi Imam Buksh along with his two sons, Mir Niaz Ali and the persons of Kucha Chhelan (it is said they were fourteen hundred in number) were arrested and taken to Rajghat gate. They were shot dead and their dead bodies were thrown into the Jumna. As for the women, they came out of thier houses along with thier children and killed themselves by jumping into the wells. All the wells of Kucha Chhelan were filled with dead bodies. My pen dare not write more"

এমনকি বিদ্রোহীরা যাদের লুণ্ঠন করেছে ও যাদের ওপর অত্যাচার করেছে—এমন অসংখ্য লোককেও আমরা বেয়নেটের দ্বারা বিদ্ধ করেছি, অথবা তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করেছি, অথবা বন্দুকের গুলী দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক বিদ্ধ করেছি।…কালা-আদমি দেখামাত্রই আমাদের জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপিত হয়ে উন্মত্ততার সীমানায় পৌছে গিয়েছে।"[৩২]

এমনকি ইংরেজের হিতকাংক্ষী মইনউদ্দিনও তার ডায়েরিতে লিখেছিল : "শহরে কোনো মানুষের জীবনই নিরাপদ নয়। পুরুষ মানুষ দেখলেই হলো—তাকে বিদ্রোহী বলে ধরে তখনই গুলীকরে হত্যা করা হচ্ছে।"[৩৩]

এমনকি গ্রামাঞ্চলেও নির্দোষীদের কিরকম ভাবে হত্যা করা হয়েছে তার অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ—"একদল গরিব গ্রামবাসীর নিকট কয়েকটি নতুন পয়সা পাবার অপরাধে তাদের সকলকে ফাঁসি দেওয়া হয়। নিকটবর্তী একটা ধনাগার নাকি কিছু পূর্বে লুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এই পয়সাগুলি দিয়ে আমাদেরই লোকরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুধ, শাকসবজি, আটা ইত্যাদি কিনেছিল।"[৩৪]

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও বহুদিন ঠাণ্ডা মাথায় এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলতে দেখে কোনো কোনো প্রকৃতিস্থ ইংরেজ শাসকও চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। বম্বে প্রদেশের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোন জন লরেন্সকে লিখেছিলেন : "দিল্লির যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও আমাদের সৈন্যদের নৃশংস কাজগুলি সত্যিই খুব হৃদয়বিদারক। শত্রু-মিত্র বাছবিচার না করেই পাইকারি ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। আর লুণ্ঠনের ব্যাপারে, আমরা নাদির শাহকেও ছাড়িয়ে গিয়েছি।"[৩৫]

১৮৫৭ সনের পূর্বে দিল্লিতে আরো কয়েকবার লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। কিন্তু এবারকার সুসভ্য ইংরেজের হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের ব্যাপকতা ও প্রকৃতি অন্যবারের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ইংরেজ ইতিহাসবিদ মণ্টোগোমারি মার্টিন বলেছেন : "১৭৩৯ সনের তুলনায় (নাদির শাহের আক্রমণ) ১৮৫৭ সনে পুরনো রাজধানীর ধ্বংস. পূর্ণতরভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। মোগল বাদশাহীর বিরুদ্ধে নাদিরের অত্যাচারের আতিশয্যকে কোনো ব্যক্তির একটা উগ্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী রোগের আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেই রোগ মানুষের শরীরকে সব সময়ের জন্যে দুর্বল করে দিলেও, সে আরোগ্য লাভ করে উঠে

৩২. *History of the Sepoy War in India*, vol. III, p.636
৩৩. Metcuff : p. 59
৩৪. *History of the Sepoy War in India*, vol. III, p. 638
৩৫. Smith : *Life of Lord Lawrence*, vol. II, p.262

দাঁড়ায়। কিন্তু ইংরেজের আঘাতের ফলে দুর্বল রোগী একেবারেই মরে গেল।"[৩৬]

ইংরেজের উদ্দেশ্যও ছিল তাই—রোগীকে এমন প্রচণ্ড আঘাত করা যে, সে যেন কোনোদিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া, আরো একটা বিশিষ্ট পার্থক্য ছিল এই যে, পূর্বেকার আক্রমণ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনগুলি করেছিল কতকগুলি বর্বর অসভ্য দস্যুদল। আর, ১৮৫৭ সনের হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীরা হলো সুসভ্য ইংরেজ।

একজন ইংরেজ অফিসার দিল্লি থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর একটা চিঠিতে লিখেছিলেন: "দিল্লির ঐশ্বর্য বর্ণনা করা আমার কলমের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সোনার কাজকরা কাশ্মীরের শাল, সোনার লেস-যুক্ত কাঁচুলি, চোগা চাপকান, ঘড়ি সিল্ক সোনা—যা ইংল্যাণ্ডে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাড়িতেও দেখা যায় না—প্রথম দিনেই শিখরা এসব লুঠপাট করে জমা করছিল। তার এক-একটা শাল, যার দাম ইংল্যাণ্ডে ১০০ পাউণ্ড হবে, মাত্র ৪ টাকায় বিক্রি করছিল। জেনে রেখো ইংরেজরাও এই ব্যাপারে কারো পিছনে পড়ে ছিল না। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তারা এক-একজন ১ হাজার পাউণ্ড (১০ হাজার টাকা) সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে।"[৩৭]

বস্তুত লুণ্ঠনকারীদের পক্ষে দিল্লি ছিল স্বর্গরাজ্য। সোনা, রূপা, অলংকার, মণি, মুক্তা, হীরা, কার্পেট, সিল্ক ও পশমের কাপড়—কিছুরই অভাব ছিল না। এসব ধনরত্ন প্রাণভরে লুঠ করার প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে যেসব শিখ, পাঠান, বালুচি, দুর্বৃত্ত-গুণ্ডা-বদমাশের দল ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তারা ও ইংরেজ সৈন্যরা এমন সুযোগ পাওয়া মাত্রই হিংস্র জন্তুর মতো তাদের শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিল্লির লুণ্ঠন সম্বন্ধে কেই এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন: "দিল্লি লুণ্ঠন করা শিখদের অনেক দিনকার একটা দিবাস্বপ্ন। তাদের এই চিরাকাংক্ষিত বাসনা পূরণ করবার এখন তারা সুযোগ পেল।

৩৬. Montogomery Martin : *Indian Empire*, vol. III, p.148.

করে হত্যা করা ছাড়াও সহস্র সহস্র লোককে ফাঁসিতে ঝোলান হয়েছিল। Mrs. Coopland তাঁর *A Lady's Escape from Gwalior*-এ লিখেছিলেন : "The provost-marshal (of Delhi) who performed this revolting duty (i.e. hanging) had put to death between 400 to 500 wretches since the siege, and was now thinking of resigning his office." (p. 208) মোগল পরিবারের ২১ জন শাহজাদা—যাঁরা ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন—তাঁদেরও ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

৩৭. Ball : *History of the Indian Mutiny*, vol. I. p. 522

কোনো সংকোচ আর তাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারল না। সম্ভবত পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও চরিত্রগত ধূর্তামি দ্বারা তারা জানত কিভাবে লুক্কায়িত ধনরত্নের গুপ্তস্থান সন্ধান করে বার করতে হয়। যদি তা মেঝের নিচে পুঁতে রাখা হয়, তাহলে ফাটা জায়গায় জল ঢেলে দিত; যদি সত্যই পূর্বে ঐ স্থান খনন করা হয়ে থাকে তাহলে জল ভিতরে প্রবেশ করে যাবে, তা নাহলে মেঝের উপর ভেসে উঠবে। আর যদি দেওয়ালে ইঁট দিয়ে গেঁথে রাখা হয়, তাহলে একজন চিকিৎসক যেমন রোগীর বক্ষস্থান পরীক্ষা করেন, সেইভাবে কান পেতে টোকা মেরে দেখা হবে।··· যে অসংখ্য দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছিল ও মেঝে খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল তা থেকেই বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, এরা এ বিষয়ে কতখানি উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা দেখিয়েছিল। এটাও দেখা গিয়েছিল যে, তারা দেওয়ালের ওপর দিয়ে এইসব লুঠের মাল তাদের বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং তারা গোরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল যে, তাদের দেশবাসীরা দিল্লির পতনের কথা বিশ্বাসই করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের চোখের সামনে এই লুঠের প্রমাণ দেখতে পাবে। কিন্তু কেউ যেন না ভাবে যে, শিখরাই এই লুঠের একমাত্র অংশীদার ছিল। সর্বজাতির সৈন্য ও তাদের অনুচররা নির্বিচারে যেখানে যা পেয়েছে, তাই হস্তগত করেছে। ইয়োরোপীয় সৈন্যরাও, একটু কম করে হলেও, এই লুঠে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু শিখ সাথীদের মতো তাদের দৃষ্টি এতটা তীক্ষ্ণ ছিল না।"[৩৮]

৩৮. *History of the Sepoy War in India*, vol. III, pp.640-41. হাডসন একমাত্র জিন্নৎ মহলের নিকট থেকেই ২ লক্ষ টাকার গহনা ও মুদ্রা লুঠ করেছিল। গ্রিফিথ্‌স তার *Siege of Delhi*-তে লিখেছিল যে, প্রত্যেক ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যদের ঘরগুলি নানারকমের বহুমূল্যবান জিনিসপত্রে বিশেষ করে গহনায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল; অনেক মণিমুক্তা ছিল 'as large as hen's eggs'। গ্রিফিথ্‌স নিজে ৩ সপ্তাহ ধরে বড় একটা কোমরবন্ধ নিয়ে শিকারের খোঁজে বেরত: "Though many years have elapsed the events of those weeks seem as vivid in my memory as though they had happened yesterday—the brightness of the jewels, dazzling gold, the nerves wrought to the highest pitch of tension while waiting in eager expectation for the result of a search." দিল্লির মিলিটারি গভর্নর বার্নস একটা মোটামুটি হিসেব করে বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ অফিসার ও সৈন্যরা ২ কোটি টাকার সোনা, মণিমুক্তা ও গহনা নিয়ে গিয়েছিল—প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক বেশি নিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে লখনৌ ইত্যাদি শহরের লুঠের টাকা।

বস্তুত, ভাড়াটিয়া শিখ, পাঠান, বালুচি, গুর্খা ও ইংরেজরাও এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের জন্তে সমানভাবে দায়ী। কিন্তু এইসব দুষ্টচরিত্র ও গুণ্ডা প্রকৃতির ভাড়াটিয়া শিখদের দুষ্কর্মের জন্তে ইতিহাসবিদ কেই যে সমগ্র শিখজাতির প্রতি বক্রোক্তি করেছেন, তা তাঁর মতো একজন সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। কেই ও অন্যান্য ইংরেজ ইতিহাসবিদরা অনেক স্থলে উল্লেখ করেছেন যে, কতরকমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কত প্রলোভন দেখিয়ে এবং লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে বলে এইসব বাছাই করা দুশ্চরিত্রদের ইংরেজ সৈন্যদলে ভর্তি করা হয়েছিল। দিল্লির ও অন্যান্য স্থানের পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের জন্তে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজরাই দায়ী।[৩৯] শিখদের তথাকথিত 'চির-

---

দিল্লিতে অনেক বাড়ি ও জমি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল। রাজভক্ত বানিয়া ও অন্যান্য ভারতীয় এই জমি শস্তায় কিনেছিল। "And so it happens today that rows of houses in most localities (in Delhi) belong to one owner." (Nigam : *Delhi in 1857*, p. 164)

৩৯. অধ্যাপক সেন দিল্লিতে ইংরেজদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের নিরপেক্ষভাবে কিছুটা বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, ইংরেজ মিলিটারি অফিসাররা দিল্লি শহরটাকে কার্থেজের মতো ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু 'ভালো ইংরেজ সিভিলিয়ানরা' সেই সম্ভাব্য ধ্বংস থেকে দিল্লিকে রক্ষা করেছিলেন এবং এজন্তে তিনি স্যার জন লরেন্সকে খুব প্রশংসা করেছেন। "Delhi was lucky in escaping the fate of Carthage." (p.114) "Luckily the civilians did not see eye-to-eye with their friends in the army ··· the credit of restoring to the unfortunate victims of war what remained of their ancestral homesteads, and of rehabilitating the deserted city, goes to Sir John Lawrence and the civilians." (p. 118) ৩ মাস ধরে দিল্লিতে অবিরাম লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চলার পর ক্যানিংকে লরেন্স ৪ঠা ডিসেম্বরে লিখেছিলেন যে, এরকম ব্যাপার চলতে থাকলে 'নেটিভ' ও ইংরেজদের মধ্যে ব্যবধান এত বেড়ে যাবে যে তাতে ভারতে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে। এই সময়েই লরেন্স আর একটা চিঠিতে ভারতে গেরিলাযুদ্ধ বিস্তার লাভ করতে পারে বলে আশংকা করেছিলেন। তিনি দিল্লির কম্যাণ্ডার জেনারেল পেনিকে লিখেছিলেন : "··· unless we endeavour to distinguish friend from foe, we shall unite all classes against us. A guerrilla warfare will spring up, the country will gradually become desolated, and eventually will be too hot to contain us." (Michael

কালের দিবাস্বপ্ন', 'জাতীয় প্রতিশোধ নেবার আকাংক্ষা' ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজ শাসকরাই উস্কানি দিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শিখদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছিলেন।

শিখদের এরকম ব্যবহার ইংরেজ শাসকবর্গের নিকট চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইর লিখলেন : "সুবিবেচক লোকেরা এই ভেবে আশঙ্কিত হচ্ছেন যে, শিখরা যে পরিমাণ ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে তাদের দেশবাসীরাও যদি অনুরূপ ধনরত্ন অর্জন করবার জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তাহলে ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে খুব অনুকূল নাও হতে পারে।"[৪০]

"লুণ্ঠনের ব্যাপারে ইংরেজ বীরপুরুষরা, সে সম্মানিত অফিসারই হোক কিংবা সামান্য সৈনিকই হোক, কেউ কারো পিছনে পড়ে ছিল না।" জেনারেল উইলসনের স্টাফের একজন অফিসার গ্রিফিথ্‌স তাঁর বইতে একজন ইংরেজ অফিসারের কথা উল্লেখ করেছেন—যে ২ লক্ষ টাকার মূল্যবান দ্রব্যাদি লুঠ করেছিল। গ্রিফিথ্‌স আরো বলেছেন : "যে উদাহরণটি এইমাত্র দেওয়া হলো এরকম আরো অনেক উদাহরণ আমরা ঐ সময়ে জানতাম, যাদের প্রত্যেকের লুণ্ঠিত টাকার পরিমাণ ২ লক্ষ টাকার চেয়ে কিছুটা কম ছিল।"[৪১] এইসব দস্যুর দল মন্দির ও মসজিদ লুণ্ঠন করতেও এতটুকু ইতস্তত করেনি। "মন্দিরের মূর্তিগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে ফেলে দিয়েছিল এবং পূজার বেদী ভেঙে লুক্কায়িত ধনরত্নের সন্ধান করেছিল।"[৪২] এসব দেখে দিল্লির ইংরেজ বাহিনীর একজন ইংরেজ চিকিৎসক ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইরকে লিখেছিলেন : "শহরের প্রতিদিনকার লুণ্ঠনের পরিমাণ অত্যধিক বেশি—এত বেশি যে তা প্রায় বিশ্বাস করা যায় না। আমার মনে হয়, দিল্লিতে উপস্থিত প্রত্যেক অফিসার চাকুরি থেকে এখনি অবসর গ্রহণ করতে পারবেন।"[৪৩] প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পরই 'প্রচুর সংখ্যক' অফিসার ও সৈন্য চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিল।[৪৪] ব্যক্তিগতভাবে লুণ্ঠন ছাড়াও সরকারিভাবে সাড়ে ৩৫ লক্ষ লুঠের টাকা দিল্লির সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।[৪৫]

Edwards : *The Necessary Hell* ; John and Henry Lawrence and the Indian Empire, 1958. London. pp. 173-74

৪০. *Records of the Intelligence Dept.*, vol. I, p. 208

৪১. Griffitns : *Siege of Delhi*, pp. 234-35

৪২. *Ibid*, p. 245

৪৩. *Records of the Intelligence Dept.*, vol. I, p.239

৪৪. Griffiths : *Siege of Delhi*, p.233

৪৫. *Military Proceedings*, no. 1279, Feb. 1869

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে বিনা বাধায় এই হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন দিল্লি শহরে ও চারদিকে বেপরোয়াভাবে চলতে লাগল। এর ফলে ইংরেজ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা এত বেড়ে গেল যে, দিল্লির সেনানায়ককে লুণ্ঠন বন্ধ করবার জন্যে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে একটা কড়া আদেশ জারি করতে হলো। ঐ অফিসার ২১শে ডিসেম্বর তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "বিনা বাধায় এরকম লুঠপাটের ফলে শৃংখলা একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শত্রু হোক মিত্র হোক, বিনা পক্ষপাতিত্বে সকলকেই সমানভাবে লুঠ করা হয়েছে। এমনকি আমাদের দেশবাসীদের সম্পত্তি পর্যন্ত, যা বিদ্রোহীদের নিকট থেকে উদ্ধার করা গিয়েছিল তাও যুদ্ধের পুরস্কার বলে ঘোষণা করে আত্মসাৎ করতে দেওয়া হয়েছে।"[৪৬] তিন-চার মাস ধরেই এরকম বেপরোয়াভাবে লুঠপাট করবার পর যখন লুঠ করার মতো আর কিছুই থাকল না, তখনি লুঠ বন্ধ হলো।

দিল্লির পতন যদিও বিদ্রোহীদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর হলো, কিন্তু তাতে যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা হলো না। তার জন্যে অযোধ্যার জনগণ লখনৌকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত হচ্ছিল। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, মধ্যভারত, বিহার ও বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভবিষ্যৎ তখনো অনিশ্চিত। তখনো বেঙ্গল আর্মির অনেক সিপাহিদল বিদ্রোহে যোগ দিতে শুরু করেছে। ভারতের লক্ষ-লক্ষ নরনারী তখনো স্বাধীনতা লাভের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দিল্লির পতনের ফলে, মহাবিদ্রোহের পর্যায়, অর্থাৎ সিপাহি-যুদ্ধের পর্যায় শেষ হলো। মিরাটে সিপাহি-বাহিনী বিদ্রোহ করার পরই আরো যেসব বড় বড় সিপাহি-বাহিনী—নিমথ, নাসিরাবাদ, বেরিলি, কানপুর, ঝাঁন্সি ইত্যাদি—বিদ্রোহ করেছিল, তারা সকলেই দিল্লিতে এসে সমবেত হয়েছিল। সিপাহিদের নেতৃত্বেই দিল্লির যুদ্ধ চলেছিল এবং সিপাহিরাই তাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দিল্লির যুদ্ধে প্রধান প্রধান বিদ্রোহী সিপাহি-বাহিনীগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। লখনৌ, কানপুর, ঝাঁন্সি, জগদীশপুর, বেরিলিকে কেন্দ্র করে মহাবিদ্রোহের যে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো, তা হলো গণযুদ্ধের পর্ব। এই পর্বে কৃষক, কারিগর, জমিদার ও শহরবাসীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। অনেক সিপাহিও এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্যায়ে জনসাধারণের ভূমিকাটাই ছিল প্রধান। সিপাহিযুদ্ধ প্রধানত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল একটিমাত্র শহরে; গণযুদ্ধের পর্যায়ে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল একটা বিরাট অঞ্চলে এবং গণযুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে আরো অনেক বেশি ভয়ংকর।

৪৬. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p.281

বাহাদুর শাহের গ্রেপ্তার ও বিচার

বাহাদুর শাহ যখন প্রাসাদ ত্যাগ করে ২৯শে সেপ্টেম্বর দিল্লির ৯ মাইল দক্ষিণে কুতুবে আশ্রয় নিলেন, তখনো শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণের কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তা থাকলে প্রাসাদে বসেই তিনি তা করতে পারতেন। বাদশাহ কোথায় গিয়েছেন তা ইংরেজরা জানত না। তাদের এমন শক্তিও ছিল না যে, তারা বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে। তাছাড়া তখনো প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই সময় ইংরেজদের দুটো ভয়ের কারণ ছিল—হয়তো বিদ্রোহীরা সদলবলে ফিরে এসে দিল্লিতে আবার তাদের আক্রমণ করবে, নতুবা তারা বাহাদুর শাহকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। জেনারেল বখ্‌ত খান ও আরো কয়েকজন বিদ্রোহী-অফিসার তখনো বাহাদুর শাহের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা তাঁকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বাদশাহকে বোঝাতে চেষ্টা চেষ্টা করলেন যে, যদিও ইংরেজরা দিল্লি দখল করেছে তবুও এখনো সমস্ত অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড তাঁদের সামনে রয়েছে এবং তাঁর ছত্রতলে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে এখনো যুদ্ধে জিতবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই যে তাঁর পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পথ ছিল, তা বাহাদুর শাহ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুত তাঁর জীবনের আর কটা দিনই বা বাকি? তিনি কি শেষ জীবনের এই বাকি কটা দিনেব জন্যে দাম্ভিক বিদেশী শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবেন? যখন মরতেই হবে, তখন সৈন্যদের সঙ্গে থেকে রাজার মতো, মানুষের মতো মরাই তো শ্রেয়। তাঁর নিজের ও জাতির এই মহা-পরীক্ষার দিনে তিনি কি বাবর হুমায়ুন ও আকবরের মতো মনুষ্যোচিত পথ অনুসরণ করবেন না?

যখন এই সম্মানজনক পথই তিনি বেছে নিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি তাঁর দুর্বলতার বশে এলাহি বক্স ও জিন্নৎ মহলের চক্রান্তে পা বাড়ালেন। বখ্‌ত খান বাদশাহকে ওজস্বিনী ভাষায় অযোধ্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে যা বললেন, তা এলাহি বক্স চুপ করে শুনে গেলেন। তারপর বখ্‌ত খান যখন বাদশাহের নিকট থেকে পরদিন হুমায়ুনের কবরভূমিতে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি নিয়ে চলে গেলেন, তখন এলাহি বক্স বাদশাহকে অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে যাওয়া তাঁর পক্ষে কতখানি কষ্টসাধ্য কাজ, বিশেষ করে বিদ্রোহীদের পরাজয় যখন নিশ্চিত। তারপর তিনি অন্য

দিকটা তুলে ধরলেন—বাদশাহ যদি তৎপর হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেন তাহলে বিজেতা ইংরেজদের বিশ্বাস করানো যাবে যে, এ পর্যন্ত তিনি যাকিছু করেছেন সবই তাঁকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।"[১]

বাহাদুর শাহের প্রিয় বেগম জিন্নৎ মহলও এই আলোচনায় যোগ দিলেন ও তাঁকে ইংরেজদের নিকট কয়েকটি শর্তে আত্মসমর্পণের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এরকম দোটানায় পড়ে বৃদ্ধ বাদশাহ যে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তাঁর পূর্বেকার সংকল্প শিথিল হয়ে পড়ল। তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে তখন খুবই শোচনীয় তা সহজেই অনুমেয়। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৯০ বৎসর।[২]

এরকম বৃদ্ধ বয়সে ৪ মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর আবার একটা অজানিত পরিবেশে তাঁকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—এই কঠিন সমস্যার সমাধান তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। দিল্লির যুদ্ধে পরাজয়ের পর যখন বাহাদুর শাহের শরীর-মন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তখন জিন্নৎ মহল ও এলাহি বক্স কৌশল করে বিদ্রোহী-নেতাদের প্রভাব থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে তাঁদের নিজেদের আওতায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাহি বক্স দিল্লিতে ইংরেজের প্রধান গুপ্তচর ও তার বন্ধু রজ্জব আলিকে বাহাদুর শাহের অবস্থানের খবর পাঠিয়ে দিলেন।[৩] রজ্জব আলিও তৎক্ষণাৎ দিল্লির ইংরেজ বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান অফিসার ক্যাপ্টেন হাডসনকে এই মূল্যবান খবরটি পাঠিয়ে দিল।

এখানে হাডসনের একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লেফটেনান্ট উইলিয়াম হাডসন ছিল হেনরি লরেন্সের একজন আশ্রিত ও প্রিয়পাত্র। পাঞ্জাব অধিকারের পর লরেন্স তাকে নবগঠিত 'গাইড-কোর'এর নায়ক নিযুক্ত করেন। কিন্তু শীঘ্রই 'হিসাবপত্রের গণ্ডগোলের জন্যে' তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং লণ্ডনের ডিরেক্টররা তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল যে—'সে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত নয়'। ডালহাউসিও তার উগ্র

১. Malison : *Indian Mutinies* ; Cabinet edn. vol. IV, p.55

২. Rychs : *Notes on the Revolt*, p 81

৩. Malison : *Ibid*, p. 52. এই পৃষ্ঠাতেই ম্যালিসন রজ্জব আলি সম্বন্ধে বলেছেন যে, একজন উঁচু দরের গুপ্তচর হতে হলে যেসব গুণ থাকা দরকার—দক্ষতা, ধূর্ততা, দুঃসাহস ও নিশ্চয়তা—রজ্জব আলির এসব গুণই ছিল। ইংরেজরা তাকে বিশ্বাস করত, সেও ইংরেজদের অনুগত ছিল।

মেজাজ ও ঔদ্ধত্যের জন্যে তাকে ভৎর্সনা করেছিলেন। তারপর বিদ্রোহের সময় সে তার 'যোগ্যতা' প্রমাণ করবার আবার একটা সুযোগ পেল। দিল্লির ইংরেজ বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স শাখার জন্যে তাকে একটা পুরো বাহিনী গঠন করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৪] ম্যালিসন তার সম্বন্ধে বলেছেন : "সে ছিল মধ্যযুগের একজন দস্যু।...মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তার মধ্যে কোনো সহানুভূতি জাগত না। রক্তপাতে তার কোনো দুঃখ হতো না, খুন করে তার কোনো মর্মপীড়া হতো না।"[৫] সংক্ষেপে, হাডসন ছিল একজন সত্যিকারের ঔপনিবেশিক 'হিরো'!

হাডসন রজ্জব আলির কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া মাত্রই হেড কোয়ার্টারে গিয়ে জেনারেল উইলসনকে একথা রিপোর্ট করল এবং বাদশাহের সঙ্গে তাঁর আত্মসমর্পণ বিষয়ে এলাহি বক্সের মাধ্যমে কথাবার্তা চালাবার অনুমতি চাইল। সে আরো বলল যে, বাদশাহকে তাঁর জীবনের গ্যারান্টি দিলেই তিনি খুব সম্ভবত আত্মসমর্পণ করতে রাজী হবেন। কিন্তু এটা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার ও এই ব্যাপারে জেনারেল উইলসনের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার ছিল না। দিল্লিতে বেসামরিক কাজের জন্যে ভার ছিল হার্ভি গ্রেটহেডের ওপর, কিন্তু ২০শে সেপ্টেম্বর কলেরায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। উইলসন প্রথমে হাডসনকে বাহাদুর শাহের সঙ্গে কোনো শর্তেই কথাবার্তা চালাতে দিতে রাজি হননি এবং বাদশাহের প্রাণ বাঁচাবার গ্যারান্টি দিতেও তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তাঁর মতে বাহাদুর শাহ ছিলেন আইনের আশ্রয়-বহির্ভূত লোক (outside the law)—তাঁর সঙ্গে কোনো কথাবার্তাই চলতে পারে না ; তাঁর একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।[৬] কিন্তু তখন সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের পীড়াপীড়িতে উইলসন অবশেষে যখন বুঝতে পারলেন যে, বাদশাহকে আর কোনো উপায়েই ধরা যাবে না, তখন তিনি হাডসনকে বাহাদুর শাহের প্রাণ বাঁচাবার শর্তে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার অনুমতি দিলেন।

মুইরও লিখে গেছেন : "এই সময়ে আমরা জানতাম না বাহাদুর শাহ ও তাঁর পরিবার কোথায় আছেন। বাহাদুর শাহকে তাঁর জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি হাডসনকে এলাহি বক্সের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার অধিকার না দেওয়া হতো, তাহলে একেবারেই বাদশাহকে ধরতে পারতাম কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"[৭]

৪. Kaye : *Ibid*, vol. II, p.182
৫. Malison : *Indian Mutinies*, vol. II, p. 75
৬. *Ibid*, vol. IV, p. 52
৭. *Records of the Intelligence Dept.*, vol. I, p. 220

উইলসনের অনুমতি পাওয়া মাত্রই হাডসন রজব আলির মাধ্যমে এলাহি বক্স ও জিন্নৎ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের জানাল যে, বাদশাহকে যেন তাঁরা কোনোমতেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে না দেন। এ বিষয়ে হাডসন লিখেছিল: "এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমি এলাহি বক্সকে ডেকে পাঠালাম ও তাঁর মধ্যস্থতায় জিন্নৎ মহলের সঙ্গে আমি কথাবার্তা চালাতে লাগলাম।"৮

প্রথমদিকে বেগম জিন্নৎ মহল বিদ্রোহীদের একজন খুব উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, এজন্যে বিদ্রোহীরাও তাঁর পুত্র জওয়ান বখ্‌তকে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে রাজী হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সিপাহি-নেতারা কোনো উৎসাহই দেখান নি। জেনারেল বখত খান বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হবার পর তাঁর সঙ্গেও কিছুদিনের জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং বখত খানও নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বেগমকে এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করেন নি। মির্জা মোগলের সঙ্গে বখত খানের ঝগড়ার এটাও একটা কারণ ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে বেগম আর বখত খানের কাছ থেকেও কোনো আশা পাননি। তারপর থেকেই জিন্নৎ মহল তাঁর পিতা এলাহি বক্সের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু করেন।

দিল্লির পতনের পর তিনি আবার ইংরেজের সঙ্গে দর-কষাকষি করবার একটা সুযোগ পেলেন। অবস্থার যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তিনি হয়তো তা উপলব্‌ধি করতে পারেন নি। স্বভাবতই তিনি জওয়ান বখ্‌তের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত ছিলেন, কারণ যদিও সে তখন মাত্র একটি বালক ও বিদ্রোহে কোনো অংশ গ্রহণ করেনি, তবুও সে এমন শিশুও ছিল না, যার জন্যে ইংরেজের আক্রোশ থেকে সে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। এলাহি বক্স ও রজব আলির মন্ত্রণায় প্রলুব্ধ হয়ে তিনি ভাবলেন যে, তিনি যদি বাদশাহকে আত্ম-সমর্পণ করাতে রাজী করাতে পারেন তাহলে ইংরেজরা খুশি হয়ে কৃতজ্ঞতার বশে তাঁর পুত্রের জীবনরক্ষা তো করবেই, এমনকি তাকে তারা মোগল সিংহা-সনের উত্তরাধিকারী বলেও মেনে নিতে পারে। এইসব অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে বেগম দু'ঘণ্টা ধরে বিভ্রান্ত, শক্তিহীন, আশাহত, বৃদ্ধ স্বামীর ওপর স্ত্রীলোকের সকল রকমের অস্ত্রপ্রয়োগ করে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ করে নিলেন।

কিন্তু এসবের পেছনে জিন্নৎ মহলের পিতা এলাহি বক্সের হাত ছিল। এখানে সেই এলাহি বক্সের সামান্য একটু পরিচয়ও অবান্তর হবে না। তার সম্বন্ধে কেই লিখেছেন যে, বাদশাহের আত্মসমর্পণের বিষয়ে "আমরা দিল্লির বাদশাহ পরিবারের একজন বিশ্বাসঘাতক, অর্থাৎ তখনকার ফ্যাশান অনুযায়ী বলতে

৮. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p. 325

গেলে একজন 'রাজভক্ত' সভ্যের নিকট ঋণী। তিনি হচ্ছেন মির্জা এলাহি বক্স (বাদশাহের শ্বশুর)। এই লোকটি, যাঁকে সকলেই অন্যান্যদের চেয়ে 'সম্মানিত' বলে মনে করত, নিশ্চয়ই খুব দূরদর্শী ছিলেন। ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে—এই বিশ্বাসে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ গোপনে ইংরেজকে সাহায্য করা, আর সেই স্বার্থের পরিপূরক হিসাবে প্রকাশ্যে বাদশাহের বন্ধুবৎ পরামর্শদাতার মর্যাদা দাবি করা। এইভাবে যে খেলা তিনি দেখিয়েছিলেন তা প্রাচ্যের ধূর্তামিতে কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। বিদ্রোহী নেতারা বাদশাহকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাবার জন্যে খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে রসদ ফুরিয়ে যাবার জন্যেই তারা দিল্লি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিল।...অন্যত্র তারা ইংরেজদের সঙ্গে আরো ভীষণভাবে লড়বে। তাদের চেষ্টা প্রায় সফল হয়ে আসছিল। এমন সময় এই ধূর্ত মির্জা বৃদ্ধ বাদশাহকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবার কাজ থেকে তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন।"[৯]

জিন্নৎ মহলের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর পিছনে হাডসনের কেবলমাত্র শত্রু-নিপাত করা ছাড়াও আর এক উদ্দেশ্য ছিল। বাদশাহ আত্মসমর্পণে সম্মতি জানালে, হাডসন যে কেবলমাত্র বাহাদুর শাহের জীবনরক্ষারই প্রতিশ্রুতি দিল তা নয়, সে বিনা অধিকারে জওয়ান বখ্‌তের জীবনরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে দিল; অবশ্য উদারতা ও দয়ার পরবশ হয়ে নয়—জিন্নৎ মহলের নিকট থেকে ২ লক্ষ টাকা পাবার অঙ্গীকারে।[১০] এডমণ্ড স্টোনের নিকট সণ্ডার্সের চিঠি থেকে আরো জানা যায় যে, জওয়ান বখত তার মায়ের টাকা ও গহনা কোথায় লুকানো আছে সেই খবর পরে সে ইংরেজদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। তারপর জিন্নৎ মহলের বাড়ি লুঠ হয় এবং ২ লক্ষ টাকার ওপর অলংকার ও মুদ্রা ইংরেজরা আত্মসাৎ করে নেয়।

যাই হোক, বাহাদুর শাহকে তাঁর জীবনরক্ষা সম্বন্ধে এই প্রতিশ্রুতি দানে ভারতের ইংরেজ শাসকবর্গ যে খুবই ক্রোধান্বিত হয়েছিল, তা ভারত-সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারি সিসিল বিডনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিঠি (১৩ই অকটোবর মুইর-কে লিখিত) থেকেই বোঝা যায়: "দিল্লির বাদশাহের সঙ্গে এরূপ রফা করাটা আমার কাছে খুবই আপশোষের কথা বলে মনে হয়। তার পৌত্র ও পুত্রদের যেরূপ ন্যায্যভাবে প্রাণদণ্ড হয়েছে, সেভাবে তারও উপযুক্ত শাস্তি—মৃত্যু।. আমার মনে কোনোরূপ সংশয় নেই যে, এই লোকটিই হচ্ছে

৯. Kaye: vol. III, p. 644. এই কাজের জন্যে এলাহি বক্স নগদ ১ লাখ টাকা ছাড়াও বিরাট জমিদারি পুরস্কার পেয়েছিল।

১০. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p.318

বিদ্রোহীদের একজন প্রধান নেতা, সুতরাং মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য এবং আমি এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমরা যদি তাকে প্রাসাদের প্রাচীরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতাম তাহলে তার ফল সমস্ত ভারতবর্ষে খুব ভালো হতো। এটা না করার জন্যে লোকে ভাববে যে, আমরা ভয়ের জন্যেই তা করিনি।"[১১] এই চিঠি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, বাহাদুর শাহের 'অপরাধ' সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকবর্গের কোনো সন্দেহই ছিল না।

২১শে সেপ্টেম্বর হাডসন ৫০ জন বাছাই-করা অশ্বারোহী নিয়ে হুমায়ুনের কবরের নিকট একটা ভাঙা বাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগল এবং তার দূত রজ্জব আলি ও এলাহি বক্সকে বাদশাহের নিকট পাঠিয়ে দিল। এখানে দু'ঘণ্টা ধরে হাডসনকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কারণ বাদশাহ তখনো সম্পূর্ণভাবে মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। তাঁকে আবার নতুন করে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে হলো। তখনো ভারতের ভাগ্য যেন একটা সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে। চারিদিকে তখন প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র বিদ্রোহী বিদ্যমান। তারা কি এই লজ্জাকর ঘটনা ঘটতে দেবে? "মরীয়া হয়ে এসব লোক এরকম একটা মুহূর্তে যে কী একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারত, তা বলা খুবই কঠিন।"[১২]

বাহাদুর শাহ, জিন্নৎ মহল ও জওয়ান বখত যখন হাডসনের নিকট আত্ম-সমর্পণ করলেন, তখন প্রচুর লোক সেখানে জমায়েত হয়েছিল। তাদের চোখের সামনে কি শোকার্ত ঘটনা ঘটছে, তা তারা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছিল না। এই জনতার মধ্যে কারো মুখ থেকে একটি কথা অথবা একটি ইঙ্গিত ফুটে বেরোলে এক মুহূর্তে হাডসন ও তার সঙ্গীদের সেদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে হতো এবং বাদশাহকে শত্রুর হাত থেকে তারা ছিনিয়ে নিতে পারত। কিন্তু কিছুই ঘটল না। বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করলেন।

হাডসন যখন বন্দীদের নিয়ে হেড কোয়ার্টার্সে পৌছল, তখন জেনারেল উইলসন বলে উঠেছিলেন: "অতি উত্তম, তুমি ওকে আনতে পেরেছ দেখে আমি খুবই আনন্দিত। আমি সত্যিই তোমাকে কিংবা ওকে পুনরায় দেখব বলে আশা করিনি।"

পরদিন ২২শে সেপ্টেম্বর হাডসন আবার হুমায়ুনের কবরে গেল এবং মির্জা মোগল, খিজির সুলতান ও আবু বকরকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। কিছুক্ষণ ধরে নিষ্ফল দর কষাকষির পর তারাও আত্মসমর্পণ করল। সে সময় সশস্ত্র বিদ্রোহীরা তাদের পাশেও এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কেউই তাদের প্রতিরোধ করতে বলল না। লাহোর গেটের কাছাকাছি পৌছে যখন বিদ্রোহীরা আর

১১. *Records of the Intelligence Dept.*, vol. II, p. 361

১২. Kaye: *Ibid*, vol. III, p. 645

তাদের অনুসরণ করল না, তখন হাডসন "বন্দীদের গোরুর গাড়ি থেকে নামতে বলল ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সব খুলে ফেলতে বলল। তারা কাঁপতে কাঁপতে আদেশ পালন করল, তারপর আবার তাদের গোরুর গাড়িতে ফিরে যেতে বলা হলো। তখন...একজন সৈন্যের কাছ থেকে একটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে হাডসন ধীরে ধীরে নিজের হাতে ৩ জন নিরস্ত্র ও অসহায় বন্দীকে একে একে গুলী করে হত্যা করল। তারপর তার শিকার নিয়ে দিল্লিতে প্রবেশ করল এবং কোতোয়ালির সামনে প্রকাশ্যে মৃত দেহগুলিকে ঝুলিয়ে রেখে দিল।"[১৩]

তিনদিন পর ২৫ তারিখে, খুব গর্ব করে হাডসন লিখেছিল: "আমি নিজের কাজের জন্যে সন্তুষ্ট না হয়ে পারছি না। আমাদের জাতির শত্রুদের ধ্বংস করার জন্যে চারদিক থেকে সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সমস্ত ইংরেজ জাতি উৎফুল্ল হবে।"[১৪]

আত্মসমর্পণ করার পর বাহাদুর শাহ তাঁর বেগম ও পুত্রসহ তাঁরই প্রাসাদে ভৃত্যদের একটা কামরায় ইংরেজের বন্দী হয়ে অতি হীন অবস্থায় দিন যাপন করতে লাগলেন। একদিন পরে ২২শে সেপ্টেম্বর, গ্রিফিথ্‌স তাঁকে দেখার পর লিখেছিলেন: "মোগল বংশের এই শেষ প্রতিনিধি একটা 'চারপাই'-এর উপরে একটা বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।...তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হচ্ছিল না। যে অবস্থার মধ্যে তাঁকে ফেলা হয়েছে তা যেন একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি দিনরাত জমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এইভাবে চুপ করে বসে থাকতেন।"[১৫] হয়তো তিনি তাঁর আত্মসমর্পণ করার ভুল তখন বুঝতে পেরেছিলেন। কখনো কখনো তিনি কোনো দর্শককে তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। অনেক সময় তিনি বসে বসে কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু তাঁকে এক টুকরো কাগজ-পেন্সিলও দেওয়া হয়নি, তাই কোনো কোনো সময়ে পোড়া কাঠি দিয়ে দেওয়ালে কবিতাগুলি লেখার চেষ্টা করতেন।

বাহাদুর শাহের বিচার হবে কি হবে না, সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তাঁর অপরাধ সম্বন্ধে তাঁদের কারোরই কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই বিনা বিচারে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতে অনেকেই পক্ষপাতী ছিলেন। ২৭শে অক্টোবরে মুইর লিখেছিলেন: "বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি সাজানো ও ব্যাখ্যা করার জন্যে তাঁর বিচারের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে গভর্নমেণ্ট অনায়াসেই ছাপিয়ে ইয়োরোপে পাঠাতে পারে। সব প্রমাণই লিখিতভাবে রয়েছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে

---

১৩. *Ibid*, pp. 650-51

১৪. *Ibid*, p. 653

১৫. *Siege of Delhi*, p. 202

বাদশাহ যেসব কাজ করেছেন, তা প্রমাণ করার জন্যে প্রাসাদে যেসব গেজেট-গুলি ছাপানো হয়েছিল তাই যথেষ্ট ; আর তাঁর গোপনীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধেও অনেক নথিপত্র রয়েছে।" যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সামরিক আদালতে বাহাদুর শাহের বিচার করাটাই স্থির হলো। ইতিমধ্যে মোগল বংশের যে কয়জন রাজ-পুরুষ দিল্লিতে ধরা পড়েছিল তাদের সকলকেই ইংরেজরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল।

মুইর, ১৯শে নভেম্বর ১৮৫৭ তারিখে লিখেছিলেন : "গতকাল সকালে দিল্লিতে ২৪ জন শাহজাদাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। দু'জন ছিলেন বাদশাহের ভগ্নীপতি, দু'জন জামাতা, আর সকলেই ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়।"[১৬] জওয়ান বখ্‌তেরও পরে ফাঁসি হয়েছিল। এক বাহাদুর শাহ ব্যতীত, বাবর হুমায়ুন ও আকবরের মোগল বংশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

২৭শে জানুয়ারি ১৮৫৮, দেওয়ান-ই-খাসে এই বিচার শুরু হলো। ৪৪ দিন ধরে বিচারের নামে এই প্রহসন চলেছিল। বাদশাহের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের প্রধান অভিযোগ হলো : "ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রজা হয়েও বশ্যতার কর্তব্য উপেক্ষা করে দিল্লিতে ১১ই মে তারিখে সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি নিজেকে ভারত-শাসনকারী সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে ও বেআইনিভাবে দিল্লি শহর দখল করেছিলেন। ১১ই মে থেকে ১লা অক্টোবর ১৮৫৭-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর পুত্র মির্জা মোগল, মহম্মদ বখত খান ও আরো অনেক বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ; এবং এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করবার জন্যে দিল্লিতে তিনি সৈন্যবাহিনী জমায়েত করেছিলেন ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে তাদের প্রেরণ করেছিলেন।" বাদশাহের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি দিল্লিতে ইয়োরোপীয়দের হত্যা করেছিলেন, অথবা তাদের হত্যায় সম্মতি দিয়েছিলেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিচারকালে বাহাদুর শাহের নামে যে জবানবন্দী আদালতে পেশ করা হয়েছিল তা একেবারেই তাঁর নিজের বক্তব্য কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এরকম জবানবন্দীর সঙ্গে বিচারকালে বাহাদুর শাহের আচরণের কোনোই সঙ্গতি নেই। তাঁকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্যেই তাঁর শুভাকাংক্ষীরা এই জবানবন্দী তৈরি করেছিলেন। আত্মসমর্পণ করার পর থেকে বিচারের শেষ পর্যন্ত তাঁর মানসিক অবস্থা যেরকম ছিল, তাতে তাঁর পক্ষে ঐরূপ জবানবন্দী দেওয়া সম্ভবপর বলে মনে করা যায় না।

৯ই মার্চ যেদিন আদালতের শেষ অধিবেশন বসল, সেদিন বাহাদুর শাহের

১৬. *Records of the Intelligence Dept.*, vol. I. p.273

উকিল গোলাম আব্বাস বাদশাহের তরফ থেকে ঘোষণা করলেন : "যে আদালতে বাহাদুর শাহের বিচার হচ্ছে, তাঁকে বিচার করবার অধিকার সেই আদালতের আছে বলে তিনি স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তারও কোনো জবাব তিনি দেবেন না।"[১৭]

তারপর বাদীপক্ষ সমস্ত সাক্ষ্য ও দলিলপত্র পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত সন্ধিপত্র উপেক্ষা করে আসামী নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উপরন্তু, 'ইয়োরোপীয়দের' হত্যা, তাঁর হুকুমে না হলেও তাঁর সম্মতিতে তাঁর পুত্রদের ও মোগল পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে তাঁরই দেহরক্ষীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করার পর বিচারপতিরা রায় দিলেন যে, বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে তার সবগুলিতেই তিনি দোষী। এর জন্যে বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হিসাবে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত; কিন্তু জেনারেল উইলসনের তরফে ক্যাপ্টেন হাডসন ২১শে সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্বে তাঁর জীবনরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেহেতু এই আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের হুকুম দিচ্ছেন।[১৮]

বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হবে তা স্থির করতে কর্তৃপক্ষের অনেকদিন সময় লেগেছিল। আন্দামানে তখন অনেক বিদ্রোহী বন্দীদের পাঠানো হচ্ছিল। বাহাদুর শাহকে এইসব বিদ্রোহীদের সন্নিকটে রাখাটা গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল সমীচীন বলে মনে করলেন না, তাই তাঁরা দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকারকে অনুরোধ জানালেন বন্দী বাহাদুর শাহকে স্থান দেবার জন্যে। ভারত সরকারের সেক্রেটারি বিডন চেয়েছিলেন বাহাদুর শাহকে চীনদেশের হংকং-এ পাঠানো হোক।[১৯]

বিডনের এই প্রস্তাব যে সাম্রাজ্যবাদীদের একটা উপযুক্ত প্রস্তাবই হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম আফিম-যুদ্ধের (১৮৩৯-৪২ খ্রী.) পর ইংরেজরা হংকং অধিকার করে। দ্বিতীয় আফিম-যুদ্ধের (১৮৫৭) পর কোয়াংটাং ও কাংসি প্রদেশের গভর্নর জেনারেল ইয়ে-মিং-শেন্ চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে বন্দী করে কলকাতায় নির্বাসন দেওয়া হয় ও কলকাতার জেলে ১৮৬০ সনে মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে তাঁর মৃত্যু হয়।

৭ই অক্টোবর ১৮৫৮ সনে বন্দী বাদশাহ ও তাঁর পরিবারকে গোপনে কড়া

---

১৭. Martin : *Indian Empire*, p.184

১৮. *Indian Empire*, p.184

১৯. *Ibid*, p.187

মিলিটারি পাহারায় একটা অজানিত গন্তব্য স্থানের পথে দিল্লি ত্যাগ করতে হলো। বাহাদুর শাহের সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই পত্নী, বেগম তাজমহল ও বেগম জিন্নৎ মহল এবং জওয়ান বখতের বালিকা স্ত্রী।

বন্দীরা কলকাতায় পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের একটা যুদ্ধ জাহাজ 'মেঘেড়া'তে তুলে নেওয়া হলো এবং ঐদিনই সকাল ১০টার সময় জাহাজ সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করল—যার গন্তব্যস্থল একমাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেনই জানতেন। এর ৪০ দিন পর ১১ই জানুয়ারি ১৮৫৯, বন্দী বাহাদুর শাহের অদৃষ্ট সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অবগত হলো এই ছোট্ট সংবাদটিতে: "দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার বাহাদুর শাহকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায়, দিল্লির ভূতপূর্ব বাদশাহকে 'কেপ অব গুড হোপ'-এর পরিবর্তে ব্রিটিশ-বর্মার রেঙ্গুনে পাঠানো হয়েছে। বাদশাহ ৯ই ডিসেম্বর রেঙ্গুনে পৌছেছেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে রেঙ্গুন থেকে ৩০০ মাইল ও পেগু থেকে ১২০ মাইল দূরে, সিটাং নদীর ধারে, কারেন দেশের নিকটবর্তী টংঘো নামক দূষিত ও জনশূন্য একটা স্থানে।"

চার বৎসর পর ৭ই নভেম্বর ১৮৬২ সনে এই নির্বাসনে, রেঙ্গুন জেলে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। ১৯৪৩ সনে যখন সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-সরকার স্থাপন করেন, তখন তিনি বাহাদুর শাহের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

পাঞ্জাব

যে মাসে মিরাট ও দিল্লিতে বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ একটা সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছিল। মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে (১৩ই জানুয়ারি, ১৮৪৯) শিখরা নিজেদের শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল, কিন্তু আবার দু'মাস পরে গুজরাটের যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা স্বাধীনতা হারাল এবং শতদ্রু থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। কিন্তু তারপরেও পাঞ্জাব সম্বন্ধে ইংরেজরা সব সময়েই ভীত ছিল; তাদের ভয় ছিল যে, সুযোগ পেলেই পাঞ্জাবের লোকরা হয়তো তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। বিশেষ করে শক্তিশালী শিখ সর্দাররা এত বড় একটা সাম্রাজ্য হারিয়ে চুপ করে চির-কালের জন্যে বিদেশীর দাসত্ব মেনে নেবে, তা খুব কম লোকেই আশা করতে পেরেছিল। তাছাড়া, আফগানিস্তানের দোস্ত মহম্মদ ও সীমান্তের পাঠানরাও কম ভয়ের কারণ ছিল না।

এই কারণে, পাঞ্জাবকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে ইংরেজ সরকার তার সামরিক শক্তির বেশির ভাগই এই প্রদেশে সমাবেশ করেছিল। মিরাট বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবে ব্রিটিশ বাহিনীর শক্তি ছিল ৬০ হাজার। তার মধ্যে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ হাজার। এদের প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করে পাঞ্জাবের দুই প্রান্তে সন্নিবেশ করা হয়েছিল—তার একটি হলো পেশোয়ার উপত্যকায়, আর একটি হলো শতদ্রু নদীর ধারে। আর বেঙ্গল আর্মির পুরবিয়াদের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার, অর্থাৎ ইংরেজদের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি; এছাড়া ছিল ২ হাজার গুর্খা ও ১৪ হাজার অনিয়মিত (ইরেগুলার) পাঞ্জাবি সৈন্য; আরো ১০ হাজার পাঞ্জাবি মিলিটারি পুলিশও ছিল। এই সংখ্যাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ইংরেজ ও পুরবিয়া সৈন্যদের মধ্যে পাঞ্জাবি সৈন্যরাই ভারসাম্য বজায় রাখছিল। যদি পুরবিয়া ও পাঞ্জাবিরা একই শত্রুর বিরুদ্ধে মিলিত হতো, তাহলে উত্তর ও মধ্য ভারতের মতো পাঞ্জাবেও মুহূর্তের মধ্যে বিদেশী শাসন বিলুপ্ত হয়ে যেত।

এ বিষয়ে জন লরেন্সের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ২১শে অক্টোবর ১৮৫৭, তিনি লিখেছিলেন: "আমি সত্যই বলছি যে, আমি যখন গত ৪ মাসের ঘটনাবলীর দিকে ফিরে তাকাই, তখন কি করে আমরা এখনো বেঁচে আছি, তাই ভেবে আমার খুবই আশ্চর্য বোধ হয়। যদি শিখরা আমাদের বিরুদ্ধে যেত তাহলে আমাদের বাঁচাতে পারত এমন সাধ্য কারো ছিল না। কেউই আশাও

করতে পারেনি, কল্পনাও করতে পারেনি যে, তারা (পাঞ্জাবিরা) এই সুযোগে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হারানোর প্রতিশোধ নেবার লোভ সংবরণ করবে।"[১]

কিন্তু সে সময়কার পাঞ্জাবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ইংরেজদেরই অনুকূলে গেল। পাঞ্জাবের লোক বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—হিন্দু, শিখ, পাঞ্জাবি, পাঠান ও মুসলমান। এই প্রদেশে নিজেদের শাসন বজায় রাখবার জন্যে এতগুলি সম্প্রদায়কে পরস্পারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করাই ছিল ইংরেজ শাসকদের প্রধান অস্ত্র। পাঞ্জাবের ডালহাউসি-পন্থী শাসকরা,—জন লরেন্স, হারবার্ট এডওয়ার্ডস্, জন নিকলসন, নেভিল চেম্বারলেন, মণ্টোগোমারি, এবট্, কুপার, রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি—ডালহাউসির ভাষায় যাঁরা ছিলেন 'বিজেতা-জাতির শ্রেষ্ঠ নমুনা'—প্রত্যেকেই ছিলেন এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।

হোমস বলেছেন: "ডালহাউসি তাঁর পাঞ্জাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বশে এই প্রদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে শ্রেষ্ঠ লোকদেরই বেছে বেছে পাঠিয়েছিলেন। আর একটা দেশের নাম করা খুবই কঠিন, যেখানে সংখ্যানুপাতে এতগুলি উপযুক্ত সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের পাঠানো হয়েছিল।"[২]

পাঞ্জাব সম্বন্ধে আরো একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় হলো এই যে, পাঞ্জাবের সর্দাররা ও জমিদাররা ইংরেজের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে কোনো আঘাতই লাগেনি। পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কয়েক বৎসরে সর্দারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করা হবে, এই নিয়ে হেনরি ও জন লরেন্স এই দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। হেনরি চেয়েছিলেন সর্দারদের জায়গির ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখতে, আর জন চেয়েছিলেন তা খর্ব করে দিতে। শেষ পর্যন্ত হেনরির নীতিই অবলম্বন করা হয়েছিল। "মিউটিনির সময় পাঞ্জাবে জন লরেন্সের গভর্নমেণ্টের বিস্ময়কর সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে, পুরানো জায়গিরদারি অধিকারগুলি বজায় রাখবার জন্যে স্যার হেনরি যেসব নীতি কার্যে পরিণত করেছিলেন, সেগুলি; যেসব সর্দারদের তিনি পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং যাদের জন্যে তিনি তাঁর পদ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই সর্দাররাই তাদের সমস্ত দলবল নিয়ে আমাদেরই পাশে এসে দাঁড়াল, এবং জন লরেন্সকে পাঞ্জাব থেকে দিল্লিতে সৈন্য পাঠাতে সমর্থ করে তুলল।"[৩] শুধু সৈন্য জুগিয়েই নয়, ইংরেজদের নবগঠিত সামরিক ও বেসামরিক সংগঠনের জন্যে খাদ্য, সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে খুব শীঘ্র ধনী হবার এই সুযোগও অনেক সর্দারের নিকট খুব লোভনীয় হয়ে উঠল।"

১. Rychs : *Notes on the Revolt*, p. 74
২. Homes : *History of the Indian Mutiny*, 1904. p. 312
৩. Forrest : *State Papers*, vol. II, p.11

পাঞ্জাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শক্তিশালী ধনী কৃষকদের সংখ্যা বেশি ছিল। পাঞ্জাবে শান্তি স্থাপন ও নিজেদের শাসন সুদৃঢ় করবার জন্যে ইংরেজরা খাজনা কম করে ধার্য করে এই শ্রেণীর লোকদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। যেখানে অন্য প্রদেশের কৃষকরা তাদের ফসলের অর্ধেক কিংবা তিন-চতুর্থাংশ খাজনা দিচ্ছিল, পাঞ্জাবে সেই ক্ষেত্রে ফসলের শতকরা মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ খাজনা ধার্য করা হয়। এই নীতির ফলে অধিক সংখ্যক সামান্য জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না হলেও কিছু সংখ্যক ধনী কৃষক যে কিছুকালের জন্যে খানিকটা লাভবান হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আরো একটি কথা এই যে, বিদ্রোহের পূর্বে পাঞ্জাবে ৩-৪ বৎসর ধরে কৃষকরা ভালো ফসল পেয়েছিল। অনেক কৃষকেরই চাষেব জমির অভাব ছিল না। খাজনা দেবার জন্যে তাদের ঋণ গ্রহণ করতে হতো না। রাস্তাঘাট, খাল কাটা ইত্যাদি কাজের জন্যেও অনেকেবই কিছু রোজগার হতো। পেটি-বুর্জোযা শ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা পুরবিয়াদের স্থানে ছোট ছোট কাজগুলি পেয়ে সন্তুষ্টই ছিল।

সর্বশেষে, "একথাও ভুললে চলবে না যে, পাঞ্জাবের লোকদের কোনো অস্ত্র-শস্ত্র বাখতে দেওয়া হয়নি। এই সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ কযেক বৎসরের মধ্যেই জাতীয় প্রকৃতিতে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। কঠিন ও বলবান লোকরা (বিদ্রোহের সময়) দেখতে পেল যে, তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত নয় এবং যুদ্ধের একটা প্রধান উপকরণ থেকে তাবা বঞ্চিত। তারপর সৌভাগ্যবশত, যে শ্রেণীর লোক পূর্বে যুদ্ধের সময় নেতা হতো এবং যাদের কেন্দ্র করে অসন্তুষ্ট লোকরা জমায়েত হতে পাবত, সেই শ্রেণীর লোকদেব পাঞ্জাবে আর রাখা হয়নি। রাজবন্দী ও বিপজ্জনক লোকদের সব সময়ই তাদের নিজের প্রদেশ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় যে খুবই সুফল হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সামন্ততান্ত্রিক কিংবা অন্য কোনো ক্ষমতা নিয়ে যেসব সর্দাররা থাকল, তারা প্রত্যেকেই আমাদের দিকে ছিল। ·· তারা জানত যে, বিদ্রোহীরা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পরাস্ত করতে পারলে বিজয়গর্বে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠবে যে, তখন তারাই (সর্দাররাই) হবে তাদের প্রথম বলি।"[৪]

ইংরেজদের দিকে এতগুলি অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও, তারা পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখতে পারত না, যদি ঐ প্রদেশে আরো একটা অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হতো। অবশ্য এ পরিস্থিতি সমগ্রভাবে সকল ভারতবাসীর পক্ষেই ছিল ক্ষতিকর। বেঙ্গল আর্মির সিপাহিদের পাঞ্জাবিরা বলত পুরবিয়া ; কারণ এই সিপাহিরা ছিল পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা। বেঙ্গল

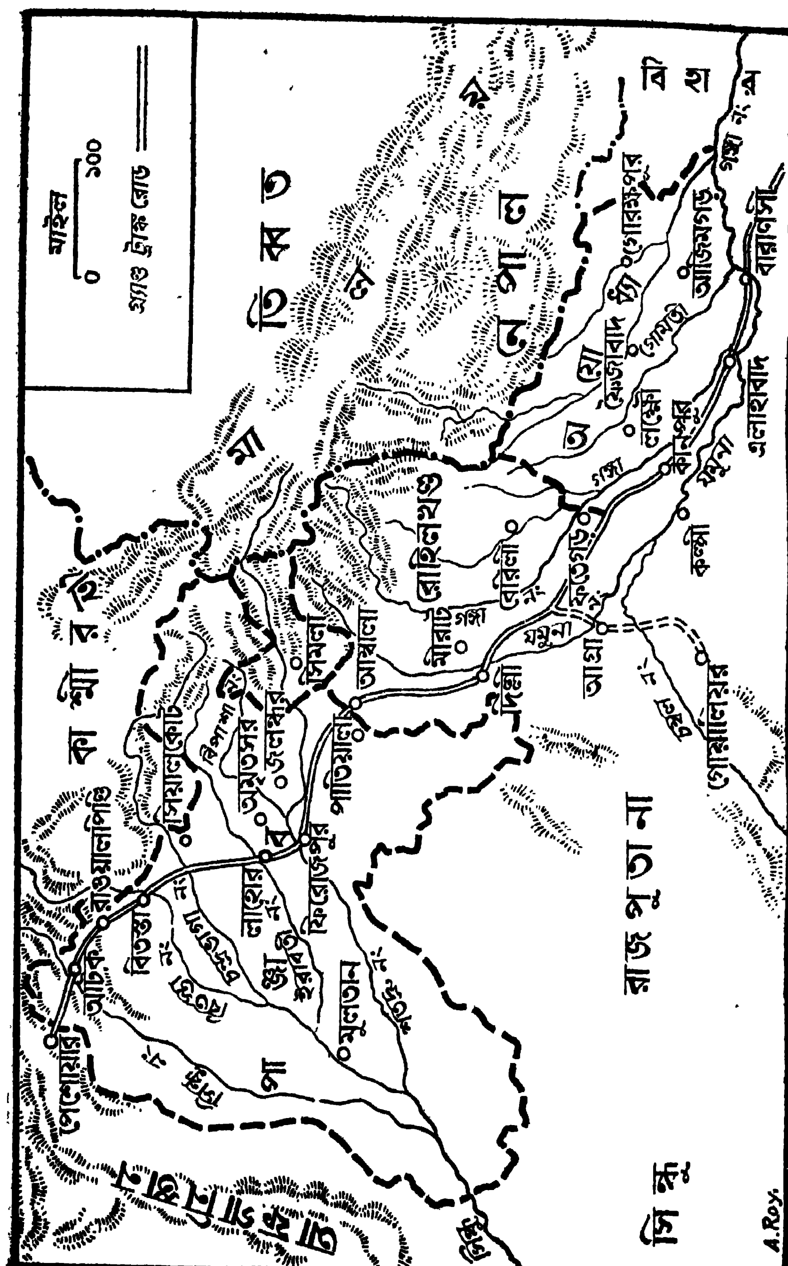
৪. *Punjab Mutiny Records*, **vol. VIII, part II, p.361**

আর্মির সাহায্যেই ইংরেজরা খালসা বাহিনীকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করতে পেরেছিল। তারপর পাঞ্জাবে 'শান্তি-প্রতিষ্ঠা' করার জন্যে, অর্থাৎ পাঞ্জাবের লোকদের দাবিয়ে রাখার জন্যেও এই পুরবিয়াদেরই নিযুক্ত করা হয়। একটা 'আর্মি অব অকুপেশন'-এর ('বিজেতা বাহিনীর') মতো বেঙ্গল আর্মির সিপাহিরা পাঞ্জাবে অবস্থান করত; তারাই যেন পাঞ্জাব জয় করেছে—এইরকম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সঙ্গে তারা ব্যবহার করত। এতে শিখদের দাবিয়ে রাখতে সুবিধা হয় বলে ইংরেজরা এই ঔদ্ধত্যকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিত। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, পাঞ্জাবে এই ঘৃণাব্যঞ্জক 'পুরবিয়া' কথাটা পর্যন্ত ইচ্ছে করেই চালু করা হলো। কারণ, "এর ফলে পাঞ্জাবি ও হিন্দুস্থানিদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়ে গেল এবং দু'পক্ষের সহযোগিতার সম্ভাবনা খুবই সুকঠিন হয়ে উঠল।"[৫]

পুরবিয়াদের আধিপত্যজাত যে অপমান, তা "পাঞ্জাবিদের পক্ষে সহ্য করা আরো কষ্টকর ছিল এই কারণে যে, তারা তুলনায় নিজেদের বেশি বীরপুরুষ বলে মনে করত। জন লরেন্স ভেবেছিলেন, এই কথাটা (বীরত্ব) প্রমাণ করবার জন্যে তারা এতই ব্যগ্র হয়ে পড়বে যে, সেটাই হবে এই প্রদেশটাকে রক্ষা করবার উপায়।"[৬] অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করার ব্রিটিশের 'divide and rule' নীতি। তবু পাঞ্জাবে এত জাতি-বিদ্বেষ, বিভেদ ও প্রাদেশিকতা থাকা সত্ত্বেও যে পাঞ্জাবের অনেক শিখ, অনেক পাঞ্জাবি, অনেক পাঠান এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিদ্রোহে যোগ দিয়ে অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল—এটা পাঞ্জাবিদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

পাঞ্জাবে শিখ-মুসলমান সংঘর্ষ মোগলযুগ থেকে একটি বহু পুরনো ঐতিহাসিক সমস্যা। রণজিৎ সিংহ এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ছোট থেকে সর্বোচ্চ চাকুরিগুলি হিন্দু, মুসলমান, শিখ—সকলের জন্যেই যোগ্যতা অনুসারে খোলা ছিল। জীবনব্যাপী তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন ফকির আজিজউদ্দিন। তাঁর অনেক প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন মুসলমান। অনেক দুর্গরক্ষার ভার ছিল মুসলমানের ওপর এবং অনেক সৈন্যবাহিনীর নায়কও ছিলেন মুসলমান। সুফি পণ্ডিত ইলাহি বক্স ছিলেন তাঁর মন্ত্রণাদাতা। রণজিৎ সিংহের সবচেয়ে বিশ্বস্ত যেসব দেহরক্ষী ছিল, তাদের মধ্যে ৫০ জন ছিল মুসলমান। আকবরের সময় থেকে এই প্রথম দেখা গেল, রণজিৎ সিংহের দীর্ঘ ৪০ বৎসরের রাজত্বকালে ধর্মান্ধতা,

৫. Cave-Brown : *Punjab and Delhi in 1857*, vol. I, p. 41
৬. Gibbon : *Lawreneces of the Punjab*, p. 258



বিদ্রোহকালে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের পাশে পাঞ্জাবের অবস্থান

গাঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থেকে পাঞ্জাব মুক্ত হয়েছে। ১৭০৮ সনে (যে সনে মোগল সম্রাটের হুকুমে নিষ্ঠুরভাবে গুরু গোবিন্দ সিংহকে হত্যা করা হয়েছিল) এই মনোভাবের বহু ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে ১৫০ বৎসর পরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। সেই পুরনো মোগল বাদশাহীও আর ছিল না এবং শিখ সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ১৮৫৭ সনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিখ, হিন্দু ও মুসলমান—সবারই সমান শত্রু হলো ইংরেজ।

দিল্লিতে বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সমাজদেহের যে ক্ষতস্থান আরোগ্যলাভের পথে চলেছিল, সেই পুরনো ক্ষতস্থানেই ইংরেজ শাসকরা খোঁচাতে শুরু করল এবং বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বিদেশী সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দু, শিখ, মুসলমান জনসাধারণের যে ঐক্য গড়ে উঠতে যাচ্ছিল (যে ঐক্য-কে ইংরেজ সবচেয়ে বেশি ভয় করত) তাকে ভাঙবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠল। শিখ সর্দারদের তারা বোঝাতে চেষ্টা করল যে, দিল্লিতে পুনরায় মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হলে শিখদের ওপর অত্যাচার শুরু হবে, তাদের পুরবিয়াদের অধীনে থাকতে হবে ; উপরন্তু গুরু গোবিন্দ সিং ও অন্যান্য শহিদদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ—তারা ইচ্ছা করলেই এবার তাদের চিরকালের স্বপ্ন—দিল্লি অধিকার ও লুণ্ঠন—সফল করতে পারে। এইসব প্রলোভনের দ্বারা সাধারণ শিখরা যে খুব প্রলুব্ধ হয়েছিল তা বলা যায় না, তবে একদল ভাগ্যান্বেষী তাদের অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠনের কাজে একটা 'নৈতিক' অজুহাত পেয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দিল্লি ও মিরাট বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই পাঞ্জাবের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে পুরবিয়া ও মোগলদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবিদের, বিশেষ করে শিখদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ উত্তেজিত করবার জন্যে সবরকম পন্থা অবলম্বন করল। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ পুরবিয়া সিপাহিদের হুকুম দিয়েছেন সমস্ত শিখদের ধ্বংস করতে, এই মর্মে লাহোর ও অমৃতসরে দেওয়ালে প্রাচীরপত্র টাঙিয়ে দিয়ে ও আরো নানা উপায়ে প্রচার চলল। এ বিষয়ে জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছে : "লাহোরের একজন সর্দারের নিকট থেকে যে চিঠি পাওয়া গিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, স্যার জন লরেন্স পাঞ্জাবে একটা ইস্তাহার বিলি করেছেন, যাতে তিনি একথা জানিয়েছেন যে, যারাই শিখদের হত্যা করবে ও তাদের মাথা কেটে নিয়ে আসবে, দিল্লির বাদশাহ তাদের মোটা পুরস্কার দেবেন।"[৭]

এইরকম মিথ্যা প্রচার আরো নানা উপায়ে চারদিকে ছড়ানো হতে লাগল। ইংরেজরাই যে পাঞ্জাবের শত্রু, তারাই যে পাঞ্জাবের স্বাধীনতা হরণ করেছে,

৭. Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 167

তাদের দাস করে রেখেছে, এই কথাটা চাপা পড়ে গেল। মোগল বাদশাহ আর পুরবিয়া—এরাই হলো পাঞ্জাবের শত্রু ; আজ ইংরেজরা শিখদের সেই পুরনো জাতীয় শত্রুর সঙ্গে লড়ছে ; শিখগুরুদের হত্যাকারীদের ওপর প্রতিশোধ নেবার আজ অপূর্ব সুযোগ!—এই হলো ব্রিটিশ প্রচারের অর্থ। এ বিষয়ে একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ স্পষ্ট করে বলেছেন,—"আমাদের একমাত্র উপায় ছিল শিখদের আহ্বান করা ও শত্রুকে দেখিয়ে দেওয়া—যে শত্রুকে তারা অবজ্ঞা করে, ঘৃণাও করে।…এই বিদ্বেষকে আমরা শীঘ্রই কার্যকরী করে তুললাম।…শুধু তাই নয় ; পাঞ্জাবে বিদ্রোহী সিপাহিদের জন্তুর মতো শিকার করে বেড়ানোর কাজটা লাভজনকও ছিল বটে।…একজন সশস্ত্র সিপাহিকে ধরার জন্যে পুরস্কার দেওয়া হতো ৫০ টাকা, নিরস্ত্র সিপাহির জন্যে ২৫ টাকা।"[৮]

কিন্তু এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইংরেজরা শিখ ও পাঞ্জাবিদের নিকট থেকে ৩-৪ মাস পর্যন্ত বস্তুত দিল্লির পতন পর্যন্ত, বিশেষ কিছু সক্রিয় সাহায্য পায়নি। তাদের পরস্পরের মধ্যে যত বিদ্বেষই থাকুক, সকল পাঞ্জাবিরই ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল সবচেয়ে প্রবল। পাঞ্জাবের এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে রবার্টস লিখে-ছিলেন : "সব নেটিভরাই সমান এবং আমি জোর করে বলতে পারি—অন্যান্য স্থানে যে রকম, পাঞ্জাবেও তেমনি সকলে আমাদের সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে।"[৯]

সামরিকভাবে পাঞ্জাবে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল মিয়ান মির, লাহোর, গোবিন্দগড়, ফিরোজপুর, ফিলুর, মুলতান, কাংড়া, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার ইত্যাদি স্থানের দুর্গ ও অস্ত্রাগারগুলি রক্ষা করার ওপর। ১২ই মে তারিখে আনারকলিতে (লাহোর) এক জরুরি সভায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এইসব স্থানে সিপাহিরা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হোক আর না হোক, আর এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে তাদের নিরস্ত্র করতে হবে এবং এইভাবে ইংরেজের শক্তির পরিচয় দিয়ে পাঞ্জাবের লোকদের অভিভূত করে ফেলতে হবে।

১২ই তারিখে মিলিটারি পুলিশের একজন অফিসার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল যে, মিয়ান মিরের সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের চক্রান্ত চলেছে। পাঞ্জাবের কমিশনার মণ্টোগোমারি লিখেছিলেন,—"১৩ই তারিখে আমাদের বিপদ আমরা যা মনে করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যুগপৎ দুর্গ দখল করার ও ক্যাণ্টনমেণ্টে সিপাহিদের বিদ্রোহ শুরু করার একটা চক্রান্ত হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্যে এটা মনে রাখতে হবে যে, এই দুর্গ লাহোর শহরে আধিপত্য বজায় রাখার কেন্দ্রস্বরূপ এবং এখানেই ধনাগার ও অস্ত্রাগার অবস্থিত। এখান থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে ফিরোজপুরেও

৮. **Meed :** ***Sepoy Revolt*****, pp.163-64**
৯. ***Letters*****, p.56**

আর একটি অস্ত্রাগার আছে, সেটা হচ্ছে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড়। যদি এই দুটি স্থানের পতন হতো, তাহলে আপাতত পাঞ্জাব আমাদের সম্পূর্ণভাবে হারাতে হতো; এখানকার সমস্ত ইয়োরোপীয়দের জীবন নষ্ট হতো, দিল্লি পুনর্দখল করা যেত না এবং ভারত জয় আবার একেবারে প্রথম থেকে শুরু করতে হতো।"[১০]

লাহোর থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে অবস্থিত এই মিয়ান মির ছিল সামরিক দিক থেকে পাঞ্জাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই স্থান বিদ্রোহীদের দ্বারা অধিকৃত হলে শুধু যে ইংরেজদের সামরিক শক্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত পড়ত তাই নয়, পাঞ্জাবের লোকেরাও বিশেষ করে পাঞ্জাব ইরেগুলার (অনিয়মিত) বাহিনী, ইংরেজের শক্তি ও ক্ষমতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত ও বিদ্রোহের দিকেই ঝুঁকে পড়ত। ১২ই তারিখে রাত্রে ইংরেজ সৈন্যদের একটা বল-নাচের আয়োজন করা হয়েছিল। যথারীতি এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হলো। এইদিন সন্ধ্যার সময়েই হুকুম দেওয়া হলো যে, পরদিন সকালে একটা প্যারেড হবে। ইংরেজ সৈন্যদের সারারাত আমোদ-প্রমোদ করতে দেখে পরদিনকার প্যারেড সম্বন্ধে সিপাহিদের মনে কোনো সন্দেহই জাগল না।

১৩ই মে সকালে বাহিনীগুলি সব এক লাইনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। দক্ষিণে ৮১-তম ইংরেজ বাহিনী ও ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী, মাঝখানে সিপাহি পদাতিক, বামদিকে সিপাহি অশ্বারোহী। প্রথমে ব্যারাকপুরের ৩৪-তম বাহিনীর বরখাস্তের হুকুম পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হলো। তারপরেই শুরু হলো আসল কাজ। সিপাহিদের পিছনে হঠতে বলা হলো; আর ইংরেজ সৈন্যরা সিপাহিদের সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ইংরেজ গোলন্দাজরা ইংরেজ পদাতিকদের পেছন থেকে ও সিপাহিদের অলক্ষ্যে কামান সাজিয়ে তৈরি হয়ে থাকল। সচরাচর প্যারেডে এই রকমই হয়ে থাকে বলে তখনো সিপাহিদের মধ্যে কোনো সন্দেহ জাগেনি। তারপরেই একজন ইংরেজ অফিসার হিন্দুস্থানিতে এইসব সিপাহিদের বরখাস্তের হুকুম পড়ে শুনিয়ে দিলেন এবং পড়া শেষ হওয়া মাত্রই তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমির উপর রেখে দেওয়ার হুকুম হলো। সঙ্গে সঙ্গে ৮১-তম ইংরেজ বাহিনী ভাগাভাগি হয়ে কয়েক-পা পিছিয়ে কামানগুলির মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিপাহিরা মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পেল—তারা উদ্যত কামানের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সিপাহিরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারপর তারা অস্ত্র সমর্পণ করল।[১১] এইভাবে প্রায় ২৫ হাজার সিপাহি মাত্র ৬০০ ইংরেজের তৎপরতা ও কৌশলের কাছে পরাজিত হলো।

মিয়ান মিরের ঘটনা সম্বন্ধে কেই বলেছেন যে, "এই চমৎকার পরিকল্পনাটি

১০. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. I, p.229
১১. Cooper : *Crisis in the Punjab*, pp. 4-5

চূড়ান্ত কৌশলের দ্বারা কার্যে পরিণত করা হয়েছিল এবং যদি প্রথম আঘাতেই কোনো যুদ্ধ জয় করা হয়ে থাকে, তাহলে পাঞ্জাবের যুদ্ধ ঐদিন লড়া হয়েছিল এবং ঐদিন সকালেই জেতা হয়েছিল।"[১২]

লাহোর থেকে ৩০ মাইল দূরে ও অমৃতসরের পাশে গোবিন্দগড়ের দুর্গও সিপাহিরা প্রস্তুত হবার পূর্বেই ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হলো। সমস্ত শিখ অঞ্চলকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে গোবিন্দগড়ের দুর্গের গুরুত্ব মিয়ান মিরের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

ফিরোজপুরের অস্ত্রাগার ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগার। সব রকমের কামান, বন্দুক, গোলাবারুদ এখানে প্রচুর পরিমাণে ছিল। ৪৫-তম ও ৫৭-তম পদাতিক ও ১০ম অশ্বারোহী সিপাহি বাহিনীগুলি এখানে ছিল। আর ছিল ৬১-তম ইংরেজ বাহিনী ও একদল শক্তিশালী ইংরেজ গোলন্দাজ। এই দুর্গের নায়ক ঠিক করেছিলেন ৪৫-তম ও ৫৭-তম বাহিনী দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে নিরস্ত্র করবেন। তাদের যখন মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা ইংরেজ সৈন্যদের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে। ৪৫-তম বাহিনীর সিপাহিরা, সংখ্যায় মাত্র ২০০, তখনি বিদ্রোহ করে অস্ত্রাগার আক্রমণ করল। সেখানে ইংরেজ সৈন্যরা তখন পাহারা দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর ঐ স্থান অধিকার করতে অসমর্থ হয়ে তারা শহরে চলে গেল। ততক্ষণে শহরের লোকও বিদ্রোহী হয়ে যা কিছু বিদেশী—ক্যান্টনমেণ্ট, গির্জা, বাংলো, ইত্যাদি ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে। ৫৭-তম বাহিনীর সিপাহিরা নিষ্ক্রিয় থেকে গেল—যদিও তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন। ১০ম বাহিনীর অশ্বারোহীরা ইংরেজদের দিকেই লড়ল। পরের দিন ১৪ই তারিখে ৫৭-তম পদাতিক ও ১০ম অশ্বারোহীদের বিনা বাধায় নিরস্ত্র করা হলো। সব সিপাহিরা একসঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই তারা অস্ত্রাগার অধিকার করতে পারত এবং তা ঘটলে, কেভ-ব্রাউনের মতে, ইংরেজরা 'চার মাসের চারগুণ সময়ের মধ্যেও' দিল্লি অধিকার করতে পারত না। এখানে ব্যর্থ হয়ে বিদ্রোহী সিপাহিরা দিল্লির দিকে চলে গেল।

ফিলুরের দুর্গের অবস্থান ফিরোজপুরের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিল্লি-লাহোর-পেশোয়ার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে, জলন্ধর ও লুধিয়ানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই ফিলুর দুর্গ সত্যই 'পাঞ্জাবের চাবিকাঠি' ছিল। এই চমৎকার সামরিক অবস্থান ছাড়াও ফিলুরের অস্ত্রাগারের স্থান ছিল ফিরোজপুরের পরেই। এ সময় অন্যান্য স্থানের তুলনায় ফিলুরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই দুর্গ রক্ষার ভার

১২. Kaye : *History of the Sepoy War in India*, vol. II, p.433

ছিল ৩য় সিপাহি বাহিনীর ওপর। এখান থেকে ২৪ মাইল দূরে জলন্ধরে থাকত ইংরেজ ৮ম বাহিনী ও একদল গোলন্দাজ, আর থাকত ৩৬-তম ও ৬১-তম সিপাহি পদাতিক ও কিছু অশ্বারোহী। ইংরেজরা খবর পেল যে, জলন্ধরের সিপাহিরা ফিলুরের কমরেডদের সঙ্গে এই স্থানগুলি দখল করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিলুরে একদল ইংরেজ সৈন্য আর জলন্ধরে কাপুর-তলার রাজার সৈন্যদের পাঠিয়ে দিয়ে সিপাহিদের নিরস্ত্র করবার ব্যবস্থা করতে লাগল। সিপাহিরা বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হলেও তারা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে পারল না। বিনা বাধায় ফিলুর দুর্গের ভার ইংরেজ সৈন্যদের ছেড়ে দিল। ইংরেজরা দুর্গ দখল করল বটে, কিন্তু তাদের এত শক্তি ছিল না যে তারা ৩য় বাহিনীকে নিরস্ত্র করে। এর এক সপ্তাহ পরে এই সিপাহিদেরই দিল্লি আক্রমণের জন্যে কতকগুলি অবরোধ-কামান শতদ্রু নদীর অপর পারে নিয়ে যাবার জন্যে হুকুম করা হলো। তারা কামানগুলি অপর পারে নিয়ে যাবার ২ ঘণ্টা পরে বন্যার জলে নৌকার সেতু ভেসে গিয়েছিল। যাহোক, হুকুম মতো তারা কামানগুলি নাভা রাজার সৈন্য আর ৯ম ইরেগুলার (অনিয়মিত) শিখ বাহিনীর হাতে তুলে দিল। অথচ এই ৩য় বাহিনীর সৈন্যরাই এই ঘটনার মাত্র ২ সপ্তাহ পরে বিদ্রোহ করেছিল। একদিকে এই আনুগত্য ও বশ্যতা, অন্যদিকে বিদ্রোহ—তাদের এহেন অসামঞ্জস্য ও পরস্পর বিরোধী ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে কমিশনার রিকেটস্-এর লুধিয়ানা রিপোর্টে বলা হয়েছে: ৩য় বাহিনীর সিপাহিরা অন্যান্য বাহিনীর সিপাহিদের সঙ্গে স্থির করেছিল—তারা সকলে মিলে একটা বিশেষ দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং এই কারণেই আশু কোনো সুবিধার লোভে তাদের সিদ্ধান্ত-বহির্ভূত কোনো কাজে অগ্রসর হয়নি।[১৩]

প্রকৃতপক্ষে, ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে সিপাহিদের এরকম স্ববিরোধী কাজের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়, যখন ইতস্তত ও অবহেলার বশে এবং তৎপরতার অভাবে শত্রুকে ধ্বংস করবার শ্রেষ্ঠ সুযোগগুলি তারা হারিয়েছে এবং তাদের শত্রুদের সুবিধা করে দিয়ে নিজেদেরই ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করেছে।

৭ই জুন, মধ্যরাত্রিতে জলন্ধরের সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সেখান-কার অল্পসংখ্যক ইংরেজদের ধ্বংস করে তারা অনায়াসে শহর দখল করতে পারত। শহরে বিদ্রোহের খবর প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজরা যে যেখানে পেরেছিল, আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

১৩. *Ibid*, vol. *II*, p.190

কিন্তু বিদ্রোহ করেই জলন্ধরের সিপাহিরা ফিলুরে চলে গেল। সেখানে ৩য় বাহিনী দ্রুত এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সমবেত বিদ্রোহীরা তখন স্থির করল, শতদ্রু পার হয়ে তারা লুধিয়ানা দিয়ে দিল্লি চলে যাবে। ফিলুরের অপর পারেই আর একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লুধিয়ানা। জলন্ধরের বিদ্রোহের খবর পেয়েই লুধিয়ানার ইংরেজ গোলন্দাজরা ও একদল নাভা সৈন্য বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। নৌকার সেতু ভেসে যাওয়ার ফলে বিদ্রোহীরা ৪ মাইল উত্তরে নৌকা করে নদী পরে হওয়ার চেষ্টা করল। তাদের নৌকাগুলি যখন মাঝপথে তখন ইংরেজের কামানের গোলায় তাদের বেশ ক্ষতি হলো। প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে সিপাহিদের কোনো কামান ছিল না। তা সত্ত্বেও অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে নদী পরে হয়ে তারা বন্দুক ও তলোয়ার নিয়েই ইংরেজদের আক্রমণ করল। নাভার রাজার শিখ সৈন্যরা প্রথমেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল।[১৪] তারপর ইংরেজ বাহিনীর নায়ক উইলিয়াম্‌স ও আরো কয়েকজন ইংরেজ মারা যাবার পর ইংরেজ গোলন্দাজরাও রণে ভঙ্গ দিল। ৮ই জুন মধ্যাহ্নে বিজয়োল্লাসে বিদ্রোহীরা লুধিয়ানা শহরে প্রবেশ করল।

বিদ্রোহীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই লুধিয়ানার জনসাধারণও বিদ্রোহে যোগদান করল। সিপাহিরা ধনাগার দখল করল ও জেলখানা খুলে দিল। ইংরেজদের বাংলো, সরকারি অফিসগুলি ও গুদাম ইত্যাদি সব লুঠ হয়ে গেল। যেসব ভারতীয় ইংরেজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল, তাদের বাড়িঘরও লুঠ হয়ে গেল।[১৫]এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় হলো যে, লুধিয়ানা ছিল একটি শিখ-প্রধান শহর এবং শিখরাই এখানে বেশি করে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। ইংরেজের এত সাবধানতা সত্ত্বেও জলন্ধর-দোয়াবের বিদ্রোহ চমৎকার ভাবে সফল হয়েছিল। কেবলমাত্র শহরেই নয়, শতদ্রু নদীর দু'ধারে ফিরোজপুর থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আম্বালা, থানেশ্বর পর্যন্ত গ্রামগুলিতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। শিখ, হিন্দু, মুসলমান কেউই পিছিয়ে পড়ে থাকেনি। পাঞ্জাবের লোকরা, বিশেষ করে শিখরা (এই অঞ্চলে শিখদের সংখ্যাই বেশি ছিল) যে ইংরেজের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েনি, জলন্ধর-দোয়াবের এই গণবিদ্রোহ ইংরেজের নিকট তা প্রমাণ করে দিল। লুধিয়ানার এই বিদ্রোহ আরো প্রমাণ করে দিল যে, শিখরাও সুযোগ ও নেতৃত্ব পেলে অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদেশী শত্রুকে বহিষ্কার করে নিজেদের দেশকে মুক্ত করতে প্রস্তুত ছিল।[১৬] ফিলুরে যে ৩য় সিপাহি-বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল তাদের মধ্যে দু'জন ইংরেজের

১৪ *Ibid*, p.505

১৫. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p.13

১৬. *Ibid*, p. 101

হাতে ধরা পড়ে যায়। তাদের একজন ছিল ঝেলামের মুসলমান, আর একজন মাঞ্ঝা শিখ,—যে লেফটেনাণ্ট ইয়র্ককে গুলী করে মারার চেষ্টা করেছিল। ইংরেজের গুলীতে দু'জনকেই অবশ্য মৃত্যু বরণ করতে হয়।

লুধিয়ানাতে বিদ্রোহীরা আসামাত্রই লুধিয়ানার মৌলভি জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্যে আহ্বান জানালেন। এই মৌলভি সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার রিকেটস্-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্বে "দু'বার মুসলমানদের বিদ্রোহের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে অনেক আফগান শাহজাদা সম্মান করতেন (শাহ জামান ও শাহ সুজার বংশধররা আরো অনেক আফগান নির্বাসিতের সঙ্গে বছরে ৩৫ হাজার টাকা পেনসনভোগী হয়ে ওখানে বাস করছিলেন) এবং তাঁদের একজন সফদার জঙ্গ তাঁর দলভুক্ত ছিলেন। নিচু জাতির লোকদের কাছে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁর প্রতিপত্তি সমগ্র জেলা ছাড়িয়ে আরো অনেক স্থানে বিস্তারলাভ করেছিল। কারণ তিনি ছিলেন জাতিতে গুজার মুসলমান, আর এই জাতি শতদ্রুর সমগ্র নিম্নভূমিতে বাস করত। ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অপরাধে তাঁকে লুধিয়ানায় ১৮৪৯ সনে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। সিপাহিদের আসার পর তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে তাঁর ধর্মের সবুজ পতাকা উড়িয়ে চললেন দিল্লির দিকে।[১৭] দুর্গে কামানগুলি দাঁড় করাবার জন্যে ২০০ গুজার সিপাহিদের সাহায্য করেছিল। দুর্গের নিকটবর্তী সব লোকেরাই সিপাহিদের সাহায্য করেছিল, একসঙ্গে তাদের ১০ দিনের মতো খোরাক জোগাড় করে এনে দিয়েছিল এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিয়েছিল।[১৮]

শ্রমিকরাও যে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে সব সময় খুব অগ্রণী ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উক্ত রিপোর্টেই দেখা যায় যে, লুধিয়ানার কাশ্মীরি শাল-শ্রমিকরা "গভর্নমেণ্ট স্টোর্স লুঠ করতে, আমেরিকান মিশন ধ্বংস করে দিতে (যেখানে তারা অনেকেই শিক্ষালাভ করেছিল), গির্জা ও বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে, প্রেস ভেঙে দিতে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্যে সরকারি কর্মচারি ও ইংরেজের শুভকাংক্ষীদের বাড়িগুলি সিপাহিদের দেখিয়ে দিতে বিশেষভাবে অগ্রণী ছিল।"[১৯]

বিদ্রোহের সময় ধনী ও বানিয়াদের ব্যবহার সম্বন্ধে রিকেট্স তাঁর রিপোর্টে যা বলে গিয়েছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন : "প্রধান প্রধান চৌধুরি, ব্যবসায়ী ও মহাজনরা একটু চেষ্টা করলেই শহরের শান্তি ও শৃংখলা বজায়

১৭. *Ibid*, p. 95
১৮. *Ibid*, p. 94
১৯. *Ibid*, p. 95

রাখবার জন্যে নিচু স্তরের লোকদের ওপর তাদের সাধারণ প্রভাব খাটিয়ে অনেক কিছু করতে পারত, কিন্তু তারা তাদের টাকার থলিগুলি নিরাপদ গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকল। যখন রণযোধ সিং-এর অধীনে শিখ বাহিনী ১৮৪৫ সনে লুধিয়ানা আক্রমণ করেছিল, তখন এদের প্রত্যেকটি লোক তাঁকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এই শ্রেণীর সকল লোকই বাতাস যেদিকে বয় সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মুখ্য স্বার্থে ব্যাঘাত না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেই জিতুক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। যদিও শৃংখলা ও সুশাসনে এদের চেয়ে বেশি আর কেউ লাভবান হয় না এবং বিপরীত অবস্থায় এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তথাপি সরকারের প্রতি আনুগত্য ও স্বদেশপ্রেম—প্রকৃত অর্থে ও স্বদেশপ্রেমের নিজস্ব দাবিতে স্বদেশপ্রেম—এদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের অভাবে তারা তাদের চোখের সামনে যা ঘটছে তার বেশি কিছু দেখতে পায় না। কাপুরুষোচিত চরিত্র এবং কেবলমাত্র নিজেদের লাভের চিন্তাবশত তারা যে কার পক্ষে, সেটা তারা সজোরে ঘোষণা করতে পারে না।…এদের আর উপেক্ষা করা গভর্নমেণ্টের উচিত হবে না। তাদের ভয় ও স্বার্থের কথা মনে রেখে তাদের নিকট থেকে জোর করে সম্মান ও সাহায্য আদায় করতে হবে।…এইসব লোক সরকারি ঋণের মাত্র ২ লক্ষ টাকা দিয়েছে, তাও খুব অনিচ্ছার সঙ্গে, এবং দিল্লি অধিকারের পূর্বে এদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি।'[২০]

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিজয়ী সিপাহিরা তাদের এই তাৎপর্যপূর্ণ জয়ের ও শিখ অঞ্চলের মধ্যস্থলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত লুধিয়ানার গুরুত্ব একেবারেই বুঝতে পারল না। একদিন পর ৯ই জুন তারা লুধিয়ানা ত্যাগ করে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করল। লুধিয়ানাকেও কেন্দ্র করে যদি বিদ্রোহীরা জলন্ধর-দোয়াব দখল করে বসত এবং শিখ ও পাঞ্জাবিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আহ্বান জানাত, তাহলে বিদ্রোহীদের নৈতিক ও সামরিক শক্তি এতই বেড়ে যেত যে সমগ্র পাঞ্জাবে ব্রিটিশদের অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে পড়ত এবং জনসাধারণ তাদের মনের দোদুল্যমান অবস্থা কাটিয়ে বিদ্রোহীদের দিকে ঝুঁকে পড়ত। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির গুরুত্ব ইংরেজরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। কেই বলেছেন: "দুর্গ দখল করে, কামানগুলিতে গোলন্দাজ বসিয়ে, ধনাগার হস্তগত করে এবং জনসাধারণের অধিকাংশের সাহায্য পেয়ে বিদ্রোহীরা অনায়াসে, অন্তত কিছুকালের জন্যে আমাদের উপেক্ষা করতে পারত। ইংরেজদের পক্ষে পাঞ্জাব থেকে দিল্লি যাবার প্রধান রাস্তার উপর এই শহর হারানো বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষতিকর হতো; দিল্লি অধিকারের প্রচেষ্টা অনির্দিষ্ট কালের

২০. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, pp.95-96

জন্যে পিছিয়ে যেত ও তার ফলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সমগ্র অভিযানেরও সর্বনাশ হয়ে যেত।"[২১]

লুধিয়ানার কমিশনার রিকেট্স তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, সিপাহিরা যদি লুধিয়ানাতেই থেকে যেত তাহলে "তারা সমস্ত শতদ্রু অঞ্চলে অরাজকতা বিস্তার করে দেশীয় শিখ রাজ্যগুলিকে কাহিল করে দিতে পারত,...কিন্তু তাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি জলন্ধর ত্যাগ করার সময় তারা ভুল করে গুলীশূন্য টোটা সঙ্গে নিয়েছিল। সেইজন্যে আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে কোনো রকমের সংঘর্ষ এড়িয়ে তাদের দিল্লি অভিমুখে দ্রুত মার্চ করে চলে যেতে হয়েছিল।"[২২]

বিদ্রোহীরা লুধিয়ানা ছেড়ে চলে যাবার পর একটি ইংরেজ বাহিনী এসে বিজয়গর্বে শহরে প্রবেশ করল ; তারপরেই শুরু হলো তাদের তাণ্ডব। কত লোককে যে তারা গুলী করে মারল ও ফাঁসিতে ঝোলাল, তার কোনো হিসেব নেই। বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যে দুর্গের ৩০০ গজের মধ্যে যত বাড়িঘর ছিল, সব ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলো। ১৭ই জুন তারা শহরের অধিবাসীদের নিরস্ত্র করতে শুরু করল। "খানাতল্লাসি খুব ভালোভাবেই করা হয়েছিল। ১০ গাড়ি ভর্তি সব রকমের অস্ত্রশস্ত্র ধরা হয়েছিল...ইয়োরোপীয় অফিসার-দের তত্ত্বাবধানে আম্বালা, থানেশ্বর, জগদ্রী ও ফিরোজপুর শহরগুলিতেও এভাবে খানাতল্লাসি করা হয়েছিল। . কিছুদিন পরে এই ডিভিশনের প্রত্যেকটি গ্রাম আবার দ্বিতীয়বার আরো ভালো করে খানাতল্লাসি করা হয়েছে।"[২৩] কুপার এ সম্বন্ধে আরো সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন : "এই কুখ্যাত ও হাঙ্গামাকারী শহরের লোকেরা, কমিশনার রিকেট্স যে লৌহদণ্ড দিয়ে জেলাতে বিদ্রোহ দমন করলেন তার প্রথম আঘাত, হাড়ে-হাড়েই উপলব্ধি করতে পারল। এই কাজের জন্যে তিনি যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তা খুবই সু-অর্জিত। প্রকৃত-পক্ষে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর নামটাই লোকের মনে এত আতঙ্কের সৃষ্টি করল যে, কয়েকজন অধিবাসী তাঁকে 'সাবাড়' করে দেবার জন্যে দিল্লির বাদশাহের নিকট দরখাস্ত করেছিল।"[২৪] এই খানাতল্লাসি থেকে কোনো লোকই রেহাই পায়নি। ইংরেজ সৈন্যরা কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রই বাজেয়াপ্ত করেনি, গহনা ও টাকা-পয়সা নিতেও তারা ভোলেনি।[২৫] এই ধরনের খানা-

২১. Kaye : *History of Sepoy War in India*, vol. II, p. 505
২২. *Ibid*, p. 508
২৩. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p.17
২৪. Cooper : *Crisis in the Punjab*, p. 41
২৫. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p. 97

তল্লাসি ও অত্যাচার একেবারে সিমলা পর্যন্ত করা হয়েছিল।

এসব সাধারণ শাস্তি ছাড়াও সমস্ত লুধিয়ানা শহরের ওপর একটা পাইকারি জরিমানা বসানো হলো। দোষী-নির্দোষী, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শহরের প্রত্যেকটি লোককে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সরকারের মতে যখন সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তখন সকলেই জরিমানা দিতে বাধ্য। তাছাড়া, জেলখানা, বেত্রদণ্ড ইত্যাদির মতো সাধারণ শাস্তির চেয়ে এরকম পাইকারি জরিমানাকে সকলে আরো ভয় করে; শান্তি বজায় রাখার পক্ষে এর মতো মহৌষধ আর নেই। এই উপায়ে শুধু লুধিয়ানা শহরেই নয়, সমস্ত জেলায় যে খুব 'সন্তোষজনক ফল' পাওয়া গিয়েছিল সে সম্বন্ধে রিকেট্স তাঁর রিপোর্টে অনেক কিছু লিখেছিলেন।[২৬]

বিদ্রোহী সিপাহিরা যখন লুধিয়ানা ত্যাগ করল, তখন "তাদের একটি ছোট দল প্রধান বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে উত্তরের দিকে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলতে লাগল; তারা হোসিয়ারপুর জেলায় শতদ্রু পার হলো, তারপর সমগ্র আম্বালা জেলা অতিক্রম করে যমুনা নদীর অন্যধারে পৌঁছে গেল। সর্বত্রই জনসাধারণের নিকট থেকে তারা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পেয়েছিল। লোকে বিদ্রোহীদের খাদ্য সরবরাহ করেছিল এবং নিরাপদ রাস্তা দিয়ে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।"[২৭] পাঞ্জাবের গ্রামবাসীদেরও সহানুভূতি ও সমর্থন যে পুরোমাত্রায় বিদ্রোহীদের প্রতি ছিল, তা এরকম সরকারি রিপোর্টগুলি থেকেই বোঝা যায়। সমগ্র থানেশ্বর জেলায় গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ সক্রিয় আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে গুজারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাহিরা চলে যাবার পর ইংরেজরা এক-একটা করে প্রত্যেকটি গুজার-গ্রাম আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং গুজারদের পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সিপাহিদের সাহায্য করার অপরাধে থানেশ্বর শহরে একদিনে ২২ জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।[২৮]

এই সময়ে নাভা রাজ্যে জেইটো নামক স্থানে জনসাধারণ গুরু শ্যামদাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফরিদকোটেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। যখন ফিরোজপুরের ডেপুটি-কমিশনার মেজর মার্সডেন দুটি কামান সহ ১০ম ইংরেজ অশ্বারোহী ও পাতিয়ালার কিছু সৈন্য নিয়ে জেইটো-তে আসলেন, তখন শ্যামদাসের অধীনে ৩ হাজার গ্রামবাসী ইংরেজকে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে শ্যামদাস ও আরো অনেকের মৃত্যু হয়।[২৯] এর কিছুদিন পরে বিদ্রোহীরা

২৬. *Ibid*. pp. 99-100
২৭. *Ibid*, vol. VIII, pt. I, p. 17
২৮. *Ibid*, p 15
২৯. *Ibid*, p. 15, p. 53

থানেশ্বরেরর জেলখানা আক্রমণ করে, কারণ এখানে অনেক বিদ্রোহীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহী বন্দীদের যখন ঐখানে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে আম্বালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন গ্রামবাসীরা ইংরেজদের আক্রমণে আক্রমণ করেছিল। এদের রক্ষা করার জন্যে আর একটি ইংরেজ বাহিনীকে কামান সহ আসতে হলো। এখানেও সমস্ত স্থানটাই ধ্বংস হয়ে গেল ও অনেক লোক হতাহত হলো।[৩০] এইসব উদাহরণগুলি থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পাঞ্জাবের কতকগুলি জেলায় বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গণ-বিদ্রোহের আকারেই তা প্রসারলাভ করছিল। বস্তুত ইংরেজ সম্পর্কে একটা অসহযোগিতার মনোভাব সমাজের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছিল। কেউ বলেছেন যে, বিদ্রোহের প্রথমদিকে আম্বালা থেকে দিল্লি পর্যন্ত "সর্বশ্রেণীর নেটিভরা দূরে সরে ছিল ; তারা ঘটনাগুলি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। আমাদের ক্ষমতা কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে, ধনী থেকে কুলি পর্যন্ত কেউই আমাদের কোনো রকম সাহায্য করছিল না।"

মিয়ান মিরে সিপাহিদের নিরস্ত্রীকরণের দেড় মাস পরে ২৬-তম বাহিনীর ৭৫০ জন সিপাহি অপমান ও লাঞ্ছনা আর সহ্য করতে না পেরে ৩০শে জুলাইতে বিদ্রোহ করে অন্যত্র চলে যেতে চেষ্টা করল। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার কুপার ১৫০ জনের একটি মিলিটারি পুলিশের দল নিয়ে তৎক্ষণাৎ সিপাহিদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ভূতপূর্ব খালসা বাহিনীর একজন পুরনো জেনারেল হরসুখ রায় এবং ইংরেজদের একজন আদি 'বন্ধু' সিন্ধনওয়ালা পরিবারের সর্দার পরতাব সিং কিছু অনুচরসহ কুপারের সঙ্গে চললেন। সিপাহিরা যখন অমৃতসর থেকে ২২ মাইল দূরে আজনালা গ্রামে পৌঁছল, তখন সেখানকার স্থানীয় পুলিশ অফিসার দেওয়ান প্রেমনাথ পুলিশ ও গ্রামবাসীদের নিয়ে "ওখানকার নৌকো দুটি বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করল এবং অনেককে মারতে মারতে নদীতে ফেলে দিল। এইভাবে ১৫০ থেকে ২০০ জন লোক গুলীতে নয়তো জলে ডুবে মারা গেল।"[৩১]

অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা সাঁতার কেটে নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপের উপর আশ্রয় নিল। বন্যার ফলে দ্বীপের যে অংশ জেগে ছিল তা হচ্ছে ২০০ গজ লম্বা ও ৭০ গজ চওড়া সামান্য একটু স্থান। অনাহারে ও ক্লান্তিতে বিদ্রোহীরা তখন মৃতবৎ হয়ে পড়েছে। সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই কুপার তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হলেন এবং দ্বীপ থেকে ১৬০ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করে আজনালায় নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে বীরপুঙ্গব পরতাব সিং-ও চারদিকের গ্রামগুলি থেকে ৬৬

৩০. *Ibid*, p. 16

৩১ *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. I, p. 388

জনকে ধরে নিয়ে এলেন। অন্যেরাও কয়েকজন করে বন্দী নিয়ে এলো। এইভাবে ২৮২ জনকে বন্দীকে ৩১শে জুলাই রাত্রে একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রাখা হলো।

পরদিন প্রত্যূষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক 'হিরো' কুপার বীরদর্পে তাঁর কাজ শুরু করলেন। যেখানে যত দড়ি পাওয়া গেল, ফাঁসির জন্যে সব তিনি আনিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তাতেও যখন আর কুলিয়ে উঠল না, তখন অবশিষ্টদের গুলী করে হত্যা করাই ঠিক হলো। এই 'কঠিন কর্তব্যে'র বর্ণনা কুপার নিজেই এইভাবে দিয়েছেন: "এভাবে ১৫০ জনকে গুলী করে মারার পর একজন গুলীচালক (যে ছিল গুলীচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ) অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার কাজ শুরু হলো। এইভাবে যখন ২৩৭ জনকে সাবাড় করে দেওয়া হয়েছে তখন দেখা গেল বাদবাকি বন্দীরা, যাদের একটা খুব ছোট দুর্গের মতো স্থানে কিছুক্ষণ পূর্বে আটকে রাখা হয়েছিল, তারা বেরিয়ে আসতে রাজী হচ্ছে না।··· তাদের অদৃষ্টে কি লেখা আছে তা তারা কয়েক ঘণ্টার জন্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। দরজা যখন খোলা হলো, তখন কী দৃশ্য দেখা গেল? দেখা গেল, তারা প্রায় সকলেই মরে পড়ে আছে। অজ্ঞাতসারে হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যার বিয়োগান্ত নাটক আবার অভিনীত হলো।···৪৫ জনের দেহ, যারা ভয়ে ক্লান্তিতে গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গিয়েছিল, টেনে বের করা হলো এবং অন্যান্য মৃতদেহগুলির সঙ্গে একই গর্তে ফেলে দেওয়া হলো।"[৩২] এইভাবে বেলা ১০টার মধ্যে ২৮২ জন লোককে কুপারের কথায় 'অমরধামে পাঠিয়ে দেওয়া হলো' (launched into eternity)।"[৩৩] কুপার আরো বলেছেন যে, বন্দীরা সবরকম মনের ভাবই প্রকাশ করেছিল—ভয়, বিস্ময়, রাগ ও দৃঢ় শান্তভাব, "কিন্তু পালাবার পূর্বে তাদের অফিসারদের কে খুন করেছিল কেউই তা প্রকাশ করতে রাজী হয়নি।" ২৬-তম বাহিনীর যারা বেঁচে থাকল, তাদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল না। ঐ বাহিনীর ৪১ জন সিপাহিকে ধরে মিয়ান মিরে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানে কামানের মুখে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হয়। তার কয়েকদিন পরে আরো ৬০ জনকে গুরুদাসপুরে হত্যা করা হয়। ২৬-তম বাহিনীর খুব কম সিপাহিই শেষ পর্যন্ত জীবন নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছিল।[৩৪]

জেনারেল নীলের মতোই কুপারের বীরত্ব! কুপারের এই বীরত্বের খবর পাওয়া মাত্রই জন লরেন্স তাঁর নিজের ও ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে কুপারকে

---

৩২. Cooper : *Crisis in the Punjab*, pp. 162-63

৩৩. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p. 380

৩৪. *Ibid*, p. 380

লিখলেন—"২৬-তম বাহিনীর লোকদের ধরায় ও শাস্তি দেওয়ায় যে যোগ্যতা ও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" আর মন্টোগোমারি লিখলেন: "আপনার কাজের জন্যে আপনাকে আজ প্রশংসা করছি। কী নিপুণতার সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন।...আপনি যতদিন বাঁচবেন এটা আপনার মুকুটমণি হয়ে থাকবে।"[৩৫]

এই আজনালারই অতি নিকটে ৬২ বৎসর পরে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা-বাগে আর একজন ইংরেজ 'হিরো' জেনারেল ডায়ার এই কুপারেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।

এই সময় থেকে পাঞ্জাবে 'কুপারইজ্‌ম' কিভাবে চালানো হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কুপার নিজেই লিখে গিয়েছেন: "সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ধরে একদল অশ্বারোহী একস্থান থেকে আর একস্থানে অনবরত সংবাদ নিয়ে যাতায়াত করছিল। প্রত্যেকটি প্রভাবশালী ব্যক্তিরই গতিবিধি ও চালচলনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। যদিও রাজা দীননাথের মৃত্যুতে আমাদের একজন শত্রুর অপসারণ হলো, তবুও অনেকে আবার থেকে গেলেন যাদের প্রতি আমাদের সতর্ক থাকতে হলো।"[৩৬] কিভাবে চারিদিকে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা হলো, সে সম্বন্ধে কুপার বলেছেন: "রাজদ্রোহকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্যে আমরা হারেমের পর্দা ভেদ করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যেতাম; কোনো মসজিদ বা মন্দিরও রেহাই পেত না। পণ্ডিত ও মৌলভিদের পর্যন্ত তাদের অনুচরদের মাঝখান থেকে আমরা ছিনিয়ে আনতাম। বিশিষ্ট নামকরা লোকদের মাঝরাতে আমরা ধরে নিয়ে আসতাম। নিশ্চিত পুরস্কারের আশায় যতক্ষণ না রাজদ্রোহীদের আবিষ্কার করতে পারত ততক্ষণ গুপ্তচর তাদের পেছনে লেগে থাকত। ভিদকের ডিটেকটিভদের মতো সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—বাজারে, মেলায়, উপাসনার স্থানে, জেলে, হাসপাতালে, বাজারে, ঘাটে যেখানে লোকে স্নান করে, সেতুর উপর যেখানে লোক জড়ো হয়ে গল্পগুজব করে, গ্রামে কুয়োর পাশে ও গাছতলায়, কাছারিতে, রাস্তার ধারে, যেখানে মজুররা রাস্তা মেরামত করে, এবং সরাইখানায়। কোনো মানুষেরই জিহ্বা আর তার নিজের সম্পত্তি রইল না। অ্যাংলো-স্যাকসনের নতুন জাগ্রত দৃঢ়তার সামনে এশিয়াবাসীর ছল-চাতুরি একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল।"[৩৭] পাঞ্জাবের 'ডালহাউসি-বয়'দের একটা বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা কোনো আধাআধি কাজ পছন্দ করত না। সমগ্র পাঞ্জাবে পুলিশের সাহায্যে পুরোমাত্রায় তারা সন্ত্রাসবাদ চালাতে লাগল।

৩৫. Cooper: *Crisis in the Punjab*, pp. 167-69
৩৬. *Ibid*, p. 20
৩৭ *Ibid*, pp. 24-25

পাঞ্জাবের সর্দাররা যে সকলেই ইংরেজের গুণমুগ্ধ ছিলেন তা নয়; কুপার তাঁর বইতে সর্দার নারসিং সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। যখন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার নারসিংকে ডেকে পাঠালেন, তখন তিনি 'ঘুমোচ্ছিলেন' তাঁকে 'বিরক্ত করা চলবে না'। 'তাঁর শরীরের একটা বিশেষ স্থানে সাংঘাতিক একটা ফোঁড়া হবার জন্যে তিনি শয্যাগত'! এটা নিশ্চয়ই ইংরেজ-প্রীতির পরিচায়ক নয়। বস্তুত খুব কম সর্দারই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইংরেজকে সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। "যারা আমাদের সঙ্গে নেই, তারাই আমাদের বিরুদ্ধে"—বিশেষ করে সর্দারদের সম্বন্ধে সরকার এই নীতি অনুসরণ করে তাদের ইংরেজকে সাহায্য করতে বাধ্য করল। যেসব সর্দার ১৯৪৮ সনে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল (এই যুদ্ধকে ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে শিখদের বিদ্রোহ বলে মনে করত), দাগী আসামীদের মতো একটা 'ব্ল্যাক লিস্টে' তাদের নাম রাখা হয়েছিল। মিরাটের বিদ্রোহের পরই জন লরেন্স তাঁদের প্রত্যেককে লিখে পাঠালেন যে, "তাঁদের দোষ-স্খালনেব এই হচ্ছে অপূর্ব সুযোগ, কালবিলম্ব না করে তাঁদের সদলবলে আসা প্রয়োজন।...তাঁরা দলবল সঙ্গে নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংগঠিত করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।"[৩৮] ইংরেজের এরকম জবরদস্তির বিরুদ্ধে সর্দারদের মধ্যে অনেক বিক্ষোভ ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লি থেকে একজন গুপ্তচর ১লা আগস্টে লিখেছিল: "সামশের সিং, রণযোধ সিং, গুরুমুখ সিং প্রমুখ সিন্ধনওয়ালা সর্দারদের ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর সিং সর্দারদের একটা চিঠি নিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন...তাতে সর্দাররা পাঞ্জাবে ইংরেজদের আক্রমণ করবেন কিনা জানতে চেয়েছেন।"[৩৯]

শিখ সর্দারদের কিভাবে ভয় দেখিয়ে তাদের সাহায্য আদায় করা হতো, একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ সে সম্বন্ধে লিখেছেন: "পুলিশরা প্রথম থেকেই প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করছিল। তাদের সংখ্যা বাড়ানো হলো এবং তাদের শান্তিরক্ষার কাজে সাহায্যের জন্যে সর্দারদের নিজেদের অনুচরদের মধ্য থেকে এক-একদল লোক দিতে হলো।"[৪০] যেটুকু 'সহযোগিতা' পাঞ্জাবে ইংরেজরা পেয়েছিল, তা অন্তত বিদ্রোহের প্রথমদিকে জোর-জবরদস্তি করেই আদায় করতে হয়েছিল।

পাঞ্জাবের 'সহযোগিতা'র আর একটি নমুনা হচ্ছে যে, 'নেটিভ' সংবাদপত্র-গুলির ওপর অত্যন্ত কঠিন 'সেনসরশিপ' প্রয়োগ করা হলো, 'যা প্রথম থেকে

---

৩৮. Bosworth Smith : *Life of Lord Lawrence*, vol. II, p.97

৩৯. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p.290

৪০. Homes : *History of Indian Mutiny*, p.334

শেষ পর্যন্ত কড়াভাবে চালু ছিল'।[৪১] রাজদ্রোহ প্রচারের অজুহাতে অনেকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হলো, আর যেগুলি প্রকাশ হতো সেগুলি ইংরেজ সরকারেরই মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল।

ইংরেজরা শিখদের যে শত্রু বলে মনে করে না, এ কথাটা বোঝাবার জন্যে কেবলমাত্র পুরবিয়া সিপাহিদের প্রতিই নয়, বেসামরিক সমস্ত হিন্দুস্থানিদের প্রতি অত্যাচার চূড়ান্ত সীমায় পৌছল। যে সমস্ত হিন্দুস্থানিরা সরকারি চাকুরিতে ছিল, তাদের বহিষ্কার করে দেওয়া হলো এবং তাদের স্থানে শিখদের নেওয়া হলো। হিন্দুস্থানিদের কড়া নজরে রাখা হতো এবং সপ্তাহে সপ্তাহে, নিয়মিতভাবে তাদের কয়েকজনকে ধরে দলবদ্ধভাবে মার্চ করিয়ে পাঞ্জাব থেকে বার করে দেওয়া হতো। দিল্লির পতনের পরও এ কাজটি চালু ছিল।[৪২]

শিখদের ইংরেজ-প্রীতি সম্বন্ধে ইংরেজরা কোনোদিনই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেনি। বিদ্রোহের প্রথমদিকে শিখদের ব্রিটিশ বাহিনীভুক্ত করতে ইংরেজরা যে যথেষ্ট ইতস্তত করেছিল, ভারত সরকারকে লিখিত পাঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারি ব্র্যাণ্ডরেথের ১৭ই মে'র এই চিঠিই তার প্রমাণ: "পুরনো খালসা সৈন্যদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করতে চিফ-কমিশনারকে বলা হয়েছে। কিন্তু এরূপ সৈন্যবাহিনী গঠন করা খুবই বিপজ্জনক হবে মনে করে তিনি একাজ করতে হুকুম দেননি; তার বিশেষ কারণ এই যে, শতদ্রু নদীর ওধারের শিখ রাজ্যগুলি থেকে খালসা বাহিনীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ লোকগুলি আসত এবং সেখানকার শিখরা আমাদের ভালো চোখে দেখে না।"[৪৩]

এর কিছুদিন পর ঐ ব্র্যাণ্ডরেথই আর একটা রিপোর্টে লিখেছিলেন: "যে বাহিনী আমরা গঠন করেছি, তা ধীরে ধীরে রিক্রুট করা হয়েছিল এবং কতটা তাদের ওপর নির্ভর করা চলে, এটা দেখে তার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। সকল রকমের জাতি, যা পাঞ্জাবে প্রচুর রয়েছে—হিংস্র বালুচি, সমর্থ আফ্রিদি এবং অনুগত পাহাড়ি নিয়েই—এই বাহিনী তৈরি হয়েছে।"[৪৪]

ইংরেজের এত অত্যাচার ও সন্ত্রাসনীতির ফলে পাঞ্জাবে অনেক লোক যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ প্রচার করেছিল, তা মণ্টোগোমারির কথাতেই বোঝা যায়। ১৩ই জুনের এক সার্কুলারে তিনি বলেছিলেন: "যদিও এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমস্ত পাঞ্জাবে সাধারণত রাজভক্তির মনোভাবই বিদ্যমান, তথাপি এমন কোনো স্টেশন বা বড় শহর নেই যেখানে রাজদ্রোহ

৪১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part II, p.233
৪২. *Ibid*, p. 235
৪৩. *Ibid*, vol. VII, part I, p. 37
৪৪. *Ibid*, vol. VII, pt. I, p.209

প্রচার করবার জন্যে ও আমাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে দুশ্চরিত্র লোক নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, এমন বাজার খুব কমই আছে যেখানে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, এ কথাটা লোকে খোলাখুলিভাবে বলে না। আর যখন এ কথাটা বারবার বলা হচ্ছে, তখন জনসাধারণ কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তাদের মন এই সম্ভাবনার জন্যে তৈরি হচ্ছে এবং সময়-মতো তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।"[৪৫] পাঞ্জাবের একটা সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ওখানকার পোস্ট অফিসগুলিতে প্রচুর বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করেছিল। "সাধারণত রাজদ্রোহের কথা রূপক ও হেঁয়ালি ভাষায় ব্যক্ত করা হতো।"[৪৬]

লুধিয়ানার ডেপুটি-কমিশনার রিকেট্সও তাঁর রিপোর্টে ইংরেজের বিরুদ্ধে শিখদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের কথা লিখেছিলেন: "যখন আমি শহরের সমস্ত বিক্ষুব্ধ শ্রেণীগুলির কথা স্মরণ করি, যখন নাভা সৈন্যদের সন্দেহজনক সাহায্যের ও মালের কোটলার অশ্বারোহীদের ততোধিক সন্দেহজনক অবস্থার কথা ভাবি এবং যখন চিন্তা করি যে, ১২-তম ইরেগুলার বাহিনীর ১৫০ জন বিদ্রোহী ছিল এই জেলারই লোক ও ৯ম ইরেগুলার বাহিনীও তাই, যাদের সকলকেই আমরা কেটে ফেলেছিলাম এবং যখন ভাবি যে, এরা বিদ্রোহ করেছিল তাদের নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজনের প্রভাবের ফলে, ··· তখন আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই, যদি দিল্লির বিদ্রোহীরা আরো ৩ সপ্তাহ টিকে থাকতে পারত, তাহলে এ জেলায় নিশ্চিত বিদ্রোহ হতো।"[৪৭]

পাঞ্জাবের লোক যে ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তা ব্র্যাণ্ডরেথের রিপোর্ট থেকেও দেখা যায়। তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন:

৪৫. *Ibid*, vol. VIII, pt. II, p. 315

৪৬. *General Report on the Administration of the Punjab for 1856-57 & 1857-58*, p. 12. আবার অনেক চালাক-চতুর শিখেরও অভাব ছিল না। "Many Sikhs, who equally hated the English as well as the Purabiahs, waited in the expectation that they will kill each other and then their turn will come. Then after the fall of Delhi some of them joined British Army to receive English arms, equipment, training, still confident that when Englishmen and Hindusthani should have exhausted all their resources they alone in India would be left strong and ambitious." (Meditation of a Sikh soldier in *Friend in India.*)

৪৭. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, pp.115-16

"এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পাঞ্জাবের লোকের ধৈর্য শেষ করে দিচ্ছে। মুরীয় বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমি এর পূর্বেই রিপোর্ট করেছি। তা দমিত হয়েছে বটে, কিন্তু হাজারার লোকদের রাজভক্তি যে টলে উঠেছে, তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।"[৪৮]

পাঞ্জাব সরকারের আর একটি রিপোর্টে দেখা যায়: "প্রথম দিকে আমাদের অবস্থা যেরূপ আশাপ্রদ দেখা যাচ্ছিল তা ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলে যেতে লাগল, তবুও আমরা বিদ্রোহ দমন করতে পারলাম না, তখন পাঞ্জাবিরা ভাবতে শুরু করল যে, ব্রিটিশ-শক্তি এত আঘাত সামলিয়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। যে বাধাগুলি রাশীকৃতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে জমা হয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল তা আর আমরা অতিক্রম করে উঠতে পারব না। যখন দলের পর দল ইয়োরোপীয় সৈন্যরা পাঞ্জাব ছেড়ে দিল্লি যেতে লাগল, অথচ তাদের স্থানে আর কেউ এলো না, যখন বিদ্রোহীদের সফলতা দেশময় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, যখন সমগ্র হিন্দুস্থানে সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লি অভিমুখে ছুটতে লাগল, যখন বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র এসে পৌঁছতে লাগল, তখন পাঞ্জাবিরা বুঝতে শুরু করল আমরা কতখানি নিরুপায় ও আমাদের ভবিষ্যৎ কতখানি আশাহীন। তাদের মনে তখন বিশ্বাস থেকে জাগল সন্দেহ, সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস, তারপর তা অসন্তোষে পরিণত হলো। এই বিক্ষোভ যখন বিস্তার লাভ করেছে ঠিক সেই সময় পতন হলো দিল্লির।"[৪৯]

ঐ রিপোর্টেই কিছু পরে আরো বলা হয়েছে: "এই বিপদের পূর্বাভাষ আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেখা দিল দুটি স্থানে, যা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও অনেক দূরে অবস্থিত এবং যেখানে আমাদের শাসনে লোকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে, সে দুটি স্থান হলো হাজারা ও গোগারিয়া। তবু সেখানে যে বিদ্রোহ হয়ে গেল, তা কোনো বিশিষ্ট অভিযোগের ফলে হয়নি। তা হয়েছিল কেবল মাত্র এই বিশ্বাসের ফলে যে, ব্রিটিশ-শক্তি একেবারে ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়েছে। দিল্লির পতন না হলে সর্বত্র যা ঘটত, এই দুটি জায়গা হচ্ছে তার উদাহরণ।"[৫০]

মুরি ও গোগারিয়ার বিদ্রোহ দুটি পাঞ্জাবের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগস্ট মাসের শেষে হাজারা জেলার কাড়াল জাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ১লা সেপ্টেম্বর মাঝরাতে তারা মুরির পার্বত্য গ্রীষ্মাবাস আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হয়। মুরির কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কাড়ালরা

৪৮. *Ibid*, vol. VII, part I, p. 59
৪৯. *Ibid*, vol. VIII, part II, p. 363
৫০. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part II, p. 364

মুরি ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পাহাড় দখল করে থাকল। রাওয়ালপিণ্ডি, আবতারাবাদ থেকে সৈন্য পাঠিয়ে, কাড়ালদের সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তাদের গোরু-বাছুর সব কেড়ে নিয়ে, অনেক কাড়ালকে বন্দী করে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। মুরির দু'জন হিন্দুস্থানি সরকারি ডাক্তার ও আরো ৫০ জন লোকের মৃত্যুদণ্ড হয়। পাঞ্জাবের সব বড় বড় ইংরেজ কর্মচারিদের স্ত্রী ও শিশুরা এখানেই থাকত, সুতরাং এখানে বিদ্রোহ সফল হলে তার নৈতিক প্রতিক্রিয়া সমগ্র পাঞ্জাবে ও বিশেষ করে ইংরেজদের মধ্যে কিরকম হতো, তা সহজেই অনুমেয়।[৫১]

গোগারিয়া জেলার বিদ্রোহ যোগ্য নেতৃত্ব পাওয়ার ফলে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল ও অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। লাহোর থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলতান বিভাগে অবস্থিত এই অঞ্চলে মুসলমান খুরুল জাতির বাস। বারি-দোয়াবের খুতিয়াল জাতি এবং ভুটে জাতিও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। শিখপ্রধান বুচোকি থানাতেও সকলেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।[৫২] বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলের অনেকগুলি থানা আক্রমণ করে সব অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছিল। অনেক দিনের জন্যে মেজর চেম্বারলেনকে একটা সরাইখানায় অবরোধ করে রেখেছিল। লাহোর ও মুলতান থেকে সৈন্য পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করতে ইংরেজের অনেকদিন লেগেছিল। বিদ্রোহী-দের নেতা আহম্মদ খানের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পরও তারা আরো অনেকদিন ধরে বনে-জঙ্গলে মীর বাহাওয়াল ফতোয়ানার নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল।[৫৩] বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে বাওহালপুর নবাবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এজন্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে শাসিয়েছিল। দিল্লির পতনের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের 'চরিত্রের' অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। তাড়াতাড়ি ডিগবাজি খেয়ে অনেক বিদ্রোহী-দের বন্দী করে তিনি ইংরেজের নিকট তাঁর রাজভক্তির পরিচয় দিলেন।

আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্যে পাঞ্জাব সরকার জুন মাসে ১ কোটি টাকা ঋণের জন্যে আবেদন করেছিল। এই ঋণের জন্যে শতকরা ৬ টাকা সুদ দেওয়া হবে, আর এক বৎসরের মধ্যে সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এই সুদের হার তখনকার দিনের পক্ষে খুব লোভনীয়ই ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাঞ্জাবিদের, বিশেষ করে ধনীদের, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মনোভাব কিরকম ছিল, তা এই ঋণ সম্পর্কেই খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। একজন ইতিহাসজ্ঞ

৫১. *Ibid*, vol. VIII, pt. II, p. 124

৫২. *Ibid*, vol. VIII, part I, p. 266

৫৩. Cave-Brown : *Punjab & Delhi in 1857*, vol. II, pp.200-223

বলেছেন: "যেসব সর্দাররা সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই উদারভাবে আমাদের ঋণও দিয়েছিলেন, কিন্তু ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীরা যেটুকু একেবারেই না দিলে নয়, তার বেশি দেননি।"[৫৪] মণ্টোগোমারি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: "আমরা আশা করেছিলাম যে লাহোর ও অমৃতসরের ধনীরা ৬ টাকা সুদে যে ঋণ দেবে, তার পরিমাণ বেশ মোটাই হবে। কিন্তু বিপরীতটাই হলো ঘটনা।···যারা ৫০ লক্ষ টাকার মালিক তারা দিয়েছে মাত্র ১ হাজার টাকা, অন্যান্যরাও দিয়েছে এই হারে। আমাদের সরকারের প্রতি তাদের এরকম হীন অবিশ্বাস তাদের রাজভক্তির অভাবই প্রমাণ করে।"[৫৫] লাহোর ডিভিশনের কমিশনার রবার্টস তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, যেটুকু ঋণ তারা দিয়েছে, তা দেওয়া হয়েছে অতি অনিচ্ছা ও অতি কার্পণ্যতার সঙ্গে; "৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঋণ উঠেছিল (লাহোর শহরে) মাত্র ৭৫ হাজার টাকা, তার মধ্যে একটি পরিবার দিয়েছিল ৫৫ হাজার টাকা।"[৫৬] সমগ্র পাঞ্জাবে ভয় দেখিয়ে, খোশামোদ করেও ৩০শে এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকা তুলতে পেরেছিল। কিন্তু এর অর্ধেকেরও বেশি এসেছিল পাঞ্জাবের রাজভক্ত রাজা ও সর্দারদের কাছ থেকে। পাতিয়ালার রাজা দিয়েছিলেন ৭ লক্ষ, কাশ্মীরের মহারাজা ৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা, নাভা ৩ লক্ষ, কাপুরতলা ৩ লক্ষ ইত্যাদি।"[৫৭]

পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কমিশনার বার্নেস কিভাবে ভয় দেখিয়ে ঋণ আদায় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "ধনী মহাজনদের খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁরা কতখানি অনুগত, তা এই ঋণ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবই প্রমাণ করে দেবে এবং যাঁরা পিছিয়ে থাকবেন, তাঁরা সরকারের বিশ্বাস ও শুভাকাংক্ষা হারিয়ে ফেলবেন।"[৫৮] বার্নেস-এর অধীনে শিখ রাজারা দিয়েছিলেন ১২-১৩ লক্ষ টাকা এবং তিনি বলেছিলেন, "আমি দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম যে, ঐ পরিমাণ টাকা আমি ধনীদের কাছ থেকেও তুলব।" কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

৫৪. Homes: *History of Indian Mutiny*, p. 334

৫৫. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. II, p.237

৫৬. *Ibid*, vol, VIII, pt. I, p. 268

৫৭. *Ibid*, pp. 206-9

৫৮. *Ibid*, p. 19 "...every rupee lent by traders and bankers had been obtained by extortion...Their contributions were inappreciable···Their niggard distrust of our Government

বিদ্রোহের প্রথম দিকেই পাঞ্জাব সরকার যেসব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, তার মধ্যে একটি হলো শিখ ও পাঞ্জাবিদের বেঙ্গল আর্মি থেকে সরিয়ে তাদের নিয়ে আলাদা করে নতুন বাহিনী গঠন করা। ২০শে মে থেকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঞ্জাব জয় করার পর ভারত সরকার বেঙ্গল আর্মির প্রত্যেক রেজিমেণ্টে পুরাবিয়াদের প্রাধান্য খর্ব করবার জন্যে ২০০ করে শিখ ভর্তি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাঞ্জাবের বাইরে দেখা গিয়েছিল, যেখানেই বেঙ্গল আর্মির কোনো রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করেছে, সেখানে শিখরাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরবিয়াদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে। শিখরা দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড়া কখনোই পুরবিয়া সিপাহিদের বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা, জল্পনা-কল্পনা সম্বন্ধে তাদের ইংরেজ অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করেনি। এর কারণ এই যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ই একটা সময়ের জন্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল।

এ বিষয়ে 'পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস' উল্লেখ করেছে: "এক সময়ে মনে হয়েছিল যে, সমগ্র দেশময় সকল শ্রেণীর মধ্যেই একটা চক্রান্ত চলেছে—সেটা হলো শাদা-আদমির বিরুদ্ধে কালা-আদমির একটা বিদ্রোহ। সিমলার নিকট নাসিরি ব্যাটালিয়নের খারাপ ব্যবহারের মতো ঘটনা এটাই প্রমাণ করে দিল যে, একটা কোনো বিষ গুর্খাদেরও স্পর্শ করেছে, যে বিষ গুর্খাদের স্পর্শ করার সবচেয়ে কম সম্ভাবনা ছিল।"[৫৯]

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭-এর ভারত সরকারের নিকট পাঞ্জাব সরকারের রিপোর্টে দেখা যায় যে, লুধিয়ানা রেজিমেণ্টের ৫ জন শিখ সৈন্যের জলন্ধরে ফাঁসি হয়েছিল এবং আরো ২ জনের এরকম শাস্তি হয়েছিল এবং অনেকের দ্বীপান্তর হয়েছিল। গুরগাঁও জেলায় ২২টি মাওয়াতি গ্রাম আগুন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, কারণ সেখানকার মাওয়াতিরা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।

speaks very unfavourably for their loyalty...In Peshwar, when the city fathers declared their inability to find any money, Edwardes assessed them at 4 lakhs and gave them a day to make their arrangements. The amount was at once produced. Edwardes reported : 'The loan operated very well on public opinion. The people enjoyed seeing the money-lenders brought to book, and respected the power which asserted itself in difficutties.'" p. 225

৫৯. *Ibid*, vol. VIII, part II, p. 338

রূপরাকাতে ৩,৫০০ মাওয়াতি লড়াই করেছিল এবং বহু সংখ্যক হতাহত হয়েছিল।[৬০]

অন্যান্য স্থানেও কিছু শিখ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। কাশীতে যখন সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল তখন সেখানকার শিখরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল। দিল্লিতে যে কিছু সংখ্যক শিখ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৬ই আগস্ট দিল্লি থেকে এক গুপ্তচর রিপোর্ট পাঠিয়েছিল: "গতকাল ১৫০ জন শিখ দিল্লিতে এসেছে। তাদের সবজিমণ্ডিতে রাখা হয়েছে। আগামীকাল নিমখ ও বেরিলি ব্রিগেড ছুটি নজফগড় ও বাঘপথ আক্রমণ করবে। কেবলমাত্র দিল্লি ও মিরাটের বাহিনী কিছু অশ্বারোহী ও শিখদের নিয়ে দিল্লি রক্ষার জন্যে থাকবে।"[৬১] তার কয়েকদিন পর রজব আলি কমিশনার বার্নেসকে লিখেছে: "শিখরা যাতে ব্রিটিশ ক্যাম্পে ফিরে যায়, সেই কারণে শিখদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে আমি গতকাল একজন লোক পাঠিয়েছি।"[৬২]

১৮৫৮ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি ২১ জন শিখকে লুধিয়ানাতে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঝান্সিতে যে বেঙ্গল আর্মির ১২-তম রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করেছিল, এই শিখরা সেই বাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। "অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল যে, শিখ সৈন্যরাও ঐ বিদ্রোহে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল।"[৬৩] শিখরা যে অনেক স্থানে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে পুরবিয়াদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ করে মণ্টোগোমারি লিখেছিলেন: "অনেক শিখ যারা (বেঙ্গল) রেজিমেণ্টগুলির সঙ্গে ছিল, তাদের দেশ ও প্রভুদের প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা অনেকেই বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল এবং দিল্লির পতনের পর তারা গোপনে দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল।"[৬৪]

হিন্দুস্থানিদের থেকে পৃথক করে যে নতুন পাঞ্জাব বাহিনী গঠন করা হলো, আগস্ট মাসের শেষে তার শক্তি হলো ৫০ হাজার লোক। লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, এই পাঞ্জাব বাহিনীতে শিখদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। এই ৫০ হাজার লোকের মধ্যে ২৪ হাজার আফ্রিদি, বালুচি, মুলতানি প্রভৃতি মুসলমান, ১৩,৩৫০ শিখ, ৮ হাজার হিন্দু, ২,২০০ গাড়োয়ালি, গুর্খা ইত্যাদি।

৬০. *Ibid*, vol. VII, part II, pp. 225-26
৬১. *Ibid*, vol. VIII, part I, p. 419
৬২. *Delhi News*, file 133, Sept. 6
৬৩. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, pt. II, p.247
৬৪. *Ibid*, p. 236

অর্থাৎ শিখদের সংখ্যা মাত্র এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশি ছিল। ইংরেজরা যে শিখদের বিশ্বাস করত না এবং শিখরাও যে ইংরেজের গুণমুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দেয়নি, অন্তত দিল্লির পতন পর্যন্ত, এই সংখ্যাগুলি থেকেই তা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়। ইংরেজরা যে ভেদ-নীতি অনুসরণ করে এই নতুন বাহিনী গঠন করেছিল, তা তাদের নিজেদের রিপোর্টেই পাওয়া যায় : "মুসলমানদেরও বিভিন্ন জাতি থেকে নেওয়া হয়েছে—যেসব জাতিগুলির মধ্যে এক ধর্ম ছাড়া আর বিশেষ কোনো ঐক্যই নেই। এই মুসলমানরা আবার হিন্দুস্থানিদের প্রতি যেমন বিরূপ, তেমনি শিখদেরও বিরোধী। দ্বিতীয় পাঞ্জাব যুদ্ধের সময় এবং তার পূর্বেও বহুবার প্রমাণ হয়েছে যে, শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাদের ওপর নির্ভর করা চলে।"[৬৫] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লি আক্রমণের সময় ইংরেজ বাহিনীর শক্তি ছিল মোট ১০ হাজার লোক। এদের মধ্যে পাঞ্জাব বাহিনীর শক্তি ছিল প্রায় ৩ হাজার। এই তিন হাজারের মধ্যে শিখদের সংখ্যা ১ হাজারেরও কম ছিল। এদের সঙ্গে পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দের ১,১০০ সৈন্য যোগ করলেও মোট শিখদের সংখ্যা হয় মাত্র ২ হাজার।

পাঞ্জাব সম্বন্ধে, বিশেষ করে শিখদের সম্বন্ধে বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, দিল্লির পতনের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ পাঞ্জাবি ও সাধারণ শিখদের ইংরেজরা পুরবিয়া ও মোগলদের বিরুদ্ধে হাজার রকমের কুৎসা ও জাতিবিদ্বেষ প্রচার করেও দলে টানতে পারেনি। পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ—হিন্দু, শিখ, মুসলমান—সকলেই ইংরেজকেই প্রধান শত্রু বলে মনে করত। এই সত্য ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিরা ও ইতিহাসবিদরা যে বারবার স্বীকার করে গিয়েছেন, সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অনেক শিখ ভলান্টিয়ার হয়ে ও অনেক শিখ ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে দিল্লিতে যে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাও পূর্বে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব শিখ ইংরেজের হয়ে লড়েছিল, তা তারা ইংরেজ-প্রীতির বশবর্তী হয়ে করেনি। শিখ-রাজারা ও কয়েকজন শিখ সর্দার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে ও পুরস্কারের লোভে এইসব শিখদের, অনেক সময় কতকটা জোর করেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আবার অনেক সময় পুরস্কারের ও লুঠপাটের প্রলোভন দেখিয়ে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার

---

৬৫. *Ibid*, pp, ১40-41. Lawrence "chose his recruits wisely, so balancing antagonistic nationalities and creeds as to give dangerous preponderance to none." (Thorburn : *Punjab in Peace and War*, p. 210)

জন্যে পাঠিয়েছিল। "অনেকে যারা পুরনো উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির কথা ভেবে নির্জনে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত এবং কোনো রকমের গণ্ডগোল শুরু হলেই যারা আমাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা আরম্ভ করে দিতে পারত, তারাই শেষে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, যে জীবিকা-অর্জনে স্বদেশে তারা সমর্থ হচ্ছিল না, এখন সেই জীবিকার আশায় ও হিন্দুস্থানের লুঠে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে দিল্লি অভিমুখে সানন্দে যাত্রা করল।"[৬৬] আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি, সুযোগ পেলেই তাদের অনেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, অথবা অনেক ক্ষেত্রে দলত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমরা এটাও দেখেছি যে, কাশ্মীরের মহারাজা যে ডোগরা বাহিনীকে দিল্লিতে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন, তারা প্রথম দিনের যুদ্ধেই কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছিল।

এ ব্যাপারে ড. মজুমদারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, হিন্দুস্থানি ও মোগলদের প্রতি ঘৃণাবশতই শিখরা 'সর্বান্তঃকরণে' ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল।[৬৭] কিন্তু তাঁর এ বিশ্বাস তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অনেক শিখ যে ইংরেজের বিরুদ্ধেই ছিল এবং অনেক শিখ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েও ছিল, সে সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নি। এটা কি তাঁর 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়?

শিখদের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, সীমান্তের পাঠানদের সম্বন্ধেও তাই। অসংখ্য পাঠান ঝান্সি, লখনৌ, বেরিলি, দিল্লি ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে পরিপূর্ণ ছিল এবং ১৮৫৭-৫৮ সনে বিদ্রোহের কালে নানা সময়ে নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে তারাও বিদ্রোহ করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহী হিন্দুস্থানি সিপাহিদেরও সাহায্য করেছে। সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে পেশোয়ার ডিভিশনের ডেপুটি-কমিশনার হেণ্ডারসন তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "এদের মনোভাবে ছিল একটা অদ্ভুত রকমের মিশ্রণ। তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ছিল দিল্লির বাদশাহের প্রতি, যদিও পুরবিয়াদের প্রতি তারা ছিল বিদ্বেষপরায়ণ।...এই সীমান্ত জাতিগুলির মেজাজ ও মনোভাব সব সময়েই আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল এবং তাদের মধ্যে আমাদের বন্ধু বলে বিশেষ কেউ ছিল না।...আগস্ট মাসের শেষে, অর্থাৎ যখন তাদের জির্গা ও সভাগুলিতে ও তাদের নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম এবং যখন তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই আমরা এই সীমান্তের লোকদের আমাদের বাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করি।"[৬৮]

৬৬. *Ibid*, vol. VII, pt. II, p. 360
৬৭. *Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, p.322
৬৮. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part II, p.106

ইংরেজ বাহিনীতে কোন ধরনের পাঠানদের ভর্তি করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পেশোয়ারের কমিশনার কর্নেল এডওয়ার্ডস্ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "পেশোয়ার উপত্যকার সব ভবঘুরে ও গুণ্ডাদের টেনে নেওয়া হলো।···আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, বিদ্রোহের সময় এখানে অপরাধের (crime) সংখ্যা যত কম হয়েছিল, তা আর কোনো সময়েই হয়নি। বস্তুত এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কেবলমাত্র একটা বাহিনীতেই, যে বাহিনীটা বর্তমানে লখনৌতে যুদ্ধ করছে, খুব কম করে ৬০ জন নাম-করা দাগী দস্যু রয়েছে। তাদের নেতৃত্বে আছে দুর্ধর্ষ মুখুরম খান। যে নেটিভ ভদ্রলোকটি এদের বাহিনীতে ভর্তি করেছিলেন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'এরাই পুরবিয়াদের মারুক, অথবা পুরবিয়ারাই এদের মারুক, তাতে সমানভাবে রাষ্ট্রেরই উপকার হবে'।"[৬৯]

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মতোই পাঞ্জাবেও হিন্দু, শিখ, মুসলমান—সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচুর অসন্তোষ জমা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবেই তা জাতীয় আকারে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও তখনো কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন গড়ে না ওঠাতে এই সর্বজনীন অসন্তোষ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতই থেকে গেল। পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমান সর্দাররা এবং সীমান্তের খান ও মালিকদের বেশির ভাগই ইংরেজ-বিরোধী ছিলেন। তাঁরা তখনকার অবস্থায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পারতেন, কিন্তু সাহস করে অগ্রসর হয়ে এলেন না; তাঁরা অতি-বুদ্ধিমানের মতো 'হাওয়া কোনদিকে বয়' তাই দেখতে লাগলেন। এই সুযোগে শিখ রাজাদের ও কিছু শিখ-সর্দারদের হাত করে, কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে, কিছু লোককে প্রলোভন দেখিয়ে এবং কিছু গুণ্ডা ও দুশ্চরিত্রদের দলবদ্ধ করে ইংরেজ সরকার এই সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল।

---

৬৯. *Ibid*, p. 183. John Lawrence তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, "Thus, the very class most likely to profit by disturbance and to turn against us for the want of something better to do, were enlisted in our cause." (*Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part II, p. 360)

পাতিয়ালা নাভা ও ঝিন্দ

পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ,কাপুরতলা—এসব শিখ রাজ্যগুলি যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ১৫ হাজার বর্গমাইল স্থান অধিকার করেছিল ও তাদের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ এই রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তার দৈর্ঘ হলো ২০০ মাইল এবং এই রাস্তার জনপূর্ণ এলাকাগুলির "অধিকাংশ লোকই বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের প্রতিই সহানুভূতি দেখিয়েছিল।"[১] বিদ্রোহের প্রচণ্ড ঢেউগুলি যদি এখানে বাধা না পেত, তাহলে সমগ্র পাঞ্জাবে তা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ত। কারণ, পাঞ্জাব ও তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (অযোধ্যা, রোহিলখণ্ডের) মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সীমারেখা ছিল না। এই শিখ রাজ্যগুলিই বিদ্রোহের ঢেউ প্রতিরোধের ব্যাপারে বাঁধের কাজ করেছিল।

মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু'ধারে আম্বালা পর্যন্ত সব জেলাগুলিতে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হলো। শিখ রাজ্যগুলির কমিশনার বার্নেস লিখেছিলেন: "সিসরা, হান্সি, হিসার, পানিপথ, মুজফফর নগর ইত্যাদি প্রতিবেশি জেলাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশৃংখল হয়ে পড়ল। বেসামরিক কর্মচারিদের হয় হত্যা করা হয়েছিল, অথবা তাদের পালিয়ে যেতে হয়েছিল। পানিপথের ম্যাজিস্ট্রেটের কর্নাল শহরের বাইরে কোনো ক্ষমতা ছিল না। সাহারানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট খুব সাহসের সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর জেলায় নিজের বলতে আর কিছু রইল না; লুণ্ঠনকারীরা যা খুশি তাই করতে লাগল। কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র দলগুলি দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃংখলতা ছড়িয়ে পড়ল।"[২] সকল শ্রেণীর লোকই ধরে নিয়েছিল যে, ইংরেজদের অন্তিম অবস্থা এসে গিয়েছে। সৈন্যবিভাগ পর্যন্ত একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ল। "ইঁদুর যেমন ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে যায়, শিবিরের অনুচররাও তেমনি শিবির পরিত্যাগ করে চলে গেল।" তাছাড়া, "পানিপথ ও হিসারে রংঘুর বিদ্রোহ খুবই সফল হয়েছিল এবং তারা শিখ রাজ্যগুলির লোকদের এই বলে উত্তেজিত করতে লাগল যে, তারা কি এতই কাপুরুষ যে এখনো তারা ফিরিঙ্গিদের আনুগত্য মেনে চলছে! চারিদিকে খুব সংঘর্ষ চলেছে এবং পুলিশ এইসব ঘটনার রিপোর্ট করতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে।"[৩]

১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p. 8
২. *Ibid*, p. 8
৩. *Ibid*, p. 10

রুপুরে বিদ্রোহ চারিদিকে বিস্তার লাভ করেছিল। দুটি শিখ পুলিশ কোম্পানিকে ওখানে শান্তিরক্ষা করতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেখানে গিয়েই তারা নিজেরাই বিদ্রোহে যোগ দিয়ে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগল। বার্নেস বলেছেন: "যাই হোক, পাঁচ জনকে ধরা হলো এবং তাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধ প্রমাণ করা হলো। মোহন সিং নামক রুপুরের একজন লোককেও ধরা হলো। আমি এবং মি. ফোরসাইট ৫ই জুন এইসব লোকের বিচার করলাম এবং ঐদিনই তাদের ফাঁসি দিলাম।"[৪]

একই সময়ে ফিরোজপুর জেলায় দিল্লির বাদশাহের সমর্থনে বিদ্রোহ করার অপরাধে রানিয়ার নবাব ও আরো ১৭ জনকে ফাঁসি দেওয়া হলো।[৫]

যখন দিল্লি থেকে বিদ্রোহের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজদের গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে, যখন ব্রিটিশরাজের শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এবং যখন ইংরেজ শাসকরা বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হয়ে উঠছে, ঠিক এরকম গভীর সংকটপূর্ণ মুহূর্তে শিখ রাজারা তাঁদের ইংরেজ প্রভুদের বাঁচাবার জন্যে তাঁদের সমস্ত সৈন্যবল, ধনবল ও জনবল নিয়ে অগ্রসর হয়ে এলেন। রবার্টস এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, ফুলকিয়া পরিবার (পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা) কোনদিকে যাবে তাই ভেবে লাহোরের কর্তৃপক্ষ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পাতিয়ালা রাজার ব্যক্তিগত বন্ধু আম্বালার ডেপুটি-কমিশনার ডগলাস ফোরসাইট তৎক্ষণাৎ মহারাজার সঙ্গে দেখা করলেন। "তিনি মহারাজাকে বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছেন, এমন সময় মহারাজা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—যা ঘটেছে তা তিনি সবই জানেন। তারপর ফোরসাইট জিজ্ঞাসা করলেন, দিল্লি থেকে পাতিয়ালার দূত এসেছে, এ কথাটা সত্য কিনা। কিছু-দূরে বসে আছে এমন কয়েকজনকে দেখিয়ে মহারাজা বললেন: 'ঐ যে তারা'। ফোরসাইট তখন মহারাজার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাইলেন। মহারাজাকে একলা পেয়ে তিনি বললেন: 'মহারাজা সাহেব, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন—আপনি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে'? মহারাজা সানন্দে উত্তর দিলেন—'যতদিন বেঁচে থাকব আমি আপনাদেরই, কিন্তু এটা জানবেন যে, আমার নিজের দেশেই অনেক শত্রু আছে; আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আমার বিরুদ্ধে, তাদের একজন হচ্ছে আমার নিজের ভাই। যাহোক, আমাকে কি কাজ করতে হবে বলুন'। ফোরসাইট তখন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নিরাপদ রাখার জন্যে মহারাজাকে তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনী কর্নালের দিকে পাঠাতে বললেন। মহারাজা এই শর্তে রাজী হলেন যে, ইয়োরোপীয় সৈন্যও শীঘ্রই সেখানে পাঠানো হবে। এটা খুবই

৪. *Ibid*, p. 11
৫. *Ibid*, p. 56

একটা সংগত শর্ত, কারণ তিনি জানতেন—তাঁর লোকেরা যদি আমাদের চূড়ান্ত জয়ের ওপর আস্থাবান না হয়, তাহলে তাদের বিশ্বাস করা যাবে না।[৬]

দিল্লি-বিদ্রোহের মাত্র তিনদিন পর ১৪ই মে "পাতিয়ালার রাজা ১,৫০০ সৈন্য ও ৪টি কামান নিয়ে থানেশ্বরে প্রবেশ করলেন। ... ১৭ই তারিখে ঝিন্দের রাজাও ৪০০ লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ও পরদিন কর্নালে গেলেন।"[৭]

নাভা ও কাপুরতলার রাজারাও এইভাবে চটপট করে তাঁদের লোকজন নিয়ে হাজির হলেন। এই সময়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চিন্তার বিষয় ছিল বিদ্রোহী এলাকাগুলি পুনর্দখল করার দিকে নয়, বরং এই অঞ্চলের প্রধান রাস্তা ও নদী পার হবার স্থানগুলি ইংরেজ বাহিনীর যাতায়াতের জন্যে ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম পাঠাবার জন্যে নিরাপদ রাখা। শিখ রাজাদের এই দায়িত্বটাই দেওয়া হলো। এ সম্পর্কে বার্নেস লিখেছেন: "যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এইসব শিখ রাজারা যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তাদেরই তত্ত্বাবধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামগুলি অনবরত পাঠানো হতো। তাঁদেরই সৈন্যেরা আমাদের সামরিক ঘাঁটিগুলি রক্ষা করত এবং ফিরোজপুর ও ফিলুর থেকে একেবারে দিল্লি পর্যন্ত সমস্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটাই পাহারা দিত। ... একদল ঝিন্দ সৈন্য রাজপথের সেতু দখল করেছিল ও তারই ফলে আমাদের মিরাট বাহিনী হেড-কোয়ার্টার্সে যোগ দিতে সমর্থ হয়েছিল।"[৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শিবির থেকে ভারতীয় অনুচররা সব অন্তর্ধান হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ গোরুর গাড়ি, উট, গাড়িচালক, ডুলিবাহক প্রভৃতি কিছুই আর সংগ্রহ করতে পারছিল না। এইসব সংগ্রহ করাও রাজাদের ও সর্দারদের একটা প্রধান কাজ হলো।

শিখ রাজ্যের সর্দাররা স্বেচ্ছায় ইংরেজকে সাহায্য করতে আসেন নি। তাঁদের কাছ থেকে জোর করে, ভয় দেখিয়ে সাহায্য আদায় করা হয়েছিল। রাজারা ইংরেজের দিকে ঝুঁকে পড়ার পর সর্দাররা যখন কোনঠাসা হয়ে গেলেন, তখন সহজেই ইংরেজদের পক্ষে ভয় দেখানো সম্ভব হলো। কমিশনার বার্নেস এই কাজ কি করে সম্পন্ন করেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "পুলিশে নতুন লোক ভর্তি না করে ১৮৪৯ সনে যেসব জায়গিরদারদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই এই কাজের জন্যে লোক দিতে বলা হলো। এইসব ছোট ছোট সম্ভ্রান্তদের সংখ্যা এই রাজ্যগুলিতে অনেক। এঁরা কাজের পরিবর্তে শান্তির সময় তাঁদের আয়ের ৮ ভাগের ১ ভাগ বিনিময়-ট্যাক্স দিয়ে

---

৬. Lord Roberts: *41 Years in India*, vol. I, pp. 203-4

৭. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part II, p.28

৮. *Ibid*, p. 7

থাকেন। যেহেতু এইসব সর্দারদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি এই প্রদেশেই, সেহেতু আমি ভেবে দেখলাম যে, এটাই হচ্ছে তাঁদের আনুগত্যের চমৎকার গ্যারান্টি। আমি ঠিক করলাম যে, আমরা নিজেরা পুলিশের দল গঠন না করে, এঁদেরই দলগুলিকে এই কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং আমি তাঁদের সকলকে ডেকে পাঠালাম এবং তাঁদের কাছ থেকে এই সাহায্য দাবি করলাম; এর পরিবর্তে কিছুকালের জন্যে তাঁদের বিনিময়-ট্যাক্স দেওয়া থেকে রেহাই দিলাম। ... এই পন্থা খুব চমৎকার ফল দিল। আমাদের সব ঘাঁটিগুলি দৃঢ় হলো এবং সর্বত্র একটা নিরাপত্তার ভাব বিস্তারলাভ করল। জায়গিরদাররাও তাঁদের ওপর এই বিশ্বাস স্থাপনের ফলে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য পালন করলেন।"[৯]

এইসব শিখ রাজা ও সর্দারদের ওপর ইংরেজদের ঘাঁটিগুলি পাহারা দেওয়া, সরবরাহ বিভাগের জন্যে লোক জোগাড় করা, রাস্তাঘাট নিরাপদ রাখা ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাহারা দিয়ে একস্থান থেকে আর একস্থানে নিয়ে যাওয়া—এইসব কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া আরো দুটি কাজ তাঁদের করতে হয়েছিল—ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর জন্যে লোক সংগ্রহ করা ও সরকারের জন্যে ঋণ জোগাড় করা। রাজভক্তির এত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও পাতিয়ালা ও ঝিন্দের রাজারা সন্তুষ্ট হননি। দিল্লির শেষ আক্রমণের সময় তাঁরা নিজেদের দলবল নিয়ে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[১০] এইসব রাজাদের রাজভক্তি দেখে অনেক ইংরেজ-শাসক এতই তাঁদের গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন যে, এমনকি কুপারের মতো একজন 'অগ্নিভক্ষক', তলোয়ার-ঝন-ঝনকারী ভারতীয়-বিদ্বেষী ব্যক্তিও পাতিয়ালার রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, পাতিয়ালার রাজা এতই অনুগত ছিলেন যে "তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একচোখ খোলা রেখে ঘুমোতেন" এবং তিনি হচ্ছেন "অভূতপূর্ব লোভকে জয় করে এশিয়ার সম্মান বজায় রাখার জলন্ত দৃষ্টান্ত।"[১১] এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শাহ পাতিয়ালার রাজাকে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখে দূত পাঠিয়ে ছিলেন; রাজা এই চিঠিগুলি কমিশনার বার্নেসকে দিয়ে দিয়েছিলেন।[১২]

শিখ রাজারা নিজেদের এত আনুগত্য সত্ত্বেও তাঁদের প্রজাদের কিন্তু রাজভক্ত

৯. *Ibid*, p.8
১০. Forrest : *State Papers*, vol. I p. 383
১১. Cooper : *Crisis in the Punjab*, p. 37
১২. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, p. 57

করে তুলতে পারেন নি। এইসব রাজাদের সৈন্যরা সুযোগ পেলেই যে অনেক সময় দলত্যাগ করে বিদ্রোহীদের দিকে চলে যেত, তার অনেক উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] পাতিয়ালার মহারাজা নিজেই ডেপুটি-কমিশনার ফোরসাইটকে বলেছিলেন যে, তাঁর নিজের রাজ্যের মধ্যেই 'গৃহশত্রু'র অভাব নেই। জনসাধারণ ছাড়াও রাজদরবারের মধ্যেও যে শক্তিশালী 'গৃহশত্রু'র অভাব ছিল না, তা নিচের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়: "পাতিয়ালার মহারাজা ১০০ জন বিদ্রোহী সিপাহিকে ধরেছিলেন এবং তাদের একটা দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন। তাঁর দেওয়ান নিহালচাঁদ, যিনি দিল্লির লোক, ভুল করে এইসব বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেন। কিছুকাল পরে আজ এই ঘটনার কথা চিন্তা করে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, তাদের হয়তো ইচ্ছা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দীদের আমাদের হাতে সমর্পণ করতে সকলেই অনিচ্ছুক ছিলেন, এমনকি আমার মনে হয় মহারাজা নিজেও অনিচ্ছুক ছিলেন।"[১৪]

এইসব নানা কারণে ও উগ্র ভারতীয়-বিদ্বেষের ফলে ইংরেজ-শাসকরা তখন তাদের পরম বন্ধুদেরও বিশ্বাস করতে পারেনি এবং পাতিয়ালার রাজার মতো লোককেও, যিনি ইংরেজ প্রভুদের স্বার্থের দিকে একচোখ খোলা রেখে ঘুমোতেন, তারা অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি। বিদ্রোহ শুরু হবার বেশ কিছুদিন পর, যখন পাতিয়ালার রাজা তাঁর কাজের দ্বারা তাঁর ইংরেজ-ভক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন, সেই সময় রবার্টস লিখেছিলেন: "এখনো সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, পাতিয়ালার রাজা এবং জলন্ধর-দোয়াব ও পাঞ্জাবের কয়েকজন সর্দার বিদ্রোহে যোগ দিতে খুবই ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের সরকারি কাজকর্ম ঠিকঠিক ভাবে চলছে দেখে তারা বুঝতে পারছে যে, আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাইনি, যদিও আমরা খুব জোর ঘা খেয়েছি।"[১৫] ১লা জুন, জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছিল: "সংবাদ এসেছে যে, সমগ্র পাতিয়ালা বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে। যখন হিন্দুস্থানিরা তাদের ধর্মরক্ষা করার জন্যে লড়ছে, সেই সময় মহারাজা ইংরেজকে সাহায্য করছেন—এই বলে সৈন্যরা খোলাখুলিভাবে মহারাজাকে ভর্ৎসনা করেছে।"

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনাটিও তাৎপর্যপূর্ণ: "মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লর্ড ক্ল্যারেনডনের নিকট একটা যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায্য চিঠিতে লিখতে দেখা যায় ক্ল্যারেনডন অভিযোগ করেছিলেন যে, নৃশংসতার বিরুদ্ধে মহারাজা দলীপ সিং (রণজিৎ সিং-এর পুত্র) তাঁর ক্রোধ গোপন করেন নি। এই চিঠিতে মহারাণী

---

১৩. *Ibid*, vol, VIII, part I, p. 12

১৪. *Letters*, p. 33

১৫. *Letters*, p. 33

ক্ল্যারেনডনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁর নিজের দেশের লোককে 'পাষণ্ড', 'দানব' ইত্যাদি বলা হবে ও শত শত দেশবাসীকে হত্যা করা হবে—এসব তিনি শুনে ও দেখে পছন্দ করবেন, এটা তাঁর কাছে আশা করা যায় না।"[১৬]

প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজ সরকারের ঘোরতর সংকটের দিনে, যে জুন ও জুলাই মাসে, যখন ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লুপ্ত হতে চলেছিল, তখন এই শিখ রাজারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। একথা বলা একেবারেই অত্যুক্তি হবে না যে, শিখ রাজাদের নিকট থেকে সাহায্য না পেলে বিদ্রোহ দেখতে দেখতে পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাবকে গ্রাস করে ফেলত। স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন শিখরাজ্য পাঞ্জাব গ্রাস করবার জন্যে দু-দু'বার ইংরেজরা পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিল, তখন এই পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ও কাপুরতলার শিখ রাজারাই নিজেদের স্বধর্মী ও স্বজাতি ভাইদের বিরুদ্ধে বিদেশী ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা যে আবার নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণী স্বার্থের জন্যে স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, এতে আর আশ্চর্য কি!

তাঁদের এই অসাধারণ সাহায্যের জন্যে পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ও কাপুরতলার রাজাদের প্রত্যেককে গভর্নর-জেনারেল তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে এই চিঠিখানা লিখেছিলেন: "শতদ্রু ও পাঞ্জাবের যুদ্ধের সময় (১ম ও ২য় শিখ যুদ্ধ) আপনি আপনার শুভেচ্ছা ও রাজভক্তির বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। আজকে আবার সেই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে তাতেও আপনি অগ্রসর হয়ে এসে বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে আপনার রাজভক্তির ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। এই ব্যবহার আমাকে খুবই সন্তুষ্ট করেছে।" শিখ যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে কাপুরতলার সর্দার নিহাল সিংকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ—এঁরাও ইতিমধ্যেই 'রাজা' হয়েছিলেন। বিদ্রোহের সময় তাঁরা অভূতপূর্ব রাজভক্তি প্রদর্শন করলেন, তার জন্যে সদাশয় ব্রিটিশ সরকার এঁদের সকলকেই 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করলেন। এছাড়া নিহাল সিং একটি সম্পত্তিও পেলেন, যার বার্ষিক আয় ২০ লক্ষ টাকা। পাতিয়ালা, নাভা এবং ঝিন্দও এইভাবেই পুরস্কৃত হয়েছিল।

যেসব পণ্ডিতরা বলেন ৫৭-র বিদ্রোহ ছিল ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিকদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা শেষ প্রচেষ্টা মাত্র, তাঁরা এইসব পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ এবং গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ইত্যাদির রাজা-মহারাজাদের বিদ্রোহ-বিরোধী ভূমিকা সম্বন্ধে একেবারে মৌন কেন? এই বিদ্রোহ যদি সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠারই চেষ্টা হতো, তাহলে এইসব শক্তিশালী

১৬. Edith Sitwell : *Victoria of England*, p. 166

সামন্ত-রাজারাই তো এই সুযোগে ইংরেজের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু তা না করে তাঁরা বিদেশী ইংরেজদের অধীনতাই মেনে নিলেন। কেন? এই কারণে যে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন—যা আমাদের পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন না—যে একটা গণ-বিদ্রোহের অংশীদার হয়ে তাঁরা তাঁদের পুরনো সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী ক্ষমতা আর বজায় রাখতে পারবেন না, বরং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের 'মিত্র' হিসেবেই তাঁদের দীর্ঘায়ু হবার সম্ভাবনা বেশি। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে,এসব রাজারা—যাঁরা ছিলেন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূ—ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই বিদ্রোহ বাহাদুর শাহ, হজরত বেগম, নানা সাহেব, ঝান্সির রানী, কুনওয়ার সিং-এর পতাকাতলে ঘটলেও, তা ছিল মূলত গণবিদ্রোহ—সেখানে সামন্ততন্ত্রের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়। তাঁরা তাঁদের সহজাত বুদ্ধিতেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই গণবিদ্রোহের মধ্যেই গণতন্ত্রের বীজ সুপ্ত রয়েছে—বিদ্রোহের সাফল্য তাকে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলবে।

দ্বিতীয় উদ্যম ও ব্যর্থতা

২রা জুলাই তারিখে বখত খানের নেতৃত্বে বেরিলি-ব্রিগেডের আগমনে বিদ্রোহী দিল্লির একটি নতুন অধ্যায় শুরু হলো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহী সরকার এক মহা সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছিল। যদিও তারা দিনের পর দিন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজ শিবির আক্রমণ করে তাদের দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং তাদের শিবিরের অবস্থা কাহিল করে তুলেছিল, কিন্তু তবুও তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা—একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব সংগঠিত করা—তার কিছুই সমাধান তারা করতে পারেনি। সিপাহিরা যে সামরিক-কোর্ট গঠন করেছিল, তার আধিপত্য তারা তখনো সম্পূর্ণভাবে বিস্তার করতে পারেনি। শাহজাদারা এক একজন এক-একটি বাহিনীর নায়ক। অধিকন্তু শাহজাদা মির্জা মোগল সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁরা শহরে এক ভয়ানক অরাজকতার সৃষ্টি করলেন। এই অরাজকতা ও অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজের দালাল ও গুপ্তচররা তাদের অন্তর্ঘাতী কাজের দ্বারা বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করে তুলল। দিল্লির বিদ্রোহী জনসাধারণও নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষার অভাবে কোনোরকম নেতৃত্ব গঠন করতে সমর্থ হলো না।

মইনউদ্দিনের নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বেরিলি বাহিনীর আগমনের দিন দিল্লির নাগরিকরা বখত খান ও এই বাহিনীর নিকট থেকে কতখানি আশা করেছিল, এবং বখত খান নিজে দিল্লি তথা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার কত বড় একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্ণনা থেকে জানা যায়: "যমুনায় নৌকা-সেতু মেরামত করা হয়েছে, কারণ বেরিলি বাহিনীর আগমনের জন্যে সকলেই অপেক্ষা করছে। রোহিলখণ্ডের এই বাহিনী যখন অনেক দূরে তখন বাহাদুর শাহ একটা দূরবীণ দিয়ে তাদের দেখছিলেন। ২রা জুলাই সকালবেলায় নবাব আহম্মদ কুলি খান অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। হাকিম আসানুল্লা খান, জেনারেল সামুদ খান, ইব্রাহিম আলি খান, গোলাম কুলি খান এবং অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। রোহিলখণ্ড বাহিনীর নায়ক মহম্মদ বখত খান বাদশাহের কাছে উপস্থিত হয়ে বাদশাহকে তাঁর সেবা গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। বাদশাহ বললেন, 'আমি সর্বান্তঃকরণে চাই যে, দিল্লির অধিবাসীরা রক্ষিত হোক, তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় থাকুক এবং আমাদের বিজয় ও ব্রিটিশ শত্রুর

ধ্বংস সাধিত হোক'। জবাবে জেনারেল বখত খান জানালেন, যদি বাদশাহ ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হতে সম্মত আছেন। এই কথায় বাদশাহ সাদরে জেনারেলের করমর্দন করলেন। তারপর তিনি বিভিন্ন বাহিনীর নেতাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা বখত খানকে তাঁদের অধিনায়ক নির্বাচিত করতে রাজী আছেন কিনা। তাতে সকলেই সম্মতিসূচক ভোট দিলেন এবং প্রত্যেকেই সামরিক শপথ গ্রহণ করে জানালেন যে, তাঁরা বখত খানকে তাঁদের অধিনায়ক বলে মেনে নেবেন। দরবারের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে বাহাদুর শাহের সঙ্গে বখত খানের আবার কথাবার্তা হলো। সমস্ত শহরে প্রচার হয়ে গেল যে, বখত খান এখন থেকে সর্বাধিনায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছেন।…আর মির্জা মোগল বখত খানের সহকারি নিযুক্ত হলেন। বখত খান বাদশাহকে বললেন যে, এমনকি যদি কোনো শাহজাদাও লুঠপাট করে তাহলে তিনি তার নাক-কান কেটে দিতে ইতস্তত করবেন না। বাদশাহ তাতে জবাব দিলেন: 'আপনার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হলো, আপনি যা ভালো বুঝবেন, এতটুকু ইতস্তত না করে তাই করবেন।' কোতোয়ালকে জানিয়ে দেওয়া হলো, যদি তাঁর নিজের অবহেলার জন্যে শহরে কোনোরকম গণ্ডগোল কিংবা লুঠপাট হয়, তাহলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। বখত খান বাদশাহকে জানালেন যে, তাঁর সঙ্গে ৪টি পদাতিক বাহিনী, ৭ শত অশ্বারোহী ও ৯টি কামান আছে। এই বাহিনীকে ৬ মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এখন তাঁর হাতে ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকাতে বাদশাহের কোনো চিন্তার কারণ নেই।"[১]

এইভাবে বখত খানের হাতে ডিক্‌টেটরি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হলো। তাঁর কাজ হলো দুটি: ১. শহরে শান্তিশৃংখলা স্থাপন করে বিদ্রোহী সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, ২. ইংরেজ শত্রুকে পরাজিত করা। এই কর্তব্য পালন করার জন্যে তাঁর নিজের বেরিলি বাহিনী ছাড়াও তিনি পেলেন মিরাট, দিল্লি, জলন্ধর, নাসিরাবাদ, আগ্রা ও হিসারের বিদ্রোহী বাহিনীগুলি এবং কয়েক সহস্র দিল্লির নাগরিক ভলান্টিয়ার। দিল্লি যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজ বাহিনী ছিল সংখ্যাগুরু, এখন বিদ্রোহী সিপাহিদের সংখ্যা হলো ইংরেজ বাহিনীর দ্বিগুণ। পুরো একমাস ধরে বখত খান এই সুবিধাটা পেয়েছিলেন। অন্যান্য সুবিধাও বখত খান কম পাননি। নরম্যান লিখেছিলেন: বিদ্রোহীরা যমুনার নৌকা-সেতু দিয়ে সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করছে, "শহরে বিদ্রোহীদের গমনাগমন ও তাদের খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বন্ধ করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলাম, আর পাঞ্জাবের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখাটা কতই-না কষ্টসাধ্য হচ্ছিল।

১. Metcalf: *Two Native Narratives*, pp. 60-61

বিদ্রোহীরা যদি তাদের অশ্বারোহীদের বিচারপূর্বক ও সাহসের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারত, তাহলে আমরা যে খুবই বিপদে পড়তাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"[২]

দিল্লির এই সামরিক সুবিধাগুলি ছাড়াও সাধারণভাবে বিদ্রোহীদের অবস্থা এই সময়ে সমস্ত ভারতে খুবই আশাপ্রদ ছিল। বেঙ্গল আর্মির বেশির ভাগই তখন বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে এবং পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত অন্যান্য বাহিনীগুলিতেও বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছিল। উত্তর-ভারতের একটা বড় অংশে ব্রিটিশ-শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, আর অন্যান্য স্থানেও প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। ইংরেজরা সর্বত্র আতঙ্কগ্রস্ত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখন তাদের খুবই নৈরাশ্য। ভারতে বন্ধু বলতে তাদের কেউই নেই। শিখ ও পাঠানরাও অন্যান্যদের মতোই ব্রিটিশ-বিরোধী; তারা বিদ্রোহী-ভারতের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে যাচ্ছে, আর অপেক্ষা করছে।

দিল্লির প্রাঙ্গণে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ ছিল না। জুলাই মাসের প্রথমদিকে তাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে কেই লিখেছেন: "প্রতিটি জয় আমাদের অত্যধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হচ্ছিল এবং আমাদের লক্ষ্য দিল্লি অধিকার করার বিষয়ে আমরা একেবারেই অগ্রসর হচ্ছিলাম না। প্রতিদিনই আমরা উপলব্ধি করতে পারছিলাম যে, বিদ্রোহীদের কামানের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম। তাদের কামানের গোলা আমাদের ওপর এসে পৌছত, কিন্তু আমরা তাদের কাছে একেবারেই পৌছতে পারতাম না। তাদের কামানগুলি আমাদের কামানের চেয়ে অনেক বেশি ভারি ছিল, আর তাদের গোলা আমাদের চেয়ে বেশি দূরে পৌছত এবং অনেক সময়ই তা ধ্বংসাত্মক নিশ্চয়তার সঙ্গে কাজ করত।...আমরা ঐ কামানগুলিকে নিস্তব্ধ করে দিতে পারিনি।..আমাদের গোলাবারুদ যখন শূন্যের কোঠায় এসে পৌছচ্ছে, তখন বিদ্রোহীদের শহরে মজুত গোলাবারুদ এত পর্যাপ্ত যে তারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় যতই ব্যবহার করুক না কেন, তাতে তাদের কিছুই আসত যেত না।"[৩]

এরকম একটা শুভ মুহূর্তে জেনারেল বখত খান দিল্লিতে পদার্পণ করলেন এবং দিল্লি তথা ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর এখন প্রধান কর্তব্য হলো এইসব অনুকূল শক্তিগুলিকে সংযোজন করে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া। দিল্লিতে বিদ্রোহীদের প্রথা অনুযায়ী বেরিলি বাহিনীর আগমনের পরদিন, ৩রা জুলাই তাদের শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। বখত খান

২. Forrest: *State Papers*, vol. I, p. 449
৩ Kaye: vol. II, p. 548

ঠিক করলেন, আলিপুর দখল করে সেখানে ইংরেজদের পাঞ্জাবের সঙ্গে প্রধান গমনাগমনের পথ কেটে দেবেন। পাঁচ-ছয় হাজার সিপাহি ও কয়েকটি কামান নিয়ে তিনি বিনা বাধায় আলিপুর দখল করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রত্যুষে বখত খান তাঁর দলবল নিয়ে আবার দিল্লিতে ফিরে গেলেন।

বখত খানের এই চালে ইংরেজরা যে কতখানি বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। নর্মানের সামরিক রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, "বিদ্রোহীরা রাত্রে আলিপুর লুঠ করার পর যে কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তা আমরা একেবারেই বুঝতে পারলাম না। তারা কি সোজা রাই ও লাডসৌলির দিকে গেল, না দিল্লিতে ফিরে গেল? আমাদের সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম এই ভেবে যে, তারা হয়তো কর্নালের দিকে, নতুবা ভারতীয়দের পাহারায় আমাদের যে ধনভাণ্ডার আসছিল, তা কর্নাল ও দিল্লির মাঝামাঝি কোনো জায়গায় হস্তগত করবার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে।[৪]

গুপ্তচর মারফত ও যারা ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে সিপাহিরা ইংরেজের দুর্বলতার কথা সঠিকভাবে জানতে পেরেছিল। তাই তারা তাদের কৌশলও বদলে ফেলল। তারা ঠিক করল, এখন থেকে তারা ইংরেজের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ একই সময়ে আক্রমণ করবে। তাদের বর্তমান সংখ্যাধিক্য এই কৌশল কার্যে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হতো। তাছাড়া দিল্লি থেকে কর্নাল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বিদ্রোহী জনসাধারণ, বিশেষ করে গুজাররা, ইংরেজদের সব সময়ই হয়রান করছিল। এইসব বিদ্রোহীদের সাহায্যে কর্নাল পর্যন্ত যে-কোনো স্থানে ইংরেজকে আক্রমণ করে পাঞ্জাবের সঙ্গে তাদের গমনাগমনের পথ কেটে দেওয়া ও ইংরেজ-শিবিরকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পঙ্গু করে দেওয়া, আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত দিল্লির সিপাহিদের পক্ষে কঠিন ছিল না। এরকম একটা পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যেই জেনারেল বখত খান ৩রা জুলাই সদলবলে সুসজ্জিত হয়ে দিল্লি থেকে বেশ একটা শুভ মুহূর্তে বেরিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে এই কর্তব্য সমাধান করা কিছুই শক্ত হতো না। কিন্তু কোনো স্থানে ইংরেজকে কোনো রকমেই আক্রমণ না করে তিনি কি কারণে দিল্লিতে ফিরে গেলেন, তা মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে একটা বড় রহস্যই থেকে যাবে। এর ফলে বখত খান শুধু যে নিজের নেতৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার একটা সুবর্ণ সুযোগ হারালেন তাই নয়, এতে আরো প্রমাণ হয়ে গেল, বাহাদুর শাহ, সিপাহিরা ও জনসাধারণ তাঁর ওপর যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তার যোগ্য তিনি নন।

৪ঠা জুলাই-এর ব্যর্থতার পর বিদ্রোহীরা আবার পাথরের দেওয়ালে কপাল-

৪. Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 450

ঢোকার পুরনো নীতি গ্রহণ করে ৯ই ও ১৪ই জুলাইতে পুনরায় হিন্দুরাও-এর বাড়ি আক্রমণ করল। পূর্বের মতোই নিজেদের জীবনের মায়া সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ডভাবে তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই দুটি আক্রমণের ফলে ইংরেজ শিবিরের অবস্থান আবার কেঁপে উঠল—আবার তাদের নতুন করে সংকট দেখা দিল। এই দু'দিনই ইংরেজদের প্রচুর হতাহত হলো।

জেনারেল রীড গভর্নর জেনারেলকে তাঁর রিপোর্টে লিখলেন: "আমি আপনাকে অতি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের ক্ষতি অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়েছে, যা আপনি এর সঙ্গেই বিবরণ থেকে দেখতে পাবেন এবং আমি আরো গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল চেম্বারলেন অতি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।"[৫] ৯ই জুলাই ইংরেজদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ২২৩ জন এবং ১৪ই তারিখে ১৬ জন অফিসার সহ ২০০ জনেরও বেশি—দু'দিনে প্রায় ৪৫০ জন; সমগ্র বাহিনীর তুলনায় এটাও যে বেশ বড় একটা সংখ্যা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতীয়দেরও ক্ষতি কম হলো না। ইংরেজদের মতে বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যা ছিল—১৪ই জুলাইতে ১ হাজার।[৬] অর্থাৎ একজন ব্রিটিশ সৈন্য ৫ জন ভারতীয়ের সমান। যাহোক, মহাবিদ্রোহের সময় সাধারণত প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই ভারতীয়দের হতাহত যে বেশি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ থেকে একটা বিষয় অন্তত প্রমাণ হয় যে, ভারতবাসীরা সেদিন এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিল যে, শস্তায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যায় না, তার জন্যে উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে।

সিপাহিদের এই তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে ইংরেজ-শিবিরের প্রতিটি সৈন্যকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল এবং পূর্বের মতোই গুর্খা, পাঠান ও শিখ ভাড়াটিয়াদেরই এই বেগ সামলাতে হয়েছিল।[৭] এই যুদ্ধেও ইংরেজ সৈন্যদের ভূমিকা সম্বন্ধে কেই মন্তব্য করেছেন—"এই যুদ্ধ এমন ধরনের যুদ্ধ যা ইংরেজদের নিকট খুবই অরুচিকর এবং তাদের পক্ষে খুবই ধ্বংসমূলক।" ইংরেজ অশ্বারোহীরা অনেকেই পালিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছিল। ইংরেজদের একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক, অ্যাডজুট্যান্ট-জেনারেল চেম্বারলেন এবং তাদের কোয়ার্টার মাস্টার-জেনারেল বেচার এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন।

৯ই তারিখের যুদ্ধে সিপাহিরা বখত খানের নেতৃত্বে মাউণ্ড-ব্যাটারি দখল করেছিল। একদল ইংরেজ অশ্বারোহী ও পদাতিক ১৩টি ১৮-পাউণ্ডার কামান

৫. Forrest: *State Papers*, vol. I, p. 321
৬. *Ibid*, p. 456
৭. Kaye: vol. II, p. 582

নিয়ে এই ব্যাটারি রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাদের দক্ষিণ পাশে ছিল একদল ভারতীয়। বিদ্রোহীদের তীব্র আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ করতে না পেরে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের পিছনে আশ্রয় নিল। বিদ্রোহীরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে বারবার ভারতীয়দের আহ্বান জানিয়েছিল। "কিন্তু তা সত্ত্বেও নেটিভ গোলন্দাজগুলো আশ্চর্যরকম ভালো ব্যবহার করেছিল এবং তাদের পিছনকার ইংরেজদের ডেকে বলছিল তাদের মধ্য দিয়েই বিদ্রোহীদের ওপর গুলি করতে।"[৮]

ইংরেজরা এসব যুদ্ধে কিরকম বীরত্ব দেখাত তার দু'একটি নমুনা দিলেই বোঝা যাবে। যেমন, ৯ই জুলাই ফাগান নামক বীরপুঙ্গব যে মুহূর্তে শুনতে পেল বিদ্রোহীরা আক্রমণ করেছে, "সেই মুহূর্তে সে কেবলমাত্র একটা কলম হাতে করে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল এবং কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ১৫ জন শত্রুকে বধ করল এবং একজন বিদ্রোহী রিসালদারকে হত্যা করে তার তলোয়ার আর বন্দুকটি নিয়ে চলে এলো।"[৯] ইংরেজের ঔপনিবেশিক বীরত্বের এই কাহিনীটি একজন বেনামি ইংরেজ অফিসার, "যিনি দিল্লিতে যুদ্ধ করেছিলেন" তাঁর 'হিস্ট্রি অব দি সিজ অব দিল্লি'তে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইতিহাসবিদ কেই-ও বিনা দ্বিধায় গল্পটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তারপরেই কেই এই যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা একেবারে অন্যরূপ। সবজিমণ্ডিতে একজন সিপাহি হিল নামে একটি অশ্বারোহীকে আক্রমণ করে তার ঘোড়া সহ তাকে ভূতলশায়ী করে দেয়। হিল আবার উঠে দাঁড়ায় ও সিপা'হটির সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে। হিলকে আবার মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে যে মুহূর্তে সিপাহিটি তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে ইংরেজ গোলন্দাজদের নায়ক মেজর টোম্বস্ সিপা'হটিকে গুলী করে মেরে ফেলল। টোম্বস্ যখন আরো দু'জন ইংরেজের সাহায্যে আহত হিলকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় সে ভয়ে বিহ্বল হয়ে দেখল যে, আর একজন সিপাহি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও দেখতে দেখতে একজনকে বধ করে আর একজনকে জখম করে ফেলেছে। ঠিক সেইসময় এই সিপাহিটিও একটা গুলীর আঘাতে নিহত হলো। এই যুদ্ধে বীরত্ব দেখাবার জন্যে টোম্বস্ ও হিল উভয়েই 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' পেয়ে সম্মানিত হয়েছিল, কিন্তু যে দুটি সিপাহি দেশের স্বাধীনতার জন্যে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল তারা অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

ইংরেজের ঔপনিবেশিক বীরত্বের আর একটি উদাহরণ: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বখত খানের আক্রমণের ফলে ইংরেজ অশ্বারোহীরা পলায়ন

৮. Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 453

৯. Kaye : vol. II, p. 541

করেছিল। তারা শিবিরে ফিরে আসার পর "কোনো প্রকৃত শত্রুর অভাবে এক-দল নিরীহ ভৃত্য, খানসামা, মেথর প্রভৃতি যারা গির্জার এক কোণে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল, তাদের খুন করে ফেলল। এইসব ভৃত্যদের প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা ও প্রতিদিনকার ধৈর্যপূর্ণ যত্ন ও সেবা—এসব কিছুই সেদিনকার শাদা সৈন্যদের কালা-আদমির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার আগুন নির্বাপিত করতে পারল না।"[১০] এ সম্পর্কে 'সিজ অব দিল্লি'র বেনামি লেখক এক ইংরেজ অফিসারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য: এই যুদ্ধ "আমাদের লোকদের এতই পাশবিক করে ফেলেছিল যে, তারা একটা অতি নগণ্য পশুর চেয়েও একজন নেটিভের জীবনকে হেয় মনে করত। আমাদের অফিসাররাও তাঁদের কাজের দ্বারা অথবা আদেশের দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন নি।"[১১]

বস্তুত, ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজের যে জাতি-বিদ্বেষ সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রথম থেকে তাদের চরিত্রে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা এখন আরো প্রবলতরভাবে চতুর্দিকে প্রকাশ পেতে লাগল। অধিকন্তু এসব সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজরা দু'তিন পুরুষ ধরে একশ্রেণীর 'নেটিভ'দের দাসসুলভ মনোভাব, কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, ভারতীয়দের বিদ্রোহ করার ঔদ্ধত্য দেখে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর, তারা কেবলমাত্র বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত হলো না। ইংরেজ বীরপুরুষরা ভেবেছিল যে, তাদের সব শাদামুখ দেখামাত্রই বিদ্রোহীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তা তো তারা করলই না, বরং উল্টে তারা বারবার ইংরেজ প্রভুদের উগ্রভাবে প্রহার করতে লাগল! ভারতীয়দের এরূপ ব্যবহার তাদের নিকট যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই অসহ্য। তাই প্রকৃত শত্রুকে ধারে-কাছে না পেয়ে তারা নির্দোষ ও নিরীহদের ওপরই প্রতিশোধ বেশি করে নিত।

যাহোক, ২৩শে জুন এবং ৯ই ও ১০ই জুলাইতে বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা এতই সংকটজনক হয়ে পড়ল যে, বিদ্রোহীদের পুনরায় কোনো আক্রমণ তারা আর সহ্য করতে পারবে কিনা, এই সমস্যা সেনানায়ক-দের সামনে খুব বড় হয়ে দেখা দিল।

জুলাই-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরেজদের সমর-পরিষদের ঘন ঘন অধিবেশন হচ্ছিল এবং দিল্লির ওপর শেষ আক্রমণের দিনও অনেকবার স্থির হয়ে ছিল। কিন্তু বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তাদের দিল্লি আক্রমণের প্ল্যান স্থগিত রাখতে হলো।

এদিকে লর্ড ক্যানিং-এর দপ্তর থেকে ১৪ই জুলাই, দিল্লির ইংরেজ বাহিনীকে

১০. *Ibid*, p. 581

১১. *Ibid*, p. 206

জরুরিভাবে জানানো হলো "সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এখনো বিস্তারলাভ করছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদ্রোহীদের পরাজিত করে দিল্লিতে ব্রিটিশ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা সকলকে জানাতে পারা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংক্রামক ব্যাধির মতো বিদ্রোহ আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়াটাই খুব সম্ভব। সামরিক গতিবিধির পক্ষে সময় সবচেয়ে মূল্যবান; বর্তমান ক্ষেত্রে যে এর একটি রাজনৈতিক মূল্যও আছে, সে সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা চলে না। মুসলমান সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র দিল্লিতে যে এতদিন ধরে এই সরকারেরই বিদ্রোহী সিপাহি ও জনসাধারণ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এই ঘটনাটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে তুলেছে।"[১২]

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ-শিবিরের সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল। জেনারেল এন্‌সনের মতো জেনারেল বার্নার্ডেরও কলেরায় মৃত্যু হলো। জেনারেল রীড তখন কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই দিল্লির যুদ্ধের ভয়ংকর রূপ দেখে তিনি ১৭ই জুলাই জেনারেল আর্কডেল উইলসনের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলেন।

২৩শে জুনের পলাশি-যুদ্ধের শতবার্ষিকী দিনের যুদ্ধের পর থেকে লাহোরে ও দিল্লির ইংরেজ-শিবিরে অনেক উচ্চস্থানীয় লোক বলতে লাগলেন যে, তাঁদের পক্ষে আপাতত দিল্লির শিবির পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাওয়াই উচিত। ৯ই ও ১৪ই জুলাই-এর আক্রমণের পর এই মত আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। উইলসন যেদিন সেনানায়ক হলেন, তার পরদিনই তিনি জন লরেন্সকে ফরাসি ভাষায় লিখলেন: "আমার যথাসত্বর ও যত বড় সম্ভব নতুন সৈন্যবাহিনী দ্বারা বলীয়ান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। যদি শীঘ্র আমি নতুন সৈন্য না পাই, তাহলে কর্নালে আমি সরে যেতে বাধ্য হব। কিন্তু এরূপ পদক্ষেপের পরিণাম খুবই শোচনীয় হবে।"[১৩]

১৭ই জুলাই দিল্লিতে ঝান্সি বাহিনী এসে পৌঁছল এবং পরের দিনই তারা ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করল। ঠিক ছিল যে, বিদ্রোহীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল যাবে আলিপুরে ইংরেজের নতুন সৈন্যদলকে আক্রমণ করতে, অন্য দলটি সবজিমণ্ডি থেকে ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করবে। যে কোনো কারণেই হোক, আলিপুরে আক্রমণ একেবারেই হলো না।[১৪] টিলার নিচেই অনেকক্ষণ

১২. Forrest : *State Papers*, vol. I, p.324

১৩. Kaye : vol. II, p. 589

১৪. একজন গুপ্তচরের সংবাদে জানা যায় যে, আলিপুরে যাবার জন্য বিদ্রোহীরা বাঘপথের সেতু মেরামত করতে শুরু করে। কিন্তু তার পূর্বেই এত বৃষ্টি হয়েছিল যে, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিদ্রোহীরা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে।

ধরে ভয়ানক ভাবে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধের পরই উইলসন সন্ধ্যার সময় কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করলেন: "আবার একটা ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গেল। যদিও সিপাহিরা হেরে গিয়েছে, তবু আমাদের ক্ষতিও প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। ..আমাদের বাহিনী খুবই একটা সংকটজনক অবস্থার মধ্যে আছে।"[১৫] ইংরেজদের ওপর এটা ২১-তম আক্রমণ। টিলার দক্ষিণে আত্মরক্ষী কামানের ব্যাটারিগুলি রক্ষা করা ইংরেজদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নবাগত শিখ গোলন্দাজ-দের দ্বারা এই ব্যাটারিগুলি সুদৃঢ় করা হয় এবং তাদেরই দ্বারা এগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। এদিনকার যুদ্ধের পর ইংরেজ মাইনার্স ও স্যাপার্সরা সবজি-মণ্ডির সমস্ত বাড়িগুলি ধূলিসাৎ করে দেয়, যাতে করে বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণের জন্যে এই বাড়িগুলি আর ব্যবহার করতে না পারে।

ঠিক এইসময় দিল্লিতে সঠিক খবর পৌঁছল যে, একটা বিরাট নতুন ব্রিটিশ বাহিনী কর্নালে পৌঁছে গিয়েছে এবং অনেক কামান গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একটা 'সিজ ট্রেন' তাদের পিছনে পিছনে আসছে।[১৬] এদের আগমনের জন্যে ইংরেজরা বাঘপথের সেতু, যা বিদ্রোহীরা ভেঙে দিয়েছিল, মেরামত করেছে। এই সেতু অবার ভেঙে দেবার জন্যে একদল সিপাহিকে পাঠানো হলো। ইংরেজকে বাধা দেবার জন্যে আর একদলকে পাঠানো হলো আলিপুরে।

জীবনলালের ডায়েরিতে ২০শে জুলাই লেখা হলো: "একদল স্যাপার্স (শিখ) ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে দিল্লিতে এসেছে। তাদের অফিসাররা দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রিপোর্ট করলেন যে, ইংরেজ-শিবিরে এখন ৬ হাজার সৈন্য আছে। দিল্লির সমস্ত সিপাহিরা যদি একত্র হয়ে তাদের আক্রমণ করে, তাহলে বাদশাহ খুব সম্ভব বিজয়ী হবেন; আর যদি বিলম্ব করা হয় তাহলে ইংরেজদের এত নতুন সৈন্য এসে যাবে যে, বাদশাহের সৈন্যরা আর তাদের হারাতে পারবে না।"[১৭]

এই ঘটনার দু'দিন পর বখত খান মির্জা মোগলের সঙ্গে দেখা করলেন ও "তাঁকে বললেন, সমগ্র বাহিনীর একটা সাধারণ প্যারেডের হুকুম দিতে হবে। ...সেখানে প্রত্যেক সিপাহিকে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, তারা শেষ পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়বে। আর যারা যুদ্ধ করতে রাজী নয়, তাদের দেশে ফিরে যেতে বলা হবে।"[১৮] এর আরো ৩-৪ দিন পর বখত খানের অনুরোধে বাহাদুর শাহ

---

১৫. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, part I, p. 226
১৬. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 162
১৭. *Ibid*. p. 156
১৮. *Ibid*, p 162.

মির্জা মোগলকে গভর্নরের উপাধিতে ভূষিত করলেন। বখত খান আরো প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জওয়ান বখতকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে।[১৯]

যখন এইভাবে নতুন উদ্যমে আবার ইংরেজের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল, সেইসময় ৩১শে জুলাই নিমখ-বাহিনী দিল্লি পৌঁছল। শক্তিশালী নিমখ বাহিনীর আগমন বেরিলি বাহিনীর আগমনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। নাসিরাবাদ ও বেরিলি বাহিনী তাদের সঙ্গে ৬টি করে কামান এনেছিল, আর নিমখ বাহিনী আনল ৯টি। এত বড় একটা অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর আগমনে স্বভাবতই বিদ্রোহীদের উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল।

১লা আগস্ট বকর-ঈদের দিন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান সিপাহি 'হয়-মারবো নয়-মরবো' এই শপথ গ্রহণ করে ১০-১২টি কামান সঙ্গে করে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, নজফগড়ের ঝিল পার হয়ে ইংরেজ-শিবিরের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করা। সেতু তৈরি করবার সবকিছু জিনিসপত্রও তারা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। সিপাহিরা যে একটা অত্যন্ত কঠিন ও সাহসিক কাজের ভার নিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পৌঁছতে হলে মাইলের পর মাইল বর্ষার জলে-ডোবা জমি পার হয়ে আসতে হবে। মানুষ হাঁটুভাঙা জল পার হয়ে যেতে পারলেও, কোনো কামান সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু সিপাহিরা এতেও নিরুৎসাহ হলো না। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও তারা সেতু তৈরি করে ফেলল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সেতু বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে গেল। এভাবে ব্যর্থ হয়ে মধ্যাহ্নে তাদের ফিরে আসতে হলো, কিন্তু তারা শহরে ফিরে গেল না। কিষেনগঞ্জ থেকে সন্ধ্যার দিকে টিলার দক্ষিণ অংশে ইংরেজদের আক্রমণ করল এবং "সমস্ত রাত ধরে কামান আর বন্দুকের গর্জন অনবরত চলতে লাগল।" তার পরদিনও বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমানে যুদ্ধ চলল।

এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ফরেস্ট লিখেছেন, "ধর্মের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে সিপাহিরা যখন আমাদের আক্রমণ করল .. আমাদের ব্যাটারি-কামানের গোলা তখন তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। বারবার তারা নিজেদের পুনর্গঠন করে আমাদের ব্যাটারিগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রতিবারই আমরা তাদের প্রতিহত করছিলাম। আগস্ট মাসের সে রাতে সমস্তক্ষণ ধরে বিরামহীনভাবে যুদ্ধ চলল; শহরের বুরুজগুলো থেকে অনবরত কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল এবং আমাদের কামানগুলিও যে জবাব পাঠাতে লাগল, তার আলোকে সমস্ত টিলা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ধর্মান্ধদের হুঙ্কারে ও গোলাগুলীর

১৯. *Ibid*, p. 167

শব্দে আকাশ ধ্বনিত হতে লাগল। সূর্যোদয় হলো, তবুও যুদ্ধ চলতে লাগল এবং মধ্যাহ্নের পর মরদের মতো যুদ্ধ করে, তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। তাদের ক্ষতি খুব বেশি হয়েছিল।"[২০] সামরিকভাবে সিপাহিদের ১লা ও ২রা আগস্টের আক্রমণ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছিল। বিদ্রোহীদের ক্ষতি যে পরিমাণ হয়েছিল, তার তুলনায় ইংরেজদের ক্ষতি হয়েছিল খুবই সামান্য।

এত আয়োজন ও আশার পর বকর-ঈদের দিনের আক্রমণের বিফলতায় দিল্লিতে সকলেই খুব নিরাশ হলো। বাহাদুর শাহও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি সব অফিসারদের ডেকে বললেন: "তোমরা যা-কিছু টাকা এনেছিলে, সবই খরচ করে ফেলেছ। রাজকোষ এখন একেবারে শূন্য, তাতে একটি পয়সাও নেই। আমি শুনতে পাচ্ছি যে, সিপাহিরা দিনের পর দিন তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমি এখন আর জয়ী হবার আশা করি না। আমার এখন ইচ্ছা যে, তোমরা সকলে শহর ছেড়ে অন্য কোনো কেন্দ্রে চলে যাও।"[২১] অফিসাররা সকলেই বাদশাহকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। বখত খান বোঝালেন যে, বৃষ্টি হবার ফলে সব জায়গা ভেসে গিয়েছিল এবং তার ফলে সিপাহিদের ফিরে আসতে হয়েছিল। সকলে মিলে বাদশাহকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁরা টিলা জয় করবেনই।

১লা ও ২রা আগস্টের আক্রমণ ব্যতীত ১৪ই জুলাই থেকে প্রায় আগস্টের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড়মাস ব্যাপী এই দীর্ঘকাল, একরকম নির্বিঘ্নেই কেটেছে। তারপর ভয়ংকর আক্রমণের ফলে জুলাই মাসের প্রথম ভাগে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থান এতই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, তাদের নায়করা দিল্লির ক্যাণ্টনমেণ্ট পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কুপার লিখেছিলেন—"১৪ই থেকে জুলাই-এর শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ একেবারে অনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল।"[২২] ২৭শে জুলাই, "দু'জন ভারতীয় গোলন্দাজ ইংরেজ-শিবির ছেড়ে চলে আসে। তারা এই বলে খবর দেয় যে, ইংরেজ-শিবিরে যুদ্ধ করার মতো খুবই কম সৈন্য আছে।"[২৩] ২৯শে জুলাই কয়েকজন শিখ ইংরেজ-শিবির থেকে এসে ইংরেজদের চরম দুরবস্থার সংবাদ দেয়।[২৪] বিদ্রোহীরা ইংরেজদের এই দুরবস্থার সংবাদ পেয়েও এরকম স্বর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল না।

বিদ্রোহীদের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে একদিকে যেমন ইংরেজরা তাদের

২০. *History of Indian Mutiny*, vol. I, p. 113
২১. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 178
২২. Cooper: *Crisis in the Punjab*, p. 201
২৩. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 169
২৪. *Ibid*, p. 172.

আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি সুদৃঢ় করে নিল এবং শত্রুদের আক্রমণের জন্তে নতুন সৈন্তবাহিনী গঠন করবার যথেষ্ট সময় পেল, অন্তদিকে তেমনি বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশৃংখলা আরো প্রকট হয়ে উঠল। যে জেনারেল উইলসন ১৪ই জুলাই-এর যুদ্ধের পর ক্যাণ্টনমেণ্ট পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেই জেনারেল উইলসনই তাঁর গুপ্তচরদের মারফৎ বিদ্রোহীদের দুর্বলতার সংবাদ পেয়ে জুলাই মাস শেষ হবার আগেই ক্যাণ্টনমেণ্ট আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা কলভিনকে ৩০শে জুলাইতে উইলসন দিল্লির ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে লিখলেন: "এখন এটা আমার দৃঢ় সংকল্প যে, বর্তমান অবস্থান আমি ধরে থাকবই এবং শত্রুর আক্রমণ শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করবই। শত্রুরা সংখ্যায় অগণিত এবং তাদের পক্ষে ব্যূহভেদ করে আমাদের অভিভূত করে ফেলাটাও অসম্ভব নয়; কিন্তু আমাদের বাহিনী স্বস্থানে দাঁড়িয়ে মরবার জন্তে প্রস্তুত। সৌভাগ্যবশত শত্রুদের না আছে মস্তিষ্ক, না আছে কৌশল। আর আমরা খবর পাচ্ছি যে, তাদের মধ্যে খুবই ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গিয়েছে।"[২৫]

বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্য ইংরেজদের আর ভয়ের কারণ হলো না; তারা জানত যে, যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের চেয়েও চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী প্রশ্ন হলো উপযুক্ত নেতৃত্ব। ইংরেজদের চরম দুরবস্থার সময় বিদ্রোহীদের যোগ্য নেতৃত্বের অভাব-টাই তাদের সবচেয়ে আশান্বিত করে তুলল। ইংরেজ নায়করা দেখতে পেল যে, সবল নেতৃত্বের অভাবেই বিদ্রোহীরা তাদের সংখ্যাধিক্য ও দুর্দমনীয় সাহস থাকা সত্ত্বেও পঙ্গু হয়ে আছে।

জুলাই ও আগস্ট মাসের মধ্যে এত ক্ষমতা, সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও বখত খান কোনো নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলেন না। তাছাড়া, তিনি যুদ্ধে কোনোরকম কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি বলে বিদ্রোহীদের মধ্যে তাঁর সম্মান অনেকখানি কমে গিয়েছিল। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখতে পাওয়া যায়, ২৯শে জুলাই-এর দরবারে "স্যাপার্সদের সুবাদার কাদির বক্স এক বক্তৃতায় অভিযোগ করলেন যে, বখত খান ইংরেজদের আক্রমণের ব্যাপারে খুবই অবহেলা করছেন। অনেকদিন হয়ে গেল তিনি সিপাহিদের নিয়ে যুদ্ধ করতে যাননি। ইংরেজরা এই সুযোগে সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম জোগাড় করে শহর আক্রমণের জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে। জেনারেল বখত শুনে খুব চটে গেলেন। কিন্তু বাদশাহ তাকে নিরস্ত করে বললেন সুবাদার ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু এই দরবারে কিছুই ঠিক হয়নি।"[২৬]

২৫. **Kaye: vol. II, p. 594**

২৬. **Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 171**

সময়মতো ও সঠিকভাবে বেতন না পাবার জন্যে এবং আরো নানা কারণে সিপাহিদের নিজেদের মধ্যেও দলাদলি বেড়ে যাচ্ছিল। অফিসাররা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করল, যার ফলে বিভিন্ন বাহিনীগুলির মধ্যেও ঝগড়া-বিবাদ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল ; শৃংখলা বলে আর কিছু রইল না।[২৭] ৩০শে জুলাই "বেরিলি ও নিমচ বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। জেনারেল জেনারেল বখত খান সেখানে গিয়ে একটা মিটমাট করে দিলেন।"[২৮]

এই অবস্থায় ইংরেজের দালালরাও খুব সক্রিয় হয়ে উঠল। ২৩শে জুলাই "মির্জা এলাহি বক্স বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে পরামর্শ দিলেন। বাদশাহ উত্তর দিলেন যে, এতে তাঁর কোনো হাত নেই, এবং তিনি তা করতে পারবেন না।"[২৯] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এলাহি বক্স, আসাদুল্লা প্রভৃতি নিয়মিতভাবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পরামর্শ পেত। এ সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইর আগ্রা থেকে ২৪শে আগস্ট জেনারেল হ্যাভলককে যে পত্র লেখেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখছেন : "গ্রেটহেড ১৭ই তারিখে মির্জা এলাহি বক্সের নিকট থেকে এক চিঠি পেয়েছেন ; তাতে তিনি জানতে চেয়েছেন, তিনি আমাদের জন্যে কি করতে পারেন।"[৩০]

২০শে আগস্ট এক গুপ্তচরের রিপোর্টে দেখা যায় : "গতকালের দরবারে মিরাট বাহিনী বাদশাহের নিকট অভিযোগ করে এবং জিজ্ঞাসা করে, কেন বখত খান ও লাল খানকে জেনারেল ও কর্নেল করা হয়েছে ? তাঁরা কখনোই যুদ্ধ করতে যাননি এবং যে অর্থ তাঁরা সঙ্গে এনেছেন তা তাঁরা রাজকোষে দেননি। আমরা যা কিছু এনেছিলাম সবই বাদশাহের হাতে তুলে দিয়েছি ; আমরা প্রতিবার ইংরেজকে আক্রমণ করেছি, যার ফলে আমাদের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে। এর পরিবর্তে আমরা কোনো বেতন পাচ্ছি না এবং তার ফলে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও খুব অভাব। আমাদের ইচ্ছা, আমরা প্রাসাদ ও শহর লুঠ করি, তারপর এমন একটা জায়গায় চলে যাই যেখানে আমরা খেতে পরতে পাবো। আপনি আপনার জেনারেল ও কর্নেলদের নিয়ে শহর রক্ষা করার

২৭. "বাদশাহ অনেক রাত পর্যন্ত দরবারে ছিলেন এবং দিল্লি ও মিরাট বাহিনীর অবাধ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন।" (Metcuff : *Two Native Narratives*; p. 155)

২৮. *Ibid*, p. 174

২৯. *Ibid*, p. 164

৩০. *Intelligence Department Report*, vol. II, p. 142

চেষ্টা করুন। বাদশাহ উত্তর দিলেন যে, এত ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়; তাদের কর্তব্য হচ্ছে টিলা দখল করা। কিন্তু সিপাহিরা খুবই রাগান্বিত ও উদ্ধতভাবে কথা বলল। বখত খান ও মির্জা মোগল পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। সিপাহিরা কোনো হুকুমই মানে না। ইংরেজের ওপর আক্রমণ-পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু সিপাহিরা সেগুলি কার্যকরী করতে অস্বীকার করে। যারা আক্রমণ করবার জন্যে যায়, তারাও এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে রাতে শহরে ফিরে আসে।…বস্তুত বিদ্রোহীরা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছে। একদিন তারা সদলবলে দিল্লি ছেড়ে চলে যাবে। বিদ্রোহীদের সংগঠন দ্রুত ভেঙে পড়ছে। বর্তমানে টাকা ও গোলাবারুদের খুবই অভাব।…বিদ্রোহীদের সংখ্যা ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যোদ্ধা খুবই কম আছে।"[৩১]

৩১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, part I, pp.407-8

নেতৃত্বহীন দিল্লি

ইংরেজ বাহিনী যখন আম্বালা ও মিরাট থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন তারা এই সংকল্প নিয়ে এসেছিল যে, দিল্লি পৌছানো মাত্রই তারা শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে অনেকেই জন লরেন্সের কথায় বিশ্বাস করে ধরে নিয়েছিল যে, দিল্লিতে শাদামুখের আবির্ভাব হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহী গুণ্ডা বদমাশরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। ৮ই জুন তারিখে দিল্লির ক্যাণ্টনমেণ্ট ও টিলা দখল করেই ইংরেজরা খুব আশান্বিতভাবে চিন্তা করতে লাগল কিভাবে এবার তারা তাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবে। তাদের আশান্বিত হবার আরো একটা কারণ, এই সময়ে তাদের সংখ্যা দিল্লির বিদ্রোহী সিপাহিদের চেয়ে বেশি ছিল।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজের এই অতিপ্রিয় পরিকল্পনাটি ভেস্তে গেল—অবশ্য তাদের নিজেদের দোষে নয়, সিপাহিদের রণদক্ষতার জন্যে। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ইংরেজকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে বিদ্রোহীরা সংখ্যালঘু হয়েও ইংরেজদের একদিনের জন্যেও বিশ্রাম করার অবসর না দিয়ে বেপরোয়াভাবে তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। ইংরেজরা এসেছিল বিদ্রোহী দিল্লিকে অবরোধ করে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে ; কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারল যে,তারা নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ৯ই জুন তারিখে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ডভাবে হিন্দুরাও-এর বাড়ি আক্রমণ করল। সিপাহিরা বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজদের হঠাতে হলে হিন্দুরাও-এর বাড়ি দখল করতে হবে। তাই তারা আবার ১০ই জুন ও ১১ই জুন ঐ বাড়ি আক্রমণ করল।

১০ই জুনের যুদ্ধের একটি ঘটনা : "যখন গুর্খারা অগ্রসর হচ্ছিল, তখন বিদ্রোহীরা তাদের চেঁচিয়ে বলল যে, তারা গুর্খাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তারা যেন গুলী না ছোঁড়ে। কয়েকজন বিদ্রোহী বলল : 'আমরা আশা করি গুর্খারা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, আমরা তাদের গুলী করব না'। গুর্খারা উত্তর করল : 'হাঁ, আমরা আসছি, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব'। এইভাবে গুর্খারা বিদ্রোহীদের চেয়ে মাত্র কুড়ি পা পর্যন্ত অগ্রসর হলো, তারপর হঠাৎ গুলী করে ২০-৩০ জনকে মেরে ফেলল।" (Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 294)

ইংরেজ বাহিনীর অভিযান শুরু হবার পরই বাহাদুর শাহ দিল্লি রক্ষা করার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। "সমস্ত বুরুজগুলিতে লোক মোতায়েন হলো, এবং সিপাহিরা সর্বত্র তাদের স্ব-স্ব স্থানে তৈরি হয়ে থাকল।...এইসব

জায়গায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ সরবরাহ হতে লাগল।"[১] জুন মাসের প্রথম দিকেই জেনারেল সামুদ খানকে বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো। মে মাসে দিল্লিতে বিদ্রোহীদের মধ্যে গোলন্দাজদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বারুদখানার লস্করদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাদের ভালো গোলন্দাজ করে নেওয়া হলো। সাহসী ও যোগ্য সিপাহিদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হলো। অনেক বিদ্রোহী প্রথম থেকেই কর্মতৎপরতা দেখাতে লাগল। "কুলি খান ছিল ইংরেজ বাহিনীতে মাসিক ২৮ টাকা বেতনের একজন সাধারণ গোলন্দাজ। সমস্ত দিন ইংরেজের ওপর কামান চালিয়ে সে খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিল। সমস্ত শহর তার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল। বাদশাহ এই লোকটির দুঃসাহসের পরিচয় পেয়ে এত খুশি হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ১০০ মণ বারুদ তৈরি করবার হুকুম দিলেন।"[২]

এ সম্পর্কে ফরেস্ট ও নর্মান কিছু তথ্য রেখে গেছেন। দিল্লির শিবির থেকে যে রিপোর্ট ১৩ই জুন গভর্নর-জেনারেলকে পাঠানো হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল : "বিদ্রোহীরা কতকগুলি দুর্ধর্ষ কামান দাঁড় করিয়েছে। কামান ব্যবহার করার কাজেও তারা খুব দক্ষতা দেখাচ্ছে এবং সব সময়েই গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে" (Forrest : *State Papers*, vol.I, p. 283)। আর নর্মান তাঁর 'ন্যারেটিভ'-এ বলেছেন "অবরোধের প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের মাত্র এক কোম্পানি গোলন্দাজ ছিল, কিন্তু যেসব গোলন্দাজ ছুটিতে ছিল তাদের দলে নিয়েই হোক, অথবা বারুদখানার প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিমান লস্করদের শিখিয়ে নিয়েই হোক, কিংবা উভয় পন্থার দ্বারাই হোক, আমাদের দিল্লিতে আসার প্রথম দিন থেকেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বিদ্রোহীদের অনেকগুলি কামান চালাবার মতো শিক্ষিত গোলন্দাজের অভাব নেই।" (*Ibid*, p. 439)

রোটকে বিদ্রোহ করে দু'তিন শত সিপাহি ১১ই জুন দিল্লিতে এসে পৌছল; ইংরেজকে আক্রমণ করার জন্যে তাদেরই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। প্ল্যান করা হলো, ১২ই তারিখে ইংরেজ শিবির দু'দিক থেকে একই সঙ্গে আক্রমণ করা হবে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, বিদ্রোহীরা যুগপৎ আক্রমণ করল না, তাদের দুটি শাখা বিভিন্ন সময়ে শত্রুকে আক্রমণ করল।[৩] এ সম্পর্কে ফরেস্ট বলে গেছেন : "ফ্ল্যাগ-স্টাফ টাওয়ারে আর হিন্দুরাও-এর বাড়ির ওপর বিদ্রোহীরা যে একই সময়ে আক্রমণ করবার কথা ভেবেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১. **Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 117**
২. ***Ibid*. p. 120**
৩. ***History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 85**

কিন্তু আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই দুটি আক্রমণ বিভিন্ন সময়ে ঘটেছিল।"[8]

জেনারেল সামুদ খান ১,৮০০ লোক ও ১২টি কামান নিয়ে কাশ্মীর-গেট দিয়ে বেরিয়ে ইংরেজদের তাদের শিবিরের পার্শ্বস্থিত টিলার উপর ফ্ল্যাগ-স্টাফ টাওয়ারে আক্রমণ করেছিলেন। কাশ্মীর-গেট দিয়ে এই আক্রমণ এতই আকস্মিক হয়েছিল যে, ইংরেজরা এই আঘাতের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এই আক্রমণ সম্বন্ধে নর্মান তাঁর সরকারি রিপোর্টে লিখেছিলেন: "যমুনা ও মেটকাফ হাউসের মধ্যবর্তী খাদগুলিতে আত্মগোপন করে প্রচুর সংখ্যক সিপাহি প্রত্যুষে আমাদের হঠাৎ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল এবং ফ্ল্যাগ-স্টাফ টাওয়ারের বাম দিকে অবস্থিত টিলার উপর একটা উঁচু জায়গা অধিকার করেছিল। তাদের গুলী চলছিল ঘন ঘন ও তীব্র বেগে। বহু গুলী এসে আমাদের শিবিরের ভিতরেও পড়ছিল; এমনকি কয়েকজন শত্রু টিলা থেকে শিবিরের দিকে অবতরণও করেছিল।"[৫] ইংরেজরা কোনোমতে আত্মরক্ষা করতে লাগল।

এইভাবে খানিকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সামুদ খান সিপাহিদের ফিরে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু যে সময়ে সামুদ খানের সিপাহিরা ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে সিপাহিদের অন্য দলটি হিন্দুরাও-এর বাড়ি আক্রমণ করা শুরু করল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারাও ফিরে গেল। বিদ্রোহীরা যদি একই সময়ে ইংরেজ শিবিরের দুই দিকে আক্রমণ করত, তাহলে ইংরেজদের তখন যে পরিমাণ সৈন্য ছিল তা দিয়ে দু'দিকে আত্মরক্ষা করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হতো। বিদ্রোহীদের বারংবার আক্রমণের ফলে ইংরেজ বাহিনী তখন কিরকম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, সে সম্বন্ধে নর্মান লিখেছিলেন: "আমাদের অর্ধেক সৈন্যকে সব সময় চারদিকে পাহারার কাজে থাকতে হতো। যখনই শত্রুর আক্রমণ হতো, তখনই মাত্র কয়েকজনকে রিজার্ভ রেখে আর সব সৈন্যকেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে যুদ্ধে নামতে হতো।"[৬]

বারবার বিদ্রোহীদের এরূপ আক্রমণে আর একটি ফল হচ্ছিল, ইংরেজ শিবিরে যেসব ভারতীয় সৈন্য ছিল, যাদের রাজভক্তির ওপর ইংরেজরা কোনো সময়েই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি, তারা অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়ছিল।

১২ই তারিখে যখন বিদ্রোহীরা হিন্দুরাও-এর বাড়ি আক্রমণ করে, তখন ইংরেজদের একদল ইরেগুলার অশ্বারোহী তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। গুর্খা বাহিনীর নায়ক রীড বলেন: "যাদের রাজভক্তিতে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম,

৪. Forrest : *State Papers*, vol. I, p, 440
৫. Metcuff : *Two Native Narratives*, p. 117
৬. Forrest : *State Papers*, vol. I, p. 442

তারা শত্রুর সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়।" যেন তারা শত্রুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে এইভাবে তারা এগিয়ে চলল। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা শত্রুর সম্মুখীন হলো, আমি আতঙ্কিতভাবে দেখলাম তারা শত্রুর সঙ্গে একেবারে মিশে গেল।"[৭]

৬০-তম বাহিনী রোটকে যখন বিদ্রোহ করে দিল্লি চলে যায়, তখন তাদের সিপাহি-অফিসাররা ইংরেজের সঙ্গেই থেকে যায় ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে ইংরেজ শিবিরে আসে। ১২ই তারিখের যুদ্ধে এইসব ভারতীয় অফিসার-রাও ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়। ১৫ই জুন যখন বিদ্রোহীরা আবার ইংরেজদের আক্রমণ করে, তখন এইসব অফিসারদের একজন—সর্দার বাহাদুরকে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। ঐদিনকার যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক, এই ব্যর্থতার ফলে বাহাদুর শাহ খুবই ক্ষুব্ধ হলেন এবং 'সামুদ খানকে ভর্ৎসনা করলেন'।[৮]

ব্রিটিশ সরকার যেমন বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতে সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে দিল্লি পুনর্দখল করা তাদের পক্ষে আশু কর্তব্য, তেমন বাহাদুর শাহ এবং অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে বিদ্রোহের প্রসারের জন্যে ও বিদ্রোহীদের আত্মবিশ্বাস বলবৎ রাখার জন্যে একটা বড় রকমের যুদ্ধে ইংরেজকে যথাসত্বর সম্ভব পরাজিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করে পাঞ্জাব তখন একটা অতি সংকটময় অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এবং একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সকল ভারতবাসী দিল্লির দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। সেই সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, যখন ইংরেজ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ এই বিরাট ভূখণ্ডে টলটলায়মান, ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের একটা প্রধান বিজয় দোদুল্যমান প্রদেশগুলিকে বিদ্রোহের দিকে দ্রুত অগ্রসর করে দিয়ে বিদ্রোহী-ভারতের চূড়ান্ত বিজয়কে সুনিশ্চিত করে দিতে পারত। তাই বাহাদুর শাহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে টিলা আক্রমণ করে ইংরেজদের শিবির থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে বরাবর সিপাহি নেতাদের তাগিদ দিচ্ছিলেন।

১৫ই জুন একবার ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করার পর বিদ্রোহীরা আবার ১৭ই তারিখে ভয়ংকরভাবে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদিকে ইংরেজদের যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে বিদ্রোহীরা হিন্দুরাও-এর বাড়ির নিকট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঈদগা নামে একটা পুরনো মসজিদে একটা কামানের ব্যাটারি তৈরি করবার চেষ্টা করছিল। এই দুঃসাহসিক কাজে যদি বিদ্রোহীরা সফল হতো, তাহলে

৭. Kaye: *History of the Sepoy War in India*, vol. II, p. 546

৮. Metcuff: *Two Native Narratives*, p. 121

ইংরেজরা খুবই বিপদগ্রস্ত হতো, কারণ তাতে ইংরেজ শিবিরের দক্ষিণ ও পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করা বিদ্রোহীদের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়ত। বিদ্রোহীদের এই পরিকল্পনা টের পাওয়া মাত্র ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ তাদের সমস্ত শক্তি ঐখানে নিয়োগ করে পাল্টা আক্রমণের দ্বারা বিদ্রোহীদের হঠিয়ে দিল।

পরদিন—১৮ই জুন, বিখ্যাত নাসিরাবাদ বাহিনী রাজধানীতে এসে পৌঁছল। তারা ৬টি শক্তিশালী কামানও সঙ্গে নিয়ে এলো। এগুলি সেই কামান, যেগুলি জেলালাবাদের যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই শক্তিশালী বাহিনীর আগমনে দিল্লিতে বিদ্রোহীদের শক্তি অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল। ১৯শে জুন সূর্যের তেজ যখন খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন নাসিরাবাদ বাহিনী লাহোর-গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে সবজিমণ্ডি পার হয়ে, ইংরেজ-শিবিরের অরক্ষিত পশ্চাদভাগে নজফগড় ক্যানালের ধারে হঠাৎ এসে হাজির হলো। এমন অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়েও ইংরেজরা দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা ইংরেজ শিবিরের দেড় মাইলের মধ্যে অগ্রসর হয়ে এলো। "বিদ্রোহীরা আমাদের অভ্যাস ভালো করেই জানত। কাজেই সূর্যের তাপ যখন সবচেয়ে বেশি, ঠিক সেই সময় তারা আক্রমণ করত। দেশের জলবায়ু ছিল তাদের প্রধান মিত্র।"[৯]

পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—নাসিরাবাদ বাহিনীর এই তিনটি শাখাই নজফগড়ের যুদ্ধে নিপুণভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে উৎকৃষ্টতর নেতৃত্ব ও শৃংখলার পরিচয় দিয়েছিল। তাদের কামানের দ্রুত ও নিশ্চিত লক্ষ্যের ফলে ইংরেজ বাহিনী প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে এসেছিল এবং তাদের ভবিষ্যৎ একটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছিল। ইংরেজ গোলন্দাজ নায়ক টোম্বস্, তাঁর লোকদের তাদের কামানের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে দেখছিল। ইংরেজ-অশ্বারোহীরা বারবার সিপাহিদের আক্রমণ করে তাদের স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বারবারই তাদের অনেক হতাহতের পর ফিরে যেতে হয়েছিল এবং তাদের নায়ক ইউল নিহত হয়েছিল। পাঞ্জাব গাইড্‌স দলের পাঠান অশ্বারোহীদের নিয়ে তাদের নায়ক ড্যালি বিদ্রোহীদের একবার মরীয়া হয়ে আক্রমণ করল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আহত ড্যালিকে কাঁধে করে ফিরে আসতে বাধ্য হলো। বিখ্যাত ইংরেজ অশ্বারোহী, অফিসার হোপ গ্র্যাণ্ট যখন আক্রমণ করলেন তখন তিনি দেখলেন, একটি গুলীর আঘাতে তাঁর ঘোড়া নিহত। তিনি তাঁর মৃত ঘোড়ার উপর পড়ে গেলেন; একদল সিপাহি তলোয়ার নিয়ে তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হলে একজন পাঠান অশ্বারোহী সিপাহিটিকে হত্যা করল।

৯. Kaye : vol. II, p. 540

সন্ধ্যা ৮টার সময় ইংরেজরা পরাজিত হয়ে অনেকগুলি কামান ও অনেক সাজসরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে তাদের শিবিরে ফিরে গেল। রবার্টস এই দিনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "সিপাহিরা আমাদের পরাজিত করে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল।" স্বভাবতই ইংরেজরা সেই রাত্রে খুবই ক্লান্ত, হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অফিসাররাও অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। এই সম্পর্কে কেই লিখেছেন : "রাত্রিতে যখন আমাদের অফিসাররা বিষণ্ণ বদনে তাঁবুতে সমবেত হলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁদের পশ্চাতে শত্রুরা আগুনের ধারে জমায়েত হচ্ছে। আমাদের খুব সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছিল।...আমাদের আরো সর্বনাশ হতো, যদি বিদ্রোহীরা স্থায়ীভাবে আমাদের পশ্চাতে শিবির ফেলত এবং যদি তারা দিল্লি থেকে সাহায্য পেয়ে পুনরায় আমাদের পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ আক্রমণ করত।"[১০] এই অবস্থায় সিপাহিরা যদি রাত্রিকালে ইংরেজ শিবির আক্রমণ করত, তাহলে সেখান থেকে শত্রুকে হঠিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে খুব কঠিন হতো না। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, বিদ্রোহীরা সেই রাত্রে আর শত্রুদের আক্রমণ করল না। এইভাবে বিদেশী আক্রমণকারীদের পরাজিত করার আরো একটা নিশ্চিত সুযোগ বিদ্রোহীরা গ্রহণ করল না। পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজরা যখন তাদের সর্বশক্তি সংগ্রহ করে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হলো, তখন তারা দেখে অবাক হয়ে গেল যে, তাদের এই ভয়াবহ শত্রু তাদের পূর্বদিনের বীরত্বপূর্ণ বিজয়কে পদদলিত করে বিনা যুদ্ধে শহরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন শুরু করে দিয়েছে। সত্যই এই যুগে পরম দয়ালু ঈশ্বর ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন।

সাভারকারের মতে বিদ্রোহীদের এইভাবে শহরে ফিরে যাবার কারণ ছিল—'তাদের গোলাবারুদের অভাব' (*Indian War of Independence*, p. 293)। এই সময় দিল্লি শহরে গোলা-বারুদের খুব অভাব ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা খুব কঠিন। বিদ্রোহীদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখনো খুব দুর্বল ছিল বলেই সম্ভবত এমন শোচনীয় ঘটনা ঘটতে পেরেছিল। এ বিষয়ে ফরেস্ট বলেন যে, বিদ্রোহীরা সত্যই ইংরেজ শিবিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বল দিকটাই আক্রমণের জন্যে বেছে নিয়েছিল। "যদি তারা সেস্থান দখল করে বসে থাকতে পারত, তাহলে তারা আমাদের পাঞ্জাবের সঙ্গে যাতায়াতের পথ কেটে দিতে পারত। আমাদের ছোট বাহিনীটা একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত ; বিনা রসদে ও বিনা লোকবলের সাহায্যে বিদ্রোহীদের প্রতিদিনকার ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে শিবির দখলে রাখা অসম্ভব হতো। সেদিনকার যুদ্ধের ফলাফল যখন বিচার করা হলো, তখন আমাদের শিবিরের সকলে হতাশ

১০. *Ibid*, p. 552

হয়ে পড়েছিল।"[১১]

২৩শে জুন, ১৮৫৭ সন ছিল পলাশি যুদ্ধের শতবার্ষিকী দিবস—শত্রুর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্যে এই দিনটি আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর নিকট বিশেষভাবে স্মরণীয়; আজ একশত বছরের জাতীয় অপমানকে ধুয়ে মুছে ফেলে ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দিন। ইংরেজ শিবিরে সকলেই জানত যে, বিদ্রোহীরা ঐদিন চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ইংরেজরা তাদের ভবিষ্যতকে খুব উজ্জ্বল বলে মনে করল না। তাই ২১শে জুন, রবিবার শিবিরের প্রতিটি ইংরেজ গির্জায় সমবেত হয়ে পুনরায় পরম দয়ালু ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলো। এইসব ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টভক্তদের প্রার্থনায় ঈশ্বর এবারও মুগ্ধ হলেন! পরদিন ইংরেজ বাহিনীর কিছু পাঠান ও শিখ সৈন্যের বেশ একটা বড় দল সবে পাঞ্জাব থেকে ইংরেজ শিবিরে এসে পৌছল। দিল্লিতে বিদ্রোহীদের সংখ্যাও জলন্ধরে ও ফিলুরের বিদ্রোহী সিপাহিদের আগমনে বর্ধিত হলো।

২৩শে জুন সিপাহিরা দৃঢ়সংকল্প নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে এলো। ১৯শে জুনের আক্রমণ যেমন নবাগত নাসিরাবাদ ব্রিগেডের দ্বারা চালিত হয়েছিল, ২৩শে তারিখের আক্রমণ তেমনই জলন্ধরের বিদ্রোহীরা তার পুরোভাগে ছিল। বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা ছিল যে, তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল যাবে নজফগড়ে, আর একদল আক্রমণ করবে হিন্দুরাও-এর বাড়ি। কিন্তু পাঁচদিন পূর্বে নজফগড়ের যুদ্ধের পর ইংরেজরা ওখানকার সেতু ভেঙে দিয়েছিল। তাই বিদ্রোহীদের ফিরে আসতে হলো। ইংরেজদের রিপোর্টে দেখা যায় "বিদ্রোহীরা সেতু মেরামত করতে শুরু করল। কিন্তু এতই বৃষ্টি হয়েছিল যে, সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের খুবই দয়া বলতে হবে। বিদ্রোহীরা যদি সদলবলে সেতু পার হতো, তাহলে পাঞ্জাবের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের পথ কেটে দিতে পারত। তাছাড়া এদের সঙ্গে লড়বার জন্যে আমাদের শিবির থেকে অনেক সৈন্য পাঠাতে হতো, কিন্তু তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।[১২]

নজফগড় আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে সিপাহিরা সবজিমণ্ডি থেকে শত্রুকে আক্রমণ করল। আর অন্য একটি দল হিন্দুরাও-এর বাড়ির সম্মুখভাগ দিয়ে অগ্রসর হলো। দু'দলই প্রচণ্ডভাবে দু'দিক থেকে একই সময়ে ব্রিটিশের ওপর কামানের গোলাবর্ষণ করতে লাগল। মোরি বুরুজের কামানগুলিও চলতে লাগল। সবজি-মণ্ডির আক্রমণ ইংরেজদের পক্ষে প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ল; তাদের ক্রমশ পিছু হঠতে হলো। সিপাহিরা ক্রমশ হিন্দুরাও-এর বাড়ির পশ্চাদভাগে

১১. Forrest: *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 92
১২. *Punjab Mutiny Records*, vol. VII, pt. I, p. 171

অগ্রসর হয়ে মাউণ্ড ব্যাটারি আক্রমণ করল।

এইরকম একটা ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ইংরেজরা আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিয়ে মরীয়া হয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। ইংরেজ, পাঠান ও শিখ সৈন্যের বাহিনী তিনবার সবজি-মণ্ডিতে সিপাহিদের আক্রমণ করল। কিন্তু সবজিমণ্ডির সরু-সরু রাস্তা, দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বড় বড় বাড়ি, বাগান ও ছাদ থেকে সিপাহিদের হঠানো সহজ ছিল না। অনেকবার হাতাহাতি যুদ্ধও হলো ; সবজিমণ্ডির গলিগুলি হতাহতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনবারই ইংরেজরা হঠে আসতে বাধ্য হলো।

সবজিমণ্ডির যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো ইংরেজ সৈন্যের কাপুরুষতা। প্রথম বারের পর দ্বিতীয় বার তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় একটা অগ্রসর হয়নি। তারা গুর্খা, শিখ, পাঠান ভাড়াটিয়াদেরই বিদ্রোহীদের গুলীর মুখে বারবার ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মহাবিদ্রোহের সময় বারবার ইংরেজ সৈন্যেরা এই কৌশল অবলম্বন করেছে এবং বারবার এইসব ভাড়াটিয়ারা তাদের প্রভুদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ইতিহাসবিদ কেই ইংরেজ সৈন্যদের ঐদিনকার আচরণ সম্বন্ধে দরদী ভাষায় বলেছেন, "এই ধরনের যুদ্ধ ইংরেজ সৈন্যের রুচি ও মেজাজের সঙ্গে সবচেয়ে কম খাপ খায়।"[১৩]

গুর্খা বাহিনীর নায়ক মেজর রীড ২৩শে জুনের যুদ্ধের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন : "বিদ্রোহীরা বেলা ১২টা আন্দাজ আমার সমগ্র অবস্থানের ওপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ শুরু করল। বিদ্রোহীদের চেয়ে বেশি নিপুণতার সঙ্গে আর কেউ যুদ্ধ করতে পারত না। তারা ইংরেজ রাইফেল বাহিনী, পাঠান গাইড বাহিনী ও আমার গুর্খা-বাহিনীর ওপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এবং এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে, আমি নিশ্চয়ই ঐদিনকার মতো হেরে গিয়েছি। তাছাড়া, শহরের কামান এবং তারা যে কামানগুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেগুলি যেমন দ্রুত ও ভয়ংকরভাবে গোলাবর্ষণ করছিল, তাতে আমার সমগ্র অবস্থান বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল।"[১৪] কিন্তু পূর্বেও যা অনেকবার ঘটেছে, এবারও ঠিক তাই হলো। ঠিক জিতবার মুহূর্তে, বিদ্রোহীরা তাদের কামান ইত্যাদি নিয়ে সূর্যাস্তের সময় শহরে ফিরে যেতে শুরু করল। ব্রিটিশ বাহিনী এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন পর্যন্ত করতে পারল না। কেই লিখেছেন : "এটা আমাদের সেইরকম জয়, যে রকম জয় আরো কয়েকটা হলে আমাদের সমগ্র অবস্থানটি একটি কবরখানায় পরিণত

১৩. **Kaye : vol. II, p. 555**

১৪. **Forrest : *History of the Indian Mutiny* vol. I, p. 94**

হতো আর শত্রুরা সেখানে এসে বিনা বাধায় শিবির স্থাপন করতে পারত।"[১৫]

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ২৩শে জুনের পর ১২ দিন ধরে বিদ্রোহীদের, ২৭শে'র ও ৩০শে'র দুটি ছোট আক্রমণ ছাড়া আর কোনো রকমের বড় আক্রমণ হলো না। ২৩শে জুন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা ইংরেজদের খুব ঘন ঘন আক্রমণ করে আসছিল; একদিনের জন্যেও শত্রুকে তারা বিশ্রাম করতে দেয়নি। ২৩শে জুনের আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তার সুফল সংগ্রহ করার জন্যে তারা আর কোনো চেষ্টাই করল না। ইতিমধ্যে চার-দিনের অবসরে ইংরেজরা তাদের আঘাত সামলে নিয়ে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্রোহীদের বেরিলি-বাহিনীকে আঘাত হানবার জন্যে তৈরি হলো। জুন মাসের শেষে ইংরেজ শিবিরের সৈন্যসংখ্যা বর্ধিত হয়ে দাঁড়ালো ৬,৬০০।[১৬]

১৫. Kaye : vol. II, p. 556

১৬. Forrest : *State Papers*, vol. I, p 448

গুর্খা বিদ্রোহ

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ইংরেজ ইতিহাসবিদরা যে সমস্ত বই লিখে গেছেন, তাতে তাঁরা পঞ্চমুখে গুর্খাদের ইংরেজ-ভক্তি ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। দিল্লির যুদ্ধে দেখা গেছে যে, গুর্খারা কিভাবে নিজেদের প্রাণ দিয়ে ইংরেজকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বারবার রক্ষা করেছিল ও ইংরেজের চূড়ান্ত জয়কে সম্ভব করে তুলেছিল। কিন্তু এই গুর্খারাই যে ১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সে সম্বন্ধে বেশির ভাগ ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া তো দূরের কথা, অনেকেই তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। ১৯১১ সনে পাঞ্জাব সরকার 'পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্' নাম দিয়ে যেসব দলিলপত্র ছাপিয়েছিলেন, তাতে গুর্খা বিদ্রোহের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

বিদ্রোহের পূর্বে অন্যান্য বাহিনীগুলির মতো গুর্খা-বাহিনীতেও ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অভাব ছিল না। সিমলার কয়েক মাইল উত্তরে জুটোগে যে নাসিরী গুর্খা-বাহিনী ছিল, তারা চর্বিযুক্ত টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। আম্বালায় যে সিরমুর ও ৬৬-তম গুর্খা-বাহিনী দুটি ছিল, তারাই কিন্তু জুটোগের গুর্খাদের প্রভাবিত করেছিল। এই থেকেই বোঝা যায়, যে সিরমুর গুর্খা-বাহিনী কিছুকাল পরে দিল্লির যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সাহসের সঙ্গে লড়েছিল, তাদের মধ্যেও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং একসময়ে তারাই উদ্যোগী হয়ে স্বজাতীয়দের উত্তেজিত করেছিল। টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করার পর জুটোগের গুর্খারা তাদের ভাইদের কাছে আম্বালায় চিঠি লিখেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে চিঠি ধরে ফেলেছিল এবং জুটোগ-বাহিনীকে ধাপ্পা দিয়ে বলেছিল যে, আম্বালার গুর্খারা টোটা ব্যবহার করছে। জুটোগের লোকরা এতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বলে যে, তারা আম্বালার গুর্খাদের জাতিচ্যুত করবে। জুটোগের কিছু কিছু গুর্খা ধর্মনাশের আশংকায় একটা-না একটা ছুতো করে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যায়। ১৩ই মে সিমলার বেসামরিক ইংরেজরা একটা ভলান্টিয়ার-বাহিনী গঠন করবে বলে সিদ্ধান্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে থাকে। এই ঘটনার ফলে গুর্খাদের মধ্যে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়।[১]

ঠিক এই সময়েই সিমলা অঞ্চলে যত বাহিনী ছিল সকলের ওপরই হুকুম হলো:

১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. I, p. 132

আম্বালা অভিমুখে রওনা হতে। জুটোগের গুর্খাদের নিকট যখন এই হুকুম পড়ে শোনানো হচ্ছিল, তখন তারা শিস দিচ্ছিল আর ইংরেজ অফিসারদের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য করছিল। "বাহিনীর লোকরা অবাধ্যতাসূচক ও বিদ্রোহাত্মক ভাষা ব্যবহার করছিল এবং তাদের অনেকেই জুটোগ থেকে এক পা-ও নড়বে না বলে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করছিল।"[২] জুটোগ-বাহিনী এই হুকুম পালনে অস্বীকার করল এবং কাউকে সেখান থেকে কোনো কামান বা গোলা-বারুদও নিয়ে যেতে দিল না। "তারা ঘোষণা করল যে, কিছুতেই তারা মার্চ করবে না; তারা ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে বারে বারে কমাণ্ডার-ইন-চিফের নাম করতে লাগল এবং দাবি করতে লাগল যে, তাদের হাতে তাঁকে সমর্পণ করা হোক।"[৩]

সিমলার ডেপুটি-কমিশনার লর্ড উইলিয়াম হে গুর্খাদের বোঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু "তারা বলল যে, তাদের সমতলভূমিতে অর্থাৎ দিল্লিতে নিয়ে গেলে কোনো ভালো ফলই হবে না। ··তাছাড়া, তারা কোনোমতেই তাদের 'ভাইয়া'দের বিরুদ্ধে লড়বে না, এ বিষয়ে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"[৪] লর্ড হে তারপর মুণ্ডির রাজা মিঞা রতন সিংকে পাঠালেন গুর্খাদের শান্ত করবার জন্যে, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হলো না। তারপর মেজর বুগ্‌ট গেলেন। কিছুক্ষণের জন্যে শিবিরে খুব গণ্ডগোল হলো। দু'জন গুর্খার সঙ্গে বুগ্‌ট একেবারে বিবর্ণ মুখে ফিরে এলেন। গুর্খা দু'জন হে-র নিকট চর্বি মিশ্রিত টোটা, ভেজাল আটা, বেতনের নিয়মাবলীর অসুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করল।[৫]

পার্বত্য রাজ্যের একজন অফিসার ব্রিগ্‌স তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "হরিপুরে কয়েকজন পাহাড়ি আমাকে বলল যে, নাসিরী-বাহিনী একটা মেল-ব্যাগ ধ্বংস করেছে, সমতলভূমিতে নিয়ে যাবার সময় কমাণ্ডার-ইন-চিফের একটা তাঁবু জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং অফিসারদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। তারা সর্বত্র সব লোকদের বলে বেড়াচ্ছিল যে, ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তারা যদি শুনতে পায় যে, কেউ আমাদের (ব্রিটিশদের) সাহায্য করেছে কিংবা আমাদের কোনো কাজ করেছে, তাহলে তাকে তারা গুলী করে মারবে।"[৬]

তারপর পথে ব্রিগসের বাহিনীর কয়েকজন নাসিরী-গুর্খার সঙ্গে দেখা হলো।

২. *Ibid*, p. 58
৩. *Ibid*, p. 60
৪. *Ibid*, p. 63
৫. *Ibid*, p. 62
৬. *Ibid*, p. 132

তারা তাঁর সামনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে খুব গালাগালি শুরু করল—"এটা হচ্ছে দোকানদারদের বদমাশ সরকার।" একজন গুণ্ডা ব্রিগসকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু আর একজন তাকে থামিয়ে বলল—"একটা লোককে মেরে কি হবে, কমাণ্ডার-ইন-চিফকে সরাতে হবে; পরদিন সিমলায় তারা সমস্ত ইংরেজকে খতম করে দেবে এবং শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে।"[৭] একজন ইংরেজ অফিসারের সামনেই গুর্খাদের এই বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের কতখানি আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিল এবং ভারতের অন্যান্য 'ভাইয়া'দের মতো তাদেরও সেই আক্রোশ ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল।

দিল্লির হত্যাকাণ্ডের খবরে সিমলার ইংরেজ বীরপুরুষরা খুবই চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপরেই যখন তারা গুর্খাদের প্রকৃত মনোভাবের খানিকটা আভাস পেল, তখন তারা বীরত্বের লম্ফঝম্প ভুলে গিয়ে, তল্পিতল্পা ফেলে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। ইতিহাসজ্ঞ মার্টিনের কথায়—"যেসব ইংরেজ মাত্র দুই-একদিন পূর্বে সিমলা রক্ষা করার জন্যে ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লিখিয়েছিল, তারাই সর্বাগ্রে কাপুরুষতার উদাহরণ দেখাল এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের গুর্খাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিরি-সংকটের মধ্য দিয়ে পলায়ন করল। একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো আতঙ্ক ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।"[৮] এইসব বীরপুরুষরা পথে কোথাও থামেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কোনো নিকটবর্তী রাজার বাড়িতে পৌছতে পেরেছিল। "সৌভাগ্যের বিষয় যে, রাজারা খুবই তাঁদের দয়া দেখিয়েছিলেন।" আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে, এইসব বীরপুরুষদের মধ্যে বড় বড় সামরিক অফিসারেরও অভাব ছিল না। লেফটেনাণ্ট-জেনারেল কীথ ইয়াং নিজেই লিখেছেন যে, রাজা সংসার সেনের বাড়িতে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেজর-জেনারেল পেনী, চারজন লেফটেনাণ্ট-কর্নেল, কীথ ইয়াং স্বয়ং, গ্রেটহেড, কুইন ও কলিয়ার এবং চারজন ক্যাপ্টেন ও তিনজন লেফটেনাণ্ট।[৯]

দু'দিনের মধ্যেই সিমলাতে আর একটিও ইংরেজকে দেখা গেল না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা, যে যেরকম ভাবে পারল, শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। "সকলেই এতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের বিবেচনাশক্তি ও জোয়ানরা তাদের পৌরুষ হারিয়ে ফেলল। ইয়োরোপীয়রা, যাদের অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল, এইসব খবরগুলির পিছনে কোনো

৭ Martin : *Indian Empire*, vol. III, p. 79

৮. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. I, p. 65

৯. Keith Young : *Delhi 1857*, p. 323

সত্য আছে কিনা তা জানবার জন্যে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করেই, একটা কল্পিত বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে অতি অশোভন ভাবে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।...বৃদ্ধ এবং জোয়ান সুস্থ এবং রুগ্ন, মূর্ছারোগগ্রস্ত মহিলা এবং দৃঢ়চেতা স্ত্রীলোক অর্ধভূষিত অবস্থায় মহাবেগে গিরিসংকটের বন্ধুর ও খাড়া পথ দিয়ে ছুটে চলল এই আশা নিয়ে যে, কোনো গভীর ও নির্জন স্থানে ভয়ংকর গুর্খাদের ছুরিকাঘাত থেকে অন্তত তারা নিস্তার পাবে।... সিমলা থেকে ডুগসাই যাওয়ার রাস্তা সর্বপ্রকারের ও সর্বাবস্থার আতঙ্কগ্রস্ত পলাতকদের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার ওপর জনাকীর্ণ হয়ে ছিল।"[১০]

স্থানীয় অধিবাসীরা এরকম দৃশ্য কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এইরকম আতঙ্ক "আমাদের সম্মানের পক্ষে খুবই হানিকর হলো। ভৃত্যরা ও বাজারের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আমাদের তিনদিনের এই আতঙ্কে তাদের প্রভুদের প্রতি সমস্ত সম্মান হারিয়ে ফেলল ও গুর্খাদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হয়ে পড়ল।"[১১]

এদিকে বিদ্রোহ জুটোগেই শুধু সীমাবদ্ধ রইল না; অন্যান্য নিকটবর্তী স্থানেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কাসাউলিতে ২০০ জন ইংরেজ সৈন্য ও মাত্র ৫০ জন গুর্খা সৈন্য ছিল; তা সত্ত্বেও গুর্খারা বিনা বাধায় ধনাগার দখল করে সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে জুটোগে চলে গেল।[১২] হরিপুরে তারা কমাণ্ডার-ইন-চিফের তাঁবু পুড়িয়ে দিল ও কতকগুলি জিনিসপত্র লুঠ করল। সিরিতে তারা দু'একজন ইংরেজ অফিসার ও স্ত্রীলোককে থামিয়ে তাদের জিনিসপত্র পরীক্ষা করেছিল।[১৩] বিদ্রোহমূলক চিঠি লেখার অপরাধে হিন্দুর নামক স্থানে রামপ্রসাদ নামে একজন পাহাড়ির ফাঁসি হয়। যখন রাস্তা-নির্মাণ বিভাগের (P. W. D.) ইংরেজরা সিমলায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন তাদের অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছিল যে, আম্বালার উত্তরে শীঘ্রই কোনো ফিরিঙ্গি আর থাকবে না।

লর্ড উইলিয়াম হে তাঁর নিজের রিপোর্টে লিখেছিলেন: "গুর্খারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং একটা সময়ে তারা ইংরেজ অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। অধিকন্তু তারা এতই উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে, একটা আকস্মিক গুলী, কিংবা একজন গুর্খা ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সামান্য ঝগড়া, কিংবা ইয়োরোপীয়রা তাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে—কোনো মতলববাজ নেটিভের এমন যে-কোনো রকমের একটা গুজব প্রচার, এরকম যে-কোনো

১০. Martin : vol. III, p. 79
১১. *Punjab Mutiny Records*, vol. VIII, pt. I, p. 138
১২. *Ibid*, p. 66
১৩. *Ibid*, p. 67

একটা ঘটনা, এক মুহূর্তে তাদের ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের দিকে ঠেলে দিতে পারত। …সমতলে যেসব বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, তাদের* মধ্যে সবচেয়ে যেসব খারাপ লোক ছিল, নাসিরী বাহিনীতেও সেরকম বিদ্রোহী ভাবাপন্ন অনেক লোক ছিল। প্রথম অবস্থায় তারা যে চরম পন্থা অবলম্বন করেনি, তার কারণ আমাদের সাবধানতা ও দূরদর্শী ব্যবহার; আর এদের পরবর্তী ভালো ব্যবহারের কারণ, অন্যান্য গুর্খা-বাহিনীগুলির বিশ্বস্ততা।"[১৪]

সরকারি রিপোর্টে আর এক স্থানে বলা হয়েছে: "(নাসিরী) বাহিনীর উগ্র লোকেরা চরম পন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ভালো প্রকৃতির, তারাই তাদের বাধা দিয়েছিল। এই ভাবেই ১৬ই তারিখের লজ্জাজনক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে: বিদ্রোহী গুর্খা সিপাহিরা তাদের গুর্খা অফিসারদের ধাক্কা মারতে মারতে কোনঠাসা করে দিয়েছিল এবং তাদের ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত কোনো রক্তপাত হয়নি। দু-দু'বার এইসব গুর্খারা সিমলা লুঠ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু দু-দু'বারই তাদের মধ্যে ঠাণ্ডা প্রকৃতির রাজভক্ত লোকেরা নিরস্ত করেছিল।"[১৫]

গুর্খাদের নিজেদের মধ্যে এই মতভেদই হলো ইংরেজদের স্বর্ণ সুযোগ। গুর্খাদের সব দাবি তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ মেনে নিল। জুটোগের বিদ্রোহীদের ক্ষমা করা হলো এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, অথবা তাদের কোনো ধর্মবিরোধী কাজও করতে বলা হবে না। যে কয়েকজন গুর্খাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদেরও চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হলো। গুর্খা অফিসাররা ও তাদের মধ্যে যারা 'ভালো লোক' ছিল, তারা তখন সকলকেই বুঝিয়ে শান্ত করে দিল এবং তার পরেই জুটোগের নাসিরী-বাহিনী আম্বালা অভিমুখে যাত্রা করল। এইভাবে গুর্খা বিদ্রোহ নেতৃত্বের অভাবে বিস্তার লাভ করতে পারল না।

সিমলা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও যে বিদ্রোহী মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তাও স্থানীয় রাজাদের সাহায্যে দাবিয়ে দেওয়া হলো। ১০ই আগস্ট বার্নেস লিখেছিলেন: "সিমলা অঞ্চলের পার্বত্য রাজারা তাঁদের রাজ্য ও সম্পত্তির জন্যে ইংরেজদেরই ধন্যবাদ দিতে বাধ্য, কারণ ১৮১৩ সনে গুর্খাদের বিরুদ্ধে তাঁদের রক্ষা করে ইংরেজরাই তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। স্বভাবত ও কৃতজ্ঞতাবশত আমাদের সঙ্গেই তাঁরা যুক্ত।… এই কারণে সিমলা ভালো-ভাবেই সুরক্ষিত।"[১৬] এইসব রাজাদের ভলান্টিয়ার-বাহিনী গঠন করতে বলা

১৪. *Ibid*, p. 69
১৫. *Ibid*, p. 137
১৬. *Ibid*, p, 299

হলো। যখন জলন্ধরের বিদ্রোহী সিপাহিরা শতদ্রু পার হয়ে পিঙ্গরহুনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন এইসব রাজারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভলান্টিয়ার-বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; যেমন ফিলুরের রাজা দিয়েছিলেন ২৫০, বাগুলের রাজা দিয়েছিলেন ১৫০, হিন্দুরের রাজা দিয়েছিলেন ১০০ ইত্যাদি।"[১৭] পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল, এখানেও সেই ভেদনীতি অবলম্বন করা হলো। দেখানো হলো যে, হিন্দুস্থানিরাই হচ্ছে আসল শত্রু। তাদের ঘরবাড়ি খানাতল্লাসি করা হলো, অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো ও চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো যে, ইংরেজরা পার্বত্য লোকদের বন্ধু বলেই মনে করে এবং তারা ইংরেজদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন।[১৮]

গুর্খাদের ও পাহাড়িদের বিদ্রোহী মনোভাবের হঠাৎ বিস্ফোরণের সময়, যখন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, তখন এরাও ভারতের অন্যান্য স্থানের জনসাধারণের মতো জাতীয়তা-বোধের নবচেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। তারা সমস্বরে বলে উঠেছিল,—'ভাইয়াদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব না।' সব ভারতবাসী তাদের 'ভাইয়া', সব ভারতবাসী আজ এক, সকলকেই আজ মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে,—এই চেতনা অনগ্রসর জাতির মধ্যেও জেগে উঠেছিল। এই ঘটনার বৈপ্লবিক তাৎপর্য তখনকার ইংরেজ শাসকরাও কতকটা বুঝতে পেরেছিল। তাই একটি সরকারি রিপোর্টে গুর্খা বিদ্রোহের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল: "এ ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, এই দূরবর্তী ও স্বভাবত শান্তিপূর্ণ জাতির মধ্যেও অন্যান্যদের মতোই একটা পরিবর্তনের আকাংক্ষা জেগে উঠেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে এটাই তাদের বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।"[১৯] আম্বালার কমিশনার এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে,—"নাসিরী বাহিনীর দুর্ব্যবহারের ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো একটা সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা যেসব গুর্খা সৈন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হবার সবচেয়ে কম সম্ভাবনা ছিল তারাও আক্রান্ত হয়েছিল।" এর থেকে বার্নেসের মনে হয়েছিল যে, এটা শাদাদের বিরুদ্ধে কালাদের একটা চক্রান্ত।[২০] গুর্খা ও পাহাড়িদের মধ্যে এই জাতীয় নবজাগরণ, যা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল তা বিকাশ লাভ করবার সুযোগ না পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল সচেতন নেতৃত্বের অভাব।

---

১৭ *Ibid*, p. 139
১৮. *Ibid*, p. 72
১৯ *Ibid*, p. 37
২০ *Ibid*, vol. VIII, pt. 2, p. 338

অযোধ্যা - গণ-অভ্যুত্থান : লখনৌ

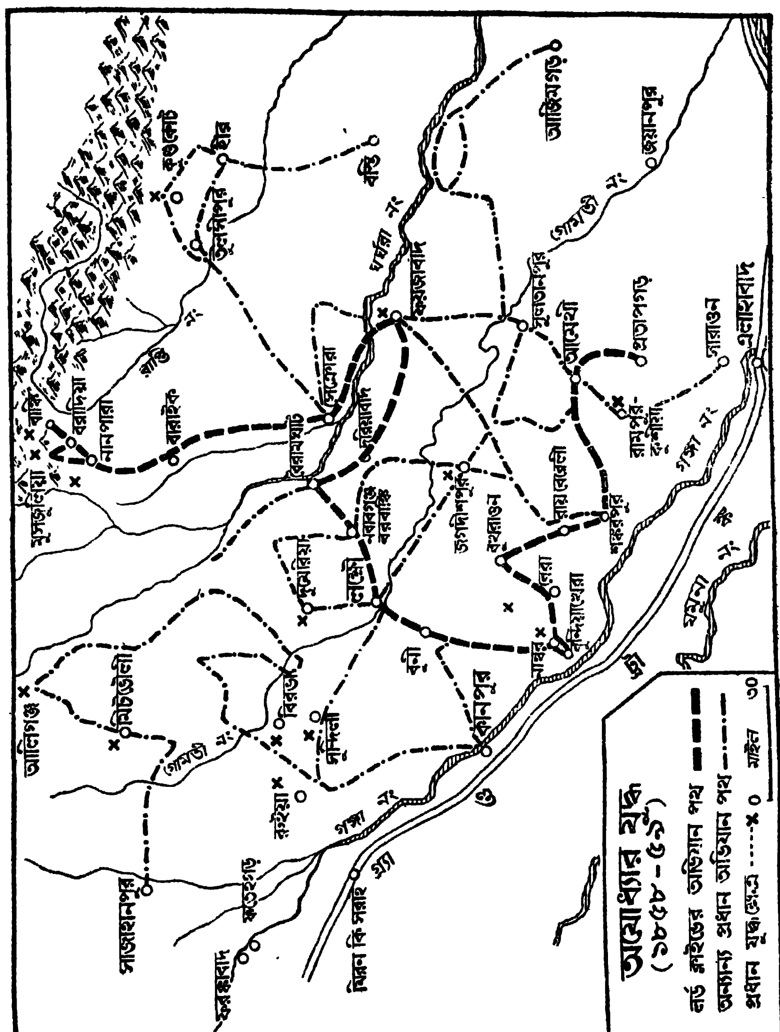
পলাশি যুদ্ধের পরও বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা হারায় নি। মীর কাশিম নবাব হবার পর বাংলার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১৭৬৪ সনে বক্‌সার যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের পর বাংলাদেশ সত্য সত্যই পরাধীন হলো এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিও পরাধীন হতে শুরু করল।

বক্‌সার যুদ্ধের সময় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা উভয়েই ইংরেজের বিরুদ্ধে মীর কাশিমের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের নিকট থেকে মীর কাশিম কোনো সাহায্যই পাননি। বক্‌সার যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই শাহ আলম অযোধ্যা প্রদেশ ফিরে পাবেন, ইংরেজের এই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হলো তখন সম্রাট সমস্ত অযোধ্যার পরিবর্তে শুধু পেলেন এলাহাবাদ এবং তার বিনিময়ে তাঁকে ইংরেজদের দিতে হলো বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি। অন্যদিকে, সুজাউদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দেবার ফলে অযোধ্যার নবাব বলে স্বীকৃত হলেন ; তাঁকে আরো একটি বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হলো যে তিনি ব্রিটিশ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে (এক্ষেত্রে মারাঠাদের সঙ্গে) মিত্রতা স্থাপন করতে পারবেন না।

এই যুগটা ছিল, কি মোগল কি মহারাষ্ট্রীয়, সমগ্র ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগ। ঐতিহাসিক কারণেই তার ধ্বংস ছিল অনিবার্য। কিন্তু ভারতীয় কোনো প্রগতিশীল শক্তির দ্বারা সেই ঐতিহাসিক যজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারেনি ; বিদেশী বণিকশ্রেণীর দ্বারা হয়েছিল বলে সে এক কলঙ্কজনক প্রতিক্রিয়াশীল কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল।

উপরিউক্ত সন্ধির পর ইংরেজ কোম্পানি মহারাষ্ট্রীয়দের হাত থেকে নবাবকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। নবাবও তাতে রাজী হলেন। ১৭৭০ সনে মহারাষ্ট্রীয়রা দিল্লি দখল করল এবং শাহ আলমকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা এলাহাবাদ নবাবকে প্রত্যার্পণ করল, কিন্তু তার জন্যে নবাবের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করে নিল এবং নবাবকে রক্ষা করার জন্যে অযোধ্যায় যে ব্রিটিশ বাহিনী রাখা হলো তার ভরণপোষণের জন্যে নবাব প্রতি বছর একটা মোটা টাকা দিতে রাজী হলেন।

১৭৭২ সনে রোহিলখণ্ডের শাসক হাফিজ রহমত খানকে ব্রিটিশরা একটা সন্ধিচুক্তি সই করতে বাধ্য করল—যার দ্বারা এই ঠিক হলো যে, মহারাষ্ট্রীয়রা


অযোধ্যার যুদ্ধ
(১৮৫৮-৫৯)
লর্ড ক্লাইভের অভিযান পথ
অন্যান্য প্রধান অভিযান পথ
প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র ----× ০
মাইল ৩০
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
এলাহাবাদ
ফৈজাবাদ
আজিমগড়
জয়ানপুর
সুলতানপুর
প্রতাপগড়
আমেথী
বরাইচ
নানপারা
বেহরামঘাট
দরিয়াবাদ
নবাবগঞ্জ
শাজাহানপুর
ফতেহগড়
ফরাক্কাবাদ
গঙ্গা নং
গোমতী নং
ঘর্ঘরা নং
যমুনা নং

রোহিলখণ্ড আক্রমণ করলে অযোধ্যার নবাব তাঁর দেশ রক্ষা করবেন এবং তার জন্যে নবাবকে ৪০ লক্ষ টাকা দেবে। আলিবর্দির রাজত্বকালে বাংলাদেশে যেমন বর্গির হাঙ্গামা হয়েছিল, ১৭৭৩ সনেও রোহিলখণ্ডে এ ধরনের একটা বর্গির হাঙ্গামা হলো—যথারীতি অযোধ্যার নবাব কিছু সৈন্য পাঠালেন এবং বর্গিরাও যথারীতি পালিয়ে গেল। হাফিজ রহমতের নিকট নবাব তৎক্ষণাৎ ৪০ লক্ষ টাকা দাবি করলেন এবং হাফিজ রহমত একটু ইতস্তত করতেই তার রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং ব্রিটিশরাও সৈন্য পাঠাল। রোহিলারা খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং হাফিজ রহমত সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। রোহিলখণ্ডকে অযোধ্যাভুক্ত করে নেওয়া হলো।

১৭৭৫ সনে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আসফউদ্দৌলা আর একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যে ইংরেজ সৈন্যদের অবস্থানের জন্যে খরচের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিলেন। ঐ বৎসরই বেগমদের (আসফ-উদ্দৌলার মাতা ও মাতামহী) কাছ থেকে ৫৫ লক্ষ টাকা জোর করে আদায় করা হলো। বেগমদের ওপর এই লুণ্ঠন ও অত্যাচার কয়েক বছর ধরে চলেছিল এবং এই কাজের জন্যে আসফউদ্দৌলা ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়োগ করেছিলেন। ভারতীয় সামন্ত শাসকশ্রেণীর কতখানি অধঃপতন হয়েছিল, এই ঘটনা তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৭৯৭ সনে আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ওয়াজির আলির পরিবর্তে, ইংরেজরা তাদের একজন 'হাতের পুতুল' সাদত আলিকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাল। পরের বছর একটা নতুন সন্ধি নবাবের ঘাড়ে চাপিয়ে এলাহাবাদের দুর্গ—যেটাকে সকলে 'উত্তর-পশ্চিমের চাবিকাঠি' বলত—সেটাকে ইংরেজরা দখল করে বসল এবং প্রতি বৎসর নবাবের নিকট থেকে ইংরেজ সৈন্যদের খরচ বাবদ ৭৬ লক্ষ টাকা আদায় করতে লাগল। এই সন্ধিচুক্তির ফলে নবাব তাঁর অবশিষ্ট স্বাধীনতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন; প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরাই অযোধ্যার শাসক হয়ে দাঁড়াল। যদিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে নবাব বঞ্চিত হলেন, রাষ্ট্রের যা কিছু গলদ, যা কিছু দোষ, তার জন্যে কিন্তু এই নামমাত্র নবাবই দায়ী রইলেন। দেশের শাসনযন্ত্র ইংরেজের কতকগুলি দালালের হাতে চলে গেল; সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ফলে সমস্ত দেশময় একটা অরাজকতার সৃষ্টি হলো।

ইংরেজের এই দুর্নীতিপরায়ণ প্রভুত্ব অনেকেই মেনে নিতে রাজী হলেন না। ওয়াজির আলির নেতৃত্বে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও কয়েকজন ইংরেজ নিহত হলো। কিন্তু বিদ্রোহ বেশিদূর অগ্রসর হলো না এবং ওয়াজির আলি তাঁর সমস্ত জীবন বন্দী অবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ামে কাটালেন। বিদ্রোহ দমিত হবার পর গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি নবাবকে আর একটা নতুন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে সমগ্র গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অর্থাৎ অযোধ্যার প্রায় অর্ধেক রাজ্য

সরাসরি দখল করে বসলেন।

১৮৪৭ সনে, যখন ওয়াজেদ আলি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন রাজভাণ্ডারে মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট ছিল। ইংরেজের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে ৫ বছরের মধ্যে তা কমতে কমতে মাত্র সাড়ে-সাত লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়াল। কয়েক বছরের মধ্যেই অযোধ্যার পরিণতি কি হবে তা ডালহাউসি ভালোভাবেই জানতেন। অযোধ্যার নবাবরা সন্ধির সমস্ত চুক্তি-গুলিই বিশ্বস্তভাবে পালন করে আসছিলেন।[১] তাই এই নিরীহ, আশ্রিত ও রক্ষিত রাজ্যটিকে গ্রাস করার জন্যে একটা সামান্য অজুহাতও খুঁজে পাওয়া কঠিন হচ্ছিল।

কিন্তু নেকড়ের যখন ছাগল খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন ছাগলের জল-ঘোলা করতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাই অযোধ্যার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্লীম্যান, লাটসাহেবের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন যে, নবাব হচ্ছেন একটি দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যক্তি ; তিনি সর্বক্ষণ নর্তকী এবং নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন ; "রাজকার্যের জন্যে তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যেও পাওয়া যায় না এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বোঝেনও না, বা কেয়ারও করেন না।" আর সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো যে, "তিনি তাঁর প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।"

১৮৫৪ সনে মেজর-জেনারেল আউটরাম, স্লীম্যানের স্থানে রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হলেন। আউটরামও ঐ একই স্থর গাইতে লাগলেন – নবাব রাজকার্যে একেবারেই মন দেন না, রাজ্য অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, প্রজারা আর্তনাদ করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লণ্ডনে কোর্ট-অফ ডাইরেক্টারস এরকম চিঠির পর চিঠি পেতে লাগলেন। তারপর ছাগলকে ভক্ষণ করার দিন স্থির করতে বেশি সময় লাগল না, অবশ্য ছাগলেরই ভালোর জন্যে! অযোধ্যার ৫০ লক্ষ লোকের প্রতি 'মানবতার জন্যে', তাদের 'নেটিভ অত্যাচারের' হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ও 'কৃষকদের অসাধারণ দুর্দশা থেকে রক্ষা করার জন্যে' অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করাই স্থির হলো।

ওয়াজেদ আলির বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ সম্বন্ধে বোর্ড-অফ ডাইরেক্টার্সের একজন সদস্য জোন্স লিখেছিলেন : "এই দেশের রীতিনীতি অনুসারে নৃত্য ও গীত খুব আপত্তিজনক ব্যবসা নয়। নবাবের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ; ব্রিটিশ রেসিডেণ্টরা নবাবের মন্ত্রী নিয়োগ করা, তাঁর প্রজাদের মধ্যে কিভাবে বিচার হবে সেসব নিয়ন্ত্রণ করা, এই ধরনের সব ক্ষমতাই নিজেদের হাতে নিয়ে

---

১. **"False to their people, false to their manhood, they were true to the British Government" (Kaye, vol. I, p. 118)**

নিয়েছেন এবং যখন তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করতে চেয়েছিলেন তখন তার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়নি।...তাহলে, আমাদের এই সমস্ত উদ্ধত হস্তক্ষেপের দরুন তাঁর বিরক্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কিরকম কাজের অধিকার আমরা তাঁকে দিতে প্রস্তুত ?" তারপর অযোধ্যার তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জোন্‌স নিজে অনেক সন্ধান নিয়ে এই মত দিয়েছিলেন যে,—"জীবিকা অর্জনের জন্যে শ্রমিকদের অন্য প্রদেশে চলে যেতে হতো না। সব শহরগুলিই সমৃদ্ধিশালী ছিল, প্রাসাদ নির্মিত হতো, শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হতো, রাস্তাঘাটও তৈরি হতো; সোরা, নীল ও শস্যদ্রব্যের রপ্তানি একেবারেই কমত না এবং জনসাধারণের মনোভাব এতটুকু দমত না,...অপরাধের সংখ্যাও খুব কম ছিল।"[২]

এই সময়ে অযোধ্যার শাসনব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়েছিল। কেবলমাত্র বানিয়া-মহাজন এবং সরকারি কর্মচারি আমিলরাই প্রভূত পরিমাণে লাভবান হচ্ছিল। স্বভাবতই এরাই ছিল ইংরেজদের একমাত্র অবলম্বন। এরা ছাড়া আর সকল শ্রেণীর লোকই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, সুতরাং তারা সকলেই ইংরেজ-বিরোধী হয়ে উঠেছিল।[৩]

এই সময়কার কোম্পানি-সরকারের নীতি ছিল—সামন্তশ্রেণীকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করা, কৃষকশ্রেণী ও জনসাধারণের উপকারের জন্যে নয়, কোম্পানির রাজস্ব বাড়াবার জন্যে। কোম্পানি-সরকার যে ইনাম-কমিশন বসিয়েছিল, তা মহাবিদ্রোহের পূর্বেকার পাঁচ বৎসরে বোম্বে প্রদেশে ৩৫ হাজার সম্পত্তির মধ্যে ২২ হাজারের বেশি বাজেয়াপ্ত করেছিল।[৪] অযোধ্যাতে যে ভূমিব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো তাতে সেখানকার বহু জমিদার তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন। দু'একটি উদাহরণ : তুলসীপুরের রাজা ১ হাজার গ্রামের মালিক ছিলেন, তিনি প্রায় সবই হারালেন; শাগঞ্জের রাজা মানসিংহ প্রায় সব গ্রামই হারালেন; শংকরপুরের রাণা বেণীমাধো ২২৩টি গ্রামের মধ্যে ১১৯টি হারালেন; ধারুপুরের রাজা ও শক্তিশালী কালাকঙ্কর দুর্গের অধিকারী হনুমন্ত সিং একজন ইংরেজ অফিসারকে বলেছিলেন : "যে জমি আমার পরিবার বংশ-পরম্পরায় ভোগ করছিল, তা থেকে তোমরা আমাকে কলমের এক খোঁচায় বঞ্চিত করলে।"[৫]

২. Ball : *History of the Indian Mutiny*, vol. I, p. 151

৩. "...never were the evils of misrule more horribly apparent, never were the vices of indolent and rapacious Government productive of a greater sum of misery." (Kaye, vol. I, p. 114)

৪. *Ibid*, p. 17

৫. Malleson, vol. I, p. 407

নূতন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে কৃষক শ্রেণী তো লাভবান হলোই না, বরং তাদের ওপর শোষণ ও অত্যাচার নানাভাবে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেল। অনেক ইংরেজ শাসক বহুবার বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, সরকারি নতুন রাজস্ব নীতির ফলে কৃষকদের খাজনা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং অনেক জমি থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছিল ও তা বানিয়াদের হাতে চলে যাচ্ছিল।[৬] ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতে কৃষি-জমি ক্রয় ও বিক্রয় খুব কমই হতো ; যেটুকু হতো তা ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমেই হতো। খাজনার বা ঋণের দায়ে পূর্বে কৃষক কখনো তার জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হতো না। কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভারতে ব্রিটিশ আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছিল।

এই সময়কার কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা করে ইংরেজ সরকারের গুণমুগ্ধ সৈয়দ আহমদ খানকেও বলতে হয়েছিল : "পূর্বেকার সেটলমেন্টের তুলনায় বর্তমান খাজনার হার খুবই বেশি। ইংরেজরা যে খাজনার হার চাপিয়েছে তা সর্বপ্রকার আনুষঙ্গিকতা বা আকস্মিকতা না ধরেই করেছে। চাষের জমির মতো পতিত জমির খাজনাও একই হারে দিতে হচ্ছে।...খাজনা দেবার জন্যে চাষীরা টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। এই ধারের জন্যে তাদের চড়া সুদ দিতে হয়।"[৭]

ইংরেজদের ধনতান্ত্রিক আইন-আদালত বিচার সবই ছিল জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। একজন ইংরেজ লেখক মহাবিদ্রোহের কিছু পূর্বে লিখেছিলেন, "ইংরেজি আইনের দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও বিচারবুদ্ধিহীন পাণ্ডিত্যে" তুলনায় ভারতীয় আইন ও বিচার ছিল "সহজ ও যুক্তিসংগত বিচার পদ্ধতি।"[৮]

৬. "Our land revenue was undoubtedly too highly assessed, and our system of enforcing payments by the sale of land made its severity the more felt. All our law, by assisting the extortion of the Bannias, cast on our government the odium of much of their rapacity". (Thornhill : *The Personal Adventures and Experiences of a Magistrate During the Rise, Progress and Suppression of the Indian Mutiny*, 1884. p. 332)

৭. Syed Ahmed Khan : *Causes of Indian Revolt*, pp. 27-30

৮. John Dickinson : *Government of India under a Bureaucracy*, 1853. Lord Russell বলেছিলেন : "The subjects of other (Indian) states who possess none of those advantages (of the

শহরবাসীদেরও দুর্দশার অন্ত ছিল না। খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, লবণ, তেল ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যেরই দাম ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। কয়েকজন কন্‌ট্রাক্টর এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসা একচেটিয়া করে ফেলেছিল এবং অবাধে জনসাধারণকে লুণ্ঠন করছিল।[৯]

অযোধ্যার সমাজদেহ আর একটা ভয়ানক প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল—সেটা হলো আমিলদের শোষণ ও অত্যাচার। ১৮০১ সনের সন্ধিচুক্তির পর অযোধ্যার শাসনভার প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রেসিডেণ্টের হাতেই চলে গিয়েছিল। কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় করার ভার পেত নিলামে যে সর্বোচ্চ টাকার প্রতিশ্রুতি দিত ; তেমন অযোধ্যাতেও নিলামের ডাকে আমিলরা রাজস্ব আদায়ের ভার পেতে লাগল। এবং এই কাজের জন্যে আমিলরা নিজেদের সৈন্যসামন্তও রাখত। ৫০ বছর ধরে অবাধ শোষণের ফলে অনেক আমিল বড় বড় জমিদারি আয়ত্ত করেছিল এবং তাদের অনেককেই ইংরেজরা রাজা, নবাব ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

রাজারা এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীগুলি যাতে আমিলদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে তার জন্যে ধূর্ত আমিলরা সবরকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিল, এবং তার ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এককভাবে অনেক রাজাই আমিলদের সশস্ত্র বাধা দিয়েছিলেন। তার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে বহু দুর্গ তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। এইভাবে সর্বসমেত ১,৬০০ দুর্গ নির্মিত হয়, যার মধ্যে ২৪৬টি ছিল বৃহৎ আকারের, সঙ্গে ৪৭৬টি কামান। মহাবিদ্রোহের সময় এইসব দুর্গগুলি বিদ্রোহীদের খুবই কাজে লেগেছিল।

British rule)…would still look upon a transfer to our rule as the greatest calamity that could befall them." (*Parliamentary Papers*, 1831-32, vol. XIV, Appendix no. 18.) Col. Sleeman, যিনি ১৮৪০ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত অযোধ্যায় Resident ছিলেন, বলেছিলেন—"I am persuaded that if it were put to the vote among the people of Oudh, 99 in 100 would rather remain as they are than have our system introduced in its present complicated state."

৯. "Everything in the shape of food was consequently very dear…contractors…were making large fortunes while the people suffered by their extortions." (Rees : *Personal Narratives of the Siege of Lucknow*, p. 35)

অবশেষে ইংরেজরা যখন পুরোমাত্রায় অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তখন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬, সকাল বেলায় "ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মেজর-জেনারেল আউটরাম নবাবের প্রাসাদে গিয়ে নবাবকে কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করে, তাঁর হাতে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে দিলেন। এই সন্ধির দ্বারা তিনি তাঁর রাজ্যের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির হাতে তুলে দেবেন। তার পরিবর্তে তাঁর জন্যে মোটা রকমের একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং তিনি কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ও সম্মানের অধিকারী হবেন। এই দলিলটি খুব মন দিয়ে পড়ার পর নবাব দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন এবং যখন কোনো যুক্তির দ্বারাই সন্ধিপত্রে তাঁকে স্বাক্ষর করতে রাজী করানো গেল না তখন রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন যে, তাঁকে বাধ্য হয়ে নবাবকে জানাতে হচ্ছে যে তিনদিন পর তিনি অযোধ্যার শাসনভার হাতে নেবেন।"[১০]

৮ই ফেব্রুয়ারিতে এক ঘোষণাপত্রে সকলকে জানানো হলো যে, ঐদিন থেকে অযোধ্যার লোকেরা ব্রিটিশ সরকারের প্রজা হলো। এই কাজের সমর্থনে ডালহাউসির ঘোষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বললেন, "অযোধ্যার যে শাসনযন্ত্র লক্ষ-লক্ষ লোককে দুঃখদৈন্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি আর এক মুহূর্তের জন্যেও সহ্য করা হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বর ও মানুষের সামনে দোষী বলে গণ্য হবে।"

নবাবকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতায় নির্বাসিত করা হলো। তাঁকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হলো যে, যদি তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতেন, তাহলে তাঁকে বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হতো। যাই হোক, এইভাবে সমস্ত পবিত্র সন্ধি-চুক্তিগুলি উপেক্ষা করে একটি রক্ষিত মিত্র রাজ্যকে গ্রাস করবার পর ইংরেজ শাসকরা গর্ব করে বলতে লাগল, "এখন জনসাধারণের বেশির ভাগই তাদের কাজের সমর্থন করে, সুতরাং নতুন সরকার খুবই নিরাপদ।"[১১] জনসাধারণের ইংরেজের প্রতি কতখানি দরদ ছিল তা অবশ্য তারা এক বছর যেতে না-যেতেই জানিয়ে দিয়েছিল।

অযোধ্যা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই তালুকদার ও কৃষকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার তাদের সেটলমেন্ট অফিসারদের লেলিয়ে দিল। তাদের ওপর চলতে লাগল বার্ড ও টোমাসনের ষ্টিম-রোলার। কর্নেল স্লীম্যান লিখিত 'ডায়েরি অফ এ টুর ইন আউধ' ছাপা হয়ে গুপ্তভাবে ইংরেজ কর্মচারিদের মধ্যে প্রচারিত হলো। এই বইতে তালুকদারদের একদল দস্যু, দখলকারী ও হত্যাকারী বলে অভি-

১০. Ball : vol. I, p. 151

১১. Kaye : *History of the Sepoy War in India*, vol. III, p. 418

হিত করা হয়েছিল এবং তাদের পিষে-সমান-করে দেওয়ার নীতি সুপারিশ করা হয়েছিল। তালুকদারদের অগ্রাহ্য করে সেটলমেণ্টের অফিসাররা সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে নতুন করে জমি ও খাজনার বন্দোবস্ত করল। তালুকদারদের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা যেসব দুর্গ ছিল তার অনেকগুলিই ইংরেজরা ধ্বংস করে দিল, জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলা হলো; আর তাদের যেসব সৈন্যসামন্ত ছিল তাদেরও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে বিদায় করে দেওয়া হলো। এদের কিছু কিছু লোক কৃষি-কার্যে নিযুক্ত হলো, কিন্তু বেশির ভাগই বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। নবাবের বাহিনীতে যে ৬০ হাজার সৈন্য ছিল তাদেরও এই একই দুরবস্থা হলো।

তালুকদারি উঠে যাওয়ার ফলে কৃষকরা কিন্তু মোটেই লাভবান হলো না। বর্ধিত খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্দশাও বেড়ে গেল। একজন ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন,—"আমরা মানুষকে সুখী করার চেয়ে আমাদের রাজভাণ্ডার পূর্ণ করার দিকেই বেশি জোর দিয়েছিলাম। স্ট্যাম্পের ওপর ট্যাক্স, দরখাস্তের ওপর ট্যাক্স, খাদ্যদ্রব্যের ওপর, বাড়ির ওপর, খেয়া পার হবার ওপর —সবকিছুর ওপর ট্যাক্স। তারপর সবকিছুই কনট্রাক্টরকে দেওয়া হতো; আফিং-এর কনট্রাক্ট, খাদ্যশস্যের কনট্রাক্ট লবণের কনট্রাক্ট—যা প্যারিসে অকট্রোয়া নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।"[১২]

মোট কথা, ইংরেজ শাসনে অযোধ্যার কোনো শ্রেণীর লোকই সন্তুষ্ট হতে পারেনি; উচ্চতম সামন্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্নতম কৃষক পর্যন্ত সকলেই তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে জমির সমস্যাই ছিল মহাবিদ্রোহের মূল কারণ—টোটার প্রশ্ন, ধর্মের প্রশ্ন ইত্যাদি প্রশ্নগুলি ছিল গৌণ। এই অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্যেই অযোধ্যায় সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। তৎকালীন ভারতের অবস্থায় সামন্তশ্রেণীই 'স্বাভাবিক নেতা' হিসেবে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সকল শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই এই বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করেছিল।

১৮৫৭ সনে মার্চ মাসে হেনরি লরেন্স চিফ-কমিশনার হয়ে অযোধ্যায় এসে বুঝতে পারলেন যে, এই বারুদখানায় যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে। তিনি তালুকদারদের ও সিপাহিদের কিছু সুবিধা দিয়ে, কিছু মিষ্টি কথা বলে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। এবং সারা এপ্রিল মাস ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দরবার করলেন। মুসলমানদের বললেন যে, ইংরেজরা শিখদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের মুক্ত করেছে এবং শিখদেশের অভ্যন্তরে, মাঞ্ঝা প্রদেশেও আজ মুসলমানরা স্বাধীনভাবে নমাজ পড়তে পারছে।

১২. Rees, p. 34

হিন্দুদের লরেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমান রাজত্বে তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, আজ কি তার চেয়ে তাঁরা ভালো অবস্থায় নেই ? স্বৈরাচারী নবাবের অধীনে ফিরে গেলে তাঁদের কি ভালো হবে ? আর শিখদের বললেন, শিখ ও মুসলমানদের প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনাটা যেন তারা ভুলে না যায়। রাজা ও তালুকদারদের বললেন, দেশে যদি অরাজকতার সৃষ্টি হয়, যদি কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁরাই তাঁদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছিল যে, সাম্রাজ্যবাদীদের চিরাচরিত ভেদনীতির কৌশল প্রয়োগ করেও শেষরক্ষা হলো না। চারদিকে অসন্তোষ নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। গুরুত্বটা লরেন্স নিজেও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন, যেদিন ১৮ই এপ্রিল রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যাবার সময় একটা ঢিল এসে তাঁর মাথার উপর পড়ল।

২রা মে তারিখে ৭ম বাহিনীকে টোটা ব্যবহার করতে হুকুম করা হলে তারা আদেশ অমান্য করে। দু' একদিন পর এই বাহিনীকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের খবর লখনৌতে এসে পৌঁছল ১৫ই মে। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন সমগ্র অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং জুন মাসের প্রথম দিকেই "অযোধ্যায় ইংরেজ শাসন একটা স্বপ্নের মতো বিলীন হয়ে গেল, তার পেছনে শুধু একটা ভগ্নস্তূপ রেখে গেল। সিপাহিরা বিদ্রোহ করল ও জনসাধারণ ইংরেজের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করল ; কিন্তু কোনোরকম লুঠপাট, ধ্বংস বা নিষ্ঠুরতা ঘটল না।"[১৩] কিছুদিনের মধ্যেই তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে অযোধ্যার এক লক্ষেরও অধিক সাধারণ মানুষ অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো।

বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে দেখে হেনরি লরেন্স রেসিডেন্সিকে কেন্দ্র করে ৬০ একর জায়গা নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। চারিদিকে পরিখা খনন করে, দেওয়ালগুলিকে মেরামত ও মজবুত করে, দরজা ও জানালার নিকট ব্যারিকেড তৈরি করে ; চারিদিকে কামানের ব্যাটারি প্রস্তুত করে ও সৈন্য সমাবেশ করে, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য সবরকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন। দিন দিন রেসিডেন্সি শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। অধিকন্তু লখনৌ শহরে বিদ্রোহের কোনো চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে লরেন্স ক্যানিংকে ২৩শে জুন গর্ব করে লিখলেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমরা একেবারেই আক্রান্ত হব কি না। আমাদের প্রস্তুতির ফলে শত্রুরা খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।"[১৪] আবার ২৭শে জুন তারিখে তিনি জেনারেল

১৩. Forrest : *History*..., vol. I, p. 217

১৪. *Ibid*, p. 345

হ্যাভলক ও হুইলারকে একই মর্মে তাঁর বিশ্বাস ও আশার কথা জানালেন।

তিনদিন যেতে না-যেতেই ৩০শে জুন রাত ৯টায় লখনৌতে অবস্থিত সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্তু ইংরেজের কামানের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিদ্রোহীরা শহরে প্রবেশ করতে পারল না। বিদ্রোহীদের ধ্বংস করার জন্তে পরদিন লরেন্স তাদের সদলবলে আক্রমণ করলেন। লখনৌ থেকে ৮ মাইল দূরে চিনহাট নামক একটি গ্রামে বিদ্রোহীরা আশ্রয় নিল। তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ হাজার—১৫ বা ১৬ হাজার নয় এবং তাদের কামান ছিল ১৩টি,—৩৬টি নয়।

ইংরেজরা সিপাহিদের ওপর আক্রমণ শুরু করল—তারা ভেবেছিল আক্রান্ত হলেই সিপাহিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চতুর্দিকে পালাবে। কিন্তু সিপাহিরা যেরকম কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজদের ওপর প্রতি-আক্রমণ শুরু করল, তাতে তারা খুবই অবাক হয়ে গেল। ধ্বংস অনিবার্য দেখে ইংরেজদের পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, দু'পক্ষে যখন ঘোরতর কামানযুদ্ধ চলেছে তখন "দেখা গেল যে, শত্রু-বাহিনীর মধ্যভাগ পিছনে হঠে যাচ্ছে—মনে হলো যেন আমাদেরই জয় হচ্ছে।...কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ঝড়ের পূর্বেকার স্তব্ধতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাণ্ড মাঠটা যেন কেঁপে উঠল এবং আমাদের ওপর দিয়ে লৌহঝড় বয়ে যেতে লাগল এবং ঘাসের গোড়াগুলি থেকে, প্রত্যেক গর্ত থেকে ধোঁয়া বের হয়ে আমাদের দু'পাশ ছেয়ে ফেলে দিল। আমাদের কামানগুলি থেকেও অবিশ্রাম ধারায় গোলাবর্ষণ হতে থাকল। কিন্তু বন্যার স্রোত ক্রমশ এগিয়েই আসতে লাগল এবং শীঘ্রই শিখদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অযোধ্যার গোলন্দাজরা ও গাড়িচালকরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। ...অশ্বারোহীদের আক্রমণ করতে বলা হলো...কিন্তু শিখরা তাদের ঘোড়ার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে পালিয়ে গেল।" ইংরেজরা বারবার বিদ্রোহীদের হঠাতে চেষ্টা করল, কিন্তু বারবার তারা ব্যর্থ হলো। বিদ্রোহীরা এগোতেই থাকল এবং ইংরেজদের প্রায় ঘিরে ফেলবার উপক্রম করল। লরেন্স তখন বাধ্য হয়ে তাঁর সৈন্যদের পিছু হঠতে আদেশ দিলেন। তাঁদের এই পশ্চাদ্‌গমন পলায়নে পরিণত হলো —'সর্বপ্রকার শৃংখলাই নষ্ট হয়ে গেল'।[১৫]

বিদ্রোহীরা পলায়নপর ইংরেজের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। ইংরেজরা শহরে ফিরে লৌহ-সেতু দিয়ে রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করল। লৌহ-সেতু ও পাথর-সেতু

---

১৫. Forrest : *Ibid*, p. 233 (চিনহাটের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর ১১৮ জন ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যের প্রাণ গিয়েছিল, আর ৫৪ জন জখম হয়েছিল; তাদের ভারতীয় সৈন্যের মৃতের সংখ্যা ছিল ১৮২।)

দু'জায়গাতেই বিদ্রোহীরা বাধা পেল। "তারপর এই দুটি সেতুর কিছু দূরে তারা গোমতী পার হয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেল এবং চারিদিককার বাড়িগুলি দখল করে সেখান থেকে আমাদের পরিখার মধ্যে বন্দুক চালাতে লাগল। তখন থেকেই শুরু হলো লখনৌ রেসিডেন্সির বিখ্যাত অবরোধ।"[১৬]

এইভাবে ১লা জুলাইতে রেসিডেন্সি অবরোধ শুরু হলো। অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহী সিপাহিদের মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল, চিনহাটে ও রেসিডেন্সিতেও তা দেখা গেল। মেজর-জেনারেল ইনেস (যিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) বলেছেন: "বিদ্রোহীদের নেতৃত্বের অভাব ছিল।...১লা জুলাই রাত্রিতে তারা তাদের স্থানত্যাগ করে চলে গিয়েছিল...এবং এই কারণে মুচি ভবন থেকে বিনা বাধায় ইংরেজরা এসে একত্রিত হতে পেরেছিল। তাদের নেতারা তাদের চালনা করার পরিবর্তে, রাজদরবারের চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ছিল এবং ৭ই জুন পর্যন্ত তারা কোনোরকম সামরিক ব্যবস্থাই অবলম্বন করেনি।"[১৭] সিপাহিদের ওপর নেতৃত্বের অনবরত হাত বদল হচ্ছিল; যুদ্ধ পরিচালনা করার কোনো সঠিক পরিকল্পনাও তাদের ছিল না।

রেসিডেন্সিতে ১,৭২০ জন সৈন্যের মধ্যে ১,০০৮ জন ছিল ইংরেজ, আর ৭১২ জন ভারতীয়। আর ছিল বেসামরিক ১,২৮০ জন — তার মধ্যে ৬০০ জন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশু, আর বাদবাকি ৬৮০ জনের প্রায় সকলেই দাসদাসী। ৮৭ দিন যুদ্ধের পর ২৫শে সেপ্টেম্বর রেসিডেন্সির অবরুদ্ধদের ইংরেজরা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। ১,০০৮ জন ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বর মাত্র ৫৭৭ জনকে জীবিত পাওয়া গিয়েছিল এবং তাদেরও বেশির ভাগ জখম কিংবা অসুস্থ ছিল। মৃতদের মধ্যে ছিলেন হেনরি লরেন্স, জুডিসিয়াল কমিশনার ওমানি এবং মেজর ব্যাঙ্কস, চিফ-এঞ্জিনিয়ার অ্যাণ্ডারসন প্রভৃতি। ৯ জন ইংরেজ গোলন্দাজ-অফিসারের মধ্যে মাত্র ৪ জন বেঁচে ছিলেন; ৯ জন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও ৫৩ জন শিশু মারা গিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে নিহত হয়েছিল ১৩০ জন, আর পালিয়েছিল ২৩০ জন। অর্থাৎ অতি বিপজ্জনক ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় সৈন্য রেসিডেন্সি ত্যাগ করেছিল।[১৮] এই পলাতকদের মধ্যে শিখদের সংখ্যাও কম ছিল না।[১৯]

১৬. *Ibid*, p. 236

১৭. Lt-Gen. Mcleod Innes : *Lucknow and Oudh in the Mutiny*, p. 116

১৮. Forrest : *Ibid*, p. 237

১৯. *Ibid*, p. 333. চিনহাটের যুদ্ধ সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ অফিসার বলেছেন : "শত্রুরা যেসব স্থান দখল করেছিল তা খুবই প্রশংসাজনক

লখনৌর অবরুদ্ধদের উদ্ধার করবার জন্যে জেনারেল হ্যাভলক ২০শে জুলাই কানপুর থেকে যাত্রা করলেন। ২৯শে জুলাই উনাউ শহর থেকে ৮ মাইল দূরে বসিরতগঞ্জে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো। ফরেস্ট এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বলেছেন: "যখন আমাদের লোকরা গ্রামটির দিকে অগ্রসর হলো তখন বাড়িগুলির দেওয়ালের ছিদ্রগুলি থেকে ভয়ানকভাবে গুলীবর্ষণ হতে লাগল।···আমরা গ্রামটিতে আগুন ধরিয়ে দিলাম, তার পরেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। ···অযোধ্যার গোলন্দাজরা, যারা সৈনিক হিসেবে খুব ভালো শিক্ষা পেয়েছিল, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একগুঁয়ের মতো যুদ্ধ করে চলল এবং তাদের কামানের পাশে দাঁড়িয়ে ধ্বংস হলো।"[২০] হ্যাভলকেরও এত ক্ষতি হলো যে, তাঁকে পিছু হঠে গিয়ে মঙ্গলভারে অপেক্ষা করতে হলো, যখন নতুন সৈন্যদল এসে পৌছল তখন আবার তিনি লখনৌর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। পুনরায় ৫ই আগস্টে বসিরতগঞ্জের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যুদ্ধ হলো। বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ এতই তীব্র হলো যে, হ্যাভলককে আবার মঙ্গলভারে ফিরে যেতে হলো। ইংরেজরা ফিরে যাবার সময় বিদ্রোহীরা ১২ই আগস্ট বুড়িয়াকা-চৌকিতে আবার তাদের আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে হ্যাভলক খবর পেলেন যে, কানপুরের অবস্থা আবার সংকটজনক হয়ে উঠেছে—৫ হাজার বিদ্রোহী কানপুর ও বিধুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হ্যাভলককে বাধ্য হয়ে কানপুরে ফিরতে হলো। এইভাবে অবরুদ্ধ লখনৌর প্রথম উদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। অবরুদ্ধ ইংরেজদের নায়ক ব্রিগেডিয়ার জন ইংলিশের স্ত্রী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "শিখরাও যে বিক্ষুব্ধ তা সন্দেহ করা হয়েছিল। জন প্রয়োজনীয় সাবধানতার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। জন তাদের এমন জায়গায় কাজ দিলেন যে, তারা ৩২-তম বাহিনীর (ইংরেজ) আয়ত্তাধীনে থাকল এবং নিজেদের জীবনকে বিপদগ্রস্ত না করে আর তাদের পালাবার পথ থাকল না; তা সত্ত্বেও, আমাদের ঘরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা চিন্তা করতেও কিরকম ভয়ংকর লাগে।"[২১]

হ্যাভলক কানপুর ত্যাগ করে আবার ১৮ই সেপ্টেম্বর লখনৌর দিকে যাত্রা করলেন। ২১শে তারিখে যদিও একমাত্র মঙ্গলভার ছাড়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে আর কোথাও সম্মুখযুদ্ধ হয়নি, তবুও তাদের গেরিলা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের

এবং তারা যে রকম নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিল তা একটি মহত্তর আদর্শের জন্যই উপযুক্ত। বিদ্রোহীরা যদি তাদের নায়ককে সঠিকভাবে মেনে চলত··· তাহলে আমাদের একটি লোকও লখনৌতে ফিরে এসে আমাদের সর্বনাশের কাহিনী বলতে পারত না।" (Rees, p.70)

২০. Forrest : *History* . , vol. I, p. 483-8১

২১. Rees : *Siege of Lucknow*, p. 63

অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। রেসিডেন্সির আত্মরক্ষার ক্ষমতা যে তখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল, তা সহজেই অনুমেয়; খাদ্যদ্রব্যের আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না; সৈন্যসংখ্যাও অর্ধেকের বেশি কমে গিয়েছিল। এই অবস্থায় আর এক সপ্তাহও বোধহয় তাদের টি°কে' থাকা সম্ভব হতো না। রেসিডেন্সির একজন ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন, "যদি তাঁরা (হ্যাভলক ও আউটরাম) শেষ মুহূর্তে এসে না পৌঁছতেন, তাহলে আমাদের নেটিভ সিপাহিরা, যারা এ পর্যন্ত খুবই মহত্ত্ব দেখিয়েছে এবং প্রশংসনীয় বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের ত্যাগ করে চলে যেত। যদি তারা তা করত, তাহলে তাদের কোনো দোষও দেওয়া যেত না, কারণ জীবন হচ্ছে মধুর; আর তাছাড়া আশা-ভরসা আমাদের একেবারেই ছিল না।"[২২] কিন্তু নেটিভদের রাজভক্তি যে সব ইংরেজ-রাই সমানভাবে তারিফ করত তা নয়। হ্যাভলকের বীরসৈন্যরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, একটা বিদ্রোহীকেও তারা জীবিত রাখবে না এবং তারা কালা আদমি মাত্রকেই বিদ্রোহী বলে গণ্য করতে শিখেছিল। ২৬শে তারিখে রেসিডেন্সিতে ঢুকে প্রথমেই তারা তাদের বীরত্ব দেখাল কয়েকজন রাজভক্ত সিপাহিকে খুন করে।[২৩] ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের ইতিহাসে রাজভক্তির এমন বিয়োগান্ত নজির অনেক পাওয়া যায়।

কানপুর ত্যাগ করার পর আলমবাগ পর্যন্ত ৬ দিনের যুদ্ধের ফলে হ্যাভলকের বাহিনীর ২০৭ জন নিহত হয়েছিল, আর আলমবাগ থেকে রেসিডেন্সিতে পৌঁছতে ৩১ জন অফিসার ও ৫০৪ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল।[২৪] নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 'হিরো'—কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর হত্যাকাণ্ডের বীর জেনারেল নীল।

কিন্তু এত বড় বিজয়ের পরও রেসিডেন্সির অধিবাসীরা খুব উৎফুল্ল হতে পারল না। রেসিডেন্সির একজন ইংরেজ মহিলা ২৭শে সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন: "এই দিনটা সকলের পক্ষেই খুব বেদনাদায়ক হয়েছিল; সকলেই খুব ভগ্নোদ্যম এবং সকলেই বুঝতে পারল যে আমরা উদ্ধার পাইনি। আমাদের বিপদের তুলনায় আমাদের সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম এবং মজুত খাদ্যের তুলনায় তারা খুবই বেশি।"[২৫] এর ওপর আবার খবর এলো যে, শহরে ১ লক্ষ সশস্ত্র লোক জমায়েত হয়েছে এবং নানাসাহেবও উপস্থিত আছেন। সাংগঠনিক কাজে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে নানাসাহেব কোনো কৃতিত্ব না দেখালেও তাঁর নাম শুনলেই

২২. Rees : *Personal Narrative ...*, p. 248
২৩. Joyce : *Ordeal at Lucknow*, p. 235
২৪. Forrest : *History...*, vol. II, p. 63
২৫. Mrs. Case : *Day by Day at Lucknow*, p. 121

আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ইংরেজই আতঙ্কিত হয়ে উঠত। এটাই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। আজও তারা তাঁকে ভুলতে পারেনি।

আরো অনেকদিন রেসিডেন্সির আশ্রিতদের অবরুদ্ধ হয়েই থাকতে হলো। ১০ই নভেম্বর ব্রিটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চিফ স্যার কলিন ক্যাম্পবেল ৫ হাজার জন সৈন্য ও ৩২টি কামান নিয়ে আলমবাগে পৌছালেন। ১৩ই তারিখে তাঁর আক্রমণ শুরু হবার পূর্বে তাঁর বাহিনীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন: "জোয়ানরা, আমি তোমাদের বলতে চাই যে, আমাদের সামনের কাজটা খুবই কঠিন ও বিপজ্জনক। ক্রাইমিয়াতে আমরা যতটা বিপদের ও কঠিন কাজের সম্মুখীন হয়েছিলাম—আজকের কাজ তার চেয়েও বেশি কঠিন ও বিপজ্জনক।"[২৬] দিলখুসা ও লা-মার্টিনিয়ের দখল করার পর ক্যাম্পবেল আকস্মিক ভাবে সেকেন্দ্রাবাগ আক্রমণ করলেন। ২,৫০০ বিদ্রোহী অন্যত্র গিয়ে লড়বার জন্যে এখানে জমায়েত হয়েছিল এবং এর পিছন দিকের সমস্ত দরজাগুলিই বন্ধ ছিল। তাছাড়া, এই সিপাহিদের সঙ্গে কোনো কামানও ছিল না। শত্রুর কামানের গোলাতে তাদের বেশির ভাগই ধ্বংস হলো। তারপর ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রতিটি বিদ্রোহীই শেষ পর্যন্ত লড়াই করে প্রাণ দিল।

এছাড়া সেকেন্দ্রাবাগের যুদ্ধের আর একটি ঘটনা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেকেন্দ্রাবাগের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা ঝাঁকড়া পিপ্পল গাছ ছিল ও তার গোড়ায় কতকগুলি জলের কলসী ছিল। একজন ইংরেজ অফিসার লিখেছেন, "হত্যাকাণ্ড যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন আমাদের অনেক লোক ছায়ার জন্যে ও তাদের অসহ্য তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে ঐ গাছের নিচে যাচ্ছিল।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, অনেক ইংরেজ সৈন্য মৃত অবস্থায় গাছের গোড়ায় পড়ে আছে। এতে অনেকের সন্দেহ হলো। ওয়ালেস নামক একজন ইংরেজ সৈন্য পিছনে হঠে গাছের ওপরে ভালো করে দেখতে লাগল। "পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি,' তারপরে সে গুলী ছুঁড়ল এবং তৎক্ষণাৎ একটা লাল কোট ও গোলাপী রঙের সিল্কের পাতলুন পরা এক ব্যক্তির দেহ মাটিতে এসে পড়ল। জোরে পড়ার ফলে তার কোটের বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখা গেল, সে একজন স্ত্রীলোক। তার সঙ্গে পুরনো ধরনের দুটি পিস্তল ছিল, একটি গুলীভরা অবস্থায় তার বেল্টেই ছিল এবং আর একটির দ্বারা সে ছয় জনের প্রাণনাশ করেছিল।"[২৭]

চারদিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৭ই নভেম্বর রেসিডেন্সি উদ্ধার হলো।

২৬. Forbes-Mitchel : *Reminiscences of the Great Mutiny*, p. 33

২৭. *Ibid*, p. 58

কিন্তু আবার ২২শে তারিখে সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রেসিডেন্সি ত্যাগ করে ক্যাম্পবেলকে কানপুর অভিমুখে ছুটতে হলো। আউটরাম তাঁর বাহিনী নিয়ে আলমবাগে রয়ে গেলেন।

লখনৌর এই যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্রোহে মহিলাদের অংশগ্রহণ। হ্যাভলকের বাহিনী যখন শহরের মধ্যে প্রবেশ করছিল (একজন ইংরেজের কথায়) "তখন সামনে থেকে ও পাশের রাস্তাগুলি থেকে প্রতিটি ছাদের উপর থেকে, প্রতিটি জানালা ও বারান্দা থেকে আমাদের ওপর অজস্র গুলীবর্ষণ হচ্ছিল।... স্ত্রীলোকদের মধ্যেও অনেকে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে তারা কেউ কেউ বন্দুক চালাচ্ছিল আর অনেকে ইট পাথর ছুঁড়ে মারছিল।"[২৮] আর একজন ইংরেজ অফিসার বলেন, কয়েকজন নিগ্রো স্ত্রীলোক সেকেন্দ্রাবাগে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল – "তারা হিংস্র বিড়ালের মতো লড়েছিল এবং তাদের মৃত্যুর পরই বোঝা গিয়েছিল যে তারা স্ত্রীলোক।"[২৯] এবং আর একজন ইংরেজ অফিসার তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে, কিভাবে একজন বৃদ্ধা লোহার সেতুতে একটা বড় বোমায় আগুন লাগাতে গিয়ে মারা গিয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৩০]

কিন্তু সিপাহি ও জনসাধারণের এত বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও তারা যে পরাজিত হতে লাগল তার প্রধান কারণ, দিল্লি ও কানপুরের মতোই, বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের একান্ত অভাব।[৩১] দিল্লির মতোই লখনৌতেও সিপাহিরা বিদ্রোহ করার পরই একটা 'কোর্ট' স্থাপন করেছিল এবং সিংহাসনচ্যুত নবাবের শিশুপুত্র বিরজিশ কদ্দরকে অযোধ্যার নবাব বলে ঘোষণা করেছিল এবং সেই শিশুর মাতা হজরত মহল-কে বেগম বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। একজন সমসাময়িক ইংরেজ লেখক কোর্টের সদস্য হিসেবে ৫ জনের নাম দিয়েছেন: ক্যাপ্টেন রঘুনাথ সিং, ক্যাপ্টেন উমরাও সিং, ক্যাপ্টেন ইমদাদ হুসেন, দারোগা ওয়াজিদ আলি, মাম্মুখাঁ

২৮. Archibald Forbes : *Havelock*, 1897. p. 198

২৯. Lt-Col. Gordon Alexander : *Recollections* ..., p. 194

৩০. Majendie : *Up Among the Pandies*, pp. 236-38

৩১. "The sepoys proved by their heavy losses that it was not courage in which they were lacking, but as at Delhi, leadership. If they had been led by men who were acquainted with the operations of war, the English commander would have found it impossible to hold his extended position and keep open his communication with Cawnpore." (Forrest : *History*..., vol. II, p. 290)

সরফউদ্দৌলা।[৩২] কিন্তু এই 'কোর্ট' দিল্লিতে তার যতটা আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিল, লখনৌতে তার কিছুই পারেনি। সিপাহিদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ তো ছিলই, তাছাড়া সামন্ত রাজাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে তারা বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

অযোধ্যা ও লখনৌতেও প্রথম থেকে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত বিভক্ত—অযোধ্যার নবাব পরিবারের সামন্ত-আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, সিপাহিদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজস্ব পৃথক চিন্তা, সামন্তরাজা ও তাদের অনুগত জনসাধারণের সশস্ত্র বাহিনীর রণকৌশল, ফয়জাবাদের মৌলভির পরিকল্পনা, এতগুলি বিভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী চিন্তাস্রোত ও সমাজশক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। এবং এই সমস্ত বিভিন্ন দলের মধ্যে অনবরত নেতৃত্বের হাত বদল হচ্ছিল।[৩৩]

এই অবস্থার মধ্যে বেগম হজরত মহল নেতৃত্ব স্থাপনের জন্যে যে সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই অবিস্মরণীয়। তাঁকে অযোধ্যার রাণী বলে রাজা, নবাব, হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন। বেগম সিপাহিদের মধ্যে ও শাসনকার্যে শৃংখলা স্থাপনের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনেক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েও সিপাহিদের উৎসাহিত করেছিলেন। যখন ইংরেজরা লখনৌকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল, যখন লখনৌতে বিদ্রোহীদের সংকট ঘনীভূত হয়ে এসেছিল, কানপুরে নানাসাহেবের দ্বিতীয়বার পরাজয় ঘটেছিল, সেই রকম হতাশাপূর্ণ অবস্থাতেও বেগম অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৩৪]

৩২. Hutchinson : *Narrative of the Mutinies in Oudh*, p. 180

৩৩ "The command of the (rebel) army was constantly being changed, as also the control and guidance of the operations against the Residency. There were a number of more or less self-constituted authorities, such as the Fyzabad Maulvi and sundry favourites of the rebel court, which had been formed in the city" (Lt-Gen. McLeod Innes : *Lucknow and Oudh in the Mutiny*, p. 31)

৩৪. "This Begum exhibits great energy and ability. She has excited all Oudh to take up the interests of her son (Birjis Kuddar), and the chiefs have sworn to be faithful to him. The Begum declares undying war against us.··· It appears, from the

কানপুর হস্তচ্যুত হওয়ার পর তাঁতিয়া টোপী নানা সাহেবের অনুমতি নিয়ে গোয়ালিয়ার চলে যান। সেখানকার শক্তিশালী গোয়ালিয়ার কনটিনজেণ্ট জুন মাস থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসেছিল ; অবশেষে তাঁরা তাঁতিয়ার সঙ্গে যোগ দিত সম্মত হয়ে ৯ই সেপ্টেম্বর কল্পিতে এসে পৌছল। ২৭ শে নভেম্বর নানাসাহেব কানপুর আক্রমণ করলেন ও জেনারেল উইণ্ডহামকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে কানপুর পুনরায় দখল করলেন ; উইণ্ডহাম ইনটেঞ্চমেণ্টে আশ্রয় নিলেন। নানা এইখানে মস্ত বড় একটা ভুল করলেন – গঙ্গার উপরকার নৌকার সেতু ভেঙ্গে দিলেন না। ২৯ তারিখে ক্যাম্পবেলের বাহিনী একরকম বিনা বাধায় সেতু পার হয়ে কানপুরে প্রবেশ করল ; এর ফলে এলাহাবাদের পথ, যে পথ দিয়ে একটা বিরাট ইংরেজ বাহিনী আসছিল, তাদের নিকট খোলাই রইল। নানাসাহেব আরো ভুল করলেন শত্রুকে ৫-৬ দিন সময় দিয়ে। ক্যাম্পবেলের বাহিনী তখন লখনৌর স্ত্রীলোক, শিশু ও অসুস্থদের এলাহাবাদে পৌছে দিতে ব্যস্ত। এই সুযোগে যদি বিদ্রোহীরা ক্যাম্পবেলকে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করত, তাহলে তাদের প্রতিরোধ করা কিংবা সেতু রক্ষা করার মতো শক্তি ক্যাম্পবেলের হতো না। তাঁতিয়া ৪ঠা ডিসেম্বরে এই ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করলেন ; তিনি প্রচণ্ডভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন এবং সেতু ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে তাঁকে ব্যর্থ হতে হলো।

ঠিক এই সময় ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর কলকাতা থেকে ৫,৬০০ সৈন্যের একটা ইংরেজ বাহিনী ৩৫টি কামান নিয়ে কানপুর পৌছে গেল। তাছাড়া দিল্লি থেকেও একটা বড় বাহিনী হোপ গ্র্যাণ্টের নেতৃত্বে এদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। ৬ই তারিখে ইংরেজরাই বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। সমস্ত দিনরাত্রিব্যাপী যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কানপুর ত্যাগ করল এবং নানাসাহেবও নদী পার হয়ে অযোধ্যায় চলে গেলেন।

কিছুদিন পর ফতেগড় আক্রান্ত হলো। কানপুর থেকে ৮০ মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারে এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে জনসাধারণ ও সিপাহিরা ফরাক্কাবাদের নবাবের অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং কর্নেল স্মিথ ও অন্যান্য ইংরেজদের পালাতে হয়েছিল। ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে ফতেগড় দু'দিক থেকে ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হলো – একদল এলো দিল্লি থেকে আর একদল কানপুর থেকে। ৩রা জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে ইংরেজরা আবার ফতেগড় অধিকার

---

energetic character of these Ranees and Begums, that they acquire in their zenanas and harems, a considerable amount of actual mental power. Their contests for ascendency over the minds of the men give vigour and acuteness to their intellect." (W. H. Russell : *My Indian Mutiny Diary*, 1957 ed., pp. 71-72)

করল। ঐ দিনই ফরাক্কাবাদের নবাবকে ফাঁসি দেওয়া হলো। "প্রথমত, তাঁর শরীরে সর্বত্র শুয়োরের চর্বি ঢেলে দেওয়া হলো এবং ঝাড়ুদার দিয়ে তাঁকে বেত মারা হলো, তারপর তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। এটা করা হয়েছিল কমিশনারের হুকুমে।"৩৫

কমিশনার পাওয়ার সমগ্র ফতেগড় জেলা ঘুরে বেড়ালেন এবং জোয়ান লোক দেখামাত্রই তাদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলালেন। একমাত্র মাও নামক একটা ছোট জায়গায় তিন দিনের মধ্যে একটা বড় পিপ্পল গাছের শাখায় ১০০ লোককে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। পাওয়ারের বন্ধুরা তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'হ্যাঙ্গিং পাওয়ার' (Hanging Power) বলে ডাকতেন।৩৬ ফতেগড় সম্বন্ধে ফোরবস্-মিচেল বলেছেন: "কমিশনার পুলিশ স্টেশনে তাঁর আদালত বসালেন। আমি জানি না বন্দীদের কিভাবে বিচার করা হয়েছিল, অথবা কিরকম সাক্ষ্য-প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আমি এইটুকু মাত্র জানি যে, বন্দীদের দলে দলে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তার পরক্ষণেই পুলিশ স্টেশনের সামনেই যে একটা মস্ত বড় বটগাছ ছিল, সেখানে আবার মার্চ করিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এই কাজ শুরু হয় বেলা ৩ টার সময় এবং অনবরত চলতে থাকে পরের দিন সকালবেলা পর্যন্ত। তখন দেখা গেল যে, গাছে আর একটুও জায়গা খালি নেই এবং ঐ সময়ের মধ্যে ১৩০ জনকে ঝোলানো হয়ে গিয়েছে। একটা ভয়াবহ দৃশ্য সন্দেহ নেই।" যে ইংরেজ বীরপুঙ্গব নিরস্ত্র বন্দী মোগল শাহজাদাদের স্বহস্তে খুন করে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল, সেই হাডসনও এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল। সেই হাডসন হেন বীরপুরুষও এই বীভৎস দৃশ্য দেখে ঘৃণায় বলে উঠেছিল: "এইসব কাজ আর আমার সহ্য হচ্ছে না। আমার যে এখন কোনো ডিউটি নেই তাতে আমি খুবই খুশি।"৩৭

কানপুর ও ফতেগড় দখলের পর সমগ্র গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, অন্তত তার শহরগুলি, ইংরেজের অধিকারে এলো এবং কলকাতা থেকে লাহোর, পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডটাই ইংরেজ সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামের যাতায়াতের জন্যে মুক্ত হলো। কিন্তু তখনো উত্তরে সমগ্র রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যা এবং দক্ষিণে সমগ্র বুন্দেলখণ্ড সম্পূর্ণ বিদ্রোহীদের অধিকারেই রয়ে গেল।

৩৫. Forbes-Mitchel : *Ibid*, p. 169

৩৬. Gordon-Alexander : *Recollections of a Highland subaltern*, p. 210

৩৭ Forbes-Mitchel : *Ibid*, pp. 169-71

নানা সাহেব

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ১৮১৮ সনে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকার পেন্সনে কাপুর থেকে ২৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারে বিঠুরে বাস করতে লাগলেন। ১৮৫১ সনে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি উইল করে তাঁর দত্তক দন্দুপন্থ নানাকে তাঁর সবকিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার নানাকে পেশোয়া বলেও স্বীকার করলেন না, ৮ লক্ষ টাকা পেন্সনও বন্ধ করে দিলেন এবং অন্যান্য অধিকারগুলি থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করলেন। পেন্সনের জন্যে তাঁর দরখাস্ত গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল যখন নামঞ্জুর করলেন, তখন নানা সাহেব কোর্ট-অফ ডাইরেক্টার্স-এর নিকট আপিল করবার জন্যে আজিমুল্লা খানকে ইংল্যাণ্ডে পাঠালেন।[১]

আজিমুল্লা খান অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা শিখে উন্নতিলাভ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যদিও তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, কিন্তু নানা সাহেবের পেন্সন সম্বন্ধে তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে পারলেন না। তারপর

১. পেন্সনের প্রসঙ্গে তখনকার সরকারি ইংরেজ মহলের মতামত ব্যক্ত করে *Delhi Gazette* (3 February, 1857) লিখেছিল যে বাজিরাওকে ৩৫ বছরে কোটি-কোটি টাকা পেন্সন দেওয়া হয়েছে, ইয়োরোপে এমন ব্যাপার কেউ কল্পনাও করতে পারে না। "বাজিরাওকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা দিয়ে একটা গঙ্গা ক্যানাল অথবা কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত রেল লাইন তৈরি করা যেতে পারত।" কথাগুলি ঠিকই—কিন্তু যারা চোরের উপর বাটপাড় তাদের মুখে একথা খাটে না। বাজিরাও ভারতীয়দের যেভাবে বঞ্চিত করছিল, ইংরেজরা তার চেয়ে ভারতবাসীর অনেক বেশি ক্ষতি করছিল। ইংরেজরাও ভারতবাসীকে শোষণ করে কোটি-কোটি টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে নীতিগত—ভারতীয়দের ভালোমন্দ বিচারের ভার ভারতীয়দেরই, বিদেশীদের নয়, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের ভার ভারতীয়দেরই ওপর—সেখানে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ অচল। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য এই যে, সামন্ততন্ত্র বিরোধী সমাজ-বিপ্লব তারা তখনো ঘটাতে পারেনি, আজও ঘটাতে পারেনি। তাই এখনো দেখা যায়, সাধারণ ভারতবাসীর কোটি-কোটি টাকা এই পরগাছাগুলি আত্মসাৎ করে নেয়।

লণ্ডন থেকে ভারতে ফিরবার পূর্বে তিনি ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ দেখবার জন্তে কনস্টান্টিনোপল যান। "যেসব রুস্তমরা, অর্থাৎ রুশরা, ইংরেজ ও ফরাসি উভয়কে হারিয়ে দিয়েছে" তাদের দেখবার জন্তে তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।[২] যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে তিনি রুশ ব্যাটারির কাজ পরিদর্শন করেছিলেন। এটাও শোনা যায় যে, কনস্টান্টিনোপলে থাকাকালীন আসন্ন ভারত-বিদ্রোহে সাহায্যার্থে তিনি কয়েকজন রুশ প্রতিনিধির সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে এ সম্পর্কে ফোরবস্-মিচেল যেটুকু তথ্য দিয়েছেন তা হলো এই, রুরকির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলি খান ইংরেজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সনে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির পূর্বে ফোরবস্-মিচেলকে মোহাম্মদ আলি কতকগুলি কথা বলেন। আজিমুল্লার সঙ্গে তিনিও ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, তারপর ক্রাইমিয়াতেও তাঁর সঙ্গে যান। তিনি আরো বলেন, "সেখানে আমরা ১৮ই জুন তারিখে ব্রিটিশের আক্রমণ ও পরাজয় দেখেছিলাম। সেখান থেকে আমরা কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যাই। সেখানে আমরা কয়েকজন প্রকৃত অথবা কৃত্রিম রুশ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আজিমুল্লা যদি ভারতে বিদ্রোহ ঘটাতে পারেন, তাহলে প্রচুর বাস্তব সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন বলে তাঁরা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সময়ই আমি ও আজিমুল্লা কোম্পানি-সরকারকে খতম করবার জন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।"[৩]

কানপুরের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানের জন্তে এখানে একটি ইংরেজ-গোলন্দাজ বাহিনী ও প্রায় ২,৫০০ সিপাহির থাকার জন্তে একটা বড় ক্যাণ্টনমেণ্ট ছিল এবং অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে বেসামরিক ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও খ্রীস্টান অধিবাসীর সংখ্যা কম ছিল না। মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের খবরের পর থেকেই শহরের অবস্থা দিনের পর দিন চঞ্চল হতে থাকল। কানপুর-বাহিনীর নায়ক জেনারেল হুইলার যে-কোনো দিন বিদ্রোহের আশংকা করতে লাগলেন। ২২শে তারিখে নানাসাহেব ২টি কামানসহ ৩০০ সৈন্য ইংরেজদের সাহায্যের জন্তে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হিলার্সডনের তখনো নানা সাহেবের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং সেজন্তে তিনি নানা সাহেবের ওপর ধনাগার, যেখানে ১০ লক্ষ টাকা মজুত ছিল, রক্ষার ভারও ছেড়ে দিলেন।

ইংরেজদের প্রতি নানার এরকম বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার সত্যিই আন্তরিক ছিল,

২. Russell : *My Diary in India*, vol. I, p. 165

৩. Forbes-Mitchel : *Reminiscences of the Great Mutiny*, p. 186

-না একটা ভানমাত্র, তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেই, ফরেস্ট, শেফার্ড প্রভৃতির মতে ইংরেজদের প্রতারণা করবার জন্যেই নানা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের ভান করেছিলেন।[৪] পক্ষান্তরে ড. রমেশ মজুমদার বলেছেন নানা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের বন্ধুই ছিলেন, বিদ্রোহী সিপাহিরাই তাঁকে ভয় দেখিয়ে ও জোর করে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু একথা প্রমাণ করার জন্যে ড. মজুমদার বিশেষ কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্য-প্রমাণ দিতে পারেন নি।

১লা জুন ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর সুবাদার টীকা সিং এবং আরো কয়েকজন নানা সাহেবের সঙ্গে বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। ২রা জুন একজন মাতাল ইংরেজ অফিসার ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর একজন প্রহরীকে গুলী করে। পরদিন সামরিক আদালতের বিচারে অচেতন অবস্থায় গুলী ছোঁড়ার অজুহাতে ইংরেজ বীরপুঙ্গবটি মুক্তিলাভ করে। ৪ঠা জুন হুইলার সমস্ত ইংরেজদের নিয়ে ও একমাসের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সুরক্ষিত ইনট্রেঞ্চমেণ্টে প্রবেশ করলেন। ৫ই জুন কানপুরের সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সুবাদার টীকা সিংকে ২য় অশ্বারোহীদের জেনারেল, জমাদার দলভঞ্জন সিংকে ৫৩-তম পদাতিকদের কর্নেল ও সুবাদার গঙ্গাদীনকে ৫৬-তম পদাতিকদের কর্নেল নিযুক্ত করা হলো। নানা সাহেবের বাহিনীর কম্যাণ্ডার জওলাপ্রসাদ হলো ব্রিগেডিয়ার।

টীকা সিং সম্বন্ধে স্যার জর্জ ট্রিভেলিয়ান তাঁর 'কানপুর' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন: "টীকা সিং তাঁর দুঃসাহস ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সিপাহিদের নেতৃস্থান অধিকার করেছিলেন।" (পৃ. ৬৭)। যখন বিদ্রোহী সিপাহিরা নানা সাহেবের অনুরোধে কানপুরে ফিরে এলো, "টীকা সিং তৎক্ষণাৎ ম্যাগাজিনে চলে গেলেন।···যেসব কামান কার্যকরী অবস্থায় ছিল সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ ইনট্রেঞ্চমেণ্টের দিকে পাঠিয়ে দিলেন, আর যেগুলি তখনই ব্যবহার করবার মতো অবস্থায় ছিল না সেগুলিকে পরিষ্কার করবার জন্যে মিস্ত্রিদের কাজে লাগিয়ে দিলেন। বিদ্রোহীদের বেশির ভাগই তাঁর মতো দূরদর্শিতা ও ধৈর্য দেখাতে

৪. Major Williams, যিনি ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কানপুরের বিদ্রোহের তদন্ত করার ভার পেয়েছিলেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন: "Whilst outwardly friendly, (Nana) inwardly carried a bitter hatred to all who bore the name of the British and seized favourable opportunity, then afforded him by the presence at Cawnpore, to temper with and foment the discontent of the native troops." ('Synopsis of Evidence of the Cawnpore Mutiny, quoted by Prof. P. C. Gupta in his *Nana Sahib & the Rising at Cawnpore*, p. 69)

পারেনি" (পৃ. ৮৮)। ৬ই তারিখে "টীকা সিং অস্ত্রাগারে সারাদিন কাজ করলেন। বড় বড় কামানগুলি ঠিকভাবে ব্যবস্থা করে ঠিক ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। যেই কামানগুলি আসতে লাগল, তখনই সেগুলিকে সঠিক স্থানে বসানো হলো এবং স্বেচ্ছাসেবকরা তার ভার বহন করল। পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে ব্যাটারির বেষ্টনী তৈরি করা শেষ হলো এবং আমাদের ইনট্রেঞ্চ-মেণ্ট চারদিক থেকে ২৪-পাউণ্ড গোলার আঘাতে কাঁপতে লাগল।" – (পৃ. ১০০)

৫ই জুন মধ্যরাত্রে কানপুরের সিপাহিরা টীকা সিং ও শামসউদ্দিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই সময়টায় বিদ্রোহীদের মধ্যে তাদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্রোহ ঘোষণা করেই সিপাহিরা দিল্লি অভিমুখে রওনা হলো। ইতিমধ্যে নানা সাহেবও স্থির করেছিলেন বিদ্রোহের কেন্দ্র দিল্লিতেই তিনি উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু আজি-মুল্লার পরামর্শ অনুসারেই নানা সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন। সিপাহিরা কানপুর ছেড়ে দিল্লির পথে যখন ৬ মাইল চলে গিয়েছে তখন নানার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয় এবং আলোচনার পর ইংরেজদের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্যে অনেক সিপাহি নানার সঙ্গে কানপুরে ফিরে এলেন।

কানপুরে বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা ইনট্রেঞ্চমেণ্টে আত্মরক্ষার জন্যে জড়ো হলো। বিদ্রোহী সিপাহিরা কানপুরে ফিরে এসেই এই ইনট্রেঞ্চমেণ্ট অবরোধ করল, এবং ৩ সপ্তাহ ধরে তার উপর গোলাগুলী পড়তে লাগল। ইতি-মধ্যে বহু স্থানীয় রাজা, নবাব ও জমিদার তাঁদের সৈন্যদল নিয়ে নানা সাহেবের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগলেন।[৫] প্রথমেই এলেন নবাব মহম্মদ আলি খান

৫. কানপুরেও অন্যান্য স্থানের মতো বিদ্রোহে প্রথমেই জনসাধারণ সিপাহি-দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং অনেক স্ত্রীলোকও তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। আজিজানের নেতৃত্বে একদল মহিলা সিপাহির পোশাক পরতেন, অস্ত্র হাতে ঘোড়ায় চড়ে শহরময় লোকদের ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে আহ্বান করতেন; আহত সিপাহিদের তাঁরা পরিচর্যা করতেন, জল দিতেন; যুদ্ধের লাইনেও তাঁরা সিপাহিদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলী সরবরাহ করতেন। নানকচাঁদ তাঁর ডায়েরিতে আজিজানের দুঃসাহসের খুবই প্রশংসা করেছেন। জানকীপ্রসাদ কর্নেল উইলিয়ামসের তদন্ত কমিশনের নিকট বলেছিলেন: "The day the flag was raised, she (Azizan) was on horse back in male attire decorated with medals, armed with a brace of pistols and joined the crusade. I saw her as thousands of others did also." অনেক ইংরেজ লেখকও আজিজান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। (George Trevelyan, p. 99)

(মুন্‌হে নবাব), ১৬ই জুন এলেন মীর নবাব ২ হাজার সৈন্য ও গোলন্দাজ নিয়ে। ২৩শে জুন (পলাশি যুদ্ধের দিন) বিদ্রোহীরা সকলে মিলে ইংরেজদের ওপর জোর আক্রমণ চালাল। আরো কিছুক্ষণ ঐভাবে আক্রমণ চালালে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে, বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ সিপাহি ও রাজা নবাবদের সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে তাদের সকলের ওপর একটা চূড়ান্ত নায়কত্ব (Supreme-Command) স্থাপন করতে পারছিল না। অন্যান্য স্থানের মতো কানপুরেও এটাই হয়ে দাঁড়াল বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

তিন সপ্তাহ পরে ইনট্রেঞ্চমেণ্ট রক্ষা করা ইংরেজদের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যেই তাদের বহু লোক হতাহত হয়েছে এবং তাদের রসদও ফুরিয়ে এসেছে।[৬] কলকাতা থেকে যে সাহায্য তারা আশা করেছিল তাও আসছে না। ১৬ই জুন নানাসাহেব হুইলারের নিকট প্রস্তাব করে পাঠালেন—"যারা লর্ড ডালহাউসির কাজের জন্যে দায়ী নয় ও যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের নিরাপদে এলাহাবাদ যেতে দেওয়া হবে।" এই শর্তে ঐ তারিখেই জেনারেল হুইলার আত্মসমর্পণ করলেন।[৭]

দুই পক্ষের কথাবার্তায় এই স্থির হলো যে, স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকল ইংরেজকেই নৌকা করে এলাহাবাদে পৌছে দেওয়া হবে ; প্রত্যেক ইংরেজ সৈন্য তাদের বন্দুক সমেত ৬০ রাউণ্ড করে গুলী সঙ্গে রাখতে পারবে, ইত্যাদি। এই সব প্রতিশ্রুতি মতো ২৭শে জুন কানপুরের সতীচৌরা ঘাটে এসে ইংরেজরা নৌকোয় উঠল। বেলা ৯টা আন্দাজ সকলের শেষে মেজর ভিবার্ট নৌকোতে চড়লেন। "মেজর ভিবার্ট নৌকোতে ওঠা মাত্রই 'চল' বলে নৌকো ছাড়ার আদেশ দেওয়া হলো। কিন্তু কিনারা থেকে একটা সংকেত পেয়ে নেটিভ মাঝিরা

৬. অধ্যাপক সেন তাঁর বইতে তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী (পৃ. ১৩৯-৪১) ইনট্রেঞ্চ-মেণ্টের ইংরেজ মহিলা ও শিশুদের দুঃখ-কষ্টের যে হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন তাতে অনেকেরই অশ্রুবর্ষণ হবে। এইসব কাহিনীর দ্বারাই ইংরেজ ইতি-হাসবিদরা তাদের সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখে। আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এইসব ইংরেজদের ও তাদের মহিলাদের ভারতবাসীরা নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসেনি।

৭. নানা সাহেবের প্রস্তাব যিনি হুইলারের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা, মিসেস গ্রীনউড, কানপুরের একজন প্রধান ইংরেজ ধনী-ব্যবসায়ীর স্ত্রী। ছিন্নবস্ত্রে, পাদুকাবিহীন অবস্থায় একটি শিশু কোলে নিয়ে গোলাগুলীর মধ্য দিয়ে তিনি নানার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন। M. Thompson : *Story of Cawnpore*, pp. 148-49)

—প্রত্যেক নৌকোয় তারা ৯ জন করে ছিল—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও কিনারার দিকে চলল। আমরা তৎক্ষণাৎ তাদের গুলী করলাম, কিন্তু বেশির ভাগই পালাতে সমর্থ হয়েছিল।"[৮] টমসনের উক্তিতেই দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজরাই—যারা তখনো একরকম বন্দী অবস্থাতেই ছিল—প্রথমে গুলী চালায় ও কয়েকজন ভারতীয় মাঝিকে হত্যা করে। তারপর বিদ্রোহীরাও গুলী চালাতে শুরু করে। প্রায় সকল ইংরেজ পুরুষই এবং অনেক স্ত্রীলোক ও শিশুও এতে নিহত হয়েছিল এবং টমসনকে নিয়ে মাত্র ৪ জন প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল।

এই ঘটনার ৩৭ বৎসর পরে কর্নেল মড্ তাঁর 'মেমরিজ অফ দি মিউটিনি'তে লিখেছিলেন : "কর্নেল উইলিয়াম্‌স (কানপুরের পুলিশ-কমিশনার) যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা খুব ভালোভাবে পড়ে এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে বলা যায়, নানাসাহেব এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বরং আমার মত এই যে, যদিও তিনি দোষী, আমি বলব যে তাঁর রক্ত-পিপাসু অনুচররাই তাঁকে এ বিষয়ে জড়িত করেছিল, যাদের কাজে তিনি বাধা দিতে সাহস করতেন না। এমনকি, আজও এবং আমাদের দেশেই দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, অনুরূপ পাশবিকতাকে ঐ একই ভাবে সহ্য করে যাওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক যে, নানাসাহেব অনেকবার অসহায় লোকদের সাহায্য করেছিলেন ; এমনকি, তাদের প্রতি সত্যিকারের দয়াও দেখিয়েছিলেন।[৯]

যেসব ইংরেজ কানপুরের এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এত পবিত্রতাপূর্ণ ক্রোধ দেখিয়েছেন, তাঁদের আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। জেনারেল নীল অনেক আগেই কানপুরের অবরুদ্ধদের উদ্ধার করতে পারতেন এবং হুইলারের আত্মসমর্পণ করবার কোনো প্রয়োজনই হতো না। কিন্তু নীল নেটিভ, 'নিগার'-দের পাইকারিভাবে ফাঁসি দিয়ে, স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে হত্যা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে বিদ্রোহীদের শিক্ষা দিতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কানপুরে পৌঁছতে তাঁর বেশ কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।[১০] জেনারেল নীলের হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচার আগে ঘটেছিল এবং সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ড পরে হয়েছিল। নীলের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের খবর কানপুরে

৮. *Ibid*, p. 163

৯. Col. J. C. Maude, vol. II, pp. 108-9

১০. অধ্যাপক সেন কানপুরে ইংরেজদের বীরত্বের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন এবং নীলের কথা বলতে গিয়ে নিজের কল্পনাশক্তিকে সংযত রাখতে পারেন নি, ক্রমওয়েলের বিপ্লবী সৈন্যদের সঙ্গেই তাকে মিশিয়ে দিয়েছেন—"A Christian of the old Puritan School, he would have been in his proper environment among Cromwell's Roundheads." (p. 151)

পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি এবং তা যে কানপুর অধিবাসীদের প্রতিশোধ নেবার আকাংক্ষাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ডের পর যেসব ইংরেজ বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে পুরুষদের গুলী করা হলো, ২০০ স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিবিঘরে বন্দী করে রাখা হলো। ১লা জুলাইতে নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁকে পেশোয়াশাহী পতাকার পাশে বাদশাহী পতাকা তুলে বিদ্রোহী কেন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করতে হলো।

কানপুরকে বাঁচাবার জন্যে জেনারেল হ্যাভলক একটি বাহিনী নিয়ে (১,৪০০ ব্রিটিশ ও ৫০০ শিখ)[১১] কলকাতা থেকে জুন মাসে যাত্রা করেছিলেন। তিনি ১২ই জুলাইতে ফতেপুর এসে পৌঁছলেন। নানাও সেখানে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। ফতেপুরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহী বাহিনী পাণ্ডু নদীর সেতু রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলো। এখানেও প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীদের হঠতে হলো। বিদ্রোহী সিপাহিরা যথেষ্ট দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়েছিল, কিন্তু তাদের নেতৃত্বের দুর্বলতাই তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল।[১২] পাণ্ডু নদীর ধারে নানা আর একটি মারাত্মক ভুল করলেন—তিনি ঠিক করেছিলেন যে এখানে হাতাহাতি যুদ্ধেই ইংরেজদের হারিয়ে দেবেন, সুতরাং পাণ্ডু নদীর সেতু ধ্বংস করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। যখন তাঁকে হঠতে হলো তখন তাড়াতাড়িতে এই পাথরের সেতুটি ধ্বংস করা সম্ভব হলো না। এই সেতু ধ্বংস করে দিতে

১১. হ্যাভলক তাঁর কামানগুলিকে ইংরেজ সৈন্যদের মাঝখানে রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন; শিখদের স্থান ছিল ইংরেজ সৈন্যদের পাশে ও কিছু দূরে; শিখরা যাতে ইংরেজদের কাছাকাছিও না যায় সেদিকে হ্যাভলক সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। (**Pratul Gupta : *Nana Sahib*, p. 127**)

১২. পাণ্ডু নদীর যুদ্ধ সম্বন্ধে **Lt. Crump** বলেছিলেন **"it was universally remarked how much closer and fiercer the mutineers fought that day.·· The inferior details of the movements were perfect but the master-mind was wanting." (quoted by Pratul Gupta, p. 138)**। এইটাই ঠিক কথা—প্রায় সব যুদ্ধেই বিদ্রোহী সিপাহি ও জনসাধারণ প্রাণপণেই লড়েছিল, কিন্তু তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে **'master-mind'**-এর অভাব ছিল। ১৭ই জুলাই-এর কানপুর যুদ্ধ সম্বন্ধে ফরেস্ট বলেছেন (***State Papers*, vol. II, pp. 91-92**), নানার লোকরা প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়েছিল, এবং তাদের লক্ষ্য আশ্চর্য রকমের অব্যর্থ ছিল। তারা অনেকক্ষণ ধরে ইংরেজদের হঠিয়ে রেখেছিল এবং তিনবার নিজেদের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিল।

পারলে হ্যাভলকের কানপুর আক্রমণ বেশ কিছুদিনের মতো স্থগিত রাখা যেত এবং আত্মরক্ষার জন্যে নানা যথেষ্ট সময়ও পেতেন। ১৭ই জুলাই কয়েকটা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর হ্যাভলক কানপুর দখল করলেন। বিদ্রোহীদের কানপুর ত্যাগ করার পূর্বে—বিবিঘরের বন্দীদের হত্যা করে একটা কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কানপুর হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে বিদ্রোহীদের ভয়ানক ক্ষতি হলো, কারণ এই শহরটি হলো এলাহাবাদ, লখনৌ, আগ্রা, এই সমস্ত অঞ্চলটার সামরিক কেন্দ্রস্থল। পক্ষান্তরে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের এই প্রথম বিজয়; সুতরাং সেই সময়কার তাদের অবনত রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থায় তাদের মনে নৈরাশ্যের স্থানে আশার সঞ্চার করেছিল।

যখন ২০শে তারিখে জেনারেল নীল এসে পৌছলেন, তখন হ্যাভলক তাঁর ওপর কানপুরের ভার দিয়ে ২৫শে জুলাই লখনৌর দিকে রওনা হয়ে গেলেন। নীল যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো কোনো রকমের কৃতিত্ব দেখান নি, কিন্তু নিরস্ত্র অসহায় ও নির্দোষ লোকের ওপর পাইকারিভাবে নৃশংস ও পাশবিক প্রতিশোধ নিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বস্তুত বারাণসী থেকে কানপুর পর্যন্ত তিনি যেভাবে জল্লাদের কাজ করেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও তার দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। কানপুর থেকে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন: "আমি নেটিভ-দের দেখাতে চাই যে, এই ধরনের কাজের জন্যে (সতীচৌরা ঘাট ও বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড) তাদের আমরা যে শাস্তি দেব তা হবে খুবই কঠোর, তা তাদের মনোবৃত্তিকে জঘন্যভাবে আঘাত করবে এবং চিরকালের মতো তা তাদের মনে থাকবে। আমি যে নিম্নলিখিত হুকুমটি জারি করেছিলাম, তা আমাদের কয়েক-জন ব্রাহ্মণ মনোভাবাপন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের নিকট যতই আপত্তিজনক হোক না কেন, আমি মনে করি কানপুরে তা খুবই ঠিক হয়েছিল।[১৩]

নীলের হুকুম ছিল এই যে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর প্রত্যেকটি অপরাধীকে বিবিঘরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে তাকে কয়েক ইঞ্চি করে রক্তের দাগ জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে হবে। "যদি কেউ এ কাজ করতে রাজী না হয় তাহলে প্রোভেস্ট-মার্শাল তাকে বেত মারতে থাকবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধী তার ঐ কাজ সম্পন্ন করবে।" তারপর উক্ত চিঠিতেই নীল লিখছেন: "প্রথম অপরাধী ছিল ৬ষ্ঠ বাহিনীর একজন সুবাদার, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাকে আধ বর্গফুট পরিষ্কার করতে হয়েছিল। সে প্রথমে আপত্তি করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার উপর পড়ল বেত। রক্ত পরিষ্কারের কাজটুকু করবার পর তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো। আরো অনেককে এইভাবে আনা হলো, তার মধ্যে একজন ছিল মুসলমান—আমাদের দেওয়ানি আদালতের কর্মচারি ও

১৩. Kaye : *Ibid*, vol. II, p. 398-400

একজন নেতৃস্থানীয় বদমাশ লোক।...এটা যে খুবই একটা অদ্ভুত নিয়ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিস্থিতির পক্ষে খুবই প্রযোজ্য এবং আশা করি যে, ঘরটা এইভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাকে কেউ বাধা দেবে না।...ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সাহায্যে আমি আমার কাজের সার্থকতা দেখাতে পারব।"

নীলের পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ফলে যেসব হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসীর প্রাণ দিতে হয়েছিল, তারা তাদের অদৃষ্টকে ধীর ও শান্তভাবেই বরণ করে নিয়েছিল। কিভাবে হিন্দু-মুসলমানেরা এই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কর্নেল মড লিখেছিলেন—"মুসলমানেরা গর্বিত ও ক্রুদ্ধভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছিল, আর হিন্দুরা অদ্ভুত রকমের একটা উদাসীনতা দেখিয়েছিল।—অনেক হিন্দু, যেন তারা কোথাও ভ্রমণে যাচ্ছে এইভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল।"[১৪]

সতীচৌরা ঘাটের মতো বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের জন্যেও প্রায় সকল ইংরেজ লেখকই নানা সাহেবকে দোষী করেছেন। বস্তুত আইনসংগত ভাবে ও নৈতিকভাবে তিনিই এই সমস্ত কাজের জন্যে দায়ী। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, সুতরাং সব কাজের জন্যেই চরম দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু এটাও বিবেচনা করতে হবে যে বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড কখন ঘটেছিল—তা নানা সাহেবের কানপুর পরিত্যাগ করবার পূর্বে, না পরে? এটা খুবই সম্ভব যে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল একদল চরমপন্থীর দ্বারা এবং নানাসাহেব কানপুর পরিত্যাগ করার পর। ব্যক্তিগতভাবে নানাসাহেব যে এইসব হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী ছিলেন, কিংবা তাঁর জ্ঞাতসারে বা তাঁর সম্মতিতে যে এইসব ঘটনা ঘটেছে—তার কোনো

১৪. Maude : *Memories of the Mutiny*, vol. I, p. 224. নীলের এই পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, নানার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে এত আলোচনা হয়েছে অথচ—"No mention of the second massacre of Cawnpore (i.e., that perpetrated by Neill) raises its disturbing head in the school-books, and it is usually glossed over in the larger histories, but it would not be wildly unsound to date from it the decline of the British Empire in India." এই লেখক আরো বলেছেন যে, কানপুরের কূপ (well) শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা প্রাচীর (wall) তুলে দিয়েছিল—"The well produced the material of *A Passage to India*; the wall, the Indian National Army of Subhas Bose." (Michael Edwards' introduction to a new edition of W. H. Russell's *My Indian Diary*, 1957, xv-xvi)

নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১৫]

কানপুর পুনর্দখলের পর কর্নেল উইলিয়াম্‌স এ সম্বন্ধে যেসব সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, ইংরেজ ইতিহাসবিদরাও তার খুব বেশি মূল্য দেননি।[১৬] ফরেস্ট তাঁর 'হিস্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি'র ভূমিকায় যা লিখেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিশ-কমিশনার কর্নেল উইলিয়াম্‌স যে ৬৩ জন লোকের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, তা আমি পড়েছি। ঐ সাক্ষ্যগুলি স্ববিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি বিচার করতে হবে। কর্মচারিদের প্রদত্ত এবং অন্যান্য গুপ্ত রিপোর্টগুলিও আমি দেখেছি। এইসব থেকে দেখা যায়, যদিও তাতে কলঙ্কময় কৃষ্ণবর্ণের প্রাধান্যই বেশি, তা হলেও চিত্রটিকে যতখানি কালো করে চিত্রিত করা হয়েছে তা ততখানি কালো নয়। কর্নেল উইলিয়াম্‌স বলেছেন 'প্রথম দিকে সাধারণভাবে সর্বত্র অহেতুক মনে করা হতো যে, আমাদের বন্দী স্ত্রীলোকরা লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত হয়েছিলেন ; সে ধারণা আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণিত হয়েছে।' তথ্যের দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়, যেসব সিপাহি

১৫. এই প্রসঙ্গে George Campbell তাঁর *My Indian Career*-এ লিখেছিলেন : "It is difficult to say anything in extenuation of the Cawnpore massacre, and the terrible scene at the well, and yet we must remember two things ; first, that it was done not in cold blood, but in the moment of rage and despair when Havelock had beaten the rebels and was coming in, and second, we had done much to provoke such things. At a later time, a careful investigation was made into the circumstances of the massacre and we failed to discover that there were any premediation or direction in that matter.···Neill did things almost more than the massacre. He seems to have affected a religious call to blood.···If these people had been really guilty of the massacre, it would have been disgusting enough, but Neill does not say that they were found guilty of the murders. He executed vengence for the massacre on 'all who had taken part in Mutiny.···The really guilty people were not likely to trust themselves in Cawnpore at that time."

১৬. *Ibid*, pp. 224-52 ; Kaye : vol. II, p. 372 ; Forrest : *History*.., vol. I, pp. 478-79

বন্দীদের পাহারা দিচ্ছিল, তারা তাদের হত্যা করতে অসম্মত হয়। এই ঘৃণ্য দুষ্কর্ম ঘটেছিল একজন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় নানা সাহেবের পাঁচজন বডি-গার্ডের দ্বারা। এই নিষ্ঠুর কাজের জন্যে একটা সমগ্র জাতিকে অভিযুক্ত করা যেমন 'ক্ষুদ্রমনের পরিচায়ক, তেমনই অসত্য'।"[১৭]

যাই হোক, রাজনীতি ও মানবতার দিক থেকে বিচার করলে, বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের কোনো সার্থকতাই ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা বিদ্রোহীরা কিছুই লাভবান হয়নি, বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছিল, কারণ ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপে ভারত-বিরোধী প্রচারে এইসব ঘটনা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের খুবই সহায়ক হয়েছিল; যদিও এটাও ঠিক যে, বিবিঘরের ঘটনা না ঘটলেও ইংরেজ শাসকদের পক্ষে ঐ রকম কিছু আবিষ্কার করে প্রচারকার্য চালানো কিছুই কঠিন হতো না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সকল যুদ্ধের সময়েই, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক যুদ্ধের সময়, এরকম বরাবরই করে থাকে।

১৭. ড. সুরেন সেন কানপুরের এই ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়েছেন, বিশেষ কোনো মন্তব্য করেন নি, কিন্তু ড. রমেশ মজুমদার তাকে 'জঘন্য অপরাধ' (heinous crime) বলে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন: "the atrocious massacre of women and children…has turnished forever the fair name of India." (p. 276), যদিও তিনি ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডগুলিকে এত উগ্রভাবে নিন্দা করেন নি। ড. মজুমদার আরো বলেছেন যে, "As a military commander he (Nana) was an absolute failure." (p. 276). নানা ছিলেন বেসামরিক লোক, সুতরাং তিনি যদি সামরিক নেতৃত্ব না দিতে পেরে থাকেন, সেটা খুব অপরাধের বিষয় নয়। কিন্তু তিনি নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করার পরও যে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নি, এটাই হয়েছিল বিদ্রোহীদের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করাটাও তাঁর যুগোপযোগী কাজ হয়নি।

লখনৌর পতন

লখনৌ আক্রমণ করার জন্তে ইংরেজসরকারকে এত বড় বিরাট আয়োজন করতে হয়েছিল যার উদাহরণ ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। ১৭টি পদাতিক বাহিনী (তার মধ্যে ১৫টি ইংরেজ সৈন্তের), ২৮টি অশ্বারোহী স্কোয়াড্রন (তার মধ্যে ৪টি ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট), ৮০টি বড় কামান, ৫৪টি মাঝারি কামান, হাতি, উট, গাড়ি, সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ—সবকিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণ। এরকম সুসজ্জিত প্রায় ১ লক্ষ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮, কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ ক্যাম্পবেল লখনৌ শহর আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণের পশ্চাতে শুধু সামরিক কারণই নয়, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণও ছিল।

১৮৫৭ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে ক্যাম্পবেল গভর্নর-জেনারেল ক্যানিংকে লিখেছিলেন, লখনৌর অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধার করবার সময় অযোধ্যার লোক যেরকম দুর্দান্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তাতে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, অযোধ্যা জয় করতে হলে তাঁর অন্তত ৩০ হাজার সৈন্তের প্রয়োজন হবে; কেবলমাত্র লখনৌকে বশ করবার জন্তেই ২০ হাজার সৈন্তের প্রয়োজন।[১] তাই তিনি আপাতত রোহিলখণ্ড আক্রমণ করাই শ্রেয় মনে করলেন। কিন্তু ক্যানিং বললেন, "অযোধ্যাই প্রথম আক্রমণ করতে হবে, কারণ অযোধ্যায় এক রাজবংশ আছে; বিদ্রোহীরা এই রাজবংশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে; লখনৌ ও অযোধ্যা এখন দিল্লির স্থান অধিকার করছে; সারা ভারতবর্ষ এখন অযোধ্যার দিকে তাকিয়ে আছে এবং রাজারাও দেখছেন, আমরা যা জয় করেছি তা রাখতে পারি কিনা।"

আবার ১৮৫৮ সনের ৮ই জানুয়ারিতে ক্যানিং লিখলেন, এখনই লখনৌ আক্রমণ করতে হবে, রোহিলখণ্ড নয়, এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই এটা করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নানা সাহেবের লোকরা সাগর আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছে, আর নানাসাহেব নিজে "পশ্চিম-ভারতের মারাঠাদের সঙ্গে চক্রান্ত করছেন। যদি তিনি তাঁদের দেখাতে পারেন যে, বিদ্রোহীরা আমাদের কাছ থেকে লখনৌ ছিনিয়ে নিয়েছে, তাহলে তাঁর আবেদন একটা বিপজ্জনক শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এবং রোহিলখণ্ড জয় করলেও সেই শক্তির সমান হওয়া যাবে না।" ক্যানিং আরো লিখলেন: "তারপর রয়েছে সবচেয়ে ভয়ংকর

১. Forrest: *History*…, vol. II, p. 252

বিপদ ও বিদ্রোহের গুপ্তস্থান হায়দ্রাবাদ, যে হায়দ্রাবাদ হচ্ছে বিশেষ করে মুসলমানপ্রধান ও গভীরভাবে অযোধ্যার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ; কারণ তারা ভয় করে, যদিও সে ভয় অহেতুক, তাদেরও পরিণতি অযোধ্যার মতো হবে। বিদ্রোহী অযোধ্যার প্রভাব যে শুধু ভারতবর্ষেই বিস্তৃত হচ্ছিল তা নয়, দূর-দূরান্তেও যে তা প্রসারলাভ করে স্বাধীনতাকাংক্ষী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল, তা ইংরেজ শাসকরা ভালোভাবেই জানতেন। উক্ত চিঠিতেই ক্যানিং লিখেছিলেন, "পেগুর রিপোর্টে দেখা যায় যে, সুদূর আভা রাজ্যে লোকে উদগ্রীব হয়ে লখনৌর খবর জানতে চায়।"[২]

ক্যানিং-এর অযোধ্যা আক্রমণ মনোনয়নের আর একটি মস্তবড় কারণ ছিল। হেনরি লরেন্স অযোধ্যার চিফ-কমিশনার হয়ে আসার পরই যখন তিনি বিদ্রোহের পূর্বাভাস পেলেন তখন তিনি ক্যানিংকে লিখলেন, যদি বিদ্রোহ ঘটে তাহলে নেপালের প্রধানমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুরের নিকট সাহায্য চাওয়ার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হোক। লখনৌতে আসার পূর্বে হেনরি লরেন্স কাঠমাণ্ডুতে ইংরেজ সরকারের রেসিডেণ্ট ছিলেন। ক্যানিং তার জবাবে লরেন্সকে জানালেন, "জঙ্গ বাহাদুরের সাহায্য চাওয়ার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হলো। আমার পক্ষে এরূপ অনুমতি দেওয়া খুবই অপ্রীতিকর ; এটা হচ্ছে আমাদের অপমানজনক দুর্বলতার স্বীকৃতি।"[৩] আত্মসম্মানে আঘাত লাগলেও, বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেনরি লরেন্স জঙ্গ বাহাদুরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, জঙ্গ বাহাদুরও খুব আগ্রহ সহকারে তাঁর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। জন লরেন্স যেমন তাঁর শিখ রাজাদের ও গোলাব সিংকে জানতেন, হেনরি লরেন্সও তেমনি তাঁর জঙ্গ বাহাদুরকে জানতেন।

ইংরেজকে সাহায্য করার জন্যে জঙ্গ বাহাদুরের এত আগ্রহের একটা গুরুতর কারণ ছিল। 'যৌবনে তিনি জুয়া খেলে কাটিয়েছিলেন', যার ফলে তিনি নিঃস্ব ও হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর পিতৃব্য যখন নেপালের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন তিনিও দরবারে ভূমিকা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। "এই দরবারই ছিল তাঁর মতো প্রতিভার বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেখানে তিনি আশ্চর্য রকম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এমন নানা রকমের কাজ করেছিলেন যা পাশ্চাত্য জগতে নৈতিক বিধি অনুসারে আইনসংগত বলে গণ্য হবে না। এই কাজগুলির মধ্যে একটা হলো তাঁর পিতৃব্যকে খুন করা, যেকাজ তিনি করেছিলেন মহারাণীর প্ররোচনায়। একটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হলো এবং তিনি হলেন কমাণ্ডার-ইন-চিফ। আরো বৃহৎ আকারে হত্যাকাণ্ডের সুযোগ তাঁর জন্যে

২. *Ibid* : p. 255
৩. Gibbon : *Lawrences of the Punjab*, p. 255

অপেক্ষা করছিল। নতুন প্রধানমন্ত্রীও নিহত হলেন এবং মহারাণী, যাঁর তিনি প্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন, এর প্রতিশোধ দাবি করলেন। নিহত মন্ত্রীর একজন সহকর্মীকে সন্দেহ করা হলো। এই সন্দিগ্ধ লোকটিকে খুন করার জন্যে তিনি আর একজন সহকর্মীকে নির্দেশ দিলেন।...এই ব্যক্তি ইতস্তত করাতে তিনি তাঁকে বন্দী করে রাখা স্থির করলেন এবং তাঁকে ধরবার জন্যে সংকেত করলেন। এই ব্যক্তির পুত্র নিরাপত্তার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে ছুটে এলেন, কিন্তু তাঁকে কেটে ফেলা হলো। পিতা প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলে জঙ্গ বাহাদুরের একটা গুলী পিতাকে পুত্রের পাশে শুইয়ে দিল।...১৪ জন বিরোধী সর্দার জঙ্গের সম্মুখীন হলো,...কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের সাহায্যে জঙ্গ সকলকেই হত্যা করলেন। ভোর হবার পূর্বেই জঙ্গ নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করলেন ...রাণীকে তাঁর দুই ছেলে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন।"[৪] কিছুদিন পরে জঙ্গ নেপালের রাজাকেও বন্দী করলেন। তারপর এক নাবালককে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি নিজেই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে বসলেন। এইসব ঘটনা ঘটেছিল ১৮৪৯-৫০ সনে। এই হলো জঙ্গ বাহাদুরের চরিত্র।

এতগুলি নিহত ও নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজের বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। সুতরাং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জঙ্গ বাহাদুরের সম্পর্কটা ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে জঙ্গ বাহাদুর নিজে মোটেই ইংরেজের শত্রু ছিলেন না—তিনি শুধু চেয়েছিলেন নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে। এখন এই বিদ্রোহকালে ইংরেজ সরকারের ঘোরতর বিপদের সময় তাদের সাহায্য করে নিজেকে তাদের পরম বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এবং নেপাল রাজ্যে নিজের স্বৈরাচারী ক্ষমতা সুদৃঢ় করবার জন্যে জঙ্গ বাহাদুর একটা মস্ত বড় সুযোগ পেলেন। তাছাড়া আরো কয়েকটা কারণ ছিল। প্রথমটা হলো, ১৮১৪-১৫ সনে ইংরেজ সরকারের নেপাল আক্রমণের পর ইংরেজ সরকার গোরখপুর থেকে গোপ নদী পর্যন্ত পাহাড়ের তলদেশে ১০০ মাইল ব্যাপী যে অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল তারই অনেকটা নেপালকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতিও জঙ্গ বাহাদুরকে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে লখনৌর পতনের পর ক্যানিং নেপালের রাজাকে প্রকাশ্যভাবেই ১৭ই মে ১৮৫৮ তারিখে লিখেছিলেন: "ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে আমি স্থির করেছি যে, পাহাড়ের নিম্নভাগে গুর্খাদের পূর্বেকার স্থানগুলি নেপাল রাজ্যকে ফেরত দেওয়া হবে।"[৫]

নেপালের বিরুদ্ধে ঐ যুদ্ধের সময় অযোধ্যা রাজ্যই ছিল ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি। ইংরেজ বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যই ছিল অযোধ্যার লোক; এসব

৪. **Thornton :** *Gazetteer*, vol. III, pp. 723-24

৫. **William Digbee :** *Nepal and India*, p. 67

ছাড়াও অযোধ্যার নবাবকে সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য, ঋণ ইত্যাদি দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করতে হয়েছিল। আজ ইংরেজরাই আবার গুর্খাদের বন্ধু সেজে অযোধ্যা-বাসীদের ও লখনৌর নবাব-পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাদের উত্তেজিত করতে লাগল,—যেমন তারা উস্কানি দিয়েছিল শিখদের, তাদের পুরনো শত্রু মোগল ও পুরবিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। পাঞ্জাবের মতোই এখানেও দেখানো হলো অবাধ লুণ্ঠনের প্রলোভন। বস্তুত গুর্খারাও ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের মতো লুণ্ঠিত ধনরত্নে বোঝাই হয়েই যুদ্ধের পর দেশে ফিরে গিয়েছিল।

ইংরেজকে সাহায্য করার জন্যে লখনৌ রেসিডেন্সিতে জঙ্গ বাহাদুর ১০০ গুর্খা সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তারপর, তিনি জুলাই মাসে গোরখপুরে কর্নেল সমসের সিং-এর অধীনে ৩ হাজার গুর্খা পাঠালেন এবং সবশেষে ডিসেম্বর মাসে ১০ হাজার সৈন্যের এক গুর্খা-বাহিনী নিয়ে নিজেই লখনৌর অভিযানে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। এই গুর্খাবীর গর্ব করে বলেছিলেন যে, লখনৌ পৌছানো পর্যন্ত তিনি ৬ হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করেন।

গোরখপুরে পুরনো নবাব-সরকারের নাজিম মহম্মদ হাসানের[৬] নেতৃত্বে জন-সাধারণ ও সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই গুর্খাদের প্রথম যুদ্ধ হয়। তারপর ছয় মাস যাবত গোরখপুর, আজিমগড়, জুয়ানপুর, সুলতানপুর, মোহনপুর ইত্যাদি স্থানে ইংরেজ ও গুর্খা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী-দের অনবরত যুদ্ধ করতে হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর মুণ্ডোরিতে এবং ৩১শে অক্টো-বর চান্দাতে যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়, তাতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গুর্খাদেরই ইংরেজ-দের তুলনায় অনেক বেশি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। চান্দার যুদ্ধের অধিনায়ক কর্নেল রাউটন সরকারকে লিখেছিলেন: "লেফটেনাণ্ট গম্ভীর সিং এখন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শুয়ে আছে। এই অফিসারের সাহস সম্বন্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে সাহসের জন্যে আমাদের দেশের লোক সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে থাকে। সাত জন বিদ্রোহী একটা কামান রক্ষা করছিল; এই অফিসারটি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৫ জনকে কেটে ফেলে, আর ২ জন জখম অবস্থায় পালিয়ে যায়। তাঁর নিজের শরীরেও আট জায়গায় তলোয়ারের আঘাত লেগেছে।"[৭] বিদ্রোহীরাও প্রতিটি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েচে। তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়েও হার মেনে নেয়নি। একটা স্থানে হেরে গিয়ে আবার অন্য একটা স্থানে জমায়েত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করেছে।

---

৬. মহম্মদ হাসান সম্বন্ধে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বইতে কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন।

৭. Forrest : *History*···, vol. II, p. 258

ইতিমধ্যে কানপুর থেকে ক্যাম্পবেলও লখনৌ আক্রমণের জন্যে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইংরেজ বাহিনীগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব থেকে আসতে লাগল। দিল্লি থেকে খুব বড় একটা সিজ-ট্রেন এলো, আর দুটো ৬৮-পাউণ্ডার কামান এলো এলাহাবাদ থেকে। পীলের নাবিক-বাহিনীও নদী পথে আসতে লাগল। স্থির হলো, ক্যাম্পবেল দক্ষিণ-পশ্চিম আর জঙ্গ বাহাদুর ও জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক পূর্বদিক থেকে একই সঙ্গে অযোধ্যার রাজধানী আক্রমণ করবেন। তাছাড়া, জেনারেল আউটরামও ৫ হাজার-এর এক বাহিনী নিয়ে লখনৌর নিকটেই আলমবাগে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা আউটরামকে সেখানে একদিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, এই দুই মাসের মধ্যে বিদ্রোহীরা ছয় বার তাঁকে ভয়ংকরভাবে আক্রমণ করেছিল। এরকম একটা আক্রমণের সময় বেগম হজরত মহল নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে বিদ্রোহীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। এইসব আক্রমণের ফলে আউটরামের বাহিনীর এত ক্ষতি হচ্ছিল যে, তিনি আলমবাগ পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। এইসব আক্রমণে বিদ্রোহীদের সাহস, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততার কোনো অভাব ছিল না। দিল্লিতে তারা যে সাহস দেখিয়েছিল, এসব ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু ঠিক দিল্লির মতোই এসব ক্ষেত্রেও উপযুক্ত নেতৃত্ব, সামরিক পরিকল্পনা, রণনীতি ও কৌশল (strategy and tactics), সৈনাপত্য (generalship)—এই সমস্ত গুণগুলির খুবই অভাব ছিল।

ফরেস্ট আলমবাগের যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন: "সিপাহিরা তাদের অত্যধিক মৃত্যুসংখ্যা দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, তাদের সাহসের কোনো অভাব ছিল না। দিল্লির মতো এখানেও তাদের যেটার অভাব ছিল, সেটা হচ্ছে নেতৃত্ব। তারা যদি যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পেত, তাহলে ইংরেজ সেনানায়কের পক্ষে তাঁর ঘাঁটি রক্ষা করা ও কানপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই কঠিন হতো।"[৮]

ইংরেজের আক্রমণ যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, বিদ্রোহী সরকারের লখনৌ সুদৃঢ় করার কাজও ততই দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তিন মাস ধরে হাজার-হাজার লোক এই কাজে নিযুক্ত ছিল। কাইজারবাগ ও রাজপ্রাসাদের ৪ মাইল পরিধিকে একটা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করা হলো। শহরের পূর্বদিকে গোমতী থেকে যে খাল দক্ষিণে চলে গিয়েছে, সেটাকেই করা হলো আত্মরক্ষার প্রথম লাইন; সেটাকে আরো গভীর করা হলো, সেতুগুলি সব ভেঙে দেওয়া হলো। গোমতী থেকে শুরু করে চরবাগ পর্যন্ত খালের ধার দিয়ে বুরুজ সমেত

৮. *History of the Indian Mutiny*, vol. II, p. 290

এক বিরাট মাটির প্রাচীর তৈরি করা হলো এবং এই খালের ওপর ৩টি রাস্তার সংযোগস্থলে শক্তিশালী কামানের ব্যাটারি প্রস্তুত করা হলো। দ্বিতীয় লাইন গোমতী থেকে শুরু হয়ে মোতিমহলের সামনে দিয়ে শহরের প্রধান রাস্তা হজরতগঞ্জ পর্যন্ত। সর্বশেষ তৃতীয় লাইন হলো—সমকোণ হয়ে খাল থেকে কাইজারবাগ পর্যন্ত।[৯]

লখনৌ শহরের প্রতিটি বাড়ি এক একটি ছোটখাটো দুর্গে পরিণত হলো। ব্যাপক গণবিদ্রোহ না হলে, কেবলমাত্র সিপাহিদের একটা বিদ্রোহ হলে, এসব সম্ভব হতো না। সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকেরাও, যেমন অস্পৃশ্য পাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা ধনুকবাণ নিয়ে লখনৌতে অনেক স্থানে লড়েছিল ও বহু বিদেশী শত্রুকে ঘায়েল করেছিল, তার কথা অনেক ইংরেজ লেখকই উল্লেখ করেছেন।[১০]

লখনৌর বিভিন্ন স্থানে ১৩০টি কামান বসানো হয়েছিল। এসব বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়িও সুরক্ষিত করা হলো এবং বন্দুক ও কামান চালাবার জন্যে দেওয়ালগুলিতে ছিদ্র করা হলো। প্রতিটি গেটে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে বুরুজ ও ব্যারিকেড তৈরি করা হলো। এইসব আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি যে খুবই মজবুত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এইসব ব্যবস্থাতে

৯. এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ কর্নেল রীজ বলেছেন : "I could never withhold my admiration at the enormous labour the insurgents had undergone, not only in their offensive but in defensive operations. Before their batteries, deep trenches, some twenty feet deep and three feet wide, were executed. Ladders were placed at intervals for sentries to go down and see that our mines did not go under their batteries. Deep trenches intersected one another all round us, along which the rebels could crawl unperceived to the very edge of our entrenchment. Some of the batteries were within 40 yards of us and all were well and stoutly made. How we resisted all these is truly a wonder. The right hand of the Lord is manifest in all this plainly enough, for inspite of all our courage, we could never have kept them out." (Rees : *Personal Narrative*, pp. 284-85)

১০. Hutchinson : *Narrative of the Mutinies*, pp. 14-15 ; Forbes-Mitchel : pp. 76-78

একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে গিয়েছিল। যাতে পিছন দিক থেকে গোমতী পার হয়ে শত্রু পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করতে না পারে, তার কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি এবং শত্রুরা বিদ্রোহীদের এই দুর্বলতার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিল।[১১]

২রা মার্চ ক্যাম্পবেল লখনৌ আক্রমণ শুরু করলেন। সেইদিনই তিনি দিলখুশা অধিকার করলেন। ৪ঠা মার্চ ইংরেজরা রাত্রিতে গোমতীর ওপর দুটি সেতু নির্মাণ করতে সমর্থ হলো। ৫ই তারিখে জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক এসে পৌছলেন। ক্যাম্পবেলের এখন মোট সৈন্যসংখ্যা হলো—২৫,৬৬৪ এবং কামান ১৬৪—"এ পর্যন্ত ভারতে এটাই সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৈন্যবাহিনী।[১২] রাত্রির গভীর অন্ধকারের মধ্যে ক্যাম্পবেল ও আউটরাম উভয়েই নদী পার হলেন এবং ৯ই তারিখে লা-মার্টিনিয়েরে ও ছক্কর মঞ্জিল দখল করলেন। ১০ই তারিখে জঙ্গ বাহাদুর ১০ হাজার গুর্খা সঙ্গে নিয়ে পৌছলেন। পরদিন সমস্ত দিনব্যাপী ভয়ংকর যুদ্ধের পর বেগমকুঠি বিদ্রোহীদের হস্তচ্যুত হলো। প্রতিটি প্রাঙ্গণে, প্রতিটি কামরায় বিদ্রোহীরা লড়েছিল। "মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণে ৮৬০ জন বিদ্রোহীর শবদেহ পাওয়া গিয়েছিল। কেউ জীবনভিক্ষা চায়নি, দেওয়াও হয়নি।[১৩] প্রাঙ্গণের মধ্যে যখন ভয়ংকরভাবে সম্মুখযুদ্ধ চলেছে, তখন ইংরেজরা কিরকম বীরত্ব দেখিয়েছিল, তার একটি নিদর্শন হলো এই: "পাইপ-মেজর জন ম্যাকলিয়ড প্রাঙ্গণের ভেতর এমনভাবে শানাই বাজাচ্ছিলেন যে সকলের মনে হয়েছিল যেন তিনি বাহিনীর উৎসবের সময় অফিসারদের মেসের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"[১৪] বেগমকুঠির যুদ্ধে মোগল শাহজাদাদের হত্যাকারী হাডসনের মৃত্যু হয়। "শিবিরে সকলেই জানত যে, লুঠ করবার সময় হাডসন নিহত হয়।"[১৫]

১৯ তারিখে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের শেষ ঘাঁটি মুসাবাগ দখল করল। কিন্তু

১১. "The enemies' works were vast and strong, but there was a cardinal fault in design and of that Sir Colin took prompt advantage in his attack. The works rested on a river which could be easily crossed, and then they could be enfiladed and taken in rivers by our batteries." (Forrest : *History...*, vol. III, App. F., pp., p. 294)

১২. Forrest : *Ibid*, p. 317

১৩. Forbes-Mitchel : *My Reminiscences of Indian Mutiny*, p. 210

১৪. *Ibid*, p. 210

১৫. Roberts : *Forty-one years in India*, vol. I, p. 404

ফৈজাবাদের মৌলভি তখনো আশা ছেড়ে দেননি। তিনি একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক নিয়ে ২২ তারিখ পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। ইংরেজরা মৌলভিকে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অবশিষ্ট ২০ হাজার বিদ্রোহী নিয়ে তিনি লখনৌ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ২০দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর ২২শে মার্চ লখনৌ পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের হস্তগত হলো।

এই কয়দিন বেগমকে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল। মুসাবাগের যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুসাবাগের পতনের পর তিনি লখনৌ ত্যাগ করেন। লখনৌর যুদ্ধে আরো অনেক স্ত্রীলোককে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। একজন ইংরেজ অফিসার সেকেন্দ্রাবাগের কয়েকজন 'এমাজন নিগ্রেস'-এর কথা এই বলে উল্লেখ করেছেন: "তারা হিংস্র বিড়ালের মতো যুদ্ধ করেছিল এবং তারা যে স্ত্রীলোক তা তারা নিহত হবার পূর্বে বোঝা যায়নি।"[১৬] আর একজন অফিসার একজন বৃদ্ধার কথা বলেছেন। লখনৌ পতনের পর লৌহসেতুর উপর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়; তাঁর হাতের পাশে সলতের মতো আংশিক পোড়া একটুকরা কাপড় পড়ে ছিল এবং তাঁর মৃতদেহের পাশে পড়ে ছিল একটা বাঁশ—যার ভিতর ছিল বোমার সলতে। এই বাঁশটা প্রকাণ্ড একটা 'মাইন'-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।[১৭]

দিল্লির পতনের পর ঐ শহরে যা ঘটেছিল, লখনৌতেও তাই ঘটল—অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংস। সর্বত্র উত্তেজিত ইংরেজ, গুর্খা, শিখ ও পাঠানরা সব হিংস্র জন্তুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। "লখনৌর যেদিকে তাকানো যেত, সেখানেই যে দৃশ্য চোখে পড়ত, তা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। হজরতগঞ্জ, ইমামবাড়া এবং কাইজারবাগের মধ্যে ও চারপাশে যে উন্মত্ত ধ্বংস ও অরাজকতা চলেছিল, তা একমাত্র নরকেই সম্ভব। 'লুণ্ঠনের মাতলামি' কথাটা পূর্বে শুনেছিলাম, এবার চোখের সামনে তার সত্যিকারের পরিচয় পেলাম। সৈন্যরা লুণ্ঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় হিংস্র হয়ে উঠল; তাদের পিছনে পিছনে শিবির সহচরের দল—যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অতি কাপুরুষ, কিন্তু গৃধিনীর মতো ক্ষুধার্ত—পরাজিত শত্রুর মৃতদেহের উপর সকলেই সমানভাবে লাফিয়ে পড়ল।"[১৮] যেসব বাড়িতে বিজেতারা প্রবেশ করেছিল সেগুলিকে তারা কসাইখানাতে পরিণত করেছিল—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করেছিল।

১৬. Gordon-Alexander: *Recollections of a Subaltern.*

১৭. Mazendy: *Up Among the Pandies*, pp. 236-38

১৮. Forbes-Mitchel: p. 229. *London Times*-এর প্রতিনিধি প্রত্যক্ষদর্শী রাসেল তাঁর *My Diary in India*-তে এই বীভৎস ঘটনার সজীব বর্ণনা দিয়েছেন।

যেসব জিনিস তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি তা তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এইভাবে নবাবের কাইজারবাগের পাঠাগারটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল —যে পাঠাগারে ৪০ হাজার মূল্যবান গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি ছিল।

লখনৌর লুণ্ঠনের পরিমাণ কত হয়েছিল, তা কয়েকটি ঘটনা থেকেই কিছুটা বোঝা যায়। ৯৩-তম হাইল্যাণ্ডার্স বাহিনী (স্কটিশ) সোনা ও হীরা দিয়ে তৈরি লক্ষ-লক্ষ টাকা মূল্যের তাজিয়াটা লুঠ করল—"তার অর্ধচন্দ্র ও নক্ষত্রটার দামই ছিল ৫ লক্ষ টাকা।"[১৯] এ বাহিনীর একজন লেফটেনাণ্টের অংশে হীরা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি তাজিয়ার গম্বুজটা পড়েছিল। কিছুকাল পরে লণ্ডনে ঐটি ৮০ হাজার পাউণ্ডে (৮ লক্ষ টাকায়) বিক্রি হয়।[২০] ফোরবস্-মিচেল বলেছেন: "আমি একজনের নাম করতে পারি, যিনি লখনৌ লুণ্ঠনের দু'বছরের মধ্যেই তাঁর ১লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ডের (১৮ লক্ষ টাকায়) বন্ধকী সম্পত্তিটা মুক্ত করতে পেরেছিলেন।"[২১] ফোরবস্-মিচেলও উক্ত বাহিনীর একজন সার্জেণ্ট ছিলেন। লুঠের অংশে তিনি নিজে কতটা ভাগ বসিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য না করলেও, তাঁর কাহিনী থেকে তা কতকটা আন্দাজ করা যায়। যুদ্ধের পর যখন জাহাজে করে মিচেল গার্ডেনরিচে পৌছলেন. তখন একজন সৈন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফোরবস্-মিচেল, ঐ রকম একটা প্রাসাদের মালিক হলে তোমার কি রকম লাগবে?" মিচেল অন্যমনস্কভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন, "ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে আমি ঐ প্রাসাদের ও বাগানের মালিক হব।" কিছুকাল পর মিচেল ডায়মণ্ড হারবারে ঐ প্রাসাদটি কিনেছিলেন এবং তার পাশে একটা পাটকল স্থাপন করেছিলেন।[২২] ঐ বাহিনীরই ডোবিন নামক আর একজন সার্জেণ্ট কানপুর রেলওয়ে হোটেলের মালিক হয়েছিলেন।"[২৩] এইসব ব্যক্তিগত লুঠ ছাড়াও সরকারিভাবে যেসব 'পুরস্কার'

১৯. Forbes-Mitchel : *My Reminiscence of Indian Mutiny*, p. 226

২০. *Ibid*, p. 227

২১. *Ibid*, p. 228

২২. *Ibid*, p. 8

২৩. *Ibid*, p. 47. সকল সৈন্যই যে করিতকর্মা ছিল তা নয়। অনেকে লুঠপাট করতে পারেনি, কিংবা করার চেষ্টা করেনি। "আমি নিজেই এক ডজনের বেশি লোকের নাম করতে পারি, যারা সব যুদ্ধেই লড়েছিল এবং তাদের মধ্যে দু'জন ভিক্টোরিয়া-ক্রসেও ভূষিত হয়েছিল, যাদের দেশের আমস্-হাউসে (দানশালায়) মৃত্যু হয়েছিল এবং কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল ক্যালকাটা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির দানশালায়।" (*Ibid*, p. 229)

সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে মিচেল বলেছেন: "আমরা লখনৌ পরিত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত 'প্রাইজ-এজেন্ট'রা যে সমস্ত লুঠ সংগ্রহ করেছিল, লণ্ডন-টাইমসের মতে (৩১ মে ১৮৫৮) তার মূল্য স্থির করা হয়েছিল ৬০লক্ষ টাকা, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তার পরিমাণ হয়েছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।" তারপর, শিবির-সহচররা যা লুঠ করেছিল, সেগুলি কেড়ে নেওয়া হলো। তার মূল্যও ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কম নয়।[২৪]

২৪. Forbes-Mitchel : p. 228

রোহিলখণ্ড

লখনৌ দখল করার পর, ক্যাম্পবেল রোহিলখণ্ড আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, কিভাবে ১৭৭৪ সনে ইংরেজ ও অযোধ্যার নবাবের দ্বারা রোহিলখণ্ড আক্রান্ত হলে হাফিজ রহমত খানের নেতৃত্বে রোহিলারা যুদ্ধ করেছিল এবং হাফিজ রহমত সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ও রোহিলখণ্ড অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং ১৮০১ সনে ইংরেজরা সরাসরিভাবে এই প্রদেশকে নিজেদের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। সেই বৎসরই ইংরেজদের বিরুদ্ধে রোহিলারা প্রথম বিদ্রোহ করেছিল।

মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের পর থেকেই এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ হতে শুরু করে। ১৯শে মোরাদাবাদে ২৯-তম বাহিনী বিদ্রোহ করে এবং ৩১শে তারিখে বেরিলি-ব্রিগেডও বিদ্রোহে যোগ দেয়। আলিগড়, বিজনুর, বুদায়ুন, মুজাফরনগর, শাহজাহানপুর সর্বত্রই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসন এইসব অঞ্চল থেকেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বেরিলিতে বিদ্রোহ ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাফিজ রহমত খানের পৌত্র, প্রায় ৮০ বছরের বৃদ্ধ খানবাহাদুর খান, দিল্লির বাদশাহের অধীনে রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহী-সরকার স্থাপন করলেন। খানবাহাদুর খান ক্ষমতা দখল করার পরই তাঁর প্রথম কাজ হয়েছিল গোহত্যা বে-আইনি বলে ঘোষণা করা। খানবাহাদুর খান যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বেরিলির সমস্ত জনসাধারণ তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল। বিদ্রোহের প্রথম দিকেই শক্তিশালী রাজপুত ঠাকুররা বিদ্রোহে যোগ দিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। খানবাহাদুর খানের মন্ত্রীসভায় ১ জন ব্যতীত সকলেই ছিলেন হিন্দু। রাজপুতদের নেতা জয়সল সিং ছিলেন তাঁর দক্ষিণ-হস্ত, আর শোভারাম ছিলেন অর্থমন্ত্রী। তাছাড়া আর একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল, তাতে ছিল ৬ জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু। এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল দেশে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা।[১]

বেরিলি-ব্রিগেড দিল্লি চলে যাবার সময় বেরিলির রাজকোষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে রোহিলখণ্ডেও দিল্লির মতোই ধনীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এইসব ধনীদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু বানিয়া এবং এদের অনেকে ছিল ইংরেজের বন্ধু, কারণ ইংরেজের আমলেই এরা তাদের ধন-দৌলত, বাড়িঘর, জমিজায়গা—সবই করেছিল। মিছির বৈজনাথ ও কুনজেত

১. English : *Report*, p. 6

লালের নিকট থেকে একবার বিদ্রোহী-সরকার ৫৪ হাজার টাকা নিয়েছিল ; পরে আরো দু-একবার তাদের টাকা দিতে হয়েছিল। এদিকে কিন্তু বৈজনাথের সঙ্গে সর্বদাই ইংরেজের যোগাযোগ ছিল এবং সে তার অনুচরের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়মিত তাদের সরবরাহ করত।[২] এর পুরস্কার স্বরূপ, বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবার পর, ইংরেজ সরকার তাকে বড় জমিদারি দিয়ে 'রাজা' খেতাবে ভূষিত করে। এই শ্রেণীর 'হিন্দু'দের নিকট খানবাহাদুর খানের 'মুসলমান' সরকার যে খুব জনপ্রিয় ছিল না, তা খুব সহজেই অনুমেয়।

এরূপ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বিদ্রোহীদের দুর্বল করবার চেষ্টা করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি-বৈষম্যকে ইংরেজরা সর্বত্রই তাদের একটা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে—রোহিলখণ্ডে ও বেরিলিতেও সেই চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। রোহিলখণ্ডের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ছিল রাজপুত ; এবং অতীতে এই রাজপুতদের সঙ্গে রোহিলা-পাঠানদের সংঘর্ষও অনেকবার হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় সেই প্রাচীন বিরোধ-সংঘর্ষের স্থানও ছিল না, অর্থও ছিল না। বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা সেই পুরনো স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে রাজপুত ঠাকুরদের খানবাহাদুর খানের সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে তারা একেবারেই সফল হয়নি। বরং অনেকেই সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহেই যোগ দিয়েছিল এবং অনেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণও দিয়েছিল।[৩]

২. English : p. 5. বৈজনাথের মতো হিন্দু-বানিয়াদের জন্যে রমেশ মজুমদার ও সুরেন সেন উভয়েই অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছেন।

৩. দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সৈন্যবিভাগে একজন ইংরেজভক্ত কেরানি। বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন বেরিলিতে এবং তারপরে তিনি 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' নামে একটি বই লিখেছিলেন। দুর্গাদাসের মতে ব্রিটিশরাজ ছিল রামরাজ, আর বেরিলির বিদ্রোহী-সরকার ছিল অধঃপতিত মুসলমানদের হিন্দুসমাজ ধ্বংস করার প্রচেষ্টা। (পৃ. ২১৫-১৬) তিনি বেরিলিতে হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অনেক অত্যাচারের কাহিনী বলেছেন এবং ড. মজুমদার ও সেন সেগুলি ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আসলে এঁরা ইতিহাসজ্ঞ থেকে গোঁড়া হিন্দুই বেশি কিনা, এটাই প্রশ্ন। বিদ্রোহীরা দুর্গাদাসকে ইংরেজের গুপ্তচর বলেই জানত এবং তাঁকে ধরবার অনেক চেষ্টাও করেছিল, আর প্রতিবারই মুসলমানরাই তাঁকে বাঁচিয়েছিল। খানবাহাদুর খানের হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর নীতি সম্বন্ধে দুর্গাদাসই বলেছেন : "হিন্দু আমার দক্ষিণ হস্ত, হিন্দু আমার দক্ষিণ-নয়ন, হিন্দু আমার দক্ষিণ-কর্ণ—হিন্দুর বলবীর্য্যের

বিদ্রোহী বাহিনীগুলি যখন রোহিলখণ্ড ছেড়ে দিল্লি চলে গেল, তখন তারা তাদের কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রগুলিও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে খানবাহাদুর খানের বিদ্রোহী সরকারের যেমন কোনো অর্থও ছিল না, তেমনই কোনো সুশিক্ষিত সৈন্য কিংবা অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। জনসাধারণকে নিয়েই খানবাহাদুর খানকে নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। ইংরেজরা তাদের গুপ্তচরদের মারফৎ বিশ্বস্তসূত্রে এই সম্বন্ধে যে খবর পেয়েছিল, তা হচ্ছে এই : "খানবাহাদুর খান বেরিলিতে ২টি কামান, ১০টি পল্টন ও কিছু অশ্বারোহী রেখেছেন। সমগ্র রোহিলখণ্ডের জন্যে আছে ৩০টি পল্টন (প্রতিটি পল্টনের সৈন্যসংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন) ও ২১টি কামান। এই বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই। কিছু লোকের বন্দুক আছে, আর সব লোকের আছে তলোয়ার, বল্লম ইত্যাদি। এদের অনেকেই বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। তাঁর গোলন্দাজরাও বিশেষ পটু নয়। নেটিভ গোয়েন্দাদের মারফৎ এইটুকুই জানা গিয়েছে।"[৪]

১৮৫৮ সনে এপ্রিল মাসে ৪টি বিভিন্ন ইংরেজ বাহিনী চারদিক দিয়ে রোহিলখণ্ড আক্রমণ শুরু করে। এদের একটি বাহিনী জেনারেল ওয়ালপোলের অধীনে ১৫ই এপ্রিল রাজপুত রাজা নিরপত সিং-এর রুইয়া দুর্গ আক্রমণ করে। ওয়ালপোলের বাহিনী ছিল ইংরেজদের একটা শ্রেষ্ঠ বাহিনী; তাতে ছিল ৪২-তম, ৭৯-তম, ৯৩-তম ক্রাইমিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞ ইংরেজ বাহিনীগুলি ও ১টি পাঞ্জাব বাহিনী। কিন্তু ইংরেজের এই আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং অসংখ্য হতাহতের পর ইংরেজ বাহিনীকে ক্যাম্পে ফিরে যেতে হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজদের একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় অফিসার ব্রিগেডিয়ার এড্রিয়ান হোপ এবং আরো অনেক অফিসার। "মৃতদের কবর দেবার পর সৈন্যরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তখন যদি কোনো নন-কমিশনড অফিসার নেতৃত্ব দিত, তাহলে জেনারেল ওয়ালপোলের জীবন এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারত।"[৫] নিরপত

সাহায্য পাইয়াই আমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি।... আজ রাজদরবারে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, যদি কোনো মুসলমান বিনা কারণে কোনো হিন্দুর উপর অত্যাচার করে, অথবা নিষিদ্ধ স্থানে গোহত্যা করে, তবে তাহাকে আমি গুরুতর দণ্ড দিব। 'হিন্দু-মুসলমান এক'—ইহাই অন্ত হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকুক। আজ হইতে ভেদ জ্ঞান উঠিয়া যাউক। আজ হইতে হিন্দু-মুসলমান এক দেহ, এক প্রাণ হউক।" (পৃ. ৩১৪)

৪ Muir : *Records of the Intelligence Department*, vol. I, p. 218

৫. Forbes-Mitchel : *My Reminiscences of Indian Mutiny*, p. 246

সিং এই পরাজিত ও ভগ্নোদ্যম ইংরেজ বাহিনীকে পুনরায় আক্রমণ করার পরিবর্তে, রাতের অন্ধকারে দুর্গ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রুইয়ার যুদ্ধের আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এখানে একজন ইয়োরোপীয় বিদ্রোহীকে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখা গিয়েছিল এবং একজন ইংরেজ অফিসারের মতে তাঁর গুলীতেই এড্রিয়ান হোপ নিহত হন। তিনি আরো মনে করেন যে, এই ইয়োরোপীয়টি ছিলেন একজন রুশ।[৬]

৫ই মে ইংরেজ বাহিনীগুলি বেরিলি শহর আক্রমণ করল। রোহিলা গাজিদের অপূর্ব বীরত্বকাহিনীর জন্যে বেরিলির যুদ্ধ ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফরেস্ট একটা যুদ্ধের এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন: "রোহিলারা যেরকম দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বামপার্শ্বের ব্যূহভেদ করে আমাদের আক্রমণ করল, তা ভারতের এই বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়।…রোহিলারা সোজা গিয়ে আমাদের একটি সেরা বাহিনী, ৪র্থ পাঞ্জাব-বাহিনীর ওপর আক্রমণ করল ও তাদের ছত্রভঙ্গ করে পেছনে হটিয়ে দিল। পিছনেই ছিল কমাণ্ডার-ইন-চিফের সঙ্গে ৪২-তম হাইল্যাণ্ডাররা। · তলোয়ার উঁচু করে তীব্র গতিতে ঐ উন্মত্তের দল এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একদল তাদের কেন্দ্র আক্রমণ করল, আর একদল তাদের বামপার্শ্ব আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পশ্চাদ্‌ভাগে আক্রমণ শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে বেয়োনেটে আর তলোয়ারে লড়াই হলো।…জেনারেল ওয়ালপোল গুরুতরভাবে আহত হলেন; আরো কয়েকজন ইংরেজ এসে পড়াতেই তিনি বেঁচে গেলেন। …রোহিলারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে প্রাণ দিয়েছিল।"[৭]

রোহিলা গাজিদের মধ্যে "কেউই পালাবার চেষ্টা করেনি; হয়-মারবে নয়তো মরবে—তারা নিশ্চয়ই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছিল।"[৮] গাজিদের এইরকম একটা আক্রমণে স্বয়ং কমাণ্ডার-ইন-চিফেরই প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছিল। একজন আহত গাজি মৃতবৎ মাটিতে পড়েছিল, ক্যাম্পবেল যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ঐ গাজি তার তলোয়ার দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে যাচ্ছিল—এমন সময় একজন শিখ-সর্দার তার মাথা কেটে ফেলেছিল।[৯] মোগল শাহজাদা ফিরোজ শাহ বেরিলির কয়েকটা আক্রমণে নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এইরকম আক্রমণে টাইম্‌স-প্রতিনিধি রাসেলও এইভাবে মৃত্যুর হাত থেকে

৬. *Ibid*, p. 279

৭. Forrest : *History*…, vol. III, pp. 369-70

৮. Forbes-Mitchel : p. 255

৯. Forrest : *History*…, vol. III, p. 371

বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু ধাক্কা সামলাতে তাঁকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল।[১০]

দুইদিন অবিরাম যুদ্ধের পর ইংরেজরা ৭ই মে বেরিলি দখল করল। খানবাহাদুর তাঁর রাজধানী ত্যাগ করার পর আরো অনেকদিন ধরে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন, তা গেরিলাযুদ্ধের একটি অবিস্মরণীয় দলিল হয়ে থাকবে: "শত্রুবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ এড়িয়ে চলবে, কারণ তাদের বাহিনীগুলি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং তাদের শৃংখলাও অনেক বেশি। তাছাড়া, তাদের অনেক কামান আছে। কিন্তু তাদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখবে। নদীর সব ঘাটগুলিতে ভালো করে পাহারা দেবে; তাদের যানবাহন ধ্বংস করবে, তাদের সাজসরঞ্জাম খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নেবে। তাদের পিকেট ও ডাকগাড়ি বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকবে; আর তাদের এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

সর্বশেষে খানবাহাদুর খান নানা সাহেবের সঙ্গে ১৮৫৯ সনের শেষভাগে নেপালে প্রবেশ করেছিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের সৈন্যদের হাতে তিনি বন্দীও হয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে বেরিলিতে ফিরে এসেছিলেন। কিছুদিন পরে ইংরেজের ক্রীতদাস কোতোয়াল তাহির বেগ তাঁকে বন্দী করে। ইংরেজের আদালতে অশীতিপর বৃদ্ধ খানবাহাদুর খানের মৃত্যুদণ্ড হয়।

---

১০. Forbes-Mitchel : p. 256

অযোধ্যার গণযুদ্ধ

২২শে মার্চ যখন ইংরেজরা লখনৌ দখল করল তখন বেগম, ফৈজাবাদের মৌলভি এবং অন্যান্য নেতারা তাঁদের অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করতে পেরেছিলেন—তাঁরা কেউই শত্রুর হাতে বন্দী হননি। তাঁরা অন্যত্র গিয়ে পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। এখন থেকে ইংরেজকে সম্মুখীন হতে হলো প্রকৃত গণযুদ্ধের।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল, লখনৌ পতনের পর অযোধ্যা দমন করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। আর তখনকার অযোধ্যা দমন করার অর্থই হলো তালুকদারদের দমন করা। সেই উদ্দেশ্যে ক্যানিং একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করে বিশেষ করে তালুকদারদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজদের অনুগত আছেন তাঁরা ছাড়া আর সকলেরই জমিদারি সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হলো।[১]

ইংরেজদের দিক থেকে যুদ্ধের পক্ষে এরকম ঘোষণার ফল খুবই খারাপ হলো। বিদ্রোহের প্রথমদিকে বহু তালুকদারই যেসব মহাজন ও বানিয়া তাদের সম্পত্তি কিনে নিয়েছিল, তাদের নিকট থেকে জোর করেই সেইসব জমি পুর্নদখল করেছিল। তারপর থেকেই বিদ্রোহের প্রতি তাদের উৎসাহ ক্রমশই কমে আসতে লাগল। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই বিদ্রোহের প্রতি ও আদর্শের প্রতি সত্যকারের আনুগত্য দেখিয়েছিল এবং স্বাধীনতার জন্যে শেষ পর্যন্ত লড়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগ তালুকদারই তাদের শ্রেণীস্বার্থ কোনদিকে ছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল।[২]

---

১. Forrest : *Selections*··, vol. III, pp. 503-4

২. ইংরেজেরা তালুকদারদের ভালোভাবেই জানত। জেনারেল আউটরাম ১৮৫৭ সনে ১৭ই সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন: "A large and influential class in Oudh...among them the most powerful and most of the middle classes of chiefs and zamindars who really desire the establishment of our rule. (*Orders, Despatches and Correspondence*, 1859, p. 297) জেনারেল ইনেস-এর মতে "the participation of most of them (talukdars) in the Mutiny had been more nominal than real." (p. 42) অনেক তালুকদার বিদ্রোহী কৃষকদের ভয়ে বিদ্রোহ সমর্থন করার ভান করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিষ্ক্রিয়ই থেকে

ক্যানিং-এর মার্চ মাসের ঘোষণার পর বেশির ভাগ তালুকদারই খোলাখুলি-ভাবে বিদ্রোহে যোগ দিল। এখন থেকে দলে-দলে কৃষকরা তালুকদারদের বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল এবং অযোধ্যার এই বিদ্রোহকে একটি ব্যাপক গণযুদ্ধে পরিণত করল। কৃষকরা দলে-দলে অস্ত্রধারণ করল।

লখনৌ শহরে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীরা সমগ্র অযোধ্যায় ছড়িয়ে পড়ল। ক্যাম্পবেল যখন বেরিলির যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন একদল-সৈন্য নিয়ে ফৈজাবাদের মৌলভি তাঁকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করার জন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। বেরিলি পতনের পর শাহজাহানপুরে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এইখানে ফিরোজ শাহ এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। বেরিলির পরাজয়ের পর, মৌলভি অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ডের সীমানায় ৫ই জুন পোভেইন নামক স্থানে তিনি একজন ইংরেজভক্ত রাজার দুর্গ আক্রমণ করেন। একটা হাতির উপর বসে যখন তিনি দুর্গের গেট ভাঙবার চেষ্টা করছিলেন তখন শত্রুপক্ষের গুলীর আঘাতে তিনি নিহত হন। তারপর মৌলভির মাথাটা কেটে রাজভক্ত রাজা শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মাথাটি কোতোয়ালির সামনে অনেকদিন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ রাজা ৫০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন।

মৌলভির মৃত্যুতে বিদ্রোহীরা তাদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতাকে হারাল। তাঁর অসাধারণ সাহস, দৃঢ়তা, নৈপুণ্য এবং ইংরেজ-শত্রুর বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাবের জন্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁকে নেতা বলে মেনে নিত। ম্যালিসন ফৈজাবাদের মৌলভির সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "দেশপ্রেমিক যদি তিনিই হন, যিনি তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে ষড়যন্ত্র করেন ও যুদ্ধ করেন, তাহলে মৌলভি নিশ্চয়ই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি কোনো হত্যার দ্বারা তাঁর তরবারি কলঙ্কিত করেন নি, কিংবা কোনো হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত হননি। যে বিদেশীরা অন্যায়ভাবে তাঁর দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে ও তাঁর দেশকে দখল করেছে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের মতো সম্মানজনকভাবে ও দুর্দান্তভাবে লড়েছেন। সর্বদেশের সাহসী ও সৎ

গিয়েছিল এবং তাদের অনেকেই "kept the British authorities informed of the movements of the mutineers and of their lack of ammunitions." Holmes এই কথাই বলেছেন: (পৃ. ১৪৩, ২৬০)। Kaye বলেছেন: "some of the powerful Rajas, whose interest it was to maintain order, either sided with the English or maintained discreet neutrality whilst the tumult was at its height". (vol. II, p. 260)

প্রকৃতির মানুষেরই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।"[৩]

লখনৌ ও রোহিলখণ্ড জয় করার পর অযোধ্যার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে ১৮৫৮ সনে অক্টোবরের শেষে ইংরেজদের অভিযান শুরু হলো। ফতেগড় থেকে একটি বাহিনী শাহজাহানপুর থেকে একটি, গোরখপুর থেকে একটি এবং এলাহাবাদের নিকট সোরাওন থেকে স্বয়ং কমাণ্ডার-ইন-চিফের বাহিনী—এই ভাবে চারটি বাহিনী বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে করতে গোগরা নদীর ওপারে নেপালের জঙ্গলে ম্যালেরিয়া ও হিংস্র জন্তুর মুখে ঠেলে নিয়ে যাবে—এই ছিল ইংরেজ সরকারের প্ল্যান।

৩১শে অক্টোবর ব্রিগেডিয়ার বার্কার জঙ্গল পরিবেষ্টিত বীরভা দুর্গ আক্রমণ করলেন; সমস্ত দিন যুদ্ধ চলল। "দুর্গের প্রবেশদ্বার কামান দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছিল।...দুর্গের প্রধান অংশ দখল করা হলো বটে, কিন্তু অন্যান্য অংশগুলি থেকে শত্রুরা যুদ্ধ চালিয়ে গেল। বিদ্রোহীদের নেতা গোলাব সিং কেন্দ্রস্থলে একটা ঘর দখল করে তার জানালা ও দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে দ্রুত ও মারাত্মকভাবে গুলী ছুঁড়তে লাগল।...তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল এবং যেহেতু ব্রিগেডিয়ার বার্কারের অনেক লোক ধরাশায়ী হয়েছিল, তিনি একটা অংশকে উড়িয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন, অন্য অংশে ইতিমধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল। যে অংশটা উড়িয়ে দেওয়া হলো তাতে অনেক বিদ্রোহী প্রাণ হারালো, আর যে কয়জন অবশিষ্ট থাকল তারা জলন্ত বাড়িটা থেকেই গুলী ছুঁড়তে লাগল। গোলাব সিং-ও ১০ জন লোক নিয়ে প্রচণ্ড বেগে পরিখায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"[৪]

৩. Mallison : *History of Indian Mutiny*, vol. II, p. 541

৪. Forrest : *History*..., vol. III, pp. 504-5. ইতিমধ্যে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অক্টোবর মাসে পাশ হয়ে গেল এবং ১লা নভেম্বর এলাহাবাদে এক দরবারে পঠিত হলো। এই ঘোষণায় বলা হলো যে, কোম্পানি-সরকারের অবসান ঘটল ও ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ করল। ঘোষণায় আরো বলা হলো, হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করা হবে না, "সকলেই সমভাবে ও নিরপেক্ষভাবে আইনের নিরাপত্তা ভোগ করবে." এবং "জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজাকেই নিরপেক্ষভাবে চাকুরিতে নেওয়া হবে।"

বেগম হজরতমহল নিজে একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করে ভিক্টোরিয়ার জবাব দিলেন। ইংরেজের প্রতিশ্রুতিতে তারা যেন ভুলে না যায়, এই বলে বেগম তাঁর দেশবাসীকে সাবধান করে দিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বললেন। ইংরেজ সরকার অন্যের রাজ্য দখল করে আর

লর্ড ক্লাইড (কলিন ক্যাম্পবেলের 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হবার পর তাঁর নতুন নাম), ওয়েদারঅল ও গ্রান্ট হোপ একসঙ্গে ৩রা নভেম্বর বৈশওয়ারার খানপুরিয়া রাজপুত রাজাদের রামপুর-কুশিয়ার শক্তিশালী দুর্গ আক্রমণ করলেন। তারপর ৭ই তারিখে আমেথির রাজার দুর্গ আক্রান্ত হলো।। রাজা ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকরা তিনদিন ধরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করল, তারপর ১১ই তারিখে রাতের অন্ধকারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেল।

সেখান থেকে বিদ্রোহীরা শংকরপুরের রাজা বেণীমাধবের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। অযোধ্যার রাজপুত রাজাদের মধ্যে বেণীমাধবই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী ও ইংরেজ-বিরোধী। এখনো অযোধ্যার লোকেরা গ্রামে গ্রামে বেণীমাধবের শৌর্যবীর্য ও স্বদেশপ্রেমের কথা গানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করে থাকে।

এদিকে ক্লাইডের বাহিনী তিনদিক থেকে ১৫ই নভেম্বর শংকরপুর ঘেরাও করে ফেলল। শংকরপুর সম্বন্ধে একজন ইতিহাসজ্ঞ বলেছেন: "এটা একটা গৌরবময় দেশ এবং অসংখ্য গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, প্রচুর ফলের বাগান, আখের ক্ষেত, গোরু-বাছুর ও সর্বপ্রকারের শাকসবজিতে পরিপূর্ণ।"[৫]

২রা নভেম্বর ক্লাইড বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানিয়ে নিজেও একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন: "যেখানে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে, সেখানে বাড়িঘর, শস্য, সবই ঠিক থাকবে, শহরে কিংবা গ্রামে কোথাও লুঠপাট হবে না। কিন্তু যেখানে বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ করবে, কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে একটা গুলীও ছুঁড়বে, সেখানে অধিবাসীদের ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। তাদের বাড়িঘর সবকিছু লুঠ হবে ও তাদের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তালুকদার থেকে সবচেয়ে গরিব প্রজা পর্যন্ত, সকলের প্রতিই এই ঘোষণা প্রযোজ্য।"[৬] বহুস্থানে ইংরেজ বাহিনী তাদের এই ভীতি-প্রদর্শন কাজে পরিণত করেছিল। সমস্ত গ্রামকে-গ্রাম তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অযোধ্যার সাধারণ মানুষ ও কৃষকরা

নিজের রাজ্য বাড়াতে চায় না—ভিক্টোরিয়ার এই কথার জবাবে বেগম বললেন "আমাদের দেশবাসীরা যখন চাচ্ছে তখন রানী ভিক্টোরিয়া আমাদের দেশটা আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?" সর্বশেষে বেগম বললেন: "ভারতীয়রা রাস্তা তৈরি করবে ও খাল কাটবে—ইংরেজরা এর চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি দেয়নি, তাতে যেন ভারতীয়রা প্রতারিত না হয়।"

৫. *Ibid*, vol. III, p. 516

৬. *Ibid*, vol. III, p. 512

ইংরেজদের এইসব পাশবিকতা উপেক্ষা করে বহুদিন ধরে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল।

ক্লাইড এই ঘোষণাপত্রটি বেণীমাধবের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। "রাজপুত রাজা উত্তর দিলেন যে, তিনি নিজে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না, কারণ তাঁর দেহ তাঁর নিজের নয়—তা হচ্ছে তাঁর দেশের রাজার; রাজার আদর্শের জন্যে তিনি লড়তে বাধ্য। কিন্তু তিনি তাঁর দুর্গ সমর্পণ করতে রাজী আছেন। কারণ তা তাঁর নিজের।"[৭]

ক্লাইড বেণীমাধবকে একেবারে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বেণীমাধব তাঁর লোকজন নিয়ে মাঝরাতে রায়বেরিলির উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গলে চলে গেলেন। যখন ইংরেজরা শংকরপুরের বিশাল দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন সেখানে কয়েকজন পুরোহিত ও ফকির ছাড়া আর কেউ ছিল না।

রায়বেরিলিতে এসে ক্লাইড 'সঠিক' খবর পেলেন যে, বেণীমাধবকে একই দিনে একই সময়ে ৩১টি বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল। যাই হোক, কানপুরের ২০ মাইল উত্তরে ডুন্দিয়াখেরা নামক একটা স্থানে ক্লাইড বেণীমাধবকে আবার আক্রমণ করলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আবার শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ডুন্দিয়াখেরা পরিত্যাগ করলেন। তাঁকে আবার ঘেরাও করবার জন্যে ক্লাইড অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষদিকে বেণীমাধব গোগরা নদী পার হয়ে উত্তরে চলে গেলেন।

স্থানীয় সমগ্র জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতা থাকার ফলেই এই ধরনের গণযুদ্ধ সম্ভব হয়েছিল, বিশেষ করে তখনকার বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও। এই গণবিদ্রোহই হলো অযোধ্যার জাতীয় বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় কথা।[৮] এবং এই গণযুদ্ধ যে সামন্ততান্ত্রিক কায়দাতেই ঘটেছিল তা ধরে

৭. Forrest : vol. III, p. 517

৮. পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ এই গণযুদ্ধের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন : "Never has the enemy been met without being routed, scattered and his guns taken. But though constantly beaten, he ever more rallies and appears again, ready for a fresh encounter. No sooner is a city taken or relieved than some other one is threatened. No sooner is one district pronounced safe through the influx of British troops than another is disturbed and convulsed. No sooner is a highway reopened between places of importance than it is again closed and all communication is for a season cut off. No sooner are the mutineers

নেওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। সরকারি রিপোর্টেই দেখা যায়: "দুটি দল (তালুকদার ও কৃষক) ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে ও ব্রিটিশ সরকারকে ধ্বংস করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারা খুব তাড়াহুড়ো না করে বেশ শৃংখলা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে; প্রত্যেকটি গ্রামের জমিদারকে তারা ডেকে পাঠাচ্ছে এবং তাদের নিকট থেকে আনুগত্য ও কর আদায় করে নিচ্ছে। যদি কোনো জমিদার না আসে তাহলে বন্দুকধারী সিপাহি তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়।…(বিদ্রোহীদের) সম্মিলিত শক্তি দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা তারা তাদের অধীনে আনছে। তারা রাজস্ব আদায় করছে, ফসল ধ্বংস করছে, এবং নিজেদের পুলিশ নিয়োগ করছে।"[৯]

ব্রিগেডিয়ার এভেলে ২রা ডিসেম্বর লখনৌর ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী একটা যুদ্ধের পর ওমেরিয়ার দুর্গ দখল করলেন। ওমেরিয়ার দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিতে ইংরেজের তিনদিন লেগেছিল। উত্তরে মেহেন্দি থেকে ব্রিগেডিয়ার টুপ, আর সান্দেলা থেকে ব্রিগেডিয়ার বারকার বীরভাতে মিলিত হলেন, এবং তাঁরা ফিরোজ শাহকে এখানে ঘেরাও করবার চেষ্টা করলেন। ক্লাইডও তাঁর বিরুদ্ধে একটা বাহিনী পাঠালেন। "কিন্তু কৃষকদের নিকট খবর পেয়ে, ফিরোজ শাহ ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে গেলেন। তাঁর উপস্থিতি দোয়াবে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল এবং প্রত্যেকটি দস্যু ও বিদ্রোহী পুনরুদ্দীপ্ত আশা নিয়ে তাঁর এটোয়ার দিকে যাওয়া লক্ষ্য করছিল।"[১০]

scoured out of one locality than they reappear with double or treble force in another locality. No sooner does a moveable column force its way through hostile ranks than these reoccupy the territory behind it. All gaps in the number of the foe seem to be instantaneously filled up and no permanent clearance or impression seems to be made anywhere. The passage of our brave little armies through these swarming myriads, instead of leaving deep traces of a mighty ploughshare through a roughened field, seems more to resemble that of the eagle through the elastic air or a stately vessel through the unfurrowed ocean." (Duff: *Indian Rebellion*, pp. 223-24)

৯. Quoted by Prof. S. B. Chaudhuri (*Civil Rebellion in the Indian Mutinies 1857-59*, p. 34) from *Further Papers Relating to the Mutiny etc*, vol. VII, p. 144

১০. Forrest: vol. III, p. 523

এটোয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হিউম (যিনি পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন) হরচাঁদপুরে ফিরোজ শাহকে ধরতে গিয়ে খুব অল্পের জন্তে বেঁচে গিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের মতো ইংরেজের ফাঁদে পা বাড়ালেন না। তিনি উত্তরে না গিয়ে, যমুনা পার হয়ে বুন্দেলখণ্ডে তাঁতিয়া টোপির সঙ্গে মিলিত হলেন।

গ্র্যান্ট হোপ ২২শে ডিসেম্বর ফৈজাবাদে এসে পৌছলেন। বিদ্রোহীরা তখন গোগরার অপর পারে অবস্থান করছিল। ২৫শে ডিসেম্বর একটা যুদ্ধ হয়। এই সময় বিদ্রোহী গোণ্ডা রাজার বাহিনীর সঙ্গেও এই অঞ্চলে ইংরেজদের কয়েকটা যুদ্ধ হয়।

ক্লাইড ৫ই ডিসেম্বর লখনৌ ত্যাগ করে ফৈজাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন। নবাবগঞ্জ বরবাঁকিতে পৌছে শুনলেন যে, বেণীমাধব ২০ মাইল দূরে বৈরামঘাটে বিদ্রোহীদের সঙ্গে রয়েছেন। গোগরা পার হবার পূর্বেই বেণীমাধবকে ধরবার জন্যে অশ্বারোহীদের নিয়ে ক্লাইড ছুটলেন। কিন্তু সেখানে এসে দেখলেন যে, বিদ্রোহীরা সকলেই নদী পার হয়ে গিয়েছে; তাছাড়া আর একটি নৌকাও এধারে নেই। ক্লাইড তখন ফৈজাবাদ হয়ে সেক্রোরার দিকে চললেন।

অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার রোক্রফ্ট নানা সাহেবের ভাই বালারাওকে ২৩শে ডিসেম্বর একটা যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তুলসীপুর দখল করলেন। সেক্রোরা থেকে ক্লাইড ১৭ই ডিসেম্বর বারাইচে পৌছলেন, যেখানে নানাসাহেব ও বেগম হজরত-মহল বিদ্রোহীদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীরা তখন ২০ মাইল দূরে নানপারায় চলে গেল এবং সেখান থেকে গেল বারোদিয়াতে। সেখানে ২৩শে তারিখে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে ক্লাইড স্বয়ং আহত হয়েছিলেন। পরদিন ৬ মাইল দূরে মসজিদিয়াতে আরো একটা যুদ্ধ হয়।

৩০শে ডিসেম্বর ক্লাইড সংবাদ পেলেন যে, নানপারা থেকে ২০ মাইল দূরে রাপ্তি নদীর ধারে বরবাঁকিতে নানাসাহেব, বেণীমাধব ও বেগম হজরত অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের নিয়ে সমবেত হয়েছেন। পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর বরবাঁকির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা জঙ্গলে প্রবেশ করল। "যেখানে নিজেদের পুনর্গঠন করে তারা ইংরেজদের ওপর ভালোভাবে লক্ষ্য করে গুলী চালাতে লাগল। গোলন্দাজরা ও অশ্বারোহীরা জঙ্গলের ভিতর তাদের আক্রমণ করতে পারছিল না।"[১১] ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল। কয়েক দিক থেকে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলতে লাগল। বিদ্রোহীরা তখন জঙ্গলের ধার দিয়ে রাপ্তির দিকে চলতে লাগল। এমন সময় ইংরেজ অশ্বারোহীরা তাদের আক্রমণ করল। বিদ্রোহীরা তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর মধ্যেও অনেকক্ষণ সম্মুখযুদ্ধ

১১. Forrest: vol. III, p. 536

হলো – তাতে অনেকেরই মৃত্যু হলো এবং রাপ্তির দ্রুত স্রোতে মেজর হানের মতো অনেকেই ভেসে গিয়েছিল।[১২]

১৮৫৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের বরবাঁকির যুদ্ধই অযোধ্যা-বিদ্রোহের শেষ যুদ্ধ। এই শেষ যুদ্ধগুলি সম্বন্ধে ক্লাইড বলেছিলেন : "এই শেষ যুদ্ধগুলির চরিত্র থেকেই বোঝা যায়, যদিও কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি তবুও ছোট যুদ্ধের সংখ্যা ছিল অনেক।"[১৩]

যুদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে নানাসাহেব, হজরত মহল, বেণীমাধো প্রমুখ প্রধান বিদ্রোহী নেতাদের বন্দী করার জন্যে ক্লাইড বহু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তাঁদের অনেক প্রলোভনও দেখিয়েছিলেন।[১৪]

বরবাঁকি যুদ্ধের পর ফরাক্কাবাদের নবাব তফাজ্জল হুসেন, মেন্দি হুসেন, মহম্মদ হাসান প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। মম্মুখান, জওলাপ্রসাদ[১৫] এবং আরো অনেককে নেপাল সরকার ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করলেন। কিছুকালের মধ্যেই গোণ্ডার রাজা দেবী বক্স, বালারাও, আজিমুল্লা

১২. বিদ্রোহী জনসাধারণ কিভাবে এতদিন ধরে বীরত্বের সঙ্গে এইসব যুদ্ধগুলি করেছিল, সে সম্বন্ধে ড. মজুমদার ও ড. সেন বিশেষ কিছু বলেননি। ড. সেন হ্যাভলক, ক্লাইড প্রমুখ ইংরেজ অফিসারদের অভিযানগুলি সম্বন্ধে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বর্ণনা দিয়েছেন। আর ড. মজুমদার, অযোধ্যার তালুকদাররা যে স্বদেশভক্ত ছিলেন না, এই কথাটাই প্রমাণ করার জন্যে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তিনি বলেন : "The talukdars, with a few exceptions, did not join the revolt and rally round the flag of Begum Hazrat Mahal *at the beginning of the struggle.* The majority comprised those who, *at a later date* joined the rebellion (both the emphasis are Mazumdar's), a few of whom swore to fight for their country till the last." (*History of the Freedom Movement in India*, vol. I, p. 194) অথচ, এই ড. মজুমদারই Holmes থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন (পৃ. ১৮৯), অযোধ্যার এই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে "1572 forts had been destroyed and 714 canons exclusive of those taken in action, surrendered." এগুলি কি পরস্পরবিরোধী উক্তি নয়?

১৩. Forrest : *Ibid*, p. 537

১৪. Russell : *Diary*, vol. II, p. 359

১৫. ১৮৬০ সনে ৩রা মে কানপুরে সতীচৌরা ঘাটে জওলাপ্রসাদের ফাঁসি হয়েছিল।

প্রভৃতির তেরাইতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়। বেণীমাধো ১২০০ লোক নিয়ে কিছুদিন তেরাই-এর জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে প্রায় ৬০০ লোক সমেত বেণীমাধো ও তাঁর ভাই যোগরাজ সিং নিহত হয়েছিলেন। অযোধ্যায় বেণীমাধোর শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে লোকগীত প্রচলিত আছে।[১৬] নানাসাহেব সম্বন্ধে আর কোনো সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়নি। বেগম হজরতমহল তাঁর অবশিষ্ট জীবন নেপালেই কাটিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার যখন তাঁকে পেন্‌সন দিতে চেয়েছিলেন, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এক ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞের[১৭] মতে অযোধ্যায় যেসব অস্ত্রধারী বিদ্রোহী নিহত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার, এবং তাদের মধ্যে সিপাহির সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার।

১৬. Sen : pp. 367-68

১৭ Holmes : p. 506

গেরিলা যোদ্ধা কুমার সিং

১৮৪৫-৪৬ সনে যখন ইংরেজরা প্রথম শিখ-যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিল, তখন বিহারের হিন্দু-মুসলমান রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা একটা বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এতে নেপালের রাজা সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার অন্যতম নেতা ছিলেন কুমার সিং। ১৮৫৫-৫৬ সনে জেলের কয়েদিদের ওপর নির্যাতন, পাদরিদের দিয়ে ভারতীয়দের খ্রীস্টান করার প্রচেষ্টা, বিদেশী শিক্ষা, চাকুরি ইত্যাদি নিয়ে বিহারে যে গণ-আন্দোলন হয়, তারও পুরোভাগে ছিলেন কুমার সিং।[১] পাটনা শহর ছিল বহুদিন ধরে ওয়াহাবি আন্দোলনের একটা প্রধান কেন্দ্র। এই বিহারেই ১৮৩১-৩৩ সনে কোল-বিদ্রোহ ও ১৮৫৫-৫৭ সনে সাঁওতাল-বিদ্রোহ ঘটেছিল।

মহাবিদ্রোহের সময় বিহার, বিশেষ করে পাটনার সামরিক অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ও নৌবাহী গঙ্গা নদী এর মধ্য দিয়েই গিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ ও বিশেষ করে রাজধানী কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এই পাটনা ও বিহারের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতো। পাটনায় ও বিহারে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে যুদ্ধক্ষেত্রের ইংরেজ বাহিনীগুলির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যেত। এই বিহারেই ছিল ভারতের একটি বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টনমেণ্ট দিনাপুরে, এবং যেখানে ছিল বেঙ্গল আর্মির ৩টি রেজিমেণ্ট ও কিছু গোলন্দাজ, কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা সেখানে ছিল খুবই কম। এই বাহিনীই মেজর-জেনারেল লয়েড-এর অধীনে সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমন করেছিল এবং বড়লাট ডালহাউসি কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। অন্যান্য সিপাহি বাহিনীগুলির মতো দিনাপুর বাহিনীতেও যথেষ্ট বিক্ষোভ ছিল এবং মে মাসে মিরাটে ও দিল্লিতে বিদ্রোহ হবার পরই যদি এখানে বিদ্রোহ ঘটত, তাহলে তাদের বাধা দেবার জন্যে কলকাতা থেকে কানপুর পর্যন্ত কোনো ইংরেজ বাহিনী পাওয়া যেত না। দিনাপুরের কয়েকটি বাহিনী বিদ্রোহ করল ২৫শে জুলাইতে, অর্থাৎ মিরাট-দিল্লির দেড়মাস পরে। ইংরেজরা যে এই সময়টা পেয়েছিল তাতে তারা দিনাপুর-বিদ্রোহের প্রথম ধাকাটা সামলে নিতে পেরেছিল।

মিরাট বিদ্রোহের পর থেকেই এইসব অঞ্চলে খুবই চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং

১. K. K. Dutta : *Anti-British Plots and Movements Before 1857*, pp. 21-34

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কাশী, এলাহাবাদ, জুয়ানপুর ইত্যাদি স্থানে জনসাধারণ ও সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পাটনায় প্রভাবশালী ওয়াহাবিরা ও অন্যান্যরা খুব সক্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু তারা কেবল মিটিং-এর পর মিটিং ডাকতে লাগল (একটা মিটিং-এ ৮০০ জন লোক হয়েছিল), অনেক জায়গায় চিঠি পাঠাল, টাকা পাঠাল, সংবাদ পাঠাল, অথচ বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হলো না। এইভাবে তারা মূল্যবান সময় নষ্ট করল এবং শক্তি সংগ্রহ করার জন্যে ইংরেজকে যথেষ্ট সুযোগ দিল। শিখদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে একজন নজিবকে ১২ই জুন ফাঁসি দেওয়া হলো।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহের আশংকা করে বিহারের কমিশনার উইলিয়াম টাইলর এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সমস্ত সন্দেহজনক নেতাদের, বিশেষ করে ওয়াহাবি নেতাদের ১৮ই জুন এক ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন 'দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্যে'। কুমার সিং-ও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যাননি। যাঁরা উপস্থিত হলেন সকলকেই টাইলর বন্দী করলেন। পরদিন তিনি হুকুম করলেন, যার যা অস্ত্রশস্ত্র আছে তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। অনেকের বাড়ি তল্লাসি হলো, অনেকে বন্দী হলেন, কয়েকজনের বিনা বিচারে ফাঁসি হলো।

৩রা জুলাই, সরকারের এই সন্ত্রাসবাদ উপেক্ষা করে জনসাধারণ একটা মিছিল বার করল। ড. লিয়েল (Dr. Lyell) কয়েকজন শিখকে নিয়ে তাদের বাধা দিতে গিয়ে তিনি নিহত হন। ওয়াহাবি নেতা পুস্তকবিক্রেতা পীর আলি এবং আরো ৪৩ জনের বিচার হলো, এবং তার মধ্যে পীর আলি ও ১৮ জনের ফাঁসি হলো।[২]

২. পীর আলি সম্বন্ধে টাইলর লিখেছিলেন : "Peer Ali himself was a model of the desperate and determined fanatic . he was calm, self-possessed and almost dignified in language and demeaner. After capital sentence pronounced upon him in my paivate room in tae hope of eliciting some further information regarding the plot. Heavily fettered, his soiled garment stained deeply with blood from a wound in his side confronted with myself and several other Englishmen, the last hope of life departed, not for a moment did he betray agitation, despondeney or fear. On being asked whether he could do anything to make it worthwhile to spare his life, he answered with supreme coolness and some contempt : 'There are some cases

পাটনার বিদ্রোহী নেতারা ঠিক সময়ে তাঁদের শত্রুদের আঘাত করতে পারলেন না ; ইংরেজরাই খুব তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের ধ্বংস করে দিল।

২৫শে জুলাই দিনাপুর-সিপাহিদের একটা অংশ বিদ্রোহ করে বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাহাবাদ জেলার জগদীশপুরে কুমার সিং-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। তখন থেকে শুরু হলো বিহারে ব্যাপক গণবিদ্রোহ। কুমার সিং-এর বয়স তখন ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে হলেও তিনি সক্রিয় বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।[৩] কুমার সিং-এর নেতৃত্বে বিহারের ব্যাপক গণবিদ্রোহ এবং দুই

in which it is good to save life. Others in which it is better to lose it.' He then taunted me with the oppressions I have exercised and concluded by saying 'you may hang me or such as me everyday but thousands will arise in my place and your object will never be gained.'…I have dwelt at some length on the description of this man because, he is the type of a class with many of whom we have, in this country to deal, men whose un-conquerable fanaticism renders them dangerous enemies and whose stern resolution entitles them in some measure to admiration and respect." (*Our Crisis*, pp. 45-46)

৩. ড মজুমদার কমিশনার টাইলর, ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েক প্রভৃতির সাক্ষ্য 'নিরপেক্ষতার' সঙ্গে 'ধীরস্থির ভাবে' পরীক্ষা করে ("after a calm and careful consideration, in a detatched spirit") বলেছেন, কুমার সিং-এর সম্পত্তির ব্যাপারে ইংরেজের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ ছিল এবং তার জন্যেই তিনি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমের জন্যে নয় : "It proves that even Taylor, who was later acused of indiscriminate arrest of Indians on mere suspicion of rebellious activities, has borne testimony to the fact that Kunwar Sing was a friend of the English, but turned against them on account of personal grievances" (*Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, p. 166) আবার, নিশান সিং-এর একটা শোনা-কথাকে তথ্য হিসেবে গ্রহণ করে ড মজুমদার বলেছেন যে, দিনাপুরের সিপাহিরা তাঁকে ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহে নামিয়েছিল। কিন্তু এই নিশান সিং যখন ঐ ভয়-দেখানোর কথাটা তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, তখন আর একটা কথাও বলেছিলেন, যার ওপর 'নিরপেক্ষ' ইতিহাসবিদ কোনো গুরুত্বই দেননি : "This threat was not made in my presence and I state it according to what I have heard."

বৎসরব্যাপী গেরিলাযুদ্ধ মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। এই অঞ্চলের একটা ঐতিহ্য হলো এই যে, এখান থেকেই ক্লাইভ যখন ইংরেজ বাহিনীতে প্রথম ভারতীয়দের ভর্তি করার চেষ্টা করেন তখন কুমার সিং-এর পূর্বপুরুষরা তাতে বাধা দিয়েছিলেন: "ভোজপুরের যেসব প্রধান ব্যক্তিরা ইংরেজদের বাধা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগদীশপুরের উদ্বাস্তু সিং, যাঁর প্রপৌত্র কুমার সিং ১০০ বছর পর তাঁদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন এবং তাদের চালনা করেছিলেন ও তাদের দ্বারা চালিতও হয়েছিলেন।"[৪]

বিদ্রোহে যোগ দিয়ে কুমার সিং নিজের লোকজন ও বিদ্রোহী সিপাহিদের নিয়ে সাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরা আক্রমণ ও দখল করলেন; কেবলমাত্র একটি সুরক্ষিত গৃহ ইংরেজদের অধীনে রইল। এই গৃহ ৩ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর, ২৯শে জুলাই কুমার সিংকে আক্রমণ করার জন্যে দানাপুর ও ডানবারের নেতৃত্বে প্রায় ৩৫০ জন ইংরেজ ও ১৫০ জন শিখ মাঝরাতে আরার ৩ মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছল। আর একটি মাত্র আমবাগান পার হতে পারলেই হয়ে যায়। কিন্তু এইখানেই কুমার সিং-এর বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ছিল। চতুর্দিক থেকে ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে তাদের ওপর আক্রমণ শুরু হলো। প্রথম দিকেই ডানবার নিহত হলেন। এই অবস্থায় ইংরেজরা পলায়ন করাই শ্রেয় মনে

ড. মজুমদার তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংগতি রেখে কুমার সিং সম্বন্ধে যেসব অযৌক্তিক অপবাদ প্রচার করেছেন, তা বহু তথ্য ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন আর একজন ইতিহাসজ্ঞ ড. কালীকিঙ্কর দত্ত। ড. দত্ত প্রমাণ করেছেন, (ক) ১৮৪৫-৪৬ সনে বিহারে যে ব্রিটিশ-বিরোধী চক্রান্ত হয়েছিল কুমার সিং তার একজন নেতা; (খ) ওয়াহাবি ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও তিনি অনেক-দিন ধরে জড়িত ছিলেন; (গ) দিনাপুরের সিপাহিদের সঙ্গে তাদের বিদ্রোহের পূর্ব থেকেই তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন; (ঘ) ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েক তাঁর রিপোর্টে বলেছেন: "Ioepoys reportedly declare that they were acting under Kunwar Singh's orders;" (ঙ) "In his stronghold of Jagadishpur he had stored six months' provisions for an army of 20,000 men and had arranged for the manufacture of arms and amunitions." (*Biography of Kunwar Singh and Amar Singh*, p. 104)

৪. Aditya Prasad Jha: 'The First Mutiny in the Bengal Army, 1764',—*Journal of the Bihar Research Society*, 1956 March

করল। কিন্তু মাইলের পর মাইল যেখান দিয়েই তারা পালাবার চেষ্টা করে, সেখানেই তারা বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরদিন এইভাবে মাত্র ৫০ জন ইংরেজ কোনোমতে প্রাণ নিয়ে দিনাপুর ফিরে যেতে পেরেছিল।

৩রা আগস্ট মেজর এইর কাশী থেকে একটি বড় বাহিনী ও কামান নিয়ে আরা আক্রমণ করলেন। কুমার সিং তখন আরা ত্যাগ করে জগদীশপুরে চলে এলেন। কিন্তু বড় বড় কামানের বিরুদ্ধে জগদীশপুরের যুদ্ধের শক্তি ছিল না। ১২ই আগস্ট এইর হাউইটজার কামান দিয়ে জগদীশপুর ধ্বংস করে দিলেন। ফরেস্ট বলেন: "১০ম ইংরেজ ফুসিলিয়ার বাহিনী দৈত্যের মতো লড়াই করেছিল...তারা আহত ও নিহতদের দেড় মাইলব্যাপী রাস্তার দু'ধারে গাছের শাখা থেকে ঝুলিয়ে দিল।...এই ধরনের কাজ অত্যন্ত দুঃখ ও ঘৃণার সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করতে হয়, কিন্তু এর একটা শিক্ষামূলক দিকও আছে।"৫

জগদীশপুর ত্যাগ করে কুমার সিং ৮ মাইল দূরে অবস্থিত আতাউরা শহরে তাঁর প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও এইর তাঁর বাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করায় কুমার সিং সে স্থানও ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। মেজর এইর গভর্নর-জেনারেলকে আতাউরা থেকে লিখলেন: "আমি এই শহর ধ্বংস করে দিচ্ছি, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকাগুলিকেও উড়িয়ে দিচ্ছি। আজ আমি একটা হিন্দু-মন্দিরও ধ্বংস করে দিলাম—যে মন্দির সম্প্রতি কুমার সিং অনেক টাকা খরচ করে বড় করে গড়ে তুলেছিলেন। আমি এটা করেছি এই কারণে যে, ব্রাহ্মণরা এই বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছিল।"৬

কুমার সিং তাঁর শক্তিশালী কেন্দ্রগুলি হারিয়ে রোটার পাহাড়ে কিছুকাল ঘুরে বেড়ালেন। এটা ইংরেজদের পক্ষে একটা ভীষণ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করল। গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের কোথায় তিনি আঘাত দেবেন, অথবা সাসারাম, মির্জাপুর বা অন্য কোনো শহর দখল করবেন, বা পাটনা আক্রমণ করবেন, এইসব আশংকা ইংরেজ সরকারের নিকট ভীষণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কুমার সিং-এর সঙ্গে তখন ১ হাজার সৈন্য, কিন্তু গোলাবারুদের খুবই অভাব। সাসারামের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ৩০শে আগস্ট ১৮৫৭ তারিখে রিপোর্ট করেছিলেন যে, "আশেপাশের গ্রামগুলির জমিদাররা কুমার সিং-এর বাহিনীর জন্যে সব রসদ সংগ্রহ করে দিচ্ছে।...এইসব স্থানে জমিদাররা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে এবং কৃষকরা খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ করছে।"

কিন্তু কুমার সিং বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে অযোধ্যা, দিল্লি ও মধ্য-ভারতের রণাঙ্গনে, নিম্নগঙ্গার অঞ্চলে নয়। দিল্লি অথবা

৫. *History...*, vol. III, p. 455
৬. *Ibid*, p 455

লখনৌ যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৫০০ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর আত্মীয় রেওয়ার রাজার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু 'ইংরেজরাই ছিল রেওয়া রাজের আরো নিকটতম আত্মীয়'; তিনি কুমার সিংকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর প্রজারা সব কুমার সিং-এর সঙ্গে যোগ দিল। রেওয়া-রাজা কোনোমতে পালিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় নিলেন।

এই সময়ে ইংরেজরা কুমার সিংকে বারবার ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের সাহায্যে তিনি তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, যেসব স্থানে ইংরেজরা তাঁকে কোনোদিনই দেখার আশা করেনি, সেইসব স্থানগুলিতে তিনি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন এবং রসদ ও অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্তর্ধান করেছেন।[৭]

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে তাঁতিয়া টোপি ও বান্দার নবাবের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে কুমার সিং রেওয়া থেকে বান্দার দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু তিনি বান্দা পৌঁছবার পূর্বেই তাঁরা কাল্পিতে চলে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে নানাসাহেব কাল্পিতে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে কুমার সিংকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। গোয়ালিয়ার বাহিনীও তাঁকে জানাল যে, তারা পৌঁছবার পূর্বে তিনি যেন যমুনা পার না হন। কুমার সিং কাল্পির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাল্পির পরাজয়ের পর কানপুরের যুদ্ধের সময়ও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁতিয়া টোপি সেখানে হেরে যাবার পর কুমার সিং তাঁতিয়ার সঙ্গে না গিয়ে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যেখানে হচ্ছিল সেই লখনৌতে চলে গেলেন। লখনৌর দরবারে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করলেন, এবং সেখানকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন।

১৭ই মার্চ ১৮৫৮, ইংরেজরা একটা খবর শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে কুমার সিং গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব-অযোধ্যার আজিমগড় থেকে ২০ মাইল দূরে আত্রোলিয়া নামক একটি জায়গায় হঠাৎ হাজার খানেক লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন পূর্বে এই সমস্ত অঞ্চলটাকেই জঙ্গ বাহাদুরের গুর্খারা ও জেনারেল ফ্র্যাঙ্কের ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করে লখনৌ ও কানপুর বিদ্রোহ দমনের জন্যে চলে

৭. যোদ্ধা কুমার সিং সম্বন্ধে ড. কালীকিঙ্কর দত্ত বলেছেন: "A skilled warrior and a consumate strategist, he changed his military tactics and movements with great celebrity to suit varying needs and often baffl d the well-contrived plans of his enemies to their utter bewilderment." (*Biography of Kunwar Singh and Amar Siugh*, p. 155)

গিয়েছিল। এইসব স্থানে যে আবার বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে তা ইংরেজরা ভাবতেই পারেনি। আজিমগড় কেন্দ্রের কমাণ্ডার কর্নেল মিলম্যান ২১শে মার্চ কুমার সিংকে আত্রোলিয়াতে আক্রমণ করলেন। বিদ্রোহীরা সামান্য যুদ্ধ করার পর হটে গেল। এই বিজয়ের পর ইংরেজরা মহানন্দে তাদের প্রাতরাশ প্রস্তুতের কাজে লেগে গেল। কুমার সিং সেই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন ; হঠাৎ তিনি ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। সমস্ত জিনিসপত্র রেখে মিলম্যানের বাহিনীকে পালাতে হলো। তল্পি বাহকরা পালিয়ে গেল। সমস্ত দিন ও রাত বিদ্রোহীরা ইংরেজদের ধাওয়া করে যেতে লাগল। মিলম্যান কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে আজিমগড়ে এসে তাঁর দুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং কাশী, লখনৌ ও এলাহাবাদে জরুরি সাহায্য প্রার্থনা করে খবর পাঠালেন।

খবর পাওয়া মাত্র কাশী থেকে কর্নেল ডেইম্‌স একটা বাহিনী নিয়ে মিলম্যানকে বাঁচাবার জন্যে এলেন। কিন্তু আজিমগড়ে পৌছতে না-পৌছতে ডেইম্‌সের বাহিনীও প্রায় শেষ হয়ে এলো এবং অবশিষ্ট কয়েকজন লোক নিয়ে তাঁকেও মিলম্যানের দুর্গে আশ্রয় নিতে হলো।

গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং তখন এলাহাবাদে ছিলেন। দুই-দুইজন ব্রিটিশ কর্নেলের পর-পর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কুমার সিং-এর দুর্দান্ত সাহসের কথা তিনি আগেই জানতেন এবং এই বৃদ্ধ যে তাঁকে একটা ভয়ংকর বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন, তা তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন। ক্যানিং আরো উদ্বিগ্ন হলেন এই কারণে যে, কুমার সিং-এর এই জয় "বাংলা দেশে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করবে। তাছাড়া, কুমার সিং যদি কাশীর দিকে রওনা হন, তাহলে কলকাতা ও লখনৌর মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।"[৮]

কুমার সিং-এরও ঠিক এই পরিকল্পনাই ছিল। ইংরেজরা যখন লখনৌ, ফৈজাবাদ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি পূর্ব-অযোধ্যা, কাশী, বিহার ইত্যাদি স্থানে ইংরেজদের আঘাত করতে মনস্থ করলেন। কুমার সিং-এর এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্যে ক্যানিং ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 'একজন অত্যন্ত সাহসী ও সুচতুর' জেনারেল, লর্ড মার্ক কেরকে পাঠালেন। তাছাড়া, ইতিমধ্যে ২০শে মার্চ লখনৌতে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটল। সুতরাং বাধ্য হয়েই কুমার সিংকে কাশী দখল করার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হলো।

৬ই এপ্রিল, মার্ক কের কাশী থেকে তাঁর বিরাট ইংরেজ বাহিনী ও ৮টি কামান নিয়ে কুমার সিংকে আজিমগড়ের ৮ মাইল দূরে আক্রমণ করলেন। কুমার সিং-এর কোনো কামান ছিল না। কিন্তু তাঁর বাহিনী এমনভাবে সমাবেশ

৮. Forrest : p. 460

করলেন, তিনিই মার্ক কেরকে পশ্চাতে ও পার্শ্বে আক্রমণ করার সুযোগ পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্ক কেরের অবস্থা খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠল। রণক্ষেত্র ত্যাগ করে তাঁকে তাড়াতাড়ি আজিমগড় অভিমুখে চলে যেতে হলো। কুমার সিং স্বয়ং অশ্বারোহণে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

ফরেস্ট আজিমগড়ের ৬ই এপ্রিলের যুদ্ধ এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "কতক্ষণ ধরে আমাদের কামানগুলি খুব গোলাবর্ষণ করতে থাকল। কিন্তু শত্রুদের ওপর তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না। অট্টালিকাগুলি ও আমবাগানের প্রতিটি গাছের শাখা বন্দুকধারী সিপাহিতে ভর্তি ছিল। আমাদের লম্বা কনভয়টি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল, হাতির মাহুত ও গোরুর গাড়ির চালকরা সকলেই পালিয়ে যায়।...এইসময় শত্রুরা সুসংগঠিতভাবে আমাদের পার্শ্বভাগে আক্রমণ শুরু করল। আমাদের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করল।"[৯]

মার্ক কের যখন কাশী থেকে কুমার সিংকে আক্রমণ করার জন্যে আসছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময় আর একটি ইংরেজ বাহিনী জেনারেল স্যার এডওয়ার্ড লুগার্ডের অধীনে এলাহাবাদ থেকে রওনা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার চেয়েছিল, তাদের এই দুটি বাহিনীর মাঝখানে ফেলে কুমার সিংকে ও বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু কুমার সিং যুদ্ধবিদ না হয়েও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়ে ইংরেজদের সেই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ করে দিয়ে জগদীশপুর অভিমুখে রওনা হলেন।

ইতিমধ্যে লুগার্ড প্রায় বিদ্রোহীদের নিকট পৌঁছে গিয়েছেন। কেবলমাত্র টন্স নদীর সেতু পার হলেই বিদ্রোহীদের তিনি পথরোধ করে দাঁড়াতে পারবেন। কুমার সিং ৩০০ জন বাছাই-করা সিপাহির ওপর ভার দিলেন, অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যে ইংরেজদের যেন সেই সেতু কোনোমতেই পার হতে না দেওয়া হয়। এই ছোট্ট বিদ্রোহী বাহিনাটির ওপর বারবার আক্রমণ চালিয়েও লুগার্ড তাদের হঠাতে পারলেন না। এই সুযোগে কুমার সিং তাঁর প্রধান বাহিনী নিয়ে ইংরেজের নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। ম্যালিসন বলেছেন: "এই সিপাহিরা অত্যন্ত ঝানু সৈনিকের মতো অসীম দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেতুটি রক্ষা করেছিল। শুধু তখনই তারা এই সেতু ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল, যখন তারা জানল তাদের দলটি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গিয়েছে।"[১০] সেতুর যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, পশ্চিম-বিহারের কুখ্যাত নীলকর ভেনাবেল এই যুদ্ধে নিহত হন।

৯. *Ibid*, pp. 461-62

১০. Malison: *History of the Indian Mutiny*, vol. IV, p. 330

এইবার ইংরেজদের লক্ষ্য হলো গঙ্গা ও গোগরার ত্রিকোণ সঙ্গমে কুমার সিং ও তাঁর বাহিনীকে আটকে ফেলা ও তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। ফরেস্ট বলেছেন : "বিদ্রোহীরা তাদের সক্রিয় ও যোগ্য নেতার অধীনে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করল ; যখন তাদের ওপর আক্রমণ হতো, তারা তখন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেত এবং রাত্রিকালে একটা নির্দিষ্ট স্থানে তাদের কমাণ্ডারের নেতৃত্বে পুনরায় মিলিত হতো।...সব গ্রামগুলির সহানুভূতিই ছিল এই বৃদ্ধ রাজপুত রাজার প্রতি। তারা ব্রিটিশ সৈন্যের গতিবিধি সবই সঠিকভাবে পৌছে দিত, পক্ষান্তরে ইংরেজদের ভুল পথে চালনা করার জন্যে সব রকমের চেষ্টাই তারা করত। কৌশলে শত্রুকে ভুল পথে চালনা করার মূল্য কুমার সিং ভালো করেই বুঝতেন এবং এই খেলা তিনি খুব নিপুণতার সঙ্গেই খেলেছিলেন। ...আমাদের লক্ষ্য ছিল পুব ও পশ্চিম দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করা এবং গঙ্গা-গোগরার ত্রিকোণ সঙ্গমে তাঁকে আটকে ফেলা ; আর কুমার সিং-এর লক্ষ্য ছিল গঙ্গা পার হয়ে তাঁর নিজ দেশের জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া।"[১১]

কুমার সিং-এর জগদীশপুরে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনায় সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ৩১শে মার্চ বড়লাটকে জানালেন—"জনসাধারণ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে এবং প্রচুর লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।" সরকার কুমার সিং-এর মাথার জন্যে ২৫ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করল[১২] এবং সমস্ত রকমের ব্যবস্থাই অবলম্বন করল। পাটনার কমিশনার বড়লাটকে রিপোর্ট করলেন,—"গঙ্গার বাম তীর ও গোগরার ডান তীরের সমস্ত নৌকাগুলি যাতে অতি অবশ্যই সরিয়ে নেওয়া হয় তার জন্যে আরা ও ছাপরার ম্যাজিস্ট্রেটদের হুকুম দেওয়া হয়েছে। জমিদার ও পুলিশদেরও পরোয়ানা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা প্রতিটি ঘাটে, বিশেষ করে শেওপুর ঘাটে যেন পাহারা বসায়।...তাছাড়া সাহাবাদের গ্রামগুলিকে, বিশেষ করে সন্দেহজনক স্থানগুলিকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তাদের মধ্যে কেউ কুমার সিংকে সমর্থন করে, তাহলে গোটা গ্রামকেই ভীষণভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।"

কিন্তু ইংরেজদের এত সতর্কতা সত্ত্বেও কুমার সিং ১৮৫৮ সনের ২১শে এপ্রিল গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। ইংরেজরা চতুর্দিক থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেল যে, কুমার সিং তাঁর বাহিনী নিয়ে বালিয়ায় গঙ্গা পার হবেন। নৌকো সংগ্রহ করতে না পারায় হাতি চড়েই সকলে গঙ্গা পার হবেন। ইংরেজরা যখন বালিয়া ও নিকটবর্তী স্থানগুলিতে গোপনে অপেক্ষা করছিল, ১০ মাইল দূরে

১১. Forrest : vol. III, pp. 468-69

১২. Ball : vol. II, p. 287

শেওপুর ঘাটে রাত ২টার সময় কুমার সিং তাঁর লোকদের গঙ্গা পার করছিলেন। জেনারেল ডগলাস এই খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন, সকলেই গঙ্গা পার হয়ে গিয়েছে—কেবলমাত্র শেষ নৌকাটি নদীর মাঝামঝি গিয়ে পৌছেছে। সব লোকজনদের আগে পার করে দিয়ে এই শেষ নৌকায় ছিলেন কুমার সিং স্বয়ং। যখন তিনি মাঝ গঙ্গায় এসেছেন, এমন সময় ইংরেজের একটি গুলী তাঁর হাতে বিদ্ধ হয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করল। ঐ হাতটি তখনই কেটে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হলো, তিনি অন্য হাতে তরবারি বের করে আহত হাতটি কেটে পবিত্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন।

আট মাস ধরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ২২শে এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে ১ হাজার সৈন্য ও ২টি কামান নিয়ে কুমার সিং আবার তাঁর জন্মস্থান জগদীশপুরে ফিরে এলেন। তাঁর ভগ্ন প্রাসাদে ব্রিটিশ পতাকার পরিবর্তে আবার নিজের স্বাধীন পতাকা উড়তে লাগল।

এই সংবাদে আরার কম্যাণ্ডিং অফিসার লেগ্রাণ্ড অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দুটি হাউইটজার কামান এবং একদল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে তৎক্ষণাৎ জগদীশ-পুর আক্রমণ করতে চললেন। এই ৮ মাস ধরে বিদ্রোহীরা একদিনের জন্যেও ভালো ভাবে বিশ্রাম ও আহারের সুযোগ পায়নি। জগদীশপুরে পৌছেই তাদের আবার পরের দিনই ইংরেজ শত্রুর সম্মুখীন হতে হলো। দুই ঘণ্টা ধরে উভয় পক্ষে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলল। তারপর হঠাৎ বিদ্রোহীরা ৩০-তম ইংরেজ বাহিনীকে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব উভয় দিক থেকেই আক্রমণ করল এবং ইংরেজরা যাতে পালাতে না পারে, তার জন্যে বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা পশ্চাৎ দিক থেকেও তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ইংরেজদের এবারও কামান ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েই পালাতে হলো।[১৩] ফরেস্ট বলেছেন: "যে যেদিকে পারল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কেউ কারো কথা শুনল না—সামরিক হুকুমে কেউ কান দিল না; লোকগুলি তখন হিংস্র উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে। এইভাবে খোলা রাস্তার উপর যখন তারা পৌছল, তখন তারা যেন সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে ধরাশায়ী হতে লাগল; তাদের শুশ্রূষার কোনো উপায় ছিল না।...ঐ অবস্থাতেই তাদের ফেলে রেখে আসতে

১৩. "Soldiers running for lives for five miles and more had now no strength even for lifting up their guns. The Sikhs accustomed to the heat of the sun, took off the elephants and fled away ahead of all. None would be with the white. Out of 199 white, about 80 alone could survive this terrible massacre. We were led into this jungle like cattle into the slaughter house, simply to be killed." (Ball: vol. II, p. 288)

হলো।"[১৪] হোয়াইট নামক আর একজন ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, ব্রিটিশের এই রকম শোচনীয় পরাজয়ের দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। চার্লস বল্ তাঁর সুবৃহৎ সিপাহি-বিদ্রোহের ইতিহাসে লিখেছেন যে, এমন একটা লজ্জাকর কাহিনীর বিবরণ লিখতে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

এই বিজয়ের তিনদিন পরে ২৬শে এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কুমার সিং তাঁর জগদীশপুরের প্রাসাদে, স্বাধীন পতাকার নিচে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।[১৫]

১৪. Forrest : vol. III, p. 472

১৫. ড. রমেশ মজুমদারের মতে কুমার সিং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহে যোগ দেননি, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন। একজন ইংরেজ লেখক, যাঁর স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ছিল না, মহাবিদ্রোহের ৫ বছর পর কুমার সিং সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তা হয়তো ড. মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি : "For long past Coer Singh had been watching the course of events with keen interest and a definite purpose...We can afford to won that he was not a devil at all but the high-souled Chief of a war-like tribe, who had been reduced to a non-entity by the yoke of a foreign invader. 'What am I good for under your dynasty ?' was his constant complaint to European visitors...He well-remembered the time when Scindia and Holkar were not mere puppets of the Government of Fort William. ··· He fretted like the proud Highland chiefs ..Surely (we) may spare a little sympathy for the chieftain, who at eighty years old...inflicted on us a disaster, complete and tragical ; who exacted from the unruly mutineers an obedience which they paid to no other, who led his force in person to Lucknow and took leading part in the struggle which decided the destinies of India ; who after no hope was left for the cause north of Ganges did not lose heart but kept up his men together during a long and arduous retreat in the face of a victorious enemy ; and as the closing act of his life by a masterly manoevre baffled his pursuers and placed his troop in safety on their own side of the great river, when friend and foe alike believed their destruction to be inevitable. On that occasion a round shot from an English gun smashed his arm as he was directing the passage of the last boat full of his followers contrary to the habit of the Eastern Generals who ordinarily shun the post of danger...it was uncommonly lucky for us that Coer Singh was not 40 years younger." (George O. Trevelyan : *Competition Wallah*, 1866. p. 74)

গেরিলা যোদ্ধা অমর সিং

কুমার সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অমর সিং আরো ৬ মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহের প্রথম দিকে কুমার সিং যখন জগদীশপুর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেই সময়ে অমর সিং সাসারামের নিকট কাইমুর পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে অবিরাম গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই দলগুলি ইংরেজদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ পরিহার করত, কিন্তু সুযোগ মতো অতর্কিতে ইংরেজদের আক্রমণ করত, তাদের রসদ ও গোলাবারুদ লুঠ করে নিত, যাতায়াতের রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিত।

পাটনার কমিশনার এই সময়ে সরকারের নিকট রিপোর্ট করেছিলেন যে, আরার চারিদিকের গ্রামগুলিতে সর্বত্র একটা সক্রিয় বিদ্রোহী মনোভাব দেখা যাচ্ছে এবং অমর সিংকে যতদিন পর্যন্ত তাঁর খুশিমতো ধ্বংসাত্মক কাজ করতে দেওয়া হবে এবং যতদিন পর্যন্ত জগদীশপুরে তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন জনসাধারণের বিদ্রোহী মনোভাব দমন করা যাবে না। যদি গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের উত্তরাঞ্চলটা অমর সিং অধিকার করে ফেলে তাহলে শুধু আরা জেলারই নয়, পাটনা ও গয়া জেলার অবস্থাও সংকটজনক হয়ে পড়বে।"[১] অমর সিং-এর মাথার জন্যে ইংরেজ সরকার ২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল এবং কিছুকাল পরে তা বাড়িয়ে দেওয়া হলো ৫ হাজার টাকায়।

কুমার সিং-এর মৃত্যুর পর অমর সিং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

মে মাসের প্রথম থেকেই জেনারেল লুগার্ড ও ব্রিগেডিয়ার ডগলাস অমর সিংকে ধ্বংস করার জন্যে নতুন অভিযান শুরু করলেন এবং শীঘ্রই বিদ্রোহীদের জগদীশপুর জঙ্গলে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেললেন। মে ও জুন মাস ধরে বহু খণ্ডযুদ্ধ হলো। অমর সিং তাঁর বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিতেন এবং দরকার মতো আবার তাদের একত্রিত করে আক্রমণকারীদের ওপর আঘাত করতেন। বিদ্রোহীদের এরকম কৌশলের ফলে ইংরেজদের পক্ষে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। এক এক সময় ইংরেজ কম্যাণ্ডাররা মনে করত যে বিদ্রোহীদের তারা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখা যেত, বিদ্রোহীরা পূর্বের মতোই শক্তি নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করেছে। জঙ্গলের একটা অংশ থেকে যখন তারা বিতাড়িত হতো, আরেকটা অংশে তারা দেখা

১. K. K. Datta ; p. 161

স্থিত ; সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে পুনরায় প্রথম অংশে সমবেত হতো। অমর সিং একদিনের জন্যেও ইংরেজদের বিশ্রাম করতে দেননি।

এইরকম একটা যুদ্ধেই বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় নেতা নিশান সিং ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। কোর্ট-মার্শালের বিচারের পর তাঁকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

জুন মাসে অমর সিং জঙ্গল পরিত্যাগ করে কর্মনাশা নদী পার হলেন ও গাজিপুর দোয়াবে এসে উপস্থিত হলেন—অযোধ্যার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে আবার তিনি জগদীশপুরের জঙ্গলে ফিরে গেলেন। তখন অমর সিং-এর অধীনে মাত্র ১৫০০ লোক, আর লুগার্ডের অধীনে ৭ হাজার লোক। সরকারের নিকট লুগার্ড অভিযোগ করলেন, "জনসাধারণের নিকট থেকে বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়ার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে।"

পাটনার কমিশনার ১৪ই জুন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখলেন : "বর্ষা শুরু হবার পূর্বেই শত্রুদের এইসব স্থানগুলি থেকে বিতাড়িত করার জন্যে আমাদের আরো প্রবলভাবে চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে বর্ষা শুরু হয়ে যাবার পর গয়া, পাটনা, সরন জেলাগুলিতেও তারা ওলট-পালট করে দেবে।"[২]

বিদ্রোহীদের দমন করতে না পেরে ১৭ই জুন ১৮৫৮ তারিখে জেনারেল লুগার্ড পদত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। বহুদিন ধরে অবিশ্রান্তভাবে বনেজঙ্গলে যুদ্ধ করার ফলে লুগার্ডের মন ও স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল।[৩]

লুগার্ডের পদত্যাগের একদিন পর পাটনার কমিশনার আবার রিপোর্ট করলেন : "জেনারেল লুগার্ডের পদত্যাগের কথা শুনে অমর সিং-এর বাহিনী, যেটা সোন নদী পার হয়ে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসছে এবং গতকাল তারা আবার জগদীশপুরের কয়েক মাইলের মধ্যে পৌঁছেছে। তাদের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার হবে—কিছু সিপাহি আর কিছু গ্রামের লোক। জিওধর সিং ৬-৭ শত লোক নিয়ে সোন নদীর ডান দিক ধরে দাউদনগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সর্বত্র তিনি লুঠ করছেন, আগুন লাগাচ্ছেন ও খুন করছেন। ... তাঁর ভাই হেতম সিং পাটনার বিক্রম থানার দিকে যাচ্ছেন। তিনি পালিগঞ্জের আফিং-এর

২. Datta : p. 171

৩. "The great hardships he had endured and the wearing anxieties and embarassments under which he had laboured were enough to shake the strongest constitution, and Lugard was forced on account of his health to resign his command and proceed to England." (Forrest : vol. III, p. 476)

গুদাম ও বিক্রমের মিস্টার সোরাবনোর ফ্যাক্টরি পুড়িয়ে দিয়েছেন। ২০-২৫ জন করে তারা সমস্ত সাহাবাদ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের সৈন্যরা এখন শিবিরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং সাহাবাদ, পাটনা ও বিহারের ভেতরের দিকগুলি বিদ্রোহীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।···অমর সিং-এর দলগুলি বিনা বাধায় জেলার সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ-অফিসারদের হত্যা করছে, ব্রিটিশের প্রতি অনুগত লোকদের সম্পত্তি লুঠ করছে, এবং কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করছে।···বর্তমান মুহূর্তে তারা ব্রিটিশ সরকারের অফিসারদের মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করছে এবং তারা এমনভাবে ব্যবহার করছে যেন তারাই দেশের প্রকৃত লোক আর আমরা হলাম চোর।"[৪]

কমিশনার আরো অভিযোগ করেছেন যে, আরা শহরে তাঁদের ১ হাজার সৈন্য, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা শহরের ৫-৬ মাইলের মধ্যে অনায়াসে আসছে। বিদ্রোহীদের আর একটা দল গয়ার জেল আক্রমণ করে সব কয়েদিদের মুক্ত করে দিয়েছে।[৫]

বর্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর অকটোবর মাসে ব্রিগেডিয়ার ডগলাস ৭ হাজার সৈন্যের একটা বাহিনীকে ৭ ভাগে ভাগ করে অমর সিং-এর বিরুদ্ধে শেষ অভিযান শুরু করলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ১৮ই অকটোবর বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি একসঙ্গে আক্রমণ করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে পৌঁছে ডগ্‌লাস তাদের কোনো সন্ধানই পেলেন না।

১৮ই থেকে ২৪শে পর্যন্ত কয়েকটা ছোটখাটো যুদ্ধ হলো। ডগ্‌লাস বিদ্রোহীদের খতম করতে পারলেন না। তখন কানপুর-বিজেতা জেনারেল হ্যাভলকের পুত্র হেনরি হ্যাভলক ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ২০শে অকটোবর সোন নদীর ধারে নোনাদি নামক একটা গ্রামে হ্যাভলক বিদ্রোহীদের ঘেরাও করে ফেললেন। বিদ্রোহীরা নদী পার হতে পারল না। এই যুদ্ধে অমর সিং-এর ৪০০ লোকের মধ্যে ৩০০ জন নিহত হলো। অমর সিং অবশিষ্ট লোক নিয়ে ইংরেজদের ব্যূহভেদ করে কাইমুর পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। তখন থেকে অমর সিং-এর উদ্দেশ্য হলো নানা সাহেবের সঙ্গে যোগ দেওয়া।

২৪শে নভেম্বর সারাদিন যুদ্ধের পর অমর সিং ও তাঁর দলের লোকেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থায় ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁরা অনেকেই নিহত হলেন, মাত্র কয়েকজন পালাতে পেরেছিলেন। যাঁরা পালাতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অমর সিং, কিন্তু তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক কালীকিঙ্কর দত্তের মতে, অমর সিংকে

৪. Datta : pp. 172-73

৫. Forrest : vol. III, p. 476

জঙ্গ বাহাদুরের সৈন্যরা বন্দী করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করেছিল এবং গোরখপুর জেলে তাঁর বিচার হচ্ছিল। বিচার শেষ হবার পূর্বেই পেটের অসুখে ৩রা জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখে অমর সিং-এর মৃত্যু হয়।

পশ্চিম-বিহারে বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম, পালামৌ সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। গয়ার দক্ষিণে সমস্ত অঞ্চলটাই একটা বিরাট গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করল। হাজারিবাগের সিপাহিরা ৩০শে জুলাই তারিখে বিদ্রোহ করেই কুমার সিং-এর নিকট চলে গেল ; রামগড়ে ১লা আগস্ট, লোহারডাগায় ২রা আগস্ট ও পুরুলিয়ায় ৫ই আগস্ট ১৮৫৭, সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। রাঁচি, হাজারিবাগ, পুরুলিয়া, চাইবাসা, দোরান্দা ইত্যাদি বহু শহর ও গ্রামাঞ্চল বিদ্রোহীদের অধীনে এলো। এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে দুই বছর ধরে গেরিলাযুদ্ধ চলেছিল।

মাত্র এক বছর পূর্বে সাঁওতাল-বিদ্রোহকে ইংরেজ সরকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিল—বহু সাঁওতাল হতাহত হয়েছিল ও অসংখ্য লোকের কারাদণ্ড হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বহু স্থানে সাঁওতালরা পুনরায় বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। কুকুরাকুমার—যাঁকে হাজারিবাগ জেল থেকে বিদ্রোহী সিপাহিরা মুক্ত করে দিয়েছিল—তিরু সাঁওতাল (ওরফে কোপা ঠাকুরান), রূপু মাঝি, কানু মাঝি, রামবানী মাঝি প্রমুখ সাঁওতাল নেতাদের নেতৃত্বে একটা সুসংগঠিত আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল।[৬] এঁরা সকলেই কুমার সিং-এর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন।

পালামৌতেই নীলাম্বর ও পীতাম্বরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ খুব গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। এঁরা ছিলেন ভোগতা—খারভার রাজপুতদের একটা উপজাতি। এই জাতি তার সংগ্রামশীলতার জন্যে খ্যাত। বিদ্রোহের প্রথম দিকেই নীলাম্বর ও পীতাম্বর বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং শীঘ্রই রামগড়ের সিপাহিরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল। অকটোবর মাসে যখন ৩ হাজার লোক নিয়ে, এঁরা অমর সিং-এর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে যাচ্ছিলেন, তখন হাজারিবাগের উত্তরে ছাত্রার যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নীলাম্বর ও পীতাম্বর কোল ও অন্যান্যদের নিয়ে পুনরায় ৬-৭ হাজারের একটা বাহিনী গঠন করলেন এবং পালামৌ শহর দখল করার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। পালামৌতে তখনো সহকারি-কমিশনার গ্রাহাম কিছু লোকজন

৬. Chaudhuri : *Civil Rebellion*···, p. 160. ২৪শে সেপ্টেম্বর কর্নেল ফিসার রিপোর্ট করেছিলেন : "It is incredible, but a fact that the Ramgarh mutineers, with their guns, are moving about in a small province and not an official, civil or military, can tell where they are to be found." (Malleson, vol. II, p. 140)

নিয়ে একটা শক্তিশালী প্রাসাদে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। মেজর কটার সাসারাম থেকে বাহিনী নিয়ে এসে কয়েকবার গ্রাহামকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে পারেন নি।

১৮৫৮ সনে জানুয়ারি মাসে ইংরেজদের মেজর ম্যাকডোনেলের অধীনে একটা শক্তিশালী বাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটা নতুন অভিযান শুরু করল। এই বাহিনীতে ময়ূরভঞ্জের রাজা এবং আরো কয়েকজন বড় বড় জমিদার বহু লোকজন ও রসদ জুগিয়েছিল। এই বাহিনী জানুয়ারি মাসে নীলাম্বর ও পীতাম্বরের হাত থেকে পালামৌ দুর্গ জয় করল; ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁদের নিজেদের দুর্গও ইংরেজরা দখল করল এবং তাঁদের সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করে দিল; তাঁদের বহুসংখ্যক সমর্থককে হত্যা করল, কিন্তু নীলাম্বর ও পীতাম্বরকে তারা বন্দী করতে পারল না। "অনেকগুলি দলকে তাঁদের ধরবার জন্যে চতুর্দিকে পাঠানো হলো।...বহু প্রভাবশালী লোকদের বন্দী করা হলো, কিন্তু ভয় দেখিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে কোনো উপায়েই তাদের নেতাদের আশ্রয় স্থানগুলির সন্ধান পাওয়া যায়নি।"[৭]

এই সময়ে ডেভিস—যাঁর ওপরে এই এলাকার বিদ্রোহ দমনের ভার ছিল—তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "আমার পূর্বেকার রিপোর্টে বলেছি যে বিদ্রোহী সিপাহিদের কয়েকটি দল সাহাবাদ ও মির্জাপুর থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসে ভোগতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে...বিদ্রোহীরা এইভাবে দলভর্তি হয়ে পাহাড়ে ও জঙ্গলে শক্তিশালী অবস্থায় আছে।...এইসব বাধাগুলির সঙ্গে আরো যোগ করতে হবে যে স্থানীয় অধিবাসীরা খোলাখুলি ভাবে না হলেও, সকলেই বিদ্রোহীদের দিকে। এদের কাছ থেকে আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে সব খবরই তারা পায়, আর আমরা তাদের কোনো সন্ধানই পাই না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কোনো নিকটবর্তী গ্রাম লুঠ করছে।" ডেভিস তাঁর রিপোর্টে আরো বললেন যে, বিদ্রোহীদের এলাকা আরো বেড়ে যাবে যদি না সাহায্য পাঠানো হয়"। ১৮৫৮ সনের শেষদিকে পালামৌ জেলার প্রায় সবটাই বিদ্রোহীদের হাতে চলে গিয়েছিল।[৮]

সুরেন্দ্র সাই-এর নেতৃত্বে সম্বলপুরে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তা দমন করতে সরকারকে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। হাজারিবাগ জেল থেকে মুক্তি পেয়েই সুরেন্দ্র সাই তাঁর ভাই উদ্দান্ত সাই ও তাঁর পুত্র মিত্রবন্ধু সাই সোজা সম্বলপুরে চলে যান ও সেখানকার দুর্গ দখল করে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন। ১৮২৬ সনে ইংরেজ সরকার সুরেন্দ্রকে গদিচ্যুত করে একজন রাজাকে গদিতে বসায়;

৭. O'Malley: *Bengal District Gazzetteer*, Palamau, p. 33

৮. Chaudhuri: pp. 187-88

সুরেন্দ্র তা মেনে নেননি ; বহুদিন ধরে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৩৯ সনে তিনি ধরা পড়েন ও তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৮৪৯ সনে সম্বলপুরের নতুন রাজা যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান তখন ঐ রাজ্য 'ডকট্রিন অব ল্যাপ্‌স' অনুযায়ী ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের দেয় রাজস্ব ৮,৮০০ টাকা থেকে ৭৪ হাজার টাকায় বেড়ে যায়। সুরেন্দ্র সাই বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরতেই সম্বলপুরের জনসাধারণ তার নিচে সমবেত হয়েছিল। তাঁকে ইংরেজরা ১৮৬৪ সনে ধরতে পেরেছিল। তাঁর ওপর নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল, যার ফলে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং "খুব সম্ভব তাঁকে গোপনে হত্যা করা হয়েছিল"।[৯]

পোরাহাটের রাজা অর্জুন সিং-এর নেতৃত্বে সিংভূম, সরাইকেল্লা ও খারসাওয়ানে কোলদের বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সমস্ত কোলজাতিই অর্জুনকে সমর্থন করেছিল। তিনি ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে কমিশনার লাসিংটনের সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করে দেন। সরাইকেল্লার রাজা ছিলেন ইংরেজদের একান্ত অনুগত ; তিনি প্রাণের ভয়ে চক্রধরপুর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কর্নেল ফর্টারের নেতৃত্বে শেখাভাটি বাহিনী অর্জুনকে অনেকবার আক্রমণ করেও বিশেষ কিছুই করতে পারল না। অর্জুনও যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই ইংরেজদের আক্রমণ করেছেন। ২৫শে মার্চ চক্রধরপুরে, ক্যাপ্টেন মনক্রিফকে আক্রমণ করে তার অবস্থা খুবই সংকটজনক করে তুলেছিলেন। যে মাসের শেষদিকে চক্রধরপুর থেকে ৪ মাইল দূরে একটা ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে অর্জুন ঘিরে ফেলেছিলেন ; তা থেকে অতিকষ্টে ইংরেজরা পালাতে পেরেছিল। সরকারি রিপোর্ট থেকেই দেখা যায়, চক্রধরপুর ও চাইবাসার অবস্থা কতটা সংকটজনক হয়ে পড়েছিল। জুন মাসে কোলবাহিনী পুনরায় উপরিউক্ত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে আক্রমণ করেছিল এবং বেশ কয়েকদিন ধরে এই আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজরা অর্জুনকে তাঁর পাহাড়ের কেন্দ্রে আক্রমণ করে। ১৮৫৯ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে অর্জুন শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[১০]

৯. *Ibid*, p. 200

১০. ছোটনাগপুরের এই বীরত্বপূর্ণ ব্যাপক গণবিদ্রোহকে ইংরেজ ইতিহাসবিদরাও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেননি, কিন্তু ড. সেন এটা 'বাঙালীদের' বিদ্রোহ বলে ৩-৪ লাইনে শেষ করেছেন—"In Chotanagpur the risings were confined to a small and discontented section of the primitive tribes and their chiefs, as much from personal animosity as from dislike of the British". (Sen, p. 409)

পশ্চিম-বিহার ও ছোটনাগপুরের বিদ্রোহের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে বিদ্রোহীরা শুধু বিদেশী সরকারকে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি, এসব স্থানে বিদেশী মূলধনের যেসব সংস্থান ছিল সেগুলিকেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। ড. চৌধুরি ঠিকই বলেছেন যে, "বিদ্রোহীরা যে ইয়োরোপীয় সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিল তা থেকেই সাহাবাদ-বিদ্রোহের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।"[১১]

সাহাবাদে বিদ্রোহ শুরু হতে না-হতেই শোন নদীর ধারে যতগুলি নীলকুঠি ছিল, তা সমস্ত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের লোহার বড় বড় কড়াই ও গামলাগুলি গলিয়ে বিদ্রোহীরা কামানের গোলা তৈরি করেছিল। ইংরেজদের কফির বাগান বা আফিং-এর গুদামগুলিও সর্বত্র ধ্বংস হয়েছিল। শুধু ছোটনাগপুর ও সাহাবাদেই নয়, অযোধ্যাতেও এরকম ঘটেছিল। ইংরেজদের কয়লার খনিগুলিও বাদ যায়নি।[১২] এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্রোহের পরে এইসব অঞ্চলে নীলচাষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে নীলের বীজ উদ্ধার করার জন্যে সরকারকে বিশেষ ঘোষণাপত্র প্রচার করতে হয়েছিল। বর্তমান শ্রমিক-শ্রেণী ভারতে সেই সময়ে সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করতে শুরু করেছে। এবং এই জায়মান শ্রমিকশ্রেণী যে মহাবিদ্রোহে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১১. Chaudhuri : p. 173. "The popular character of the movement at Palamau brooks no doubt. The mutiny resulted in a civil rebellion of a country-wide character in which all classes of people from the landed gentry to the village chief joined with the sole aim of stopping European exploitation and wiping out all traces of British rule. It was not, therefore, a military insurrection, as it has been represented in earlier works, nor a rising confined to a small and discontented section of the primitive tribes as dismissed in "Eighteen Fifty Seven" but a people's war fought with the passions roused up by deeply stirred political sentiments," (*Ibid*, p. 191)

১২. Chaudhuri : pp. 115, 154, 158, 173-74, 191, 252, 279 ; O'Malley, p. 30

লক্ষ্মীবাঈ : মেরি ঝান্সি নেহি দেউঙ্গি

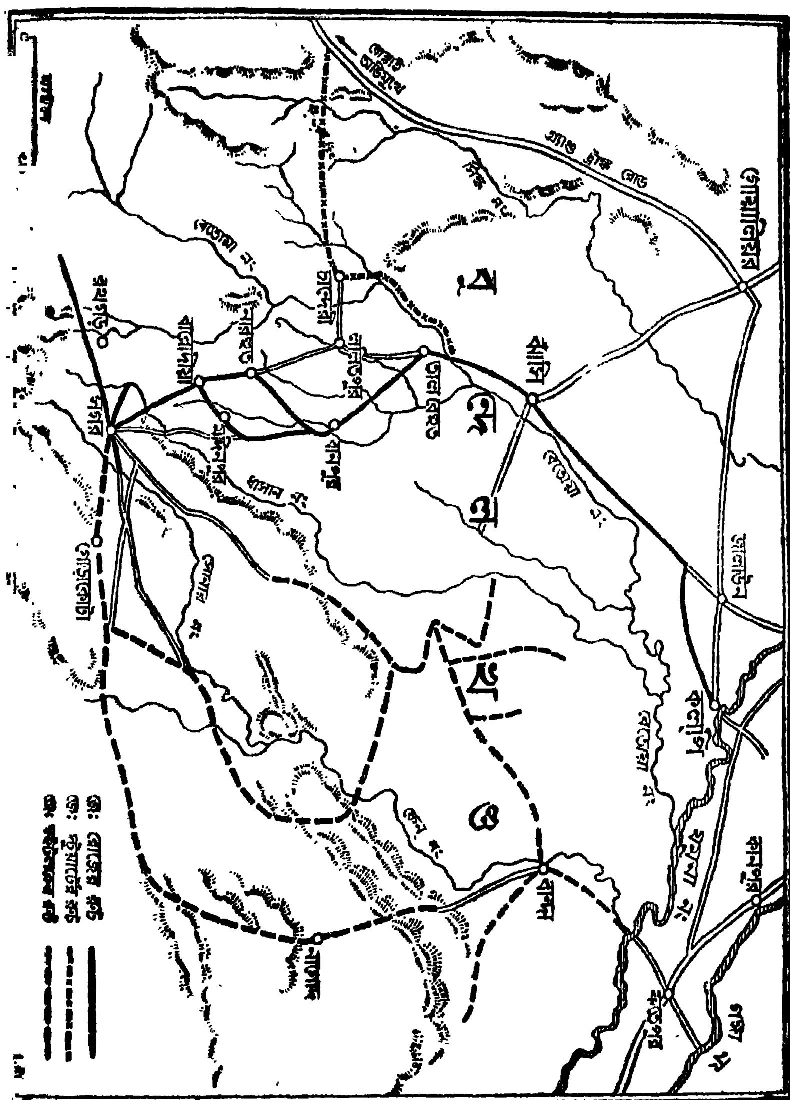
বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত ঝান্সি একটি ছোট রাজ্য হলেও তা ছিল মধ্যভারতে সব থেকে সমৃদ্ধিশালী দেশ : ঝান্সি শহরকে বলা হতো 'মরুভূমিতে মরূদ্যান'। রেশম, কার্পেট ও পিতল ইত্যাদি শিল্পের জন্যে ঝান্সি ছিল প্রসিদ্ধ।

১৮৫৩ সনে ঝান্সির রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর, ইংরেজ সরকার তাঁর দত্তককে রাজ্য দিতে অস্বীকার করে ঝান্সি তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর বয়স তখন ১৭-১৮ বৎসর। রানীকে যখন ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত জানানো হলো, তখন তিনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'মেরি ঝান্সি নেহি দেউঙ্গি'। অল্প বয়স্কা রানী হয়তো একটা সাময়িক উত্তেজনার বশেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু রানীর এই ভাস্বর উক্তি প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ তাঁর এই উক্তিতে ভারতের অপরাজেয় মনুষ্যত্বেরই প্রকাশ পেয়েছে।

শুধু যে রাজ্যই গেল তা নয়, রানী তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হলেন। তিনি যখন বারাণসীতে গিয়ে বাস করতে চেয়েছিলেন, সেই অনুমতি দিতেও ইংরেজ সরকার অস্বীকার করেছিল। ঝান্সিরাজের গৃহদেবতা মহালক্ষ্মী মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে দু'খানি দেবত্র গ্রাম ছিল, তাও বিদেশী সরকার বাজেয়াপ্ত করল। তারা রানীকে জানালো, "আপনার ঈশ্বরের দায়িত্ব আমাদের।" ইংরেজ কর্মচারিদের গোরু ও শুয়োরের মাংস সরবরাহ করার জন্যে শহরের মাঝখানে একটি কসাইখানা স্থাপন করা হলো।

কেই ও ম্যালিসন বলেছেন : "(ইংরেজ সরকার) যা করল তা আরো খারাপ। অপমানের সঙ্গে তারা নীচতাও যোগ করেছিল। রাজ্য বাজেয়াপ্ত করার সময় বিধবা রানীকে তারা বার্ষিক ৬ হাজার পাউণ্ড (৬০ হাজার টাকা) পেন্সন মঞ্জুর করেছিল। প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত রানী সেই পেন্সন গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন। যে পেন্সনকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন, তা থেকেই যখন তাঁর পরলোকগত স্বামীর ঋণ শোধ করতে বলা হলো, তখন তাঁর ক্রোধ সহজেই অনুমেয়।...বৃথাই তিনি বারবার জানালেন, তাঁকে বঞ্চিত করে রাজ্য গ্রহণ করবার সময় ঋণের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল ইংরেজ। কলভিন (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কমিশনার) জোর করে সেই ঋণ পেন্সন থেকে কেটে নিতে লাগলেন।" (vol. III, p. 120)

মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের কিছুদিন পরে ৪ঠা জুন, ঝান্সির ১২-তম বাহিনীর ৬০০ সিপাহি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রায় ১০০ জন ইংরেজ পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু



(ঝান্সি প্রতিরোধ ও ব্রিটিশ আক্রমণের মানচিত্র)

দুর্গের ভিতর আশ্রয় নেয়। ৬ই জুন বিদ্রোহীরা দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গ থেকে যখন একজন ভৃত্য পালাবার চেষ্টা করে, তখন লেফটেনাণ্ট পোইস তাকে হত্যা করে। তা দেখে পোইসের ভৃত্যই তার প্রভুকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে, ভৃত্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই রব তুলে সব ভৃত্যকে ইংরেজরা খুন করল। এই খবর পাওয়া মাত্র সিপাহিরা ইংরেজদের অবরোধ করল এবং দু'দিনের মধ্যেই ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করল। ঐ তারিখে জোকারবাগে নিয়ে গিয়ে ৫৬ জন ইংরেজকে হত্যা করা হলো। তারপর সিপাহিরা রানীর কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে দিল্লি চলে গেল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রানী জড়িত ছিলেন না ; বরং তিনি স্ত্রীলোক ও শিশুদের বাঁচাবারই চেষ্টা করেছিলেন।

সিপাহিরা চলে যাওয়ার পর ঝান্সি সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ল। রানীর মাত্র ৪০ জন বডিগার্ড ছাড়া রাজ্য রক্ষার জন্যে আর কোনো সৈন্যবাহিনী থাকল না। তিনি সাগর বিভাগের লেফটেনাণ্ট এরস্কিনকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এরস্কিন রানীর হাতে ঝান্সির শাসনভার দিয়ে তাঁকে খাজনা আদায় ও পুলিশ বাহিনী গঠন করে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে বললেন।

ইতিমধ্যে ঝান্সিকে অসহায় অবস্থায় দেখে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক কলহ প্রবল হয়ে উঠল। গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর সদাশিব রাও ঝান্সির রাজ্য দাবি করেছিলেন। এখন তিনি ঝান্সি আক্রমণ করে বসলেন এবং নিজেকে ঝান্সির মহারাজা বলে ঘোষণা করলেন। রানী তাঁকে ঝান্সির দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। মারাঠা রাজ্য ঝান্সির সঙ্গে দতিয়া ও অরছা রাজপুত রাজ্যগুলিরও কলহ অনেক প্রাচীন। এঁরাও নিঃসহায় ঝান্সিকে গ্রাস করার জন্যে একসঙ্গে আক্রমণ করলেন। এরস্কিন ভারত সরকারকে ২রা অকটোবর লিখলেন : "রানী নামে মাত্র ঝান্সির শাসক। সেখানে সর্বত্র ব্যাপক অরাজকতা চলছে। তেহরির (অরছা) রানীর সেনাপতি এবং দতিয়ার রাজা দু'দিক থেকে ঝান্সি আক্রমণ করার ফলে বিপন্ন রানী সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

বলা বাহুল্য, ইংরেজরা রানীকে কোনো সাহায্য পাঠায় নি এবং তখন তাদের সাহায্য পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল না। আরো একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, রানী তখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি, সুতরাং আইনত ঝান্সি তখনো ইংরেজ সরকারের এলাকাভুক্ত। তা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ সরকার তেহরির রানীকে কিংবা দতিয়ার রাজাকে ঝান্সি আক্রমণে বাধাও দেয়নি, তাঁদের কোনোরকম হুমকি পর্যন্ত দেয়নি।

ইংরেজ সরকারের এই অস্বাভাবিক কাজ সম্বন্ধে এরস্কিন নিজেই তাঁর একটা গুপ্ত সরকারি রিপোর্টে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন : "ঝান্সির বিদ্রোহী রানী বানপুরের রাজার সঙ্গে আমাদের একটা জোট পাকাবার জন্যে কথাবার্তা চালাচ্ছেন এবং

তেহরির রানীকে আক্রমণ করার জন্যে গোয়ালিয়ার বাহিনীকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছেন—যে তেহরির রানী আমাদেরই স্বার্থে ঝান্সি আক্রমণ করেছিলেন।"[১]

অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজেদের শক্তির ওপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ সমর্থিত দতিয়া ও তেহরির আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে ঝান্সি রাজ্য মুক্ত করলেন। এই আত্মরক্ষার কাজেই রানীকে ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

১৮৫৪ সনে ইংরেজরা ঝান্সি-রাজার যেসব সৈন্যদের বরখাস্ত করেছিল, রানী তাদের ডেকে আবার তাঁর বাহিনী গড়ে তুললেন। সেই বাহিনীতে অনেক বুন্দেলা, রাজপুত, পাঠান, মকরানি মুসলমানদেরও নিলেন। রানী একটি নারী-বাহিনীও গঠন করলেন; তাদের বন্দুক ছুঁড়তে, তরবারি চালনা করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং করতেও শেখালেন। রানী এই সময় কতকগুলি কামান তৈরি করিয়েছিলেন। তেহরি ও দতিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ই রানী তাঁর সংগ্রাম-চেতনা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিঃসংকোচে হিন্দু-মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন, বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করতেন এবং আহতদের অনেক সময় নিজের হাতে শুশ্রূষা করতেন। একদিকে এই মানবিকতা, অন্যদিকে দুর্দমনীয় সাহস ও অসাধারণ কর্মক্ষমতা—এইসব গুণের দ্বারাই তিনি প্রতিটি সৈনিকের ও প্রতিটি নাগরিকের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন।

১৮৫৮ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত রানী ইংরেজ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষকে অনেকগুলি চিঠিও লিখেছিলেন। এইসব চিঠিগুলি ও আরো কিছু নথিপত্র বিশ্লেষণ করে এবং অনেক কূটতর্কের অবতারণা করে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 'প্রমাণ' করেছেন: রানী ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ বলে ও ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে পরিষ্কার ভাষায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে করুণ আবেদন (pathetic appeals) পাঠিয়েছিলেন, সম্ভবত (?) পরেও পাঠিয়েছিলেন।

"এমনকি ১৮৫৮ সনের মার্চ পর্যন্ত, যখন স্যার হিউ রোজ মধ্যভারতে তাঁর অভিযান শুরু করে দিয়েছেন, রানী স্থির করতে পারেন নি, তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বেন, না তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করবেন। যদি তাঁর বিরুদ্ধে ব্রিটিশের সন্দেহ দূর করতে সমর্থ হতেন, তাহলে তিনি দ্বিতীয় পন্থাটিই অবলম্বন করতেন। যে সময় তিনি নিঃসন্দেহে জানতে পারলেন যে, বিদ্রোহের জন্যে ও

১. Erskin : *Report of Divisional Commissioner of Sagar and Narmada Division for the Week Ending 25-11-1857.*

ঝান্সিতে ইংরেজদের হত্যার জন্যে ব্রিটিশ সরকার তাঁকেই দায়ী করছে এবং এই অভিযোগে তাঁকে একটা বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, সেই সময় তিনি যুদ্ধ করাই স্থির করলেন,—ফাঁসিকাঠে ঝোলার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানজনক মৃত্যুই তিনি বেছে নিলেন।"[২]

সহজ ভাষায় ড মজুমদারের উক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, রানী লক্ষ্মীবাঈ দেশ-প্রেমিক ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ইংরেজ-ভক্তই ছিলেন, ইংরেজরাই তাঁকে বিদ্রোহের দিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল। বাহাদুর শাহকে যেমন সিপাহিরা জোর করে, ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল, সেই-রকম লক্ষ্মীবাঈও অনিচ্ছায় বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে ড. মজুমদারের নিকট মানুষের সাধারণ ইতিহাসটাও যেমন সহজ, বিদ্রোহ করাটাও তেমনই 'জলবৎ তরলম্'। এই বিদ্রোহের জন্যে প্রয়োজন নেই দুঃসহ অন্তর-বিক্ষোভের বা দেশপ্রেমের। বস্তুত, একটা দুঃসহ বাস্তব পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকদের মানসিক গঠন ও অন্তরাত্মার যথাযথ আন্তরিক পরিচয় না পেলে, তা উপলব্‌ধি না করতে পারলে বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমের বা তাদের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করা যায় না। এর জন্যে ইতিহাসবিদকে যান্ত্রিক হলে চলে না, তার চেয়ে বেশি কিছু হতে হয়।

জুন মাসে ঝান্সির সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল। কিছুদিন পরে যদিও গোয়ালিয়ারের সিপাহিরা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তারা নভেম্বর মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল। ঝান্সির চারপাশের মারাঠা, রাজপুত ও মুসলমান রাজারা, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, ভুপাল, তেহ্‌রি, অরছা ইত্যাদি—সকলেই ব্রিটিশের অনুগত। মধ্যভারতের জনসাধারণও বিদ্রোহের দিকে তখনো অগ্রসর হয়নি। সেই প্রতিকূল অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও শত্রু-পরিবেষ্টিত ২১-২২ বছরের একজন বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যে সম্ভব নয়, তা বিদ্রোহ করার তাৎপর্য কি, বিদ্রোহ করার অর্থ কি, সে সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্রও ধারণা আছে তাঁরাই স্বীকার করবেন। এই অবস্থায়, প্রস্তুতির জন্যে রানীর সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল সময়। তাই শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যেই হয়তো রানী এই শঠতাপূর্ণ চিঠিগুলি লিখেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে কূটনীতির কোনো স্থান নেই, রানীর চিঠিগুলিকে সরল অর্থেই নিতে হবে—একথা সরলপ্রাণ ড. মজুমদার অবধারিত বলে মেনে নিলেও, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী মেনে নিতে রাজী হয়নি। তারা প্রথমে রানীকে নির্দোষ ভেবেছিল—কিন্তু তাদের সে ভুল ভাঙ্‌তে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। রানীর আনুগত্য প্রকাশে তারা

২. Dr. Ramesh chandra Majumdar : *Sepoy Mutiny and the Revolt* ···, p. 155

এতটুকু বিভ্রান্ত হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই রানীর বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্বন্ধে যেসব সংবাদ তারা পেয়েছিল, তাতে তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিল যে, মধ্যভারতে তাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে : যে-ব্যক্তি ইংরেজের এত অনুগত, যিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা কোনোদিন চিন্তাও করেন নি, সেই ব্যক্তিই এবং যিনি একজন অল্পবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক মাত্র, ইংরেজদের ভুলের জন্যে হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ করে বসলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন করলেন ও কৃতিত্বের সঙ্গে তাদের চালনা করতে লাগলেন, কামান-বাহিনী গঠন করলেন, প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে একটা বড় অবরুদ্ধ শহরকে দিনের পর দিন রক্ষা করলেন এবং তারপর একজন অভিজ্ঞ সেনানায়কের মতো সম্মুখযুদ্ধে অশ্বারোহণে বারবার শত্রুর সম্মুখীন হয়ে আশ্চর্য রকমের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেন, এমন অভূতপূর্ব ঘটনাবলী একমাত্র আরব্য-উপন্যাস ছাড়া মানুষের বাস্তব জীবনে যে ঘটতে পারে না, তার জন্যে যে বহু পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়,—একথাটা বিজ্ঞ ইতিহাসবিদের মনে কি একবারও আসেনি?

বিদ্রোহী সিপাহিরা ঝান্সি ত্যাগ করে যাবার পর রানী তাঁর রাজ্য পুনর্গঠনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন ভারতীয় ইতিহাসবিদের পক্ষে সহজ সত্যটা স্বীকার করা সম্ভব হলো না বটে, কিন্তু ইংরেজ ইতিহাসবিদ ম্যালিসন অকুণ্ঠচিত্তে লিখে গেলেন : "নিজেকে তিনি (রানী লক্ষ্মীবাঈ) খুব সুযোগ্য শাসক হিসেবে প্রমাণ করলেন। একটি টাঁকশাল স্থাপন করলেন। দুর্গ ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে সামরিক সরঞ্জামের দ্বারা দুর্ভেদ্য করলেন। কামান ঢালাই শুরু করলেন এবং নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করতে লাগলেন। সুদর্শনা তেজস্বিনী তরুণী জনসাধারণের সামনে খোলাখুলিভাবে বেরুতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না বলে তাঁর প্রজাবর্গের ওপর অতি শীঘ্র প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেন। এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার ক্ষমতা ও চরিত্রের দৃঢ়তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাঁর অনন্য সাধারণ সাহস। এমন বিভিন্ন গুণাবলীর সমাবেশের ফলেই রানী হিউ রোজের সৈন্যদের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরোধ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। হিউ রোজের চেয়ে অযোগ্য কোনো প্রতিপক্ষ যদি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে থাকতেন, তাহলে রানীর পক্ষে সফল হওয়া অসম্ভব হতো না।"

সর্বপ্রথম বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দনসিং জুলাই মাসে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ললিতপুর, বালাবেহুত, চান্দেরি দখল করেন। শাহগড়ের রাজা বখতার আলি মর্দনসিং-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। ঝান্সির রানী এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ১৮৫৭ শেষ হতে না-হতে

মধ্যভারতের প্রায় সর্বত্র—গোয়ালিয়ার, মালোয়া, ইন্দোর, বান্দা, গড়াকোটা, চিরখরি ও রাথগড় ইত্যাদি অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠল। গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, বরোদা ও ভূপালের ইংরেজের আশ্রিত রাজারা শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহ দমিয়ে রাখতে পারলেন না। রানীও জানুয়ারি মাসে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং দুর্গের উপর উড়িয়ে দিলেন, ক্ষমা ও ত্যাগের প্রতীক মারাঠা গৈরিক-পতাকার পরিবর্তে, নাকাড়া ও চামর চিহ্নিত সংগ্রামের প্রতীক লাল-পতাকা।

উত্তর-ভারতের বিদ্রোহ দমনের জন্যে যেমন ভার দেওয়া হয়েছিল কলিন ক্যাম্বেলকে, যমুনা নদী ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের ভার পড়ল হিউ রোজের ওপর। ক্যাম্বেল যেমন পেয়েছিলেন পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দের রাজাদের এবং শিখ ও গুর্খাদের, তেমন রোজও পেলেন ভূপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়ার, হায়দ্রাবাদের রাজাদের এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদের সিপাহিদের। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যে রোজ তাঁর বাহিনীকে দুইভাগে ভাগ করে নিলেন—একটি তাঁর নিজের নেতৃত্বে যাত্রা করল মৌ থেকে, আর একটি যাত্রা করল জব্বলপুর থেকে ব্রিগেডিয়ার হুইটলারের নেতৃত্বে। রোজ ছিলেন ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের একজন বিচক্ষণ সেনাপতি এবং আলমা ও ইংকারমানের বিখ্যাত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রোজ ১৫ই জানুয়ারি ভূপালে পৌঁছলেন। "ভূপালের বেগম, যিনি বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে উদগ্রীব জনসাধারণকে এতদিন ধাপ্পা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন এই বলে যে, ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার ঠিক মুহূর্ত এখনো আসেনি, তিনিই ইংরেজ বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং রোজকে ৭০০ সৈন্য ও প্রচুর রসদপত্র দিলেন।"[৩]

বীণা নদীর তীরে পাহাড়ের উপরে রাথগড়ের শক্তিশালী দুর্গ; তার চতুর্দিকে দুর্গম বনজঙ্গল। রাথগড় দুর্গ প্রকৃতির দ্বারাই সুরক্ষিত—পূর্ব থেকে পশ্চিমে নদী বয়ে গিয়েছে, আর পূর্ব ও দক্ষিণে খাড়া পাহাড়। উত্তরে ২০ ফুট চওড়া পরিখা। শহরের অবস্থান পশ্চিমে, সেদিক থেকেই দুর্গে প্রবেশের প্রধান গেট। গেটের দুই পাশে দুর্ভেদ্য বুরুজ। ইংরেজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যারা এই দুর্গ রক্ষা করেছিল তাদের মধ্যে সিপাহির সংখ্যা ছিল খুবই কম, সামরিক শিক্ষা-বিহীন সাধারণ লোকই বেশি; এদের বন্দুকের সংখ্যা ছিল খুবই কম, তলোয়ারই ছিল প্রধান অস্ত্র। রোজের ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সুশিক্ষিত সৈন্যদল; তা সত্ত্বেও রাথগড় দুর্গ জয় করতে তাঁর ৩ দিন লেগেছিল।

রাথগড়ের মতোই আর একটি শক্তিশালী দুর্গ—গড়াকোটা। এ দুর্গও রোজ

৩. Forrest: vol. III, p. 153

জয় করলেন। ১৮১৮ সনে পিণ্ডারি যুদ্ধের সময় ইংরেজরা ১১ হাজার সৈন্য ও ১৮টা কামান ব্যবহার করেও এই দুর্গে এতটুকুও ফাটল ধরাতে পারেনি। (কিন্তু ১৮১৮ ও ১৮৫৭ সনের মধ্যে অনেক তফাৎ—এই সময়ের মধ্যে বহু বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বিদ্রোহ যদি ১৮৫৭-তে না ঘটে ১৮১৮-তে ঘটত, তাহলে ভারতীয়দের জেতা সম্ভব হতো)। নারুৎ গিরিসংকট এবং চান্দেরি, বারোদিয়া, মেদিনপুরের দুর্গগুলি একটার পর একটা ইংরেজরা জয় করল এবং ২১শে মার্চ ১৮৫৮ তারিখে রোজ ঝান্সির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

রাথগড় থেকে ঝান্সি পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধগুলির (এবং তার পরবর্তী যুদ্ধগুলিরও) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রতিটি স্থানে ইংরেজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে লড়েছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শিক্ষার অভাব থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের এই প্রচণ্ড প্রতিরোধ ভারতের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। জনসাধারণ ও রাজা-নবাবরা যে শৌর্যবীর্য ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা প্রতিটি ভারতবাসীরই গর্বের বিষয়। কিন্তু তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি ও নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, ব্রিটিশদের আধুনিক ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র এবং সংগঠনের নিকট পরাজিত হতে হয়েছিল।

ঝান্সির বিশাল দুর্গের পশ্চিম দিকে খাড়া পাহাড়, দক্ষিণ দিকে মাঝামাঝি প্রকাণ্ড বুরুজ। এই বুরুজ থেকে নগর প্রাচীর শুরু এবং যা শেষ হয়েছিল দুর্গের দক্ষিণতম অংশে অবস্থিত একটি বিশাল সুদৃঢ় নিরেট পাথরের গাঁথনিতে। এই গাঁথনির সামনে ছিল একটি গোল বুরুজ, যার বিস্তৃতি ও পরিসর এত বেশি ছিল যে সেখানে ৫টি কামান বসানো চলত। এই বুরুজটি ঘিরে ছিল পাথরের একটি গভীর পরিখা, যার অবস্থিতি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঝান্সির প্রধান চারটি গেট—অরছা, সাগর, লছমি, সইয়াঁর।

অবরোধের সময়কার ঝান্সির সামরিক শক্তি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। মোটামুটিভাবে তা ছিল কতকটা এইরকম—ঝান্সি রাজ্যের পুনর্গঠিত ৩ হাজার সৈন্য (তাদের মধ্যে বহু পাঠান গোলন্দাজ ও সওয়ার ছিল), ঝান্সি রাজ্যের বুন্দেলাদের নিয়ে গঠিত ১ হাজার সৈন্য, আর ছিল বানপুর রাজার ২ হাজার সৈন্য। এইসব সৈন্যদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত। বন্দুকও সকলের ছিল না, তলোয়ারই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। রোজের সঙ্গে ছিল ১০২টি আধুনিক কামান। ঝান্সি অধিকার করার পর ইংরেজ-সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী সেখানে তারা ৩৫টি কামান পেয়েছিল (রানী যখন ঝান্সি ত্যাগ করেছিলেন তখন একটি কামানও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি)। রোজের নেতৃত্বে ঝান্সি অবরোধের জন্যে আরো ছিল ১৫ হাজার ইংরেজ, ৬ হাজার সিপাহি ও ৫০০ এঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার প্রভৃতি।

রানীর প্রধান গোলন্দাজ ছিলেন গোলাম ঘৌস খান ও তাঁর সহকারিদের

মধ্যে ছিলেন খুদাবক্স, পীর আলি, লালাভাও বক্সী, রঘুনাথ সিং ও দুলহাজু। রানীর বিখ্যাত কামানগুলির নাম কড়কবিজলী, ঘনগর্জ, অর্জুন, ভবানীশংকর, সমুদ্রসংহার, নলদার। গোলন্দাজদের সাহায্য করেছিলেন মেয়েরা—তাঁদের মধ্যে সুন্দর, মোতিবাঈ, মান্দার, কাশী, ঝলকারী—মাত্র এই কটি নামই পাওয়া যায়।

আটদিন ধরে দুই পক্ষের অবিরাম কামানযুদ্ধ চলল। রোজ তাঁর শিবির থেকে প্রেরিত একটি রিপোর্টে লিখেছিলেন, ২৬শে মার্চ—"বিদ্রোহীদের কামানগুলি একজন সুদক্ষ গোলন্দাজের দ্বারা চালিত হচ্ছিল। দূরবীন দিয়ে আমরা দেখছিলাম যে, তিনি তাঁর কামানগুলি এমনভাবে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন যে, তা আমাদের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হচ্ছিল।"

ঝান্সি-অবরোধ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন: "বিদ্রোহীদের অনেক কামান আমরা বিকল করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সেগুলিকে তাড়াতাড়ি মেরামত করে আবার ব্যবহার করছিল। যখন ছাদের দেওয়ালগুলি আমরা ভেঙে দিচ্ছিলাম, তখন আমরা দেখেছিলাম, স্ত্রীলোকেরা সেগুলি মেরামত করছিল। বিদ্রোহীরা অবিচলিতভাবে মৃত্যুবরণ করছিল।··· বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তাদের একটুকু কমেনি। অধিকন্তু বলা যেতে পারে যে, বিপদ যত ঘনিয়ে আসছিল, তাদের সাহসও তত বেড়ে যাচ্ছিল।"[৪]

২৯শে মার্চ সাঁইয়া-গেটে কামান চালাবার সময় শত্রুর গুলীতে খোদাবক্স নিহত হলেন। তার কিছুক্ষণ পরে গোলাম ঘোসের বুকে গুলী লাগল, তিনিও মারা গেলেন। গোলাম ঘোসের স্থানে মোতিবাঈ কামান চালাতে লাগলেন। তিনিও কিছুক্ষণ পর নিহত হলেন। লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রভাবে এই রাজনর্তকী যোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ৮ দিনের এই অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ফলে ঝান্সির বহু সৈন্য হতাহত হলো এবং শ্রেষ্ঠ সেনানায়করাও নিহত হলেন। তাছাড়া, ৩০শে মার্চ ইংরেজের গোলায় দুর্গের জলাশয় ধ্বংস হলো। নিদারুণ গ্রীষ্মে জলাভাবে দুর্গে অনেক বিশৃংখলা দেখা দিল। গোলাবারুদও ফুরিয়ে আসতে লাগল।

হিউ রোজকে এরকম সর্বাত্মক প্রতিরোধের সম্মুখীন আর কখনো হতে হয়নি। সে সময়ে তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখলেন: "সর্বত্র জনসাধারণ সবকিছুতেই যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।···এত লোক অক্ষম, মৃত ও আহত হওয়া সত্ত্বেও শত্রু সমানে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।"

৩১শে মার্চ রোজ যখন শেষ আঘাত হানবার জন্যে ঝান্সির ওপর ঝাঁপিয়ে

৪. Forrest : *History of the Indian Mutiny*, vol. III, p.198

পড়তে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় খবর পেলেন তাঁতিয়া টোপি উত্তর দিক থেকে রেওয়া নদীর ধারে এসে পৌছেছেন। তাঁতিয়ার সঙ্গে ছিল কানপুর ও গোয়ালিয়ারের সিপাহিদল এবং বান্দা, শাহগড় ও বানপুর নৃপতিদের সৈন্যদলের ২০ হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী আর প্রচুর কামান ও অস্ত্রশস্ত্র।

পরের দিন তাঁতিয়া নদী পার হয়ে রোজের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। রোজের নিকট এটা ছিল একটা ভীষণ সংকট মুহূর্ত। কিন্তু বিচক্ষণ ইংরেজ জেনারেল শীঘ্রই তাঁতিয়ার দুর্বলতা ধরে ফেললেন। তিনি দেখলেন যে, তাঁতিয়ার বাহিনীর মধ্যস্থল খুবই শক্তিশালী ও সুশৃংখল, কিন্তু তাঁর দুই বাহু খুবই দুর্বল ও বিশৃংখল। রোজ এই দুই দুর্বল স্থানেই আক্রমণ করলেন। সিপাহিরা পিছনে হঠতে লাগল। তাঁতিয়ার সমগ্র বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা শুরু হয়ে গেল। তাঁর কোনো বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না। তিনি তাঁর সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ থামাবার চেষ্টা করলেন না এবং তাঁর বাহিনীকে পুনরায় সুসংগঠিত করে শত্রুকে প্রতি-আক্রমণের চেষ্টাই করলেন না। অনেক স্থানে বিদ্রোহীদের কোনো কোনো দল ভীষণভাবে লড়ল, কিন্তু তাতে কিছু ফল হলো না। যে যেদিকে পারল পালালো এবং তাঁতিয়াও পালালেন। বেতোয়ার যুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতারই নিদর্শন। বিদ্রোহীরা অনেক যুদ্ধেই পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু বেতোয়ার পরাজয় সবচেয়ে লজ্জাকর ও মর্মান্তিক।

বেতোয়ার যুদ্ধে তাঁতিয়ার এরকম শোচনীয় পরাজয় ও তাঁর আচরণের কারণ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। এটা ঠিক যে, কোনো সামনাসামনি যুদ্ধে কুমার সিং-এর মতো তাঁতিয়া কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি ; এবং এটাও ঠিক যে তখনো তাঁর অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। কিন্তু এসব যুক্তির দ্বারা, এত সৈন্যদল কামান ও গোলাবারুদ থাকা সত্ত্বেও তাঁতিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কেন পলায়ন করলেন, তার ব্যাখ্যা হয় না। তিনি নিজে বা তাঁর সৈন্যরা যে কাপুরুষ ছিলেন না এবং তাঁদের অনেকেই যে বেতোয়ার যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিলেন, তা রোজ ও অন্যান্য ব্রিটিশ অফিসাররা স্বীকার করে গিয়েছেন। দু-একদিন পরে তাঁতিয়া তাঁর বাহিনী পুনর্গঠন করে পুনরায় রোজকে আক্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু তা করার তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে, রানীর প্রতি সামন্ততান্ত্রিক ঈর্ষাই তাঁতিয়ার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ?

বেতোয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন হলো—যখন রোজের বাহিনী তাঁতিয়ার বাহিনীকে আক্রমণ করছিল, সেই সময় রানী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করলেন না কেন? শত্রুকে ধ্বংস করার এই সুবর্ণ সুযোগ তিনি ছেড়ে দিলেন কেন? এই সুযোগ ছেড়ে না দিয়ে রানী যদি আক্রমণ করতেন, তাহলে রোজ তাঁর সমস্ত শক্তি তাঁতিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে পারতেন না এবং তাঁতিয়াকেও

হয়তো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে হতো না।

তাঁতিয়া যেদিন বেতোয়া ত্যাগ করলেন, সেই রাত্রেই (১লা এপ্রিল) ইংরেজরা দুর্গের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ করতে লাগল। রানী প্রাসাদ ত্যাগ করে দুর্গে চলে এলেন। প্রতিটি জায়গা নিজে পরীক্ষা করলেন ও চূড়ান্ত প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। ঝান্সি-বাহিনী পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠল এবং পূর্ণ উদ্যমে শত্রুকে বাধা দিতে লাগল।

৩রা এপ্রিল অবরোধের পালা শেষ করে রোজের বাহিনী ঝান্সির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; এবং প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্যে তাদের লড়তে হলো। ইংরেজ ইতিহাসবিদ এই যুদ্ধের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন :

"বাম দিককার আক্রমণকারীরা যে মুহূর্তে গেটের দিকে যাবার রাস্তায় পা বাড়াল সেই মুহূর্তে শত্রুর বিউগ্‌ল বেজে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্গপ্রাচীর থেকে বোমা, গোলাগুলীর ভয়ংকর ঝড় বইতে লাগল।...২০০ গজ আন্দাজ আমাদের যেতে হলো এই আগুনের বন্যার মধ্য দিয়ে। দুর্গে ওঠার জন্যে ৩টি জায়গায় আমাদের স্যাপাররা মই স্থাপন করল। কিন্তু বিদ্রোহীরা প্রাচীরের উপর থেকে গোলাগুলী, গামলাভর্তি বারুদ, পাথর, গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি মারাত্মক জিনিস আমাদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। অনেক আক্রমণকারীই ধরাশায়ী হলো এবং জীবিতরা পাথরের পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু আমাদের নেটিভ স্যাপাররা তাদের অফিসারদের বীরত্বে উৎসাহিত হয়ে মইগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকল।...আরো নতুন সৈন্য যখন এসে পৌছল, আক্রমণকারীরা মইগুলির দিকে ধাবিত হলো। বোম্বে এঞ্জিনিয়ারদের লেফটেনাণ্ট ডিক্ একটা মইয়ের সামনে এসে পৌছল। মই বেয়ে দেওয়ালে উঠবার সময় গুলীর আঘাতে সে নিহত হলো। লেফটেনাণ্ট মাইকেল জন ও আর একজন যখন দেওয়ালে উঠতে পারল, তখন তাদের মই ভেঙ্গে গেল এবং সেই অবস্থায় তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দেওয়া হলো। লেঃ বোনাস যখন আর একটা মই বেয়ে উঠলেন একটা পাথরের আঘাতে তিনি পড়ে গেলেন, এবং সেই চেষ্টায় লেঃ ফক্সের ঘাড়ের মধ্য দিয়ে গুলী চলে গেল। ... লেঃ কর্নেল লিডেল যখন দেখলেন মই দিয়ে কাজ হচ্ছে না, তখন তিনি লেঃ গুডফেলোকে এক বস্তা বারুদ আনতে বললেন। ভীষণ গোলাগুলীর মধ্য দিয়ে নেটিভ স্যাপারদের সাহায্যে বারুদের বস্তাটা একটা গেটের পাশে রেখে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দরজাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবার জন্যে আমাদের সৈন্যরা ধোঁয়ার মেঘের মধ্য দিয়ে ধাবিত হলো, কিন্তু তাতে তারা ব্যর্থ হলো। কারণ দরজার পিছনেই ছিল স্তূপাকৃতি পাথর, ইট-পাটকেল ইত্যাদি। এখন হতাহতদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কিছু করার রইল না।"[৫]

৫. Forrest : vol. III, pp. 209-10

এরকম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে সমর্থ হলো। "রাজপ্রাসাদে যারা ছিল তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, কিন্তু তারা মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ল। প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে তারা প্রতিটি কামরা রক্ষা করেছিল। বেয়নেটের মুখে তাদের একটা কামরা থেকে আর একটা কামরায় হঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল; তারা দয়া চায়ও নি, কেউ দেখায়ও নি। তারা যখন পিছনে হঠছিল, তখন তারা বারুদের ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল, যার ফলে তারা ও তাদের শত্রুরা উভয়েই ধ্বংস হচ্ছিল।"[৬]

রানীর আফগান রক্ষী-বাহিনীদের মধ্যে ৩০-৪০ জন প্রাসাদের আস্তাবল রক্ষা করছিল। তারা তাদের তলোয়ারের দ্বারা ইংরেজ আক্রমণকারীদের এমন আঘাত দিচ্ছিল যে একজন উপস্থিত ডাক্তার বলেছিলেন—"তরবারির এমন মারাত্মক আঘাত আমি কখনো দেখিনি। বেয়নেটের দ্বারা আস্তাবল থেকে বিতাড়িত হয়ে, তারা দু'হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে পিছনে হঠছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত-না তাদের গুলী অথবা বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। মরবার মুখে যখন তারা ভূমিশায়ী হচ্ছিল, তখনো তারা আঘাত করছিল।...কয়েকজন আফগান আস্তাবলের পাশে একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘরেও আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত পোশাকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারা আমাদের আক্রমণ করল।"[৭]

একটা স্থানে রানীর পিতাকে আহত অবস্থায় ইংরেজরা বন্দী করেছিল এবং তাঁকে জোকানবাগের বাগানে ফাঁসি দিয়েছিল।

এইভাবে পাঁচদিন ধরে অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধের পর ৫ই এপ্রিল ইংরেজরা ঝান্সির প্রাসাদ ও দুর্গ দখল করেছিল।

দুর্গ ও প্রাসাদ দখল করতেই যুদ্ধ শেষ হলো না। পরের দিন ৬ই এপ্রিল সারাদিন ধরে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও বাড়ির মধ্যে সাংঘাতিক যুদ্ধ চলল। "অনেকগুলি চূড়ান্ত লড়াই হলো। আফগান ও রোহিলাদের সঙ্গে যে হাতাহাতি যুদ্ধ হলো, সে এক ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড। তাদের ৪০ জন একটা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে ও তার উঠান ও চোরাঘর দখল করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়। তাদের সংখ্যা না জেনেই আমাদের কিছু সৈন্য তাদের আক্রমণ করতে ছুটে যায়। কিন্তু আফগানরা ঠাণ্ডা মাথায় গুলী ছুঁড়তে থাকে এবং প্রত্যেকটি গুলীই অব্যর্থ ছিল।...আমাদের আরো অনেক সৈন্য এলো, বড় বড় কামান এলো, বাড়িটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া হলো, কিন্তু তবুও আফগানরা আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে লড়তে লাগল। তারা তাদের অনেক শত্রু ধ্বংস করার পর তারা নিজেরাও

৬. *Ibid*, p. 213
৭. *Ibid*, pp. 215-16

সকলেই ধ্বংস হলো। ঝান্সি অবরোধের এটাই হলো শেষ যুদ্ধ।"[৮]

বিদেশী শত্রু যোদ্ধা-অযোদ্ধা কাউকেই বাদ দেয়নি ; দিল্লি, লখনৌ, কানপুর ও অন্যান্য স্থানের মতো ঝান্সিতেও ইংরেজরা সকল ভারতীয়কেই পাইকারিভাবে হত্যা করেছিল। ইংরেজ ইতিহাসবিদরাই বলেছেন, ঝান্সিতে ইংরেজরা খুব কম করে ৫ হাজার লোককে হত্যা করেছিল। "যারা পালাতে পারেনি, তারা তাদের স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিল ও তারপর নিজেরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।"[৯]

এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছিল তাদের অবাধ লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসের তাণ্ডব। সংস্কৃত ও অন্যান্য বই ও পাণ্ডুলিপি সমন্বিত ঝান্সির বিখ্যাত গ্রন্থাগারটিও বিদেশী আক্রমণকারীরা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

গভীর রাত্রে কয়েকজন বিশ্বস্ত সওয়ার নিয়ে রানী ঝান্সি ত্যাগ করলেন। ইংরেজরাও তা টের পেয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। এক স্থানে রানীর ৪০ জন সওয়ার ফিরে দাঁড়াল, যুদ্ধে তারা অনেককে খতম করল এবং নিজেরাও প্রত্যেকে নিহত হলো। একসময়ে অনুসরণকারীদের মধ্যে লেফটেনান্ট ডাউকার রানীর খুব নিকটে এসে পড়েছিল, কিন্তু রানীর গুলীতে সে নিহত হলো। তারপর থেকে সুদক্ষ অশ্বারোহী রানীর অনুসরণ করা ইংরেজদের পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

এইভাবে রানী ঝান্সি থেকে ১৫০ মাইল দূরে কাল্পিতে এসে পৌছলেন। কাল্পিতে তখন নানা সাহেবের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। যমুনাতীরে যে খাড়া পাহাড় উঠেছে তারই উপর কাল্পি দুর্গ অবস্থিত। তার সামনে পর পর ৫টি দুর্ভেদ্য বাধা। প্রথমত বহু গিরিগহ্বর তাকে ঘিরে আছে, তারপর শহর ; শহরকে আবার ঘিরে রয়েছে একটি গিরিখাত ; তারপর আবার পূর্বে পশ্চিমে ও দক্ষিণে, চতুর্দিকে বহু গিরিখাত। কাল্পির সামরিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত কাল্পি বিদ্রোহীদের হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে ইংরেজদের অবস্থা বিপজ্জনকই থাকবে।

এই কাল্পিতেই তখন অনেক বিদ্রোহী সিপাহিদল এসে সমবেত হয়েছে— গোয়ালিয়ার কন্টিনজেন্ট, কোটা কন্টিনজেন্ট, ৫২-তম নেটিভ ইনফ্যানট্রি, ৫ম বেঙ্গল ইরেগুলার ক্যাভালরি। বান্দা, বানপুর ও শাহগড়ের রাজারাও তাঁদের সৈন্যদল নিয়ে উপস্থিত। কুমার সিং-ও কাল্পির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। নানা সাহেবের প্রতিনিধি রাওসাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত। তাঁতিয়া এই কাল্পিতে ১৪টি কামান জোগাড় করে রেখেছেন, কামান ঢালাই করার একটা কারখানা

৮. *Ibid*, pp. 219-20

৯. Lowe: *Central India During the Rebellion of 1857-58*, p. 257

তৈরি করেছেন, গোলাবারুদের কারখানাও স্থাপন করেছেন; বহু তাঁবু, সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন। তাঁতিয়া সামরিক শক্তি সংগঠনে সর্বদাই অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

ঝান্সি জয় করার পর রোজ্ কাল্পির দিকে অগ্রসর হলেন। কাল্পি থেকে রোজকে বাধা দেবার জন্যে রানী কুচে গেলেন; সেখানে তাঁতিয়াও এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। ১লা মে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর রানীকে কিছু না বলেই তাঁতিয়া কুচ পরিত্যাগ করে চিরখারি চলে গেলেন। তাঁতিয়ার এই রহস্যময় আচরণে স্বভাবতই রানী ভীষণ বিপদে পড়লেন; তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে রোজ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "একদিকে শত্রুরা যেমন কুচ থেকে হুড়মুড় করে পালাচ্ছিল, অপরদিকে স্বীকার করতেই হয় যে তাদের পিছু হঠার মধ্যে বেশ দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখা যাচ্ছিল। প্রধান বাহিনীর পিছু হঠার নিরাপত্তার জন্যে পশ্চাৎবর্তীরা ভালোভাবেই যুদ্ধ করছিল এবং আক্রান্ত হলে বন্দুক ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে মরীয়া হয়ে লড়ছিল।"

কাল্পিতে ফিরে রানী সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনে মন দিলেন। ইতিমধ্যে বান্দার নবাব ৯ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে কাল্পিতে পৌঁছেছেন। ১৯শে এপ্রিল ১৮৫৮. জেনারেল হুইটলক বান্দা আক্রমণ করেছিলেন। তাঁকে ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হুইটলক তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "শত্রু পশ্চাতে হঠে কয়েকটি জায়গা দখল করে লড়তে লাগল এবং তাদের হঠাবার জন্যে আমাদের কামানগুলি থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ করতে হলো।" বান্দার যুদ্ধে হুইটলকের এত ক্ষতি হয়েছিল যে প্রচুর পরিমাণে নতুন সৈন্য ও রসদ না আসা পর্যন্ত তিনি বান্দা ত্যাগ করতে পারেন নি।

রানী যখন বিদ্রোহী বাহিনীগুলির পুনর্গঠনের কাজ শুরু করলেন তখন সৈন্যদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। রানীর যুদ্ধনৈপুণ্যে ও শৌর্যবীর্যে সকলেই তখন মুগ্ধ। কিন্তু রানীর এই জনপ্রিয়তা রাওসাহেবের পছন্দ হয়নি। পূর্বে তিনি রানীকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। এখন তিনি জানালেন যে তিনি নিজেই সৈন্যাধ্যক্ষ থাকবেন।

নানাসাহেব কানপুরে নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেছিলেন, সামন্ততান্ত্রিক পেশোয়াশাহি পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রাওসাহেব ছিলেন নানার প্রতিনিধি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। রাওসাহেবও সিপাহি ও জনসাধারণকে মধ্যযুগীয় পেশোয়াশাহি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখতেন এবং সেইভাবেই তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন। সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধ পরিকল্পনা ও কৌশল (strategy and tactics.) সম্বন্ধে এদের ধারণা ছিল মধ্যযুগীয় এবং রাজনৈতিক ভাবেও এঁরা ছিলেন পশ্চাৎমুখী। উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্বভাবতই এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেখাপ্পা ও প্রতিক্রিয়াশীল।

পক্ষান্তরে, রানীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্ত ধরনের। সাধারণ মানুষের ঘরেই তাঁর জন্ম এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন; তিনি সম্রান্ত বংশজাত নন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন একটা ছোট রাজ্যের রানী, তাই একটা বড় রাজ্য স্থাপনের কল্পনা তাঁর মাথায় কোনোদিনই আসেনি। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্য থেকে নষ্ট হয়ে যায়নি। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তাঁকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, সৈন্তদের সঙ্গে খুবই নিকটতর হতে হয়েছিল। এইজন্যে তিনি সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন। সেইজন্তেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার মানুষ জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাণ দিতে পেরেছিল।

জনসাধারণ ও সিপাহিরা ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল একটা মহৎ আদর্শের জন্তে, কোনো একটা বিশিষ্ট রাজবংশের নতুন প্রতিষ্ঠার জন্তে নয়। তারা চেয়েছিল বিদেশীর পরাধীনতা থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে। দেশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশ স্বাধীন হবার পর কারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে, কি ধরনের শাসনতন্ত্র স্থাপিত হবে, এসব প্রশ্ন তাদের মনে তখনো আসেনি।

দেশপ্রেমের এই আদর্শের উদ্বোধনই ছিল জনসাধারণ ও সিপাহিদের শক্তির প্রধান উৎস। এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে কোনো মহৎ আদর্শ ছিল না, এবং এটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। অস্ত্রশস্ত্রে ও সংগঠনে বিদ্রোহীরা তাদের শত্রুর সমকক্ষ ছিল না, কিন্তু আদর্শের শক্তির দ্বারাই তারা এইসব সমস্তার সমাধান করে জয়লাভ করতে পারত, যদি তারা নেতৃত্বের শক্তিকে সংহত করার ক্ষমতা দেখাতে সমর্থ হতো।

এই বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই রানী বিদ্রোহী বাহিনীকে নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রানীর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, রাওসাহেব, তাঁতিয়া টোপি বা অন্তান্ত বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৪ই মে কাল্পির নিকটে যমুনার ধারে গোলৌলিতে রোজ তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে পৌছলেন, এবং এই ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি তাঁর সরকারকে জানালেন: "আমাকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলি দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটা আজ সমাপ্ত হলো। আমার বাহিনী বোম্বে থেকে মার্চ করে যমুনার তীরে এসে পৌছে গিয়েছে এবং বেঙ্গল আর্মির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে; তার ফলে কাল্পির বিরুদ্ধে সংযুক্ত অভিযান সম্ভব হয়েছে।"

১৬ই মে থেকে রোজ কাল্পির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। যমুনার অপর পারে শক্তিশালা কামানের তিনটি ব্যাটারি স্থাপন করা হলো—একটির লক্ষ্য হলো কাল্পির দুর্গ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির লক্ষ্য কাল্পি শহর।

গ্রীষ্মকালে এইসব স্থানে ইংরেজদের পক্ষে এই অভিযান চালানো যে কত কঠিন হচ্ছিল তা রোজের বাহিনীর প্রধান চিকিৎসক ডাঃ আর্নটের ১৯ মে'র রিপোর্ট থেকেই কতকটা অনুমান করা যায়: "সব শ্রেণীর সৈন্যদের স্বাস্থ্যের অবস্থা বর্তমানে কিরূপ অবস্থায় আছে তা দু'একটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে—গত সপ্তাহের মধ্যে সর্দিগর্মিতে ২১ জন ইয়োরোপীয় মরেছে, আর হাসপাতালে আছে ৩১০ জন; এবং স্টাফের মধ্যে এমন একজন অফিসার নেই যিনি সামরিক কর্তব্যের জন্যে উপযুক্ত। এই সুদীর্ঘ ও কঠিন অভিযানের ফলে এবং উপরিউক্ত ক্ষতির জন্যে আমাদের বাহিনী এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে আমি আমার একটা আশংকা প্রকাশ না করে পারছি না—তা হচ্ছে যদি কাল্পির যুদ্ধ বেশিদিন ধরে চলে তাহলে এই প্রচণ্ড গরমে আমাদের বাহিনী ধরাশায়ী হয়ে পড়বে।"[১০]

২০ মে বিদ্রোহীরা কাল্পি থেকে বেরিয়ে এসে রোজের বাহিনীর দক্ষিণ দিক আক্রমণ করল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পরই তারা তাদের শিবিরে ফিরে গেল। এইভাবে তারা আরো কয়েকদিন আক্রমণ করেছিল। ২১ মে গুপ্তচররা রোজকে জানালো যে দু'একদিনের মধ্যেই বিদ্রোহীরা ইংরেজদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করবে, তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, হয় তারা শত্রুকে যমুনার জলে ভাসিয়ে দেবে, নয়তো তারা নিজেরা মরবে। রোজের সৌভাগ্যবশত ইতিমধ্যে ২০ তারিখেই একটা নতুন ইংরেজ ও শিখ বাহিনী তাঁর শিবিরে এসে পৌঁছল; আরো এলো ৬৮২ জন শিখের একটা উটের বাহিনী।

রাওসাহেব ৮ দিন ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে ইংরেজদের আক্রমণ করতে পারলেন না; এতদিন ধরে শত্রুকে প্রস্তুত হবার এবং সর্বতোভাবে সাহায্য পাবার সময় দিলেন। ২৩ মে বিদ্রোহীরা সদলবলে বেরিয়ে এসে রোজকে আক্রমণ করল। কাল্পির প্রাঙ্গণে সারাদিন ধরে যুদ্ধ হলো। রোজ তাঁর উটের বাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভালোভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন। যমুনার অপর পার থেকে কাল্পির দুর্গ ও শহরে যেভাবে কামানের গোলা এসে পড়ছিল, তাতে রাওসাহেব সেখানে ফিরে যেতে ভরসা পাননি। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে সালাউনের দিকে চলে গেলেন।

কাল্পির পতনের পর গোয়ালিয়ারের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালপুরে

---

১০. Forrest: vol. III, p. 243. তাঁতিয়া ইংরেজ বাহিনীর এই দুর্বলতা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি হুকুম দিয়েছিলেন: "রৌদ্রতাপে ইংরেজদের যুদ্ধ করতে হলে হয় তারা সর্দিগর্মিতে মরে, নয়তো তাদের হাসপাতালে যেতে হয়। সুতরাং তাদের আক্রমণ করতে হবে বেলা ১০টার পর যাতে তারা সূর্যের তাপ ভালো করে অনুভব করে।"

বিদ্রোহী নেতারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের জন্যে মিলিত হলেন ; উপস্থিত ছিলেন রাওসাহেব, রানী, তাঁতিয়া ও বান্দার নবাব। স্থির হলো গোয়ালিয়ার দখল করতে হবে, এবং তাই করা হলো। এই পরিকল্পনার জন্যে কৃতিত্ব দেওয়া হয় তাঁতিয়াকে, কিন্তু আসলে এ দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ছিল রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের।

কেই ও ম্যালিসন বলেছেন : "পূর্ববর্তী কার্যকলাপ থেকে বিচার করে আমরা রাওসাহেব ও বান্দার নবাবকে এক কথাতেই বাদ দিতে পারি। এমন বৃহৎ ও দুঃসাহসিক পরিকল্পনা সংগঠন করার মতো মানসিক গঠন বা প্রতিভা কিছুই তাঁদের ছিল না। বাকি দু'জনের মধ্যে তাঁতিয়া টোপিকে বাদ দেওয়া চলে। তিনি যে এরকম পরিকল্পনা প্রণয়নে অক্ষম ছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর জবানবন্দী আমাদের হাতে আছে। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে সার্থক কাজটির জন্যে জবানবন্দীতে তিনি নিজে কোনো কৃতিত্বই দাবি করেন নি। মহৎ কীর্তি স্থাপনের পক্ষে যে প্রতিভা শৌর্যবীর্য ও অসম সাহসের প্রয়োজন, তা কেবলমাত্র চতুর্থ ব্যক্তিরই ছিল। ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা ও যথাসময়ে প্রচণ্ড আঘাত করার দৃঢ় সংকল্পে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং আশা করেছিলেন, প্রথম আঘাত সার্থক হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়ে ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে।...এটা শুধু অনুমানই নয়, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, গোপালপুরে নেতারা যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছিলেন, তার উদ্ভাবক ছিলেন ঝান্সির রানী এবং তিনিই তাঁর সঙ্গীদের ওপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন।"

কাল্পি হারাবার পর এক সপ্তাহ যেতে না-যেতেই বিদ্রোহীরা ১লা জুন তারিখে বিনা যুদ্ধে গোয়ালিয়ার দখল করল। গোয়ালিয়ারের মহারাজা তাঁর বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দিতে এসেছিলেন, কিন্তু সেই বাহিনী যখন বিদ্রোহীদের সঙ্গেই যোগ দিয়ে বসল, তখন মহারাজা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ঢোলপুরে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় নিলেন।

বিদ্রোহীদের দ্বারা গোয়ালিয়ার দখল ইংরেজদের মনে হয়েছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। এই দুঃসংবাদে ক্যানিং এতই চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি বলেছিলেন : "If Scindia joins the rebels, I will pack off tomorrow."—যদি সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ দেন, তাহলে কালই আমাকে তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। ইংরেজদের শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণই ছিল। প্রথমত, গোয়ালিয়ারের ভৌগোলিক অবস্থান সারা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোয়ালিয়ার থেকে উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতে যাবার বহু রাস্তা চলে গিয়েছে ; দিল্লির সঙ্গে বোম্বের যোগাযোগ গোয়ালিয়ার দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে গোয়ালিয়ার একটা শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। বিদ্রোহীদের পক্ষে পশ্চিমে ও দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ

স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। মহারাষ্ট্রে বিদ্রোহ তখন সবে আত্মপ্রকাশ করছিল। অযোধ্যায় ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে জনসাধারণের বিদ্রোহ তখনো পূর্ণ-সক্রিয়। জনসাধারণের মধ্যে তখন রানীর ও তাঁতিয়ার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে মাত্রায় পড়েছে। গোয়ালিয়ারে সেই সময় প্রচুর পরিমাণে কামান, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্যদ্রব্য ও অনেক ধনরত্ন ছিল এবং তা সবই বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়েছিল। তাছাড়া তখন বর্ষা সমাগত—সেই অবস্থায় পর্বতাকীর্ণ দুর্গম পথে ইংরেজ সৈন্য-বাহিনীর চলাচল একটা কঠিন সমস্যা। মধ্যভারতের বিদ্রোহী-নেতাদের পক্ষে গোয়ালিয়ার দখল ছিল একটা সুবর্ণ সুযোগ। সর্বোপরি, গোয়ালিয়ার দুর্গ ছিল সারা ভারতের একটা শক্তিশালী দুর্গ। এই দুর্গ বিদ্রোহীদের হস্তগত হওয়া ইংরেজের পক্ষে ভীষণ বিপদের কারণ।

গোয়ালিয়ার দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা কালবিলম্ব না করে সেখানে আক্রমণ করবে, তা সকলেরই একরকম জানা ছিল। কিন্তু রাওসাহেব গোয়ালিয়ার রক্ষা করার জন্যে কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন না, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণের জন্যেও কোনো তৎপরতা দেখালেন না। প্রথমেই জাঁকজমকের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় বিজয়োৎসবে কাটিয়ে দেওয়া হলো। লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে দরবার হলো, বাজী পোড়ানো হলো, ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো হলো। অনেক তামাশা হলো এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে পেশোয়াশাহি ঘোষণা করা হলো, নানাসাহেব পেশোয়া, রাওসাহেব তাঁর প্রতিভূ, তাঁতিয়া সেনাপতি ইত্যাদি ঘোষিত হলো। সম্ভবত রানী লক্ষ্মীবাঈকে এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হয়নি,[১১] অথবা যেটা আরো সম্ভব তা হলো, কর্তব্যকাজে অবহেলা করে এই রকমের ক্ষতিকারক জাঁকজমক তিনি সমর্থন করতেন না। নানা বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে রাওসাহেব ও তাঁতিয়ার মধ্যে তীব্র মতানৈক্য ছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। গোয়ালিয়ার রক্ষার প্রশ্নেও তাঁদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছিল।

১লা জুনে গোয়ালিয়ার বিদ্রোহীদের দখলে এলো। ৬ই জুন রোজ কাল্পি থেকে রওনা হয়ে ১৬ই তারিখে গোয়ালিয়ারের পাশে মোরারে এসে পৌছালেন। চার দিন ধরে অনেকগুলি তীব্র সংঘর্ষ হবার পর গোয়ালিয়ার পুনরায় ইংরেজদের হস্তগত হলো এবং গোয়ালিয়ারের মহারাজা আবার সিংহাসন দখল করলেন।

গোয়ালিয়ারের এই যুদ্ধে ১৭ই জুন ১৮৫৮ তারিখে কোটা-কি-সরাইতে প্রচণ্ড একটা যুদ্ধ হয়। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁতিয়া পিছু হঠতে লাগলেন, শেষে ফুলবাগে তিনি থামলেন। রানী তখন ইংরেজদের অগ্রগতির পথরোধ করে

---

১১. মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য: ঝান্সীর রানী, পৃ ২৭৯। কিন্তু লেখিকা এই উক্তির সমর্থনে কোনো নজির দেননি।

দাঁড়ালেন। এই দিনকার যুদ্ধেই রানী লক্ষ্মীবাঈ শত্রুর গুলীতে নিহত হলেন।

গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং সবচেয়ে ভীত হয়েছিলেন মধ্যভারত সম্পর্কে ও বিশেষ করে ঝান্সির রানী সম্বন্ধে। মধ্যভারতের অন্যান্য নেতাদের তুলনায় লক্ষ্মীবাঈ-এর রাজনীতিই ছিল সবচেয়ে বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ। রানী নিজে মারাঠা হলেও মারাঠা রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কোনো আওয়াজ তোলেন নি। নানাসাহেব ও তাঁতিয়া টোপি পেশোয়াশাহির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে ভুল করেছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ এমন অদূরদর্শিতার পরিচয় দেননি। মধ্যভারতের অধিকাংশ লোকই ছিল বুন্দেলা, রাজপুত, বঘেয়া ও পাঠান, আর সিপাহিদের অধিকাংশই ছিল অযোধ্যাবাসী ; মারাঠাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। পেশোয়া-শাহির আওয়াজ মধ্যভারতের জনসাধারণের নিকট কোনো সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারেনি। এমনকি, মধ্যভারতের মারাঠা রাজারাও এতে সাড়া দেননি। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যেও নানা সাহেবের পেশোয়াশাহির দাবি গ্রহণ-যোগ্য ছিল কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁতিয়া যদি এই ভুল রাজ-নৈতিক আদর্শ বর্জন করতে পারতেন, তাহলে তিনি মধ্যভারতের বিদ্রোহী জনসাধারণের মধ্যে আরো অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারতেন।

লক্ষ্মীবাঈ এরকম কোনো রাজনৈতিক ভুল করেন নি। এই কারণেও বটে এবং তাঁর যোগ্যতার জন্যেও বটে, তিনিই ছিলেন মধ্যভারতে নেতৃত্ব দেবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এই কারণেই বুন্দেলা, রাজপুত, পাঠান, মারাঠা—সকলেই সমান আগ্রহ নিয়ে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। ঝান্সি অবরোধের সময় কাল্পিতে বিদ্রোহী নেতারা স্থির করেছিলেন, মধ্যভারতের যুদ্ধের নেতৃত্ব থাকবে রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে। বেসামরিক নারী হয়েও লক্ষ্মীবাঈ যে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা সমস্ত দুনিয়ার ইতিহাসে একমাত্র জোয়ান-অফ আর্ক-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। রানীকে কেন্দ্র করেই সমগ্র মধ্যভারতের বিদ্রোহ একটা বিরাট ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

তাঁতিয়া টোপি

রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যুর পর গোয়ালিয়ারের যুদ্ধ চালানো তাঁতিয়ার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। ২০শে জুন তাঁতিয়া আর রাওসাহেব সামান্য কয়েকজন লোক নিয়ে গোয়ালিয়ার ছেড়ে চলে গেলেন, কোনো কামান কোনো রসদ কিংবা কোনো বাহিনী, কিছুই সঙ্গে নিতে পারলেন না।

গোয়ালিয়ার জয় করার পরই জেনারেল রোজ ২৯শে জুন ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করলেন এবং জেনারেল নেপিয়ার তাঁর স্থানে নিযুক্ত হলেন।

বিদ্রোহীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়; তারা দিল্লি, কানপুর, লখনৌ. বেরিলি, ঝান্সি, কাল্পি, গোয়ালিয়ার সবই হারিয়েছে; তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ নেতারা—ফৈজাবাদের মৌলভি, কুমার সিং, ঝান্সির রানী সকলেই নিহত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখন আশা-ভরসা আর বিশেষ কিছুই নেই, ঠিক সেই সময়েই ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ যেন একটা নতুন জীবন লাভ করল, এবং আরো এক বৎসরের অধিককাল ধরে নতুন উদ্যমে ও নতুন কায়দায় অযোধ্যা, মধ্যভারত ও পশ্চিম-বিহারে, সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সাধারণ মানুষ পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে চালিয়ে গেল।

ইংরেজরা তখন ইংল্যাণ্ড থেকে বহু নতুন সৈন্যবাহিনী, কামান, বন্দুক, গোলা-বারুদ পাঠিয়ে ভারতে ইংরেজ সরকারকে শক্তিশালী করে তুলেছে। তাতে নিরুৎসাহ না হয়ে তাঁতিয়া টোপি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হলেন। এখন থেকে তাঁদের প্রধান নীতি হলো ৩টি: (ক) শত্রুর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে চলতে হবে; (খ) শত্রুর ওপর সুযোগ বুঝে হঠাৎ আক্রমণ করে, বিশেষত তার পশ্চাদ্‌ভাগে সর্বদা হামলা চালিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হবে; (গ) নিজের বাহিনীর জন্যে কামান, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও টাকা-পয়সা সংগ্রহের জন্যে মধ্যভারতের অসংখ্য ধনী, রাজা, নবাব ও জমিদার—যাঁরা প্রজাদের লুণ্ঠন করে প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়ে ইংরেজের দাসত্ব বরণ করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন—তাঁদের ওপর অনবরত হামলা চালাতে হবে।

এই নীতি অবলম্বন করে তাঁতিয়া যে গেরিলা-বাহিনী সংগঠন করেন, তা খুব অল্প মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারত; ইংরেজ বাহিনীর মতো প্রচুর

মালপত্র, রসদ, তাঁবু ইত্যাদির বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত না। এই কারণে তাঁতিয়ার গতিবিধি খুব দ্রুত হয়ে পড়ল এবং এই নীতি অবলম্বন করার ফলেই তাঁর পক্ষে ইংরেজের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো প্রায় এক বৎসর কাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁতিয়ার পক্ষে আরো একটি অনুকূল অবস্থা ছিল এই যে, মধ্যভারতে প্রচুর পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-জঙ্গল থাকার জন্যে গেরিলাযুদ্ধ চালনা করার উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু কেবলমাত্র রণকৌশল (tactics) বদল করেই তাঁতিয়া ক্ষান্ত হলেন না। তাঁকে একটা নতুন রণনীতি (strategy) গ্রহণ করতে হলো। পূর্বে তাঁর রণনীতি ছিল কানপুর, গোয়ালিয়ার ও ঝান্সিকে কেন্দ্র করে সমস্ত দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়া। এখন এইসব প্রধান শক্তিকেন্দ্রগুলি হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁতিয়ার প্রধান লক্ষ্য হলো—নর্মদা নদী পার হয়ে, মহারাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে নতুন করে বিদ্রোহের প্রধান শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ করা। কিন্তু এমন একটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করা এক কথা, আর তাকে কার্যকরী করা আর এক কথা। তাঁতিয়া নিঃস্ব অবস্থায় নানা স্থানে পলাতক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর চারিদিকে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে—এই অবস্থায় শত-শত মাইলব্যাপী পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদ-নদী অতিক্রম করে নর্মদা পার হওয়া একটা অসাধ্য কর্ম বলেই সাধারণ লোকের কাছে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

তাঁতিয়া যখন দক্ষিণ দিকে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, ঠিক সেই সময় ২৯শে জুন আগ্রা থেকে একটি বাহিনী তাঁকে গোয়ালিয়ার থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে জোরা আলিপুরে আক্রমণ করে। ইংরেজ জেনারেল রবার্ট নেপিয়ার ভেবেছিলেন, তাঁতিয়াকে আচমকা আক্রমণ করে তাঁকে খতম করে দেবেন। কিন্তু শিকারকে ফাঁদে ফেলা গেল না। তাঁতিয়া ইংরেজের ব্যূহভেদ করে নিজেকে মুক্ত করলেন। তবে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া আপাতত তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না, কারণ ইংরেজরা তখন সেখানে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

তাঁতিয়া তখন ঠিক করলেন, তিনি জয়পুর অধিকার করবেন। সেখান থেকে বিশ্বস্তসূত্রে তনি খবর পেয়েছিলেন যে, জয়পুরের মহারাজা ইংরেজের গোলামি স্বীকার করে নিলেও তাঁর প্রজা, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁতিয়ার জয়পুরের দিকে রওনা হবার খবর পেয়েই সমগ্র রাজপুতানার ইংরেজ সেনানায়ক রবার্টস্ (পরে তিনি ফিল্ড-মার্শাল লর্ড রবার্টস্ হয়েছিলেন) নাসিরাবাদ থেকে এসে জয়পুর দখল করে ফেললেন।

তাঁতিয়া তখনো জয়পুর থেকে ৬০ মাইল দূরে। জয়পুর দখল করার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি দক্ষিণে টঙ্কের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে টঙ্কের নবাব ৪টি কামান সমেত একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই

তাঁতিয়া তোপীর গেরিলা অভিযান

১৮৫৮ এর ২০শে জুন গোয়ালিয়রে তাঁহার পরাজয়ের পর হইতে ১৮৫৯ এর মার্চে সিরঞ্জের নিকট বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত

০ ৩০ ৬০
মাইল

দিল্লী
বিকানীর
আলোয়ার
সেলুইর
দেভাসা
আগ্রা
এটাওয়া
জয়পুর
আজমীর
নুসিরাবাদ
কোসানী
জওড়া আলিপুর
গোয়ালিয়র
যমুনা নঃ
টঙ্ক
চম্বল নঃ
বেতোয়া নঃ
ঝাঁসি
সাঙ্গানের
আলবেহত
চান্দেরী
কোটারিয়া
বারোদ
উদয়পুর
মংগ্রৌলা
সিন্দোয়া
জিরাপুর
সিরঞ্জ
খোরাই
প্রতাপগড়
রাজগড়
বাগরোদ
আমেদাবাদ
উজ্জয়িনী
ভূপাল
গুজরাট
ইন্দোর
হোসাঙ্গাবাদ
মউ
বরোদা
ছোট উদয়পুর
নর্মদা নঃ
রাজপুর
তাপ্তী নঃ
বোম্বাই অভিমুখে
আরব সাগর

Atul Roy

গোটা বাহিনীটাই তাঁতিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার পরিবর্তে সমস্ত কামান নিয়ে তাঁর দলভুক্ত হয়ে গেল। এইভাবে নতুন করে তাঁতিয়া আবার কতকগুলি কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পেয়ে ১০ই জুলাই দক্ষিণাভিমুখে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে রবার্টস্ ও হোম্‌স দুইদিক থেকে দুটি ইংরেজ বাহিনী নিয়ে টঙ্কে পৌঁছে তাঁতিয়াকে ধারে কাছে কোথাও খুঁজে পেলেন না। তাঁতিয়া তখন অনেক দূরে সরে গেছেন। এইভাবে গোয়ালিয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২০০ মাইল দূরে বিদ্রোহী গেরিলা-বাহিনী চম্বল নদীর ধারে ইন্দ্রগড়ে এসে পৌঁছল।

চম্বল নদী পার হতে পারলেই বিনা বাধায় তাঁতিয়া আবার নর্মদার দিকে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কয়েকদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে চম্বল তখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। স্ফীত চম্বলের দ্রুত খর-স্রোতে সে নদী তখন পার হওয়া অসম্ভব। আবার এদিকে রবার্টস্ ও হোম্‌স তাঁর দিকে ধাওয়া করে আসছেন। তাঁতিয়া তখন বুঁদির দিকে রওনা হলেন এবং দ্রুত মার্চ করে নিমচ নাসিরাবাদ অঞ্চলে এসে পৌঁছলেন। এক বছর পূর্বে এই অঞ্চলটি একটি বিখ্যাত বিদ্রোহ-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁতিয়া এখান থেকে উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হলেন। এই রাজপুত রাজা ও জন-সাধারণ তাঁতিয়াকে অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল। উদয়পুর শহরের মাত্র ৮০ মাইল দূরে যখন তিনি পৌঁছেছেন, তখন রবার্টস্ ও হোম্‌স তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এখানে বাধ্য হয়ে ভীলওয়ারা নামক একটি স্থানে তাঁতিয়াকে ইংরেজের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ লড়তে হলো। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তিনি আবার দ্রুত মার্চ করে ইংরেজের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ব্রিটিশ বাহিনী ধীরে ধীরে তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। যেদিকেই যাবার চেষ্টা করেন, সেদিকেই তাঁর সামনে শত্রু বাহিনী। আরাবল্লি পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত রাজসমন্দ হ্রদের ধারে কাক্রোলির নিকট ইংরেজ বাহিনী ১৩ই ও ১৪ই আগস্ট আবার বিদ্রোহীদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। এবার সত্য সত্যই তাঁতিয়া ইংরেজের ফাঁদে পড়লেন। তাছাড়া, দিনের পর দিন দ্রুত মার্চ করার ফলে ও বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করার ফলে বিদ্রোহী বাহিনী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু তা সত্বেও যখন তাঁতিয়া দেখলেন যে ইংরেজদের হাত থেকে এবার আর নিস্তার নেই, তখন তিনি মরীয়া হয়ে লড়বার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর সঙ্গে মাত্র ৪টি ছোট ছোট কামান; আর তাঁকে লড়তে হবে ইংরেজের অনেকগুলি বড় বড় কামানের বিরুদ্ধে। তিনি পর্বতের এমন একটি স্থানে তাঁর কামানগুলি বসালেন যে, ইংরেজ বাহিনীকে তার ফলে অনেকক্ষণ ধরে তিনি একটি স্থানে আবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন; ইংরেজরাও তাদের বড় কামান দিয়ে তাঁর বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। সমস্ত দিন এইভাবে

যুদ্ধ চলার পর মুষ্টিমেয় সৈন্যকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে, অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে বান নদী সাঁতরিয়ে পার হয়ে তাঁতিয়া আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তাঁতিয়াকে আবার সবই হারাতে হলো। যে কয়টি কামান ছিল, সবগুলিই তাঁকে নদীর অপর পারে রেখে আসতে হলো, সবকটি বন্দুকও সঙ্গে আনতে পারেন নি। এইভাবে একরকম রিক্ত হস্তে তিনি আবার ছুটে চললেন নর্মদা নদীর দিকে। এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর বিশ্রাম করার সুযোগ নেই। ইংরেজরাও চুপ করে বসে নেই। তারাও ছুটছে, নতুন সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবার তাঁতিয়াকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যে।

এইভাবে ২০০ মাইল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে, কোথাও বা শত্রুকে পাশ কাটিয়ে, কোথাও বা তার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে, ২০শে আগস্ট তারিখে তিনি চম্বল নদীর ধারে এসে পৌছলেন। তাঁর পিছনে দুটি ও সামনে নদীর অপর প্রান্তে তিনটি ব্রিটিশ বাহিনী। নদী পার হলেই আবার তাঁকে ইংরেজদের ফাঁদে পড়তে হবে। তাছাড়া চম্বলের যেরকম অবস্থা, তাতে তা পার হওয়া ইংরেজরা অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল। তাঁতিয়া ইংরেজদের চোখের সামনেই বর্ষাকালের ভয়ংকর এই চম্বল নদী পার তো হলেনই, তাদের মাঝখান দিয়েই তিনি দ্রুতবেগে চলে গেলেন এবং সোজা ঝালোয়ার রাজ্যের রাজধানী ঝালরাপতনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানকার অত্যধিক ইংরেজভক্ত রাজা রানা পৃথ্বীসিং তাঁতিয়াকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু টঙ্কে যা ঘটেছিল এখানেও তাই হলো। ঝালরাপতনের সৈন্যরা ও জনসাধারণ তাঁতিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিল। এ পর্যন্ত তাঁতিয়ার নিকট একটিও কামান ছিল না, কোনো রসদ ছিল না, কোনো টাকা-পয়সাও ছিল না। ঝালরাপতনে তিনি পেলেন ৩০টি কামান, ১৫ লক্ষ টাকা, এবং অনেক নতুন সৈন্য, প্রচুর রসদ, হাতি, ঘোড়া, বন্দুক ইত্যাদি। এইখানে ৫দিন বিশ্রাম করে রাজগড় হয়ে ইন্দোর পৌছবার জন্যে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে তাঁতিয়া আবার যাত্রা শুরু করলেন।

ঝালরাপতন থেকে মালোয়া হয়ে রাজগড় পৌছতে তাঁতিয়ার দুই সপ্তাহ সময় লাগল। ইতিমধ্যে নানাদিক থেকে বিভিন্ন ইংরেজ-বাহিনী নিয়ে রবার্টস্, হোম্‌স, পার্ক, মিচেল, হোপ, লকহার্ট প্রভৃতি সেনানায়করা পুনরায় তাঁতিয়াকে ঘিরে ধরেছেন। তাঁতিয়ার সঙ্গে ৫ হাজার সৈন্য ও ৩০টি কামান। রাজগড়ের নিকটে জেনারেল মিচেলের বাহিনী বিওউড়াতে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁতিয়াকে ধরে ফেলল এবং বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ চালল। তাঁতিয়াও প্রচণ্ডভাবে প্রতি-আক্রমণ করলেন। ইংরেজ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের কামান ফেলে রেখে পিছু হঠতে লাগল। এই অবস্থায় তাঁতিয়া ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। নিজের সৈন্য-

বাহিনীকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তাঁতিয়া অনেক সময়-সুযোগ পেয়েও শত্রুকে আক্রমণ করেন নি – তাঁর সমরনীতিতে এখানেই ছিল সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।[১]

তাঁতিয়া রাজগড়ে পৌঁছানোর ফলে এই যুদ্ধে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। আগ্রা থেকে গোয়ালিয়ার ও ইন্দোর হয়ে যে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড বোম্বে পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেই রাস্তার ধারেই রাজগড় অবস্থিত। সেখান থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দক্ষিণে ইন্দোর, এবং তার আরো ৫০-৬০ মাইল দক্ষিণে নর্মদা। ইন্দোরের সৈন্যবাহিনী ও তার জনসাধারণ তাঁতিয়ার আগমনের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। ইন্দোরে তাঁতিয়ার আগমনের অর্থ – সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশের দরজা তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে খুলে যাওয়া এবং জাতীয় বিপ্লবের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হওয়া।

১. রাজগড়ের পর থেকে তাঁতিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক *Friend of India*-তে লিখেছিলেন: **"Then commenced that marvellous series of retreats which, continued for months, seemed to mock at defeat, and made Tantia's name more familiar to Europe than that of most of our Anglo-Indian Generals···slightly as we may hold the marauding leader, he was of the class to which Haidar Ali belonged, and had he carried out the plan attributed to him and penetrated through Nagpur to Madras, he might have been as formidable as his prototype."** (quoted by Savarkar, p. 529). আর একজন ব্রিটিশ অফিসার Col. Malcolm সেইসময় লিখেছিলেন: **"For two long years Tatya Tope waged relentless war against the British in the face of many odds. His soldiers were half-disciplined and he had kept together a force of beaten soldiers who were bound with no tie to his person. He had to collect fighting weapons and stores, a difficult task in itself,···yet with these handicaps, he harnessed the English and caused so much loss to them as no other leader of rhe revolt had done. His successes were few, defeats many; yet he neither lost heart, nor courage – it seemed as if defeat gave him a new spirit and further spurs for fresh action. In England and Europe, the name of Tatya Tope had at the time become more popular than that of the most of the English Generals."**

রাজগড় ছেড়ে বেতোয়া নদীর ধারে সিরঞ্জ-এর জঙ্গলে তাঁতিয়া আশ্রয় নিয়ে ৭ দিন বিশ্রাম করলেন। তারপর ইসাগড় আক্রমণ করে তিনি সেখান থেকে ৫টি কামান সংগ্রহ করলেন। কিন্তু এখানেও তিনি দেখলেন, উত্তরে সিপ্রি থেকে এবং উত্তর-পূর্ব থেকে দুইটি শত্রুবাহিনী তাঁকে আক্রমণ করার জন্যে অগ্রসর হয়ে আসছে।

তাঁতিয়া তখন তাঁর বাহিনীকে দুইভাগে ভাগ করলেন। একটা নিয়ে তিনি নিজে চান্দেরি দখল করার জন্যে অগ্রসর হলেন; আর একটা অংশ রাওসাহেবের অধীনে বেতোয়া নদী পার হয়ে তালবেহুত ঝান্সির দিকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। চান্দেরি তখন গোয়ালিয়ারের মহারাজার সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত। তাদের সেনাধ্যক্ষ তাঁতিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁতিয়াকে আক্রমণ করলেন। তাঁতিয়া তখন ২০ মাইল দূরে বান্দার নবাবকে সঙ্গে নিয়ে বেতোয়ার ধারে মাংগ্রোলি চলে গেলেন।

১০ই অকটোবর তাঁতিয়াকে সেখানে মিচেল আক্রমণ করলেন এবং অন্যান্য ইংরেজ বাহিনীও তাঁকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে শত্রুর ব্যূহভেদ করে তাঁতিয়া ললিতপুরের দিকে চলে গেলেন।

বেতোয়া নদী পার হয়ে তাঁতিয়া ১৫ মাইল দূরে ললিতপুরে এসে রাও-সাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন। মাংগ্রোলিতে তাঁতিয়াকে তাঁর সব কামানগুলি রেখে আসতে হয়েছিল। রাওসাহেবের সঙ্গে তখনো ৪টি কামান ছিল। কিন্তু ললিতপুরে থাকা সম্ভব হলো না। সেখান থেকে তাঁরা ১৮ই অকটোবর গেলেন সিন্দোয়াতে। এখানেও ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ঘিরে ধরল, আবার তাদের লড়তে হলো। সেখান থেকে বিদ্রোহীরা গেল তালবেহুতে।

এখানে তাঁতিয়ার অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে উঠল। ইংরেজরা চতুর্দিক থেকে পুনরায় তাঁকে ঘেরাও করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ কিছু নেই। এবার সরাসরি নর্মদা পার হবার জন্যে তালবেহুত থেকে যাত্রা শুরু করলেন। নর্মদা সেখান থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূর, স্বভাবতই এটা একটা দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। ইংরেজরা অনেক জায়গায় তাঁকে বাধা দিয়েও তাঁর পথ রোধ করতে পারেনি। ২৮শে অকটোবর তাঁতিয়া যখন নর্মদার নিকটে এসে পৌছেছেন তখন কর্নেল বীচার তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাঁতিয়া তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে ইংরেজদের হঠিয়ে দিলেন এবং হোসাঙ্গাবাদের ৪০ মাইল দূরে তাঁতিয়া তাঁর অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে নর্মদা পার হলেন। ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ ম্যালিসন বলেছেন: "নর্মদা পার হবার ব্যাপারে তাঁতিয়া যে দুর্দমনীয় সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।"

তাঁতিয়ার সঙ্গে যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল তা নিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, শত্রু কর্তৃক সুরক্ষিত গিরিসংকট অতিক্রম করে মহারাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে পৌছানো সম্ভবপর নয়। তাঁতিয়া ও রাওসাহেব মহারাষ্ট্রে পৌছানোর যে স্বপ্ন এতদিন ধরে দেখে আসছিলেন, যার জন্যে এত অক্লান্ত পরিশ্রম, এত অসাধারণ বীরত্ব, ত্যাগ ও অধ্যবসায় দেখিয়ে এসেছেন, তাঁদের সেই স্বপ্ন যে মুহূর্তে বাস্তবে পরিণত হবার উপক্রম হলো, সেই মুহূর্তেই তা আবার শূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

নর্মদা পার হয়ে তাঁতিয়া যেখানে উপস্থিত হলেন সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ চৌমাথা। তার সামনে হায়দ্রাবাদ,ডান দিকে বোম্বে, পুনা ও মহারাষ্ট্র ও বাঁদিকে নাগপুর। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজের গোলাম হলেও তাঁর জনসাধারণ ছিল বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন; কিছুকাল পূর্বে তা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নাগপুরের মারহাটা রাজ্য মাত্র ১৮৫৩ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এবং তার জন্যে নাগপুরের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের অভাব ছিল না। আর মহারাষ্ট্র তো তাঁতিয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়েই ছিল। ইংরেজ শাসকরা এই বিপজ্জনক অবস্থার গুরুত্ব খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল।[২] কিন্তু একটা পথও তাঁতিয়ার নিকট খোলা ছিল না, সর্বত্র ব্রিটিশ প্রহরী সজাগ এবং প্রত্যেকটি পথঘাট তাদের বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত।

তাঁতিয়া নর্মদা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে হোসাঙ্গাবাদ থেকে একটা ইংরেজ বাহিনী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। তাঁতিয়া নাগপুরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ফতেপুর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। সেখান থেকে, নাগপুর শহর হতে ৮৭ মাইল দূরে একটা মালভূমিতে অবস্থিত মুলতালিতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে নাগপুর থেকে

২. "The nephew of the man recognised by the Marhattas as the heir of the last reigning Peshawa was the Marhatta soil with an army···The Nizam was loyal. But the times were peculiar···Instances had occured before, as in the case of Scindia, of a people revolting against their sovereign when that sovereign acted in the teeth of the national feeling. It was impossible not to fear lest the army of Tantia should rouse to arms the entire Marhatta population and that the spectacle of a people in arms against the foreigner might act with irresistible force on the people of the Deccan." (Malleson, vol. V, pp. 239-40)

একটা ইংরেজ বাহিনী এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু তাঁতিয়ার সঙ্গে তখন একটা কামান নেই যে লড়াই করে তিনি তাঁর পথ মুক্ত করে নেবেন। সেই স্থান ত্যাগ করে তাঁতিয়া পশ্চিমে মালঘাটের দিকে রওনা হলেন। মালঘাটের পাহাড়গুলি অতিক্রম করতে পারলেই মহারাষ্ট্র, কিন্তু সেখানেও ইংরেজদের সতর্ক পাহারা।

১৯শে নভেম্বর তাঁতিয়া বোম্বে-আগ্রা ও গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের ২০ মাইল দূরে কুরগাঁওতে এসে পৌছলেন। সেখান থেকে খান্দেশ মাত্র ৩০ মাইল দূরে, কিন্তু সেপথ বন্ধ। কুরগাঁওতে বিশ্রাম করে তাঁতিয়া তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন। এই সময়ে ইন্দোর থেকে মহারাজার কিছু সিপাহি বিদ্রোহ করে দুটি কামান নিয়ে তাঁতিয়ার সঙ্গে যোগ দিল।

মিচেল ও পার্ক ৭ই নভেম্বর হোসাঙ্গাবাদে এসে পৌছলেন। তাঁরা ১০ দিন ধরে এদিকে-ওদিকে তাঁতিয়ার খোঁজ করলেন, কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেন না। তাঁরা আবার হোসাঙ্গাবাদে মিলিত হলেন ও খবর পেলেন যে তাঁতিয়া হারভাতে চলে গিয়েছেন। তাঁরা ছুটলেন সেদিকে, অথচ তাঁতিয়া ৭ দিন পূর্বে হারভা ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। এইসব ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, জনসাধারণ যখন তাঁতিয়াকে শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক খবর দিয়ে ও আরো অনেক উপায়ে সাহায্য করছিল, তখন তারা ইংরেজদের ভুল খবরাখবর দিয়ে ভুলপথে চালাবার চেষ্টা করছিল। জনসাধারণের এরকম সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার ফলেই তাঁতিয়ার পক্ষে দীর্ঘকাল ব্যাপী এত বড় একটা ব্যাপক এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ চালনা করা সম্ভব হয়েছিল।

মেজর সাদারল্যাণ্ড উটের একটা বড় বাহিনী নিয়ে নর্মদার উত্তরে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁতিয়া যে নর্মদা পার হয়ে দক্ষিণে অবস্থান করছেন, এ খবর পেয়ে সাদারল্যাণ্ড ৭ই নভেম্বর তাঁর উটের বাহিনী নিয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড যেখান দিয়ে গিয়েছে, সেখানে নর্মদা পার হয়ে থান নামক একটি স্থানে শিবির ফেললেন—যাতে তাঁতিয়া যেন খান্দেশের দিকে অগ্রসর হতে না পারেন, অথবা পুনরায় নর্মদা পার হয়ে উত্তরে মধ্যভারতে প্রবেশ করতে না পারেন।

২৫শে নভেম্বর শত্রুর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে তাঁতিয়া একদল সৈন্যকে সিন্ধভা ঘাটের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। সাদারল্যাণ্ড ছুটে গেলেন সেদিকে তাঁর উটের বাহিনী নিয়ে এবং রাজপুরে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে সেই রাত্রেই উল্টো দিকে যাত্রা করে তাঁতিয়া থান পার হয়ে গেলেন ও একটা জায়গায় সাদারল্যাণ্ডের বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের সামরিক সাজসরঞ্জাম লুঠ করে নিলেন।

তাঁতিয়ার অবস্থানের সঠিক খবর পেয়ে যখন সাদারল্যাণ্ড ২৬শে নভেম্বর প্রত্যুষে তাঁকে ধরবার জন্যে ছুটে গেলেন, তখন তিনি হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার

করলেন যে, তাঁতিয়া রাতের অন্ধকারে ৩৮ মাইল বনজঙ্গল অতিক্রম করে এক স্থানে নর্মদা পার হয়ে বরোদা থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে ছোট উদয়পুরে শিবির ফেলে বিশ্রাম করছেন। এরকম একটা অভাবনীয় কাণ্ড যে সম্ভব হতে পারে, ইংরেজরা তা ভাবতেও পারেনি।

ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ বলেছেন: "অন্যান্য স্থান থেকে বরোদাকে রক্ষা করার জন্যে অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য আসার পূর্বেই যদি বরোদার ওপর একটা অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাত হানা হতো, তাহলে হয়তো সমস্ত অভিযানটারই গতি বদলে যেতে পারত।"৩

কিন্তু এইখানেই বোধ হয় তাঁতিয়া একটা বড় ভুল করে ফেললেন। সত্য বটে, তাঁর বাহিনীর বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এইরকম একটা সংকট মুহূর্তে যখন প্রতিটি ঘণ্টা সম্ভাবনাপূর্ণ, তখন ৫ দিন ধরে বিশ্রাম করাটা অত্যধিক বলেই গণ্য হতে পারে। যাই হোক, এই কয়টা দিনের মধ্যে ইংরেজরা ভালোভাবেই তৈরি হবার সুযোগ পেল। ৩০শে নভেম্বর তারা দু'দিক থেকে তাঁতিয়াকে ছোটনাগপুরে আক্রমণ করল। তাঁতিয়া এর জন্যে তখন মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বাহিনী প্রচণ্ডভাবে প্রতি-আক্রমণ করল। উভয় পক্ষেই প্রচুর হতাহত হলো। এইভাবে কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধের পর তাঁতিয়া তাঁর বাহিনীর প্রধান অংশ নিয়ে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পাহাড়-পর্বতের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁতিয়ার বরোদার যাবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো; তাঁকে ধ্বংস করার ইংরেজদের অভিপ্রায়ও তিনি ব্যর্থ করে দিলেন। এই যুদ্ধের পরই বান্দার নবাব রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন।

১লা ডিসেম্বর তাঁতিয়া মাই নদীর তীরে লোনাওয়ারাতে পৌছলেন; ভেবেছিলেন এখানে নদী পার হয়ে গুজরাটের দিকে যাবেন, কিন্তু তিনি জানতে পারলেন সেপথ দিয়ে রবার্টস্ তাঁর দিকে আসছেন; আর একটা পথ দিয়ে পার্কও আসছেন। তাঁতিয়া তখন উত্তর-পশ্চিম দিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬০ মাইল অতিক্রম করে রাজপুত রাজ্য বাঁসওয়ারাতে এসে পৌছলেন। এখানে তিনি রাজার প্রাসাদ ও ধনী মহাজনদের লুঠ করে কিছু অর্থ, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘোড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন। সেখান থেকে উদয়পুরের দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু সেদিকেও শত্রু, তাই ভীলদের দেশ ভীলওয়ারাতে চলে গেলেন এবং ২৪শে ডিসেম্বর প্রতাপগড়ে এসে পৌছলেন।

প্রতাপগড়ের নিকট ইংরেজ বাহিনীর নিকট তাঁতিয়াকে লড়তে হলো, তার পরেই পুনরায় জিরাপুরে, আবার চাপরা বরসাদে। সেখান থেকে তিনি চলে

৩. Forrest: vol. III, p. 603

গেলেন কোটা রাজ্যের নাহারগড়ে। এইখানেই নারোয়ারের রাজপুত রাজা মানসিংহ তাঁতিয়ার সঙ্গে এসে যোগ দেন। সেখান থেকে ১৩ই জানুয়ারি ১৮৫৯, তাঁতিয়া গেলেন ইন্দ্রগড়ে, সেখানে ফিরোজ শাহ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ফিরোজ শাহ দিল্লির মোগল বংশের একজন শাহজাদা। বিদ্রোহের সময় মোগলদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সামরিক দক্ষতা, কৌশল ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। দিল্লির বিদ্রোহের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে দিল্লি অথবা ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। বিদ্রোহ যখন শুরু হয় তখন তিনি সবেমাত্র পারস্য থেকে ভারতে ফিরেছেন এবং বোম্বে থেকে মালোয়াতে পৌঁছেছেন। ১৮৫৭ সনের জুলাই মাসে সেখানে তিনি বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং ইন্দোর থেকে ১২০ মাইল দূরে মুণ্ডেশ্বর দখল করলেন। এই সময়ে ধর রাজ্যে যে বিদ্রোহ হয় তার সঙ্গে ফিরোজ যোগাযোগ স্থাপন করেন। উত্তরদিকে যখন তিনি একটা বিদ্রোহী-বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন, তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে অনেক স্থানে লড়তে হয়েছিল। তার মধ্যে উজ্জয়িনীর ১০ মাইল দূরে মেহিদপুর ও গোরারিয়ার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফিরোজ রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৮ সনে ৬ই ডিসেম্বর এটোয়া জেলার হরচাঁদপুরে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। তাঁর বাহিনীতে তখন ১ হাজার সৈন্য ছিল এবং তার মধ্যে বেশ কয়েকজন শিখও ছিল। এই যুদ্ধে ফিরোজের হাতে ইংরেজরা পরাজিত হয়েছিল; ইংরেজদের কম্যাণ্ডার ডয়েল নিহত হয়েছিলেন এবং এটোয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হিউম খুব সামান্যের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন (এই হিউমই পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে একজন প্রধান উদ্যোক্তা হয়েছিলেন)। এটোয়া থেকে ইন্দ্রগড় পৌঁছতে ফিরোজ শাহকে অনেক নদ-নদী পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং শত্রুর সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি যখন তাঁতিয়ার সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তাঁদের উভয়ের মিলিত সৈন্য সংখ্যা হয়েছিল ১,৫০০।

জয়পুর ও ভরতপুরের মাঝে দেওসা নামক স্থানে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স তাঁদের ১৪ই জানুয়ারি আক্রমণ করে ঘেরাও করে ফেললেন। বিদ্রোহীদের এই সময়কার দুরবস্থা সম্বন্ধে কর্নেল সমারসেট তাঁর ১লা জানুয়ারির রিপোর্টে লিখেছিলেন: "সব সময় বিদ্রোহীদের পেছনে লেগে থাকার ফলে ও অনবরত যুদ্ধের জন্যে তাদের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল। বাস্তবিকই, এটা খুবই আশ্চর্য যে, নেতাদের ঘোড়াগুলির এখনো দাঁড়াবার জন্যে পাগুলো আছে, কিংবা তাদের আরোহীদের জিনের উপর বসে থাকার শারীরিক সামর্থ্য এখনো আছে। ...অনেক ভালো ভালো যুদ্ধের ঘোড়া রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া

গিয়েছে; তাদের পিঠ পোকায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে, আর তাদের খুরগুলি একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছে।"[৪]

খুব অল্প শক্তি নিয়েই তাঁতিয়া ও ফিরোজ শাহকে শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হলো। তাদের ৩০০ জন নিহত হলো। কিন্তু এবারও তাঁতিয়া, রাওসাহেব ও ফিরোজ শাহ শত্রুকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হলেন। আবার ৭ দিন পরে আর একটা নতুন ইংরেজ-বাহিনী জয়পুর থেকে ৬৪ মাইল দূরে শিকার নামক একটা স্থানে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল। এবারও ইংরেজরা বিদ্রোহী নেতাদের ধরতে পারল না। এই সময়ে তাঁতিয়া মানসিংহের সঙ্গে দেখা করার জন্যে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর, রাওসাহেব ও ফিরোজ শাহ মার্চ মাসে সেরঞ্জ-এর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। ৬টা ইংরেজ-বাহিনী চতুর্দিক থেকে ৪০ মাইল পরিধির সেরঞ্জ-এর জঙ্গল ঘেরাও করে অগ্রসর হতে লাগল। বিদ্রোহীদের সঙ্গে কতকগুলি যুদ্ধও হলো; দু'পক্ষেই অনেক লোক নিহত হলো। কিন্তু এবারও বিদ্রোহী নেতাদের ইংরেজরা ধরতে পারল না। সেরঞ্জ-এর যুদ্ধের পর রাওসাহেব ও ফিরোজ শাহ আবার পৃথক হলেন। ছদ্মবেশে রাওসাহেব চলে যান উজ্জয়িনী, সেখান থেকে উদয়পুর। সেখান থেকে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি হয়ে জম্মুতে চেনানি নামক স্থানে বাস করতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি ইংরেজের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং ২০শে আগস্ট ১৮৬২ তাঁর ফাঁসি হয়। ফিরোজ শাহ কান্দাহার, কাবুল, তেহেরান ও ইস্তাম্বুল হয়ে মক্কায় পৌছান এবং ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৭ তারিখে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁতিয়া দু'জন সঙ্গী নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মানসিং-এর সঙ্গে পেরনের জঙ্গলে। এই সময়ে মানসিংহ একদিন তাঁতিয়াকে বললেন, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করা আর সম্ভব হচ্ছে না; তিনি ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন। মানসিংহ যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তাঁতিয়া তা বুঝতে পারেন নি। তখনো তিনি আগামী দিনের অভিযানের পরিকল্পনা করছেন।[৫]

২রা এপ্রিল ১৮৫৯ তারিখে মানসিংহ ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। "পাঁচদিন পর মানসিংহ তাঁর মহান জাতির আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাঁর অতিথি তাঁতিয়া টোপিকে ধরিয়ে দিতে রাজী হলেন। ৭ই এপ্রিল একজন বুদ্ধিমান নেটিভ অফিসারের নেতৃত্বে বোম্বাই নেটিভ পদাতিক বাহিনীর একদল সিপাহিকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে রাত ২টা পর্যন্ত তারা

৪. Forrest : *History of the Indian Mutiny*, p. 612

৫. যে কর্নেল মীডের নিকট তাঁতিয়ার বিচার হয়েছিল তিনিই বলেছিলেন: "It appears that he (Tantia) had already started to join the

লুকিয়ে রইল। তারপর তাঁতিয়া যেখানে দু'জন লোকের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলেন, মানসিংহ তাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। মানসিংহ গিয়েই তাঁতিয়ার অস্ত্র ধরে ফেললেন, আর সকলে তাঁকে বন্দী করল। সূর্যোদয়ের সময় তারা বন্দীকে ক্যাপ্টেন মীডের ক্যাম্পে নিয়ে এলো।"[৬] সিপ্রিতে ১৫ই এপ্রিল সামরিক আদালতে তাঁতিয়ার বিচার হয়; ১৮ই এপ্রিল ১৮৫৯ তারিখে "জঘন্য অপরাধের" (heinous crime) জন্যে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁতিয়ার মৃত্যুতে ভারতীয় মহাবিদ্রোহেরও যবনিকা-পতন হলো।

রাজদ্রোহ ও ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্তে তাঁতিয়াকে বিচার করার অধিকার ইংরেজের একেবারেই ছিল না। তাঁতিয়া ব্রিটিশ সরকারের প্রজা ছিলেন না। বাজিরাও-এর স্বাধীন রাজ্যে তিনি জন্মেছিলেন। সেই রাজ্য ইংরেজরা অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছিল, সুতরাং ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে আইনসংগত ভাবে বা নৈতিকভাবে তাঁতিয়া বাধ্য ছিলেন না।

বিচারের পূর্বে তাঁতিয়া হিন্দিতে লিখিত একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন: "আমি যা কিছু করেছি, তা আমি আমার প্রভুর হুকুমে করেছি। কাল্পি পর্যন্ত আমি নানা সাহেবের হুকুমে চলেছি, কাল্পির পর থেকে রাওসাহেবের। ন্যায়সংগত যুদ্ধ বা লড়াই ছাড়া আমি বা নানাসাহেব কোনো ইয়োরোপীয় স্ত্রী, পুরুষ, শিশু কাউকেই হত্যা করি নি। এই বিচারে আমি আর কোনো অংশ গ্রহণ করতে চাই না।"[৭]

---

rebels near Serong and that he had been in full communication with the Contingent troops, 1000 strong, at Sheopur, whom he endeavoured to induce to join him. He stated after his capture, that he was quite set up by his rest he had enjoyed and that he intended recommencing his movements about the country." (T. H. Thornton : *General Sir Richard Meade*, p. 74)

৬. Forrest : pp. 621-22

৭. সাভারকর, পৃ. ৫৩৮। বিচারের সময় তাঁতিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থন করবেন কিনা। তাতে তিনি তাঁর শৃংখলিত হাত তুলে জবাব দিয়েছিলেন: "আমি বেশ ভালো করেই জানি যে আমি যেভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছি তাতে আমাকে মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে হবে। আমি এই বিচারালয় স্বীকার করি না, আমি এই বিচারে কোনো অংশ গ্রহণও করতে চাই না।" — (ঐ)। তাঁতিয়া নাকি স্বেচ্ছায় আরো একটি দীর্ঘ বিবৃতি

মহাবিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপি, কুমার সিং ও ফিরোজ শাহই সবচেয়ে বেশি সামরিক উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন, যদিও বিদ্রোহের পূর্বে তাঁদের কারো কোনোরকম সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়তে হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পেশাদার সামরিক অফিসার; তাঁদের সকলেরই পেছনে ছিল ২০-৩০-৪০ বছরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তাঁরা প্রায় সকলেই ক্রাইমিয়া ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন; কমাণ্ডার-ইন-চিফ লর্ড ক্লাইভ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন নেপোলিয়ানের সময়ে—তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলিতে যোগদান করে। তাছাড়া তাঁদের পেছনে ছিল ভারত সরকারের, ইংল্যাণ্ডের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থবল, লোকবল ও যুদ্ধের অন্যান্য সকল রকমের সাজসরঞ্জাম এবং তখনকার দিনের সর্বাধুনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র। তা সত্ত্বেও এইসব অনভিজ্ঞ বিদ্রোহী নেতারা যে এতদিন ধরে এইরকম দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে এত কৃতিত্বের সঙ্গে লড়তে পেরেছিলেন, তা প্রত্যেক ভারতবাসীরই গর্বের বিষয়।

তাঁতিয়ার যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে ফরেস্ট বলেছেন: "সিপাহি বিদ্রোহের সময় যেসব নেতারা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সাংগঠনিক কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ও নতুন প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাঁর তৎপরতা ও সিদ্ধান্তের অভাব ছিল এবং রণক্ষেত্রে তাঁর জাতি মারাঠা-সুলভ সাহস তিনি দেখাতে পারে নি। বেতোয়ার যুদ্ধে তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন; স্যার ইউ. রোজকে সেরকম প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর প্রথমেই তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। স্যার রবার্ট নেপিয়ারের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবার পর ১০ মাস ধরে কতকগুলি বিস্ময়কর যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব সেনানায়করা লড়েছিলেন তাঁরাই তাঁর কৃতিত্বের প্রধান সাক্ষী। তিনি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন জায়গা দখল করেছিলেন, শহর দখল করেছিলেন, নতুন কামান, সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর বাহিনীকে সর্বদাই গতিশীল করে রেখেছিলেন।...একটা বন্য দেশের মধ্য দিয়ে হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে তিনি নর্মদার দিকে ছুটে গেলেন ও সেই নদী পার হলেন। এটা তাঁর একটা খুবই দুঃসাহসিক ও কৃতিত্বপূর্ণ কৌশল হয়েছিল। একটা ভীষণ খরস্রোতা নদী তাঁর অনুসরণকারীদের সামনে রেখে তিনি একটা নতুন যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর মহান লক্ষ্যের (মহারাষ্ট্রের) দিকে যাওয়াই ছিল

দিয়েছিলেন। ম্যালিসন সেটি উদ্ধৃত করেছেন (vol. III, p. 514)। কিন্তু এই বিবৃতিটি প্রামাণিক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা।"[৮]

অনেক ইংরেজ লেখকও তাঁতিয়ার গেরিলাযুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। তাঁরা তাঁতিয়াকে দুনিয়ার গেরিলা-যোদ্ধাদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেন এবং তাঁরা একথাও বলেছেন যে, তাঁতিয়ার মতো সে সময়ে আরো দু-একজন থাকলে ভারত-সাম্রাজ্য থেকে ইংরেজদের বঞ্চিত হতে হতো।[৯]

৮. Forrest : *Ibid*, vol. XIII–XIV. লণ্ডনের *Times* পত্রিকা লিখেছিল : (১৭ই জানুয়ারি, ১৮৫৯) : "Our very remarkable friend, Tantia Tope, is too troublesome and clever an enemy to be admired. Since last June he has kept Central India in a fervour. He has sacked stations, plundered treasuries, emptied arsenals; collected armies, lost them; fought battles, lost them; then, his motions were like forked lightning, and for weeks he has marched 30 and 40 miles a day. He has crossed the Narbada to and fro; he has marched between our columns, behind them and before them. Ariel was not more subtle, aided by the best stage mechanism. Up mountains, over rivers, through ravines and valley, amid swamps, on he goes, backwards and forwards, and sideways and zig-zag ways, now falling upon a post-cart and carrying the Bombay mails, now looting a village, yet evasive as Proteus."

৯. P. C. Standing : Tantya "was by far the brightest brain produced on the native side by the Mutiny of 1857-58. A few more like him and India had inevitably been wrested from the English." (*Guerilla Leaders of the World*). "There were Divisions, Brigades, Regiments, Detachments of troops, commanded by officers of all ranks, the heavier the force the slower the pace, and therefore the less chance of catching the swift-footed rebel-chief, who carried no tents, no provisions; these he looted as he wanted them for consumption, and when his horses were worn out, left them on the road to die, and replaced them after the same manner, sometimes from our post-stations, and some-times by attacking our long lines

কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশলে (strategy and tacics) তাঁতিয়ার চাইতেও কুমার সিং আরো বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ গেরিলা-যোদ্ধা শিবাজীর রণকৌশল কুমার সিং-ই সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কুমার সিং-এর যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল অপূর্ব—তাঁর আত্মরক্ষার দিকটাও ছিল যেমন কৃতিত্বপূর্ণ, তেমনই তাঁর আক্রমণগুলিও ছিল অসাধারণ দুঃসাহসিক। সুযোগ ও প্রয়োজন মতো তিনি যেমন বারবার শত্রুকে আঘাতও করেছেন, তেমনই আবার তাদের এড়িয়েও চলেছেন। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে একমাত্র কুমার সিং-ই গেরিলাযুদ্ধের এই প্রধান দুটি রীতিকে তাঁর অভিযানে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। সুযোগমতো কুমার সিং নিজে উদ্যোগী হয়ে শত্রুকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন এবং তাদের পরাজিতও করেছেন, কিন্তু তাঁতিয়া সুযোগ পেয়েও (গেরিলাযুদ্ধের পন্থা অবলম্বন করার পর) শত্রুকে নিজের উদ্যোগে আক্রমণ করেন নি ; শত্রু যখন তাঁকে আক্রমণ করেছে, কেবলমাত্র তখনই তিনি বাধ্য হয়ে প্রতি-আক্রমণ করেছেন।[১০]

তাঁতিয়া (এবং ফিরোজ শাহ) অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। গোয়ালিয়ারের পরাজয়ের পর প্রায় এক বছর ধরে তাঁতিয়া যেরকম বিরামহীনভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে খুবই বিরল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বারবার বড় বড় শহর ও দুর্গ দখল করেছেন, বারবার কামান, লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছেন, আবার তা সংগ্রহ করেছেন ; পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদ-নদী, বন-জঙ্গল অতিক্রম করেছেন এবং অনেক সময় দৈনিক ৬০ মাইল একনাগাড়ে অশ্বারোহণে চলেছেন। বারবার ইংরেজ-বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে ফেলেছে, বারবার তিনি শত্রুব্যূহ ভেদ করে ইংরেজের চেষ্টা

of baggage... they had the best of information, and never trusted themselves in the open country, when any force was near. We had the very worst of information, in the territories of professedly friendly Rajahs. The sympathy of the people was on their side : they appeared to have no difficulty in obtaining supplies, while our columns were sometimes much strained for grain." (Sylvester : *Recollections of the Campaign in Malwa and Central India*, pp. 196-98)

১০. "The qualities he had displayed would have been admirable, had he combined with them the capacity of the General and the daring of the aggressive soldier". (Malleson, vol. III, p. 382)

ব্যর্থ করে দিয়েছেন। শক্তিশালী অগণিত শত্রুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি নর্মদা পার হয়েছেন। কিন্তু গেরিলা নেতার আর একটি কর্তব্যে তিনি নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি ;—অনেকবার সুযোগ পেয়েও তিনি শত্রুকে আঘাত করার চেষ্টা করেন নি।

যুদ্ধের সময় সর্বদা যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া, পিছু-হঠা, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পলায়ন করা—এসবের ফলে যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃংখলা ঘটায়, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয় ও পরাজয়ের মনোভাব এনে দেয়। দক্ষতার সঙ্গে পিছু-হঠা এক কথা, আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে পলায়ন করা অন্য কথা। গেরিলা যুদ্ধে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া অথবা পিছু-হঠার কৌশলের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত রয়েছে শত্রুকে অকস্মাৎ চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করার নীতি। এইরকম আক্রমণই শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চার করে, তার মনোবল ভেঙ্গে দেয়, এবং পক্ষান্তরে গেরিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে ও তাদের নৈতিক বল বাড়িয়ে দেয়। গেরিলা যুদ্ধের একটা প্রধান নীতি হলো—শত্রুর সুবিধামতো তার নির্বাচিত ক্ষেত্রে লড়াই এড়িয়ে যাওয়া, এবং স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রে শত্রুকে টেনে আনা ও সেখানে তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা। এই নীতি অনুসরণ করেই কুমার সিং তাঁর বাহিনীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর পিছু-হঠা পরিস্থিতির ওপর ক্ষমতা বজায় রেখেই হতো, কখনো তা আতঙ্কগ্রস্ত পলায়ন হতো না ; প্রয়োজন হলে পিছু-হঠার সময় অনুসরণকারী শত্রুকে তিনি আঘাতও করতেন। তাঁতিয়া তাঁর সৈন্যদের এইভাবে শিক্ষা দিতে পারেন নি—অনেকবার তাদের আতঙ্ক ও বিশৃংখলার জন্যে তাঁকে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে হয়েছে। এই পলাতক, পরাজিত ও ভগ্নোদ্যম গেরিলাদের নিয়েই তাঁকে পুনরায় লড়াই শুরু করতে হয়েছে।

তাঁতিয়ার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল, নর্মদা অতিক্রম করে মহারাষ্ট্রের দ্বার-দেশে পৌছাবার পর আবার সেখান থেকে মধ্যপ্রদেশে প্রত্যাবর্তন করা। সেই সময়কার পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করাই ছিল তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট আশা। পূর্বে তাঁতিয়া অনেকবার সেরকম অসাধ্য সাধন করেছেন। এবারও যদি সেইভাবে মরীয়া হয়ে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করার চেষ্টা করতেন, তাহলে তাঁর স্বপ্নকে সফল করার জন্যে একটা নতুন পথ উন্মুক্ত হয়ে যেত।

মহাবিদ্রোহে গেরিলা যুদ্ধ

বিদ্রোহের প্রথম দিকে দিল্লিকে কেন্দ্র করে যে লড়াই হয়েছিল, তার সমস্ত উদ্যোগ ও নেতৃত্ব ছিল সিপাহি বাহিনীর হাতে। ১৮৫৭ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর দিল্লির পতনের পর যুদ্ধের প্রথম পর্যায় শেষ হলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহে সিপাহি-নেতৃত্বেরও অবসান ঘটল। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব বেসামরিক নেতাদের হাতে চলে গেল এবং সর্বত্র জনসাধারণের ফৌজ গঠিত হলো এবং অবশিষ্ট সিপাহিরা সেইসব ফৌজে যোগ দিল। এই পর্যায় হলো গণযুদ্ধের পর্যায়। এই পর্যায়ে বিদ্রোহীরা লখনৌ, কানপুর, বেরিলি, ঝান্সি ইত্যাদি শহর কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করার জন্যেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। ১৮৫৭ অক্টোবর থেকে ১৮৫৮ এপ্রিল পর্যন্ত সাত মাস ধরে এই যুদ্ধগুলি চলেছিল। মার্চ মাসে লখনৌ এবং এপ্রিল মাসে ঝান্সির পতন ঘটল। তারপর থেকে শুরু হলো মহাবিদ্রোহের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে বিদ্রোহীরা সর্বত্র গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এবং হাজার হাজার কৃষক তাতে যোগ দিল। গণযুদ্ধের এই গেরিলা পর্যায় দেড়-বৎসরের অধিক কাল ধরে ১৮৫৯ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলেছিল।

জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন—"মহাবিদ্রোহ কয়েকজন উৎকৃষ্ট গেরিলা যোদ্ধার জন্ম দিয়েছিল। বাহাদুর শাহের আত্মীয়—ফিরোজ শাহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু সবচেয়ে দীপ্তিমান ছিলেন তাঁতিয়া টোপি।"[১]

গেরিলাযুদ্ধ[২] ভারতে নতুন কিছু নয়। শিবাজী যে গেরিলা যুদ্ধকৌশলে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা তো সকলেরই জানা কথা। উপজাতি এবং গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে শিবাজী তাঁর বাহিনী তৈরি করেছিলেন এবং গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে কয়েক বছরের মধ্যে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মোগল-বাহিনী ও মোগল-সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন।

১৮৫৭ সনে দিল্লি, লখনৌ, কানপুরের পতনের পর বিদ্রোহীরা গেরিলা যুদ্ধের ওপরেই বেশি নির্ভর করেছিলেন। এই যুদ্ধ কেবলমাত্র ভারতবর্ষই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। ইংল্যাণ্ডের শাসকরা এর গতিবিধি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

১ Nehru : *Discovery of India*, p. 384

২. কথাটার উৎপত্তি ফরাসিভাষার guerre (গের) কথা থেকে, অর্থাৎ যুদ্ধ ; আর guerrilla (গেরিলা) হলো যোদ্ধা। সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণের পন্থাকেই গেরিলাযুদ্ধ বলা হয়।

লখনৌ এবং বেরিলি বিদ্রোহীদের হস্তচ্যুত হওয়ার পর খানবাহাদুর খান, ফৈজাবাদের মৌলভি আহমদউল্লা, হজরত বেগম, বেণীমাধো প্রমুখ নেতাদের গেরিলা-যুদ্ধের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। তাঁদের হাতে তখনো রয়েছে ৬০-৭০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ও ৫০টা কামান। তাছাড়া, নতুন করে বহু রাজা ও তালুকদার তাঁদের লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহে যোগ দিচ্ছেন। এক কথায়, লখনৌ হারানো সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা মোটেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি, তাদের উদ্যম তখনো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ইংরেজদের সামরিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা তখনো বিদ্রোহীদের রয়েছে। এবং যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা তখনো চূড়ান্তভাবে নির্ণয় হয়ে যায়নি।

মার্চ মাসে ইংরেজরা লখনৌ দখল করল। তখন গ্রীষ্মকাল, তার পরেই সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বর্ষাকাল। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে এই সময়টাতে ইংরেজ-বাহিনীর পক্ষে ব্যাপকভাবে সামরিক অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না। এই সময়টা ছিল নিজেদের সুসংগঠিত করার জন্যে বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা সুবর্ণ সুযোগ। বিদ্রোহীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠন করা কিন্তু এ বিষয়ে তারা কোনো চেষ্টা করেছিল বলে কোনো প্রমাণ নেই। তারা যে যেদিকে পারল তাদের বাহিনী নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারা পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকল এবং বিচ্ছিন্ন ভাবেই ১৫ মাস যাবত যুদ্ধ করে গেল, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করল না।

১৮৫৮ সনের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার মাঝখানে দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত একটা কোমরবন্ধের মতো কিছু এলাকা, বিশেষ করে শহরগুলি ইংরেজের অধীনে ; তার উত্তরে ও দক্ষিণে সমস্ত অঞ্চল-গুলিই ছিল বিদ্রোহীদের অধীনে—উত্তরে ছিলেন অযোধ্যার বেগম, মম্মুখান, ফিরোজশাহ, হরদৎ সিং প্রমুখ ; আর দক্ষিণে বেণীমাধো, হনুমন্ত সিং, হরিচাঁদ ও অন্যান্যরা ; এছাড়া, উত্তর-পূর্ব কোণে নেপালের সীমান্তে ছিলেন নানা-সাহেব ও তাঁর অনুগামীরা।

বেরিলি হস্তচ্যুত হবার পর খানবাহাদুর খান আরো অনেকদিন ধরে গেরিলা কায়দায় লড়েছিলেন। তিনি এই সময়ে যে ঘোষণাপত্রটি প্রচার করে-ছিলেন তা মহাবিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তিনি বলেছিলেন : "শত্রু বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে চলবে, কারণ তাদের বাহিনীগুলি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং তাদের শৃংখলাও অনেক বেশি। তাছাড়া তাদের অনেক কামান আছে। কিন্তু তাদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখবে। নদীর সব ঘাটগুলিতে ভালো করে পাহারা দেবে, তাদের যানবাহন ধ্বংস করবে, তাদের সাজসরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নেবে। তাদের পিকেট ও ডাকগাড়ি বিচ্ছিন্ন

করে দেবে, তাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকবে ; আর তাদের এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

মোগল-বাদশাহ পরিবারের বংশধর ফিরোজ শাহ, বিদ্রোহ যখন শুরু হয় তখন তিনি ছিলেন মক্কায়। তাঁর ভারতে ফিরে আসার পূর্বেই দিল্লি বিদ্রোহীদের হস্তচ্যুত হয়েছে। ফিরোজ শাহ বেরিলির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পুনরায় মধ্যভারতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁতিয়া টোপির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই দীর্ঘ সময় ধরে একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে তিনি গেরিলা-নীতি অনুসরণ করে অনেকগুলি যুদ্ধ করেছিলেন। বেরিলি থেকে মধ্যভারতে আসার পথে এটোয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালান হিউম ফিরোজকে বাধা দেন ও তাঁকে ধরবার চেষ্টা করেন। হিউমের বাহিনীকে ফিরোজ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন এবং হিউম কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। (এইসব ঘটনার ২৫ বছর পর যখন ইংরেজ শাসকরা আবার একটা বিদ্রোহের বিভীষিকা দেখতে শুরু করেছিল, তখন এই হিউমই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ভারতের ক্রমবর্ধমান জাতীয় বিক্ষোভকে একটা নিরাপদ খাতে পরিচালিত করার জন্যে জাতীয় কংগ্রেস পত্তন করেছিলেন।)

অকটোবর মাসের প্রথমদিকে বর্ষাকাল শেষ না-হতেই ফিরোজ ইংরেজ-বাহিনীকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিলেন। হীরাচাঁদ ৬ হাজার সৈন্য ও ৮টা কামান নিয়ে গোমতী অতিক্রম করলেন। অনেক তালুকদার আরো ৬ হাজার সৈন্য ও ৪টা কামান নিয়ে হীরাচাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি সান্দেলা শহরের নিকট ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। কয়েকবার আক্রমণ করেও হীরাচাঁদ ইংরেজ-বাহিনী ধ্বংস করতে পারলেন না। উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হলো।

ইংরেজ-বাহিনীরও অকটোবর মাস থেকে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। অযোধ্যার রাজাদের যেসব শক্তিশালী দুর্গ ছিল, সেগুলি একে একে ইংরেজরা দখল করতে লাগল। প্রথমেই আক্রান্ত হলেন খানপুরিয়া রাজপুতদের শক্তিশালী রাজা রামগোলাম সিং। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর রামপুর কাশিয়াতে তাঁর শক্তিশালী দুর্গ ইংরেজরা দখল করে নিল। তারপর ১০ই নভেম্বরে আমেথির রাজা লালমাধো সিং-এর দুর্গও শত্রুরা দখল করল। যুদ্ধ চলাকালীন গভীর রাত্রে লালমাধো সিং পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বিদ্রোহী রাজা ও তালুকদাররা যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন তাহলে তাঁদের জীবন ও ধনসম্পত্তির কোনো ক্ষতি হবে না, এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁদের মধ্যে অনেকে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করতে থাকেন।

২৮শে নভেম্বর রাজা বেণীমাধোর ৮ মাইল পরিধি ব্যাপী শংকরপুরের বিশাল শক্তিশালী দুর্গ ইংরেজরা আক্রমণ করল। ইংরেজদের শক্তিশালী কামানের

গোলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। বেণীমাধো ১৫ হাজার সৈন্য ও কয়েকটি কামান নিয়ে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনটি ইংরেজ বাহিনী সর্বক্ষণের জন্যে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। ১৮৫৮ সনের ২৮ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও বেণীমাধোকে ইংরেজরা ধরতে পারেনি। গেরিলা কায়দা অবলম্বন করে শত্রুর চেষ্টাকে তিনি বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।[৩]

বাঙ্কির যুদ্ধে পরাজয়ের পর বেণীমাধো নেপাল রাজ্যের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে ইংরেজদের 'বিশ্বস্ত কুকুর' জঙ্গবাহাদুর বেণীমাধোকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। "বেণীমাধো আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। ডাং উপত্যকায় গুর্খা সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয়। তাতে অনেক সৈন্যসহ তাঁর মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে তাঁর ভাই যোগরাজ সিং-এরও মৃত্যু হয়।"[৪]

গেরিলা কায়দায় আরো যারা শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোলাম হোসেন, যিনি জৌনপুরে ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করেছিলেন; মহম্মদ হোসেন আমরোহা ও হারিয়াতে শত্রুদের কয়েকবার আক্রমণ করেন, এবং নিজাম আলি খান ও আলিখান সেওয়াতি পিলভিত আক্রমণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৮৫৮ সনের ১৭ই জুন গোয়ালিয়ারের যুদ্ধে ঝান্সির রানীর মৃত্যুর পর তাঁতিয়া টোপি ৯ মাস ব্যাপী মধ্যভারতে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮ই এপ্রিল ১৮৫৯—যেদিন তাঁতিয়ার ফাঁসি হয়—সেইদিন মধ্যভারতের গেরিলা যুদ্ধের গৌরবময় অধ্যায়টি শেষ হয়।

ফেব্রুয়ারি মাসে নেপালের যুদ্ধে বেণীমাধোর মৃত্যুর পর অমর সিং আরো কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। "দুর্দমনীয় কর্মোদ্যম নিয়ে যুদ্ধকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অমর সিং এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাচ্ছিলেন। নানাসাহেব নেপালে চলে যাবার পর তেরাইতে অমর সিং নানার সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গ বাহাদুরের একটা বাহিনী ১৮৫৯ সনের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাঁকে ধরে ফেলে।" গোরখপুর জেলে ৫ই ফেব্রুয়ারি

৩. "They [Beni Madho and his men] made surprise attacks on small units of British troops whenever they found any opportunity, and retreated before strong enemy forces without offering any battle. By means of these skirmishes they ceaselessly harassed the British troops, but always eluded them." (Majumdar : *British Paramountcy*, p. 574)

৪. Sen, p. 368

১৮৬০ তারিখে রক্ত আমাশয় রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।[৫]

লখনৌর পতনের পর ভারতের গণযুদ্ধ যে একটা নতুন চরিত্র গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, মার্কস তা বুঝেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "প্রথমে দিল্লি ও পরে লখনৌ, সিপাহি বিদ্রোহের পর পর এই দুটি সদর ঘাঁটি দখলে ইংরেজদের বিরাট সামরিক যুদ্ধকর্ম সত্ত্বেও ভারতকে শান্ত করার কাজ সম্পূর্ণ করতে এখনো অনেক দেরি আছে। বস্তুতপক্ষে, ব্যাপারটায় আসল মুশকিল সবে শুরু হচ্ছে প্রায় এই কথায় বলা যেতে পারে। বিদ্রোহী সিপাহীরা যতক্ষণ বৃহৎ জনসংখ্যায় একত্র হয়ে থাকছিল, যতক্ষণ প্রশ্নটা ছিল বড়ো আকারে অবরোধ ও সম্মুখ সমর, ততক্ষণ এরূপ যুদ্ধকর্মে ইংরেজ সৈন্যদের বিপুল উৎকর্ষের দরুণ সবকিছু সুবিধা থাকছিল তাদেরই। কিন্তু যুদ্ধ এখন যে নতুন চরিত্র নিচ্ছে তার সঙ্গে এ সুবিধা বহু পরিমাণে খোয়া যাবারই সম্ভাবনা।... ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন দিকে একটা গেরিলা লড়াই যেন ছড়াচ্ছে। সৈন্য টেনে নেওয়া হচ্ছে উত্তরে, তখন বিদ্রোহী সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন সব দল গঙ্গা পার হয়ে ঢুকছে দোয়াবে, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত করছে, এবং তাদের ধ্বংসলীলার ফলে কৃষকরা জমির খাজনা দিতে পারছে না, অথবা অন্তত খাজনা না দেবার একটা অজুহাত মিলছে তাদের।

''এমনকি বেরিলি দখল করলেও এসব জ্বালাতনের প্রতিকার ঘটানো দূরে থাক, তা বোধহয় বেড়ে ওঠারই সম্ভাবনা। এই এলোমেলো যুদ্ধেই সিপাহীদের সুবিধা। লড়াইয়ে ইংরেজরা তাদের যে পরিমাণে হারাতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণেই তারা ইংরেজ সৈন্যদের হারাতে পারে মার্চে। একটা ইংরেজ বাহিনী দিনে কুড়ি মাইল যেতে পারে না; সিপাহী বাহিনী যেতে পারে চল্লিশ, এবং জোর তাগাদা থাকলে এমনকি ষাট মাইল। সিপাহী সৈন্যদের প্রধান মূল্যই হল তাদের গতিবিধির এই দ্রুততা, এবং আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা ও খোরাকির অপেক্ষাকৃত সহজতা মিলে তা তাদের ভারতীয় যুদ্ধ বিগ্রহে অপরিহার্য করে তুলেছে।... নতুন নতুন বিদ্রোহীর উদয় না হলেও রণক্ষেত্রে এখন সশস্ত্র লোকের সংখ্যা দেড় লক্ষের কম নয়, আর অস্ত্রহীন অধিবাসীরা ইংরাজদের কোনো সহায়তাও করে না, সংবাদও দেয় না।"[৬]

এই প্রবন্ধের পাঁচ সপ্তাহ পরে এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন: "ভারতের যুদ্ধ ক্রমশ এলোমেলো গেরিলা যুদ্ধের সেই পর্যায়ে প্রবেশ করছে যা আমরা তার অতি আসন্ন ও বিপজ্জনক পর্যায়ের বিকাশ বলে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। সম্মুখ-

---

৫. *Freedom – Bihar*, pp. 58-59

৬. মার্কস, এঙ্গেলস: প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ: ১৮৫৭-৫৯, পৃ. ১৬৭-৬৯

যুদ্ধে এবং শহর ও ঘাঁটি-গড়া, শিবির রক্ষায় ক্রমাগত পরাজয়ের পর অভ্যুত্থানী সৈন্য ক্রমশ দুই থেকে ছয় কি আট হাজার লোকের ছোটো ছোটো দলে ভেঙে যায়। কাজ করে কিছুটা স্বাধীনভাবে, কিন্তু কোনো বৃটিশ ডিট্যাচমেণ্টকে আলাদাভাবে আচমকা ঘায়েল করার সম্ভাবনা থাকলে একটা স্বল্পকালীন অভিযানে মিলিত হতে তারা সদাই প্রস্তুত।… এইভাবে হিমালয় থেকে বিহার ও বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত এবং গোয়ালিয়র ও দিল্লী থেকে গোরখপুর ও দানাপুর পর্যন্ত এলাকাটা ছেয়ে গেছে সক্রিয় অভ্যুত্থানী দলে, ১২ মাস যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তারা কিছুটা পরিমাণে সংগঠিত এবং কয়েকবার পরাজিত হলেও প্রতি পরাজয়ের অনির্ধারক চরিত্রের দরুণ ও বৃটিশদের স্বল্প সুবিধা লাভের ফলে তারা উৎসাহিত। একথা সত্যি যে, তাদের সমস্ত ঘাঁটি ও যুদ্ধকর্মের কেন্দ্র তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে; তাদের রসদপত্র ও কামানের বেশির ভাগটাই খোয়া গেছে; গুরুত্বপূর্ণ শহর সবই শত্রুর হাতে। কিন্তু অন্যদিকে এই সমগ্র বিপুল এলাকাটায় বৃটিশদের দখলে আছে কেবল শহরগুলো এবং খোলা মাঠের শুধু সেইটুকু যেখানে তার ভ্রাম্যমাণ বাহিনী গিয়ে দাঁড়িয়েছে; পাল্লা ধরার আশা না রেখে তারা তাদের দ্রুতগতি শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য এবং এই হয়রানি যুদ্ধ-পদ্ধতি তাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে বছরের সবচেয়ে মারাত্মক ঋতুটায়।”[৭]

---

৭. ঐ, পৃ. ১৮১-৮৪। এই সময়ে ইংরেজ পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় বাস করতেন। তিনি অযোধ্যার গণযুদ্ধ খুব মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা খুবই প্রণিধান-যোগ্য। "Never has the enemy been met without being routed, scattered and his guns taken. But though constant by beaten, he ever more rallies and appears again, ready for a fresh encounter. No sooner a city taken or relieved than some other one is threatened. No sooner is one district is pronounced safe through the influx of British troops than another is disturbed and convulsed. No sooner is a highway reopened between places of importance than it is again closed and all communication is for a season cut off. No sooner are the mutineers scoured out of one locality than they reappear with double or trebble force in another locality. No sooner does a moveable column force its way through hostile ranks than these reoccupy the territory behind it. All gaps in the number

বিদ্রোহীরা বড় বড় শহরগুলি হারালেও, গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে জয়ের সম্ভাবনা যে তখনো তাদের একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, তা এঙ্গেল্স বুঝতে পারছিলেন। ইংরেজরা কতকগুলি শহর দখল করলেও এবং কতকগুলি যুদ্ধে জিতলেও, তাদের তখনো অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, এবং তাদের চূড়ান্ত বিজয় তখনো সুনিশ্চিত ছিল না। এঙ্গেল্স সে সময় লিখেছিলেন : "দেশজ ভারতীয় তার গ্রীষ্মের মধ্যদিনের গরম সইতে পারে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে, অথচ ইউরোপীয়দের পক্ষে গায়ে রোদ লাগলেই প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু ; এরকম ঋতুতে ৪০ মাইল মার্চ করে যেতে পারে ভারতীয়, অথচ ১০ মাইলেই ভেঙে পড়বে তার উত্তর দেশীয় প্রতিপক্ষ ; তার পক্ষে এমনকি গুমট বর্ষা ও জলা জঙ্গলও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, আর বর্ষাকালে বা জলা এলাকায় ইউরোপীয়দের এতটুকু মেহনতে লাগে আমাশয়, কলেরা, ম্যালেরিয়া।… জেনারেল রোজের সৈন্যবাহিনীতে রৌদ্রে পতিত ও শত্রুর হাতে পতিতদের তুলনামূলক সংখ্যা থেকে—লখনৌ সৈন্যাবাস পীড়িত, ৩৮ নং রেজিমেণ্ট গত শরতে এসেছিল সহস্রাধিক সৈন্যসহ, এখন তাদের সংখ্যা সাড়ে পাঁচশও নয়—এই রিপোর্ট থেকে এবং অন্যান্য লক্ষণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তও টানতে পারি যে, গত বছরের অভিযানের পুরোন রোদ পোড়া ভারত সৈন্যদের জায়গা নিয়েছে যে সদ্যাগত সৈন্য ও ছোকরারা, তাদের মধ্যে এপ্রিল ও মে মাসের গ্রীষ্মতাপ তার যথা কর্তব্য করছে। ক্যাম্পবেলের হাতে যে লোক আছে তাদের নিয়ে হ্যাভলকের মতো জোর মার্চ তিনি করতে পারেন না, এবং বৃটিশ সরকার যদিও ফের জোয়ালো অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাচ্ছে, তা হলেও যে শত্রু সর্বাধিক অনুকূল সর্ত ছাড়া বৃটিশদের সঙ্গে লড়তে চায় না, তার বিরুদ্ধে এই গ্রীষ্ম অভিযানের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেবার পক্ষে সে সৈন্য যথেষ্ট হবে কিনা সন্দেহ আছে।"

এই সঙ্গে এঙ্গেল্স বিদ্রোহীদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটাও তুলে ধরলেন : "অভ্যুত্থানে ভাগ্য নির্ভর করছে তার প্রসারিত হতে পারার উপর। ছড়িয়ে যাওয়া দলগুলি যদি রোহিলখণ্ড পেরিয়ে রাজপুতনা ও মারাঠা রাজ্যে না যেতে

of the foe seem to be instantaneously filled up and no permanent clearance or impression seems to be made anywhere. The passage of our brave little armies through these swarming myriads instead of leaving deep traces of a mighty ploughshare through a roughened field, seems more to resemble that of the eagle through the elastic air or a stately vessel through the unfurrowed ocean". (Duff : *Indian Rebellion*, pp. 223-24)

পারে, আন্দোলন যদি উত্তরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে, সামনের শীতই দলগুলিকে ছত্রভঙ্গ ও তাদের ডাকাতে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে—আর অধিবাসীদের কাছে তারা অচিরেই শাদামুখো আক্রমণকারীদের চেয়েও হয়ে উঠবে বেশি ঘৃণার্হ।"[৮]

লখনৌ পতনের সময় একজন ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন: বিদ্রোহীরা তখনো পর্যন্ত খুবই শক্তিশালী ও দৃঢ়সংকল্প; সমস্ত অযোধ্যাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং তাদের কামানের গোলা যতদূর পৌঁছয় ততটুকুই ইংরেজের অধিকার।[৯]

লখনৌ পতনের পর বারি ইত্যাদি অঞ্চলে আহমদউল্লার নেতৃত্বে যে যুদ্ধগুলি হয়েছিল, তাতে তিনি গেরিলাযুদ্ধের যে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তা তাঁর শত্রুপক্ষকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।[১০] মে মাসে পোভেইনের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুতে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

দিল্লি, লখনৌ, কানপুর, বেরিলি, ঝান্সি ইত্যাদি স্থানে ইংরেজদের নৃশংসতার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে জনসাধারণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরো শক্ত করে তুলল। ফলে গ্রামাঞ্চলেও গণবিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করল। স্বভাবতই এই পরিস্থিতি উত্তর-ভারতে, মধ্যভারতে ও পশ্চিম-বিহারে গেরিলা যুদ্ধের অনুকূলে একটা চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।

কয়েকজন বড় বড় রাজাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আরো অসংখ্য বড়-ছোট-মাঝারি রাজা-তালুকদাররাও তাঁদের কৃষক-বাহিনী নিয়ে গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। সুলতানপুরের মেহ্দি হাসান অযোধ্যার উত্তর ও পূর্বের জেলাগুলিতে শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন। নসরৎপুরের বেণীবাহাদুর সিং এলাহাবাদের চতুর্দিকে বহুদিন ধরে লড়েছিলেন। পৃথ্বীপাল সিং কানপুর ও লখনৌ অঞ্চলে ইংরেজ-বাহিনীকে অনেকবার আক্রমণ করেছিলেন। এলাহাবাদের মৌলভি লিয়াকৎ আলি, আকবরপুরের অমরেশ সিং, বিহারের মাধোপ্রসাদ, উদ্রেস সিং, রাজকুমার

---

৮. ঐ, পৃ. ১৮৪-৮৬

৯. Forbes-Mitchel : *Reminiscences*, p. 195

১০. জেনারেল ক্যাম্পবেল—যিনি নিজে মৌলভির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন—তিনি বলেছিলেন : "That rascally Maulvi !—a very clever fello v though, and shows a great deal of skill." (Forrest : *History*, vol. III, p. 366). Sir Thomas Seaton বলেছেন, মৌলভি ছিলেন—"a man of great abilities, of undaunted courage, of stern determination, and by far the best soldier among the rebels." (Malleson : vol. II, p. 541)

চন্দ্রেশ সিং, ইন্দ্রাজৎ সিং প্রমুখ নেতারা গোগরা নদী পার হয়ে বহুদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। যমুনার দক্ষিণে বারজোর সিং কৃষ্ণ ও কাল্পির মধ্যবর্তী এলাকায় লড়াই করে এইসব অঞ্চল নিজের অধীনে রেখেছিলেন। সাগর প্রদেশের বিদ্রোহী নেতা দালাৎ সিং-এর জালাউন, ঝান্সি, হোসাঙ্গাবাদ ও রাজপুতানার গেরিলা যুদ্ধগুলি প্রসিদ্ধ। প্রত্যেকটা যুদ্ধেই গেরিলারা জনসাধারণের নিকট থেকে সর্বতোভাবে ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন। তা না হলে এতদিন ধরে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্ভব হতো না।[১১]

তাঁতিয়া টোপি, কুমার সিং ও অমর সিং-এর গৌরবোজ্জ্বল গেরিলা যুদ্ধগুলি সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। কুমার সিং-এর মৃত্যুর পর যখন তাঁর ভাই অমর সিং নতুন উদ্যম নিয়ে গেরিলাযুদ্ধের একটা নতুন অধ্যায় শুরু করলেন, তখন বিদ্রোহের প্রায় শেষ অবস্থা। যুদ্ধে অমর সিং-এর এরকম কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে মার্কস আবার আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন এবং মহাবিদ্রোহের ওপর তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৮) :

"বাঁশ ও ঝোপঝাড়ের এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল দখল করে আছে অমর সিং, সক্রিয়তা ও গেরিলা যুদ্ধের জ্ঞান তাঁর মধ্যে যেন দেখা যাচ্ছে বেশী। অন্ততপক্ষে, চুপ করে বৃটিশদের জন্য অপেক্ষা করে না থেকে যেখানে পারছেন সেখানেই তিনি ওদের আক্রমণ করছেন। তাঁর এ ঘাঁটি থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করার আগে যদি অযোধ্যার অভ্যুত্থানীদের একাংশ তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে ইদানীং যা করতে হয়েছে তার চেয়ে কঠিনতর কর্তব্যই আশা করতে হয় বৃটিশদের। এই

১১. "In Bihar, the people constantly and systematically misled the British with false information. In Oudh, the rebels could march without commissariat, for the people would always feed them. They could leave their luggage without guard because the people would not attack it. They were always certain of their position and that of the British, for, the people brought them hourly information. And no design could possibly be kept from them while secret sympathisers stood round every mess-table and waited in almost every tent in the British camp. No surprise could be effected except by a miracle, while rumours communicated from mouth to mouth outstripped even our cavalry." (Ball : *History of the Indian Mutiny*, vol. II, p. 572)

অঞ্চলগুলি আজ প্রায় ৮ মাস যাবৎ অভ্যুত্থানী দলগুলির পক্ষে আশ্রয়ের কাজ করছে, বৃটিশের প্রধান যোগাযোগ পথ, কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটাকে বিপজ্জনক করে তুলতে পেরেছে তারা।"[১২]

গেরিলাযুদ্ধের একটা প্রধান নিয়ম হলো এই যে, গেরিলা-যোদ্ধাদের পেছনে একটা ঘাঁটি-এলাকা (base area) সংগঠন করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই ঘাঁটি এমন হবে যেখানে কোনো শত্রু প্রবেশ করতে পারবে না। (শিবাজী প্রথম থেকেই তাঁর ঘাঁটিকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সাফল্য লাভের এটা ছিল অন্যতম কারণ।) গেরিলাযুদ্ধের মূল কাজ হলো পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝটিকা বেগে শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করা। মেরে পালিয়ে যাও, লুকিয়ে অপেক্ষা করো, আবার মারো ও পালাও; এইভাবে শত্রুকে অতিষ্ঠ করে তোলো, তার মনোবল (morale) ভেঙ্গে দাও, তাকে বিশ্রামের অবকাশ দেবে না। এরই নাম সচল যুদ্ধ (mobile warfare)। এই সচল যুদ্ধকে সঠিকভাবে বিকশিত করা বা না করার ওপরেই নির্ভর করে বিদ্রোহের জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা।

নিশ্চল যুদ্ধের কৌশল অনুসরণ করার অর্থ হলো বিদ্রোহীদের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। বিদ্রোহের প্রথম দিকেই বিদ্রোহীরা দিল্লি, লখনৌ, কানপুর, বেরিলি, ফরাক্কাবাদ, মোরাদাবাদ, ঝান্সি ও আরো অনেক ছোট-বড় শহর দখল করল। কিন্তু শহর দখল করার পর বিদ্রোহীরা নিশ্চল-যুদ্ধনীতি (static warfare) অবলম্বন করে শত্রুদের আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ফলাফল এই হলো যে কয়েক মাসের মধ্যেই বিদ্রোহীরা শহরগুলি হারালো। অথচ এই সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহীরা সচল-যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে এই শহরগুলিকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করতে পারত। গেরিলা-বাহিনী গঠন করে এই শহরগুলি থেকে একশো, দুশো এমনকি ৫০০ মাইল পর্যন্ত যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিতে পারত এবং এইভাবে তাদের ঘাঁটি থেকে বহুদূরেই শত্রুর অগ্রগতিকে রোধ করে দাঁড়াতে পারত। এইভাবে গতিশীল রূপে যুদ্ধকে সংগঠিত করার সুযোগ-সুবিধাগুলি বিদ্রোহীদের ছিল, বিশেষ করে বিদ্রোহের প্রথমদিকে। খুবই দুঃখের বিষয় যে, বিদ্রোহী-নেতারা এইসব সুযোগ-সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। আশ্চর্যের বিষয় যে, ভারতে শিবাজীর মতো এমন চমৎকার নজির থাকা সত্ত্বেও কোনো বিদ্রোহী-নেতা বিশেষত নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি অথবা ঝান্সির রানী গেরিলাযুদ্ধের নীতিগুলি বিদ্রোহের প্রথমদিকে একেবারেই প্রয়োগ করেন নি,—বিশেষ করে মধ্যভারত যখন ভৌগোলিক অবস্থার দিক থেকে গেরিলা যুদ্ধের জন্যে একটা আদর্শ অঞ্চল ছিল।

১২. মার্কস-এঙ্গেলস : ঐ, পৃ. ১৯৩

দিল্লি, লখনৌ, কানপুর ইত্যাদি বড় বড় শহরগুলি হারাবার পরও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, অযোধ্যায়, পশ্চিম-বিহারে, ছোটনাগপুরে ও মধ্যভারতে শক্তিশালী ঘাঁটি নতুন করে তৈরি করা বিদ্রোহী-নেতাদের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু একমাত্র কুমার সিং এ বিষয়ে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন ; অন্য নেতারা এই সমস্যা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামান নি।

অযোধ্যায় অনেক নদ-নদী, খাল ও বন-জঙ্গল ছিল। তাছাড়া আরো ছিল বিদ্রোহী রাজাদের অসংখ্য শক্তিশালী দুর্গ।[১৩] দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমেথি ও শংকরপুরের দুর্গগুলি ছিল ৮ মাইল পরিধির দেওয়াল, পরিখা ও দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। এই দুর্গগুলিকেই বিদ্রোহীরা তাদের ঘাঁটি এলাকার কেন্দ্ররূপে তৈরি করে নিতে পারত এবং এইসব কেন্দ্রগুলি থেকেই সুপরিকল্পিত ভাবে বহু দূরব্যাপী শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ চালাতে পারত এবং শত্রুর পক্ষে এই কেন্দ্রগুলির নিকটে আসা অসম্ভব করে তুলতে পারত। কিন্তু নেতারা তা করলেন না। তাঁরা তাঁদের এই দুর্গগুলিকে আরো শক্তিশালী করলেন এবং তাঁদের লোকজন নিয়ে শত্রুর আক্রমণের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শহরগুলিতে পূর্বে নেতারা যেমন আত্মরক্ষার (defensive) নীতি অবলম্বন করে স্থানিক যুদ্ধে (positional warfare) সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। বিদ্রোহীরা বীরের মতো লড়লেন, তাঁদের মধ্যে বহুজন নির্ভীকভাবে প্রাণ দিলেন, কিন্তু শত্রুর উৎকৃষ্টতর কামান ও এনফিল্ড রাইফেলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলো না। এই দুর্গগুলি হারাবার পরই বাধ্য হয়ে তাঁরা গেরিলাযুদ্ধের দিকে জোর দিয়েছিলেন। তখনো তাদের হাতে যথেষ্ট জনবল রয়েছে, অস্ত্রশস্ত্রও (শত্রুর থেকে নিকৃষ্ট হলেও) কম ছিল না।

মার্চ মাসে লখনৌর পতনের পর গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের জন্যে ও তারপর বর্ষার জন্যে শত্রুর শিবিরগুলিতে ইংরেজরা প্রায় অচল হয়ে বসেছিল। নিজেদের মধ্যে কোনোমতে যোগাযোগ রক্ষা করা ও রসদ জোগানোর ওপরই তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছিল। অন্যদিকে প্রায় সমস্ত গ্রামাঞ্চলগুলি ছিল বিদ্রোহীদের হাতেই। তখনো তাদের মনোবল (morale) কিছুমাত্র কমেনি। গেরিলাযুদ্ধ সংগঠন করার এটা ছিল তাদের একটা অপূর্ব সুযোগ।

এইসব বিষয়গুলি লক্ষ্য করে মার্কস তখন সঠিক ভাবেই লিখেছিলেন : "গরম কালে বিশ্রাম নেওয়া যদি ইংরেজদের স্বার্থ হয়, তবে তাদের যথাসম্ভব জ্বালাতন করাই ছিল অভ্যুত্থানীদের স্বার্থ। কিন্তু সক্রিয় গেরিলাযুদ্ধ সংগঠন করে শত্রু

১৩. বিদ্রোহীদের হাত থেকে অযোধ্যা জয় করার জন্যে ইংরেজদের ১,৫৭২টা দুর্গ ও ৭১৪টি কামান দখল করতে হয়েছিল। (Holmes, p. 523)

অধিকৃত শহরগুলির যোগাযোগ ব্যাহত করার বদলে, ছোট ছোট দলের ওপর হামলা করে খাদ্যসন্ধানী ঘোড়সওয়ারীদের জালাতন করার বদলে, রসদের জোগান অসম্ভব করার বদলে—যা নইলে বৃটিশের দখলে কোনো বড় শহর বাঁচতে পারে না—এ সবের বদলে দেশীয়রা কর বসিয়ে ও প্রতিপক্ষের দেওয়া অবসরটুকু উপভোগেই তুষ্ট থেকেছে। আরও আশ্চর্য তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেছে বলেই মনে হয়। শান্ত কয়েক সপ্তাহের সুযোগে সৈন্য পুনর্গঠিত গোলা-বারুদের গুদাম ভরে নেওয়া বা খোয়া যাওয়া কামানাদির স্থান পূরণও তারা করেছে বলে বোধ হয় না।…ইতিমধ্যে বেশির ভাগ সর্দারের সঙ্গে একটা গোপন পত্রালাপ চলছে বৃটিশ সরকারের, অযোধ্যার সমগ্র জমিটা পকেটস্থ করা এখন ইংরেজদের বিশেষ সম্ভবপর লাগছে না, ন্যায্য সর্তে পূর্বতন মালিকদের হাতেই তা ছেড়ে দিতে তারা বেশী রাজী। এইভাবে, বৃটিশদের চরম সাফল্য এখন যেহেতু সন্দেহাতীত, তাই সক্রিয় গেরিলা যুদ্ধে প্রবেশ করার পূর্বেই অযোধ্যার অভ্যুত্থান খুব সম্ভব মরে যাবে।"[১৪]

মহাবিদ্রোহের গেরিলা নেতাদের মধ্যে তাঁতিয়া টোপিই ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁর মহারাষ্ট্রে পৌঁছাবার লক্ষ্য রণনীতির (strategy) দিক থেকে ঠিকই ছিল, কিন্তু তার জন্যে যে রণকৌশল (tactics) অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল তা তিনি করতে পারেন নি। তাঁর বাহিনীকে ঠিক রাখাই ছিল তাঁতিয়ার প্রধান চেষ্টা এবং সেই অক্ষত বাহিনী নিয়ে মহারাষ্ট্রে পৌঁছানো তাঁর লক্ষ্য ; তাই তিনি সর্বদাই শত্রুকে এড়িয়ে চলতেন। শত্রুকে আক্রমণ করার সুযোগ তিনি বহুবার পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের উদ্যোগে তিনি তাদের আক্রমণ করেন নি। কেবলমাত্র যখন তিনি বাধ্য হয়েছেন তখনই তিনি ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলি ছিল দুঃসাহসিক এবং তিনি অসাধারণ নৈতিক সাহসেরও পরিচয় দিয়েছিলেন ; সংগঠন করার ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল। গোয়ালিয়ারের শোচনীয় পরাজয়ের পর তাঁতিয়া প্রায় এক বছর ধরে যে বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে খুব বেশি নেই। এই সময়ের মধ্যে তিনি বারবার বড় বড় শহর ও দুর্গ দখল করেছেন, বারবার বহু কামান, লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছেন, আবার তা সংগ্রহ করেছেন, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়েছেন, বন-জঙ্গল অতিক্রম করেছেন, নদ-নদী পার হয়েছেন ; অনেক সময় দৈনিক ৬০ মাইল অশ্বারোহণে চলেছেন। বারবার তাঁকে শত্রুবাহিনী ঘিরে ফেলেছে, বারবার তিনি শত্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

কিন্তু একথাও উপেক্ষা করা যায় না যে, এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যনির্ণয়কারী যুদ্ধগুলিতে সংকট মুহূর্তে তিনি দুর্বলতা, অক্ষমতা, এমনকি

১৪. মার্কস-এঙ্গেল্‌স : ঐ, পৃ. ১৯২-৯৩

ভীরুতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। ঝান্সির নিকট বেত্রবতী নদীর ধারে, কুঞ্চের যুদ্ধে ও গোয়ালিয়ারের যুদ্ধে—যে সময় যুদ্ধের ভাগ্য একটা সুতোয় ঝুলছিল, সেইরকম একটা গুরুতর মুহূর্তে—কোনোরকম গুরুতর কারণ না থাকা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন, তা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। পরবর্তীকালে তিনি যখন নিসার দিয়ে যাচ্ছিলেন (১৭ থেকে ২৮ নভেম্বর, ১৮৫৮), তখন তাঁর ১৫ হাজার সৈন্য ও অনেকগুলি কামান ছিল, সেইসময় তিনি ইংরেজদের ছোট ছোট দলগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্যে তাঁর গেরিলারা খুবই উৎসুক ছিল, কিন্তু তা না করার ফলে তারা হতোদ্যম হয়ে গিয়েছিল। এই-রকম আরো কয়েকবার হয়েছিল।

গেরিলা-নেতা হিসেবে তাঁতিয়ার চেয়ে কুমার সিং অনেক বেশি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। প্রয়োজন মতো তিনি শত্রুকে যেমন এড়িয়ে চলতেন, আবার সুযোগ মতো তিনি শত্রুকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর এইসব আক্রমণগুলি ছিল অসাধারণ দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। মহাবিদ্রোহে একমাত্র কুমার সিং-ই গেরিলা যুদ্ধের প্রধান নীতিটা কার্যক্ষেত্রে সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। ইংরেজরা কুমার সিংকে যেখানে দেখার একেবারেই আশা করেনি, তিনি সেখানে হঠাৎ এসে ইংরেজদের আক্রমণ করেছেন, অর্থ রসদ ও লোকজন সংগ্রহ করে আবার অন্তর্ধান করেছেন। কুমার সিং-এর গেরিলাদের হাতে আত্রাউলিয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয়, মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

মধ্যভারতে তাঁতিয়া টোপি ছাড়া, আরো দু'জন প্রসিদ্ধ গেরিলা-নেতা ছিলেন আদিল মহম্মদ ও আমানত খান। বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদিল ও আমানত ভূপাল রাজ্যের অন্যতম প্রধান দুর্গ রাহাতগড় দখল করে ভূপালের বেগমকে লিখেছিলেন: "আমরা ধর্মের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি এবং রাহাতগড় থেকে বিধর্মী ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছি।" তাঁরা বেগমকে এই বিদ্রোহ যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। বেগম বিদ্রোহে যোগ দেননি, বরং ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিলেন—সেসব ঘটনা পূর্বেই বলা হয়েছে।

রাহাতগড় ইংরেজরা পুনরায় দখল করার পর আদিল ও আমানত বহু স্থানে লড়াই করেছিলেন এবং গেরিলা পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৫৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ আক্রমণ করে তিনি সেরঞ্জের দুর্গ দখল করেছিলেন। রাওসাহেব কিছুদিনের জন্যে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯, যখন তিনি ভিলসা রাজ্যের একটা জঙ্গলে হাজার খানেক গেরিলাদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় ইংরেজরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। বহুক্ষণ ধরে লড়াই চলে এবং অনেক গেরিলার হতাহতের পর

তিনি শত্রুবেষ্টনী ভেদে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন। ১৫ই মে ভিলসা রাজ্যে পিপ্রিয়া নামক আর একটি দুর্গ তিনি দখল করলেন। এবারও ইংরেজরা তাঁকে ঘেরাও করে ফেলল। এবারও অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি সরে পড়লেন। তারপর আদিল ইংরেজ-বাহিনীকে বহুবার আগ্রা-বোম্বে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের ধারে আক্রমণ করেন। এই সময়ে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে, কেউ যদি আদিল বা তার গেরিলাদের সাহায্য করে তবে তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভোগ করতে হবে। ১৮৫৯ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর আরো কয়েকটা লড়াই হয়েছিল। তারপর আদিল সম্বন্ধে আর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি।[১৫]

মোট কথা হচ্ছে যে, শহরগুলি হারাবার পরও বিদ্রোহীদের যে জনবল ও মনোবল ছিল, তাতে তখনো তাদের জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল—তারা গেরিলাযুদ্ধের নীতিগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করেনি, তারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি ও মুক্ত অঞ্চল স্থাপন করতে পারেনি। মুক্ত অঞ্চল স্থাপন করতে পারলে—যা করা ঐ অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক অবস্থায় খুবই সম্ভব ছিল—বহুদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়া (protracted war) সম্ভব হতো। তখনকার অবস্থায় মুক্ত অঞ্চল স্থাপন করাই ছিল বিদ্রোহী নেতাদের প্রথম কর্তব্য, এবং এটাই ছিল তাঁদের পক্ষে চূড়ান্ত বিজয়ের একমাত্র পথ।

১৫. K. Srivastava : *The Revolt of 1857 in Central India-Malwa*,

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

শ ব্দ সূ চি

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥